বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

(বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ)

বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি



পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

BANGER JATIYA ITEHAS
by NAGENDRA NATH BASU

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারি ১৯৯৯

প্রকাশক :
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
সোমনাথ ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস :
টেকনোগ্রাফিক
কলকাতা-৩৫

মুদ্রক :
বসু মুদ্রণ
কলকাতা - ৪

প্রকাশকের নিবেদন

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" মূল্যবান গ্রন্থ। যা বাঙালির জাতির আত্মপরিচয় লাভের পক্ষে অপরিহার্য। দুষ্প্রাপ্য বাংলাগ্রন্থ প্রকাশের যে উদ্যোগ আমরা নিয়েছি, তারই অঙ্গ হিসাবে এই বইটি প্রকাশিত হচ্ছে পূর্ব প্রকাশিত খণ্ড অনুসরণে। প্রথম প্রকাশিত হল "বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ"। এরপর প্রকাশিত হবে "রাজন্য কাণ্ড" এবং "রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-বিবরণ"। নগেন্দ্রনাথ বসুর পরিচিতি রাজন্যকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত থাকায়, বর্তমান গ্রন্থভুক্ত হল না।

কমল চৌধুরী লিখিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

চব্বিশ পরগণা : উত্তর ● দক্ষিণ ● সুন্দরবন
অয়ন—হলুদ বসন্ত থেকে চাপরাশ
আড্ডা
স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে
অমর্ত্য সেন
অমর্ত্য সেন : অর্থনীতির মুক্তি
যুগান্তর গল্পসম্ভার
অমৃত গল্পসম্ভার
দিন বদলের গল্প
পার্বণী/কল্লোল
পিট সিগার
বাংলায় গণআন্দোলনের ছয়দশক
বাংলার নদনদী
কবি নজরুল-অ্যালবাম
সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস—স্বরূপচন্দ্র রায়
যশোহর-খুলনার ইতিহাস—সতীশচন্দ্র মিত্র
বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস
(৫টি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ একত্রে)
মধ্যযুগে বাংলা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলার ইতিহাস-নবাবী আমল—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (তিনখণ্ড)—নগেন্দ্রনাথ বসু
বৃহত্তর ঢাকার ইতিহাস
ফরিদপুরের ইতিহাস
ইতিহাসের মেদিনীপুর

সম্পাদনা প্রসঙ্গে

'বিশ্বকোষ' রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" গ্রন্থের "বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ" খণ্ডের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল। অপর দুটি খণ্ডও প্রকাশ অপেক্ষায়। বাঙালি জাতির অতীতকে যারা জানতে আগ্রহী তাদের পক্ষে এই বই অবশ্য পাঠ্য।

নগেন্দ্রনাথ ছিলেন অসাধারণ মানুষ। সাতাশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ২২ খণ্ডে "বিশ্বকোষ" সঙ্কলন করেছিলেন। যদিও "বিশ্বকোষ" রচনা শুরু করেন সাহিত্যসেবী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়। নগেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে কবিতা ও নাটক লিখেছেন এবং দুটি পত্রিকা সম্পাদনাও করেন। শেক্সপীয়রের হ্যামলেট এবং ম্যাকবেথের অনুবাদ করেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ও বাংলায় "শব্দেন্দু মহাকোষ" রচনা শুরু হলে নগেন্দ্রনাথ সঙ্কলনের দায়িত্ব নেন। এই সময়ে আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সান্নিধ্যে আসেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য হন এবং সোসাইটিতে বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বাংলার বিভিন্ন স্থান এবং ওড়িষায় ভ্রমণ করে অজস্র পুথি, শিলালিপি ও তাম্রশাসন উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত পুথি নিয়ে শুরু হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রের সম্পাদনার সঙ্গে পরিষদের পক্ষে বেশ কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থও সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত অন্যতম কয়েকখানি গ্রন্থ হল 'কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়', 'শূন্যপুরাণ', 'Archaeological Survey of Mayurbhanj', 'Modern Buddhism and its Followers in Orissa', 'Social History of Kamrup'। নগেন্দ্রনাথের সম্পাদিত বইগুলির অন্যতম হল : পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী, জয়নারায়ণের 'কাশী পরিক্রমা' এবং ভাগবতাচার্যের 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী'। নগেন্দ্রনাথ কলকাতায় কায়স্থসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'কায়স্থ' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন তিনি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল দীর্ঘকাল। এশিয়াটিক সোসাইটির ফিলোলজিক্যাল কমিটির সভ্য ছিলেন। পুরাতত্ত্বে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে "প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব" উপাধিতে সম্মানিত করা হয়েছিল। নগেন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতায় ১৮৬৬ সালের ৬ জুলাই। মারা যান ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে।

বর্তমান সংস্করণে নতুন বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সংযোজনে আছে বিদগ্ধজনের আলোচনার অংশ।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি-প্রণীত

ও

প্রকাশিত

(History of the Varendra Brahmana)

BY

NAGENDRA NATH VASU M. R. A. S.

Editor, Visvakosna , & Associate Member,
Asiatic Society of Bengal, &c., &c.

(বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ)

ব্রাহ্মণ-কাণ্ডের দ্বিতীয়াংশ

১৩৩৪

মূল্য ২॥০ টাকা।

মুখবন্ধ

বহু অসুবিধার মধ্যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ প্রকাশিত হইল। দ্বাবিংশ বর্ষ পূর্বে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-বিবরণ শেষ করিয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছিলাম। এই সময়ে রাজসাহী জেলার নানা স্থানে বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলাম। তৎকালে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রসিদ্ধ উকিল শশধর রায়, ব্রজসুন্দর সান্যাল, তালন্দার বৈষ্ণব জমিদার ৺ললিতমোহন মৈত্র, দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় প্রভৃতি রাজসাহীর নানা স্থানে গিয়া যাহাতে আমি কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারি, তৎপক্ষে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। লালৌর, মাঝেরগাঁ, নাটোর, ঘোড়ামারা প্রভৃতি স্থানে গিয়া বারেন্দ্র কুলজ্ঞ ও তাঁহাদের বংশধরগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ এবং বারেন্দ্র-কুলতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলাম। তৎকালে লালৌর ও মাঝেরগাঁয়ে প্রসিদ্ধ কুলজ্ঞগণ জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের গৃহে রক্ষিত প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত বৃহৎ বৃহৎ কুলগ্রন্থ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এই সকল প্রকাণ্ড কুলগ্রন্থ কুলজ্ঞদিগের কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক বিষয় লিখিয়া আনিয়াছিলাম, কিন্তু বহুচেষ্টায়ও তাঁহাদের গৃহস্থিত কুলগ্রন্থগুলি হস্তান্তর করিতে তাঁহারা সম্মত হন নাই। পরে পাবনা জেলার ভারেঙ্গার কুলজ্ঞদিগের গৃহ হইতে কতকগুলি পাতড়া সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই সকল পাতড়ার উপর নির্ভর করিয়া সামাজিক ইতিহাস লিখিত হইতে পারে না ভাবিয়া কিছুকাল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ লিখিতে বিরত ছিলাম। কিছুদিন পরে নদীয়া জেলাস্থ চকচণ্ডীপুরের প্রসিদ্ধ কুলজ্ঞ ৺এককড়ি রায় মহাশয়ের আত্মীয় ৺রামতারণ রায় মহাশয়ের সাক্ষাৎ লাভ করি। তাঁহার নিকট শুনিলাম, প্রথমত তিনি কুলজ্ঞের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলেও তাঁহার জীবিকানির্বাহের উপযোগী না হওয়ায় তিনি জমিদারের অধীনে তহসীলদার বা গোমস্তার কার্যে নিযুক্ত হন। তাঁহাকে আমি বিশেষ যত্ন করিয়া বর্ষাধিককাল আমার গৃহে রাখিয়া বারেন্দ্র কুলতত্ত্ব শিক্ষা করি। তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষের সংগৃহীত কুলগ্রন্থগুলি আমাকে আনিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অনেক বিষয় যাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় নাই, সেই সকল কঠিন অংশ তিনি নিজে লিখিয়া দিয়াছিলেন। বলিতে কি, তাঁহার নিকট হইতে এরূপ সাহায্য এবং তাঁহার এই প্রাচীন কুলগ্রন্থগুলি না পাইলে এই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ কখনই প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম না।

বর্তমান গ্রন্থখানি অষ্টাদশ বর্ষ পূর্বে ছাপা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কয়েকটি ফর্মার প্রুফও দেখিয়া দিয়াছিলেন। ১৬ ফর্মা পর্যন্ত মুদ্রণের পর নানা কারণে পুস্তক বন্ধ থাকে। তৎপরে কয়েকজন মহাত্মার আগ্রহে প্রথমত ময়ূরভঞ্জের ও পরে আসামের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে বিশেষরূপে ব্যাপৃত হইয়া পড়ি। কয়েক বর্ষের অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে স্নায়বিক দুর্বলতা ও হৃদরোগে আক্রান্ত হই। ক্রমশ রোগ বৃদ্ধি হওয়ায় প্রায় ৮ বর্ষ কাল গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি শেষ করিতে পারিব, সে আশা আদৌ ছিল না।

অষ্টাদশ বর্ষ পূর্বে যে ফর্মা ছাপা হইতেছিল, ছাপা হইবা মাত্র প্রত্যেক ফর্মা দপ্তরী লইয়া যায়। গত বর্ষে দপ্তরী আসিয়া সংবাদ দেয় যে ফর্মাগুলি কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইতেছে, এ সময় পুস্তক শেষ করিয়া বাহির করিতে না পারিলে সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। এ সংবাদে

প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। এই গ্রন্থের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছি, বহু অর্থব্যয় করিয়াছি,—সকলই কি বৃথা হইবে? পুস্তকখানি শেষ করিবার ইচ্ছা হইল। রোগ শয্যায় বসিয়া সহকারিগণের সাহায্যে পুস্তক ছাপাইবার ব্যবস্থা করিলাম।

৩৫ বর্ষের বহু চেষ্টায় প্রভূত অর্থব্যয়ে বঙ্গের নানা জাতির প্রায় দ্বিশতাধিক কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যাঁহারা এই সকল কুলগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই রাজনীতিক ছিলেন না। তাঁহারা যে সমাজের লোক, সেই সমাজের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া কুলকথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনেক কথাই রাজনীতিক ইতিহাসের সহিত মিলিবে না, কিন্তু তাঁহারা যে সমাজতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সেই সেই সমাজের প্রকৃত চিত্র, আভিজাত্য এবং সার্বজনীন প্রথার একটি আভাস লক্ষ্য করিতেছি। অপরাপর ব্রাহ্মণ জাতি বা শ্রেণীর এরূপ কুলগ্রন্থগুলি সংস্কৃত শ্লোকে বা বাঙ্গালা পদ্যে অধিকাংশই গ্রথিত; কিন্তু আমাদের আলোচ্য বারেন্দ্র-সমাজের কুলগ্রন্থগুলির বিশেষত্ব এই যে প্রায় সমস্তই মাতৃভাষায় গদ্যে লিখিত হইয়াছে। নিতান্ত অল্প অংশই সংস্কৃত শ্লোক বা বাঙ্গালা পদ্যে নিবন্ধ দেখা যায়। বরেন্দ্রভূমে দীর্ঘকাল বৌদ্ধ প্রাধান্য চলিয়াছিল। সাধারণের সুবিধার জন্য পূর্বতন দেশপ্রচলিত ভাষায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধাচার্যগণের ধর্মতত্ত্ব প্রচারিত হইত। আমার মনে হয় পূর্বতন প্রথা অনুসারেই বারেন্দ্র সমাজের আদি কুলকথা বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যে লিখিত হইয়াছিল। তাহাই ক্রমশ পরিবর্ধিত হইয়া বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গালা গদ্যের উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করিতেছেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের আদি কুলগ্রন্থগুলি তাঁহাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বারেন্দ্র সমাজের অংশবংশ, পটীব্যাখ্যা, কুলপঞ্জী বা কুলব্যাখ্যা, নিগূঢ় কল্প কাপ ও পটীব্যাখ্যা সমস্ত একত্র করিলে আধুনিক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কুলগ্রন্থ মহাভারত অপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ হইবে সন্দেহ নাই। যাঁহারা সামাজিক ইতিহাসের সুবর্ণসূত্র এই কুলগ্রন্থগুলি রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বাঙ্গালী চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, উপযুক্ত আলোচনা ও উৎসাহের অভাবে এই অমূল্য জাতীয় গ্রন্থগুলি অধুনা ক্রমশই ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে সামাজিক বিশুদ্ধি-রক্ষাকল্পে এই সকল গ্রন্থ রক্ষা করিতেন, আজ তাঁহারা অনেকেই কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় এবং তাহাদের বংশধরগণ প্রায় সকলেই বংশগত কুলজ্ঞের কার্য পরিত্যাগ করায় এই সকল অমূল্য গ্রন্থের সমাদর সমাজ হইতে লোপ পাইতে চলিয়াছে। অতীত সামাজিক ইতিহাসের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করি। প্রত্যেক গ্রন্থেই মূল কুলগ্রন্থের বচন যথা স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি।

আলোচ্য গ্রন্থের 'অবসাদ' ও 'পটীর বিবরণ' যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা মূল গ্রন্থের যথাযথ নকল। মূল পুথিতে যেরূপ ভাষায় বিবরণ দেওয়া আছে, দুই একটি অবোধ্য শব্দ বাদ দিয়া প্রায় সমস্তই আদর্শ অনুরূপ ছাপা হওয়ায় মূলগ্রন্থ কতকটা রক্ষিত হইল। অষ্টাদশ বর্ষ পূর্বে রচিত এই গ্রন্থের প্রথমাংশে যে ঐতিহাসিক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে, পরবর্তীকালে শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কারের সহিত তাহার কতক কতক পরিবর্তিত হইয়াছে। সে সময় মুদ্রিত গ্রন্থে বিজয় সেন ও শ্যামল বর্মাকে একই বংশীয় বলা হইয়াছে; কিন্তু নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন দ্বারা তাহা ভ্রমাত্মক স্থির হইয়াছে। বাস্তবিক শ্যামল বর্মা বর্ম-বংশীয় জাতবর্মার পুত্র হইতেছেন। যে সময় সেন বংশীয় রাজা বিজয় সেন রাঢ়দেশে আধিপত্য করিতেছিলেন, সেই সময় সামল বর্মা পূর্ববঙ্গের অধিপতি ছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থে 'প্রেমবিলাস' হইতে যে দুই পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পূর্ব দুই পংক্তি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণে ২য় সংস্করণ ১০০ পৃষ্ঠায় এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে—

"নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গানাম। মাধব আচার্যে প্রভু কৈলা কন্যাদান।
রাঢ়ীতে বারেন্দ্র বিয়ে না ভাবিও আন। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান।।"

কিন্তু এক্ষণে ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশ ও মহেশ মিশ্রের রাঢ়ীয় নির্দোষ কুলপঞ্জিকা হইতে স্পষ্টই পাইতেছি যে, মাধবাচার্য রাঢ়ীয় কুলীন ও চাটুতি গাঞি। সুতরাং প্রেমবিলাসের উক্ত শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অগ্রাহ্য।

এই পুস্তকে বীরদেবের প্রপৌত্র দর্ভপাণিকে শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণ বংশোদ্ভব বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী আলোচনার কালে বীরদেবের বংশ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ১৫০-১৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের গাঞি সম্বন্ধে এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে, "অধুনা অনেক গাঞির সন্ধান পাওয়া যায় না।" এই প্রসঙ্গে বলিতেছি—মালদহ, রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর আদি জেলার মধ্যে এবং ঢাকার পশ্চিমাংশস্থিত ভূখণ্ডে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণদিগের পূর্বতন বাস ছিল, সুতরাং ঐ সকল স্থান অনুসন্ধান করিলে গাঞি-নির্দেশক গ্রামগুলি বাহির হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য যে সকল প্রথিত বংশের পরিচয় গ্রন্থান্তরে বাহুল্য রূপে বিবৃত হইয়াছে, এই গ্রন্থে তাঁহাদের পরিচয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল এবং যে সকল খ্যাত বংশের কথা অন্যত্র প্রকাশিত হয় নাই, তাঁহাদের পরিচয় এই গ্রন্থে কিছু বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পুস্তকের প্রথমাংশ প্রকাশকালে যেরূপ শারীরিক ও মানসিক শক্তি ছিল, বর্তমান অবস্থায় সেই শক্তি ও অধ্যবসায় কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাতা আদ্যা-শক্তি ও শ্রীগুরুর চরণের উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। গ্রন্থখানির মধ্যে অনেক অভাব রহিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে পীড়া বৃদ্ধির কারণ সহকারিগণের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে ও মুদ্রাকরের অসাবধানতা বশতঃ অনেক দোষ থাকিয়া গিয়াছে ও উল্টা পাল্টা হইয়াছে। বারেন্দ্র সামাজিকগণের প্রতি আমার সানুনয় অনুরোধ, এই গ্রন্থের যে সকল অভাব ও ভ্রম পাইবেন, সুবিধামত আমাকে জানাইলে দ্বিতীয় সংস্করণে সেই সকল সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। আশা করি পাঠক ও সামাজিকগণ আমার শোচনীয় শারীরিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ১৩৩৪ সাল।

বিশ্বকোষ কুটীর
৮নং বিশ্বকোষ লেন,
বাগবাজার, কলকাতা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

সূচিপত্র

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ

বারেন্দ্র-নামকরণ

কতটা জনপদ লইয়া প্রথম বারেন্দ্রসমাজ গঠিত হইয়াছিল, জানিতে হইলে প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির প্রকৃত অবস্থান অবধারণ করিতে হইবে।

বারেন্দ্রর নামকরণ ও অবস্থান সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। এখানকার উচ্চশ্রেণীর মধ্যে একটা প্রবাদ আছে—'এক সময়ে পৌষ-নারায়ণী মহাযোগে "পাল" উপাধিধারী বার (১২) জন রাজা ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এখানে আগমন করেন। কিন্তু সেকালে পথ সুগম ছিল না, এজন্য তাঁহারা যথাসময়ে এখানে পৌঁছিয়া স্নান করিতে পারেন নাই,—পুনরায় মহাযোগের প্রতীক্ষায় সকলে এ অঞ্চলে রহিয়া গেলেন। তাঁহারা করতোয়াতীরস্থ বিভিন্ন স্থানে বাস, রাজ্যস্থাপন ও রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই বার ইন্দ্র অর্থাৎ রাজা হইতে এই স্থানের বারেন্দ্র নামকরণ হইল।' এই প্রবাদের মূলে প্রকৃত কোন ঐতিহাসিক সত্য লুক্কায়িত আছে কি না, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এদিকে বারেন্দ্র-কুলাচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে, শূরবংশীয় নৃপতি বরেন্দ্র শূর রাজসাহীর পশ্চিমে বরিন্দা নামক যে স্থানে আধিপত্য করিতেন, সেই স্থানই তাঁহার নামানুসারে "বারেন্দ্র" নামে পরিচিত হইয়াছিল। পূর্ব প্রবাদের ন্যায় কুলাচার্যদিগের এই উক্তিও কত দূর বিশ্বাসযোগ্য—তাহার উপযুক্ত প্রমাণাভাব। আবার কেহ কেহ পালরাজ নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে "ইন্দ্ররাজ" শব্দের ইন্দ্রকে বারেন্দ্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, রাজা ধর্মপালের সমসাময়িক ইন্দ্ররাজ কান্যকুব্জের অধিপতি, তাঁহার সহিত বরেন্দ্রের কোন সংস্রব নাই।[১]

বরেন্দ্রের সীমা

রাজসাহী জেলার সর্বত্রই জলাজমি-পরিবেষ্টিত উচ্চভূমি 'বরিন্দ্' নামে পরিচিত, এই 'বরিন্দ্' হইতেই 'বরেন্দ্র' বা 'বরেন্দ্রী' নাম হইয়াছে। গৌড়াধিপ বল্লাল সেনের দানসাগরের উপক্রমে সর্বপ্রথম 'বরেন্দ্রী' শব্দের সাহিত্যিক উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে 'বারেন্দ্র' বীরগণের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তাহা প্রক্ষিপ্ত বা আধুনিক রচনা বলিয়া মনে হইবে! আমাদের মনে হয় যে, অতি পূর্বকাল হইতে 'বরিন্দ্' নামেই এই স্থান অভিহিত ছিল। তৎপরে শূর বা পালরাজগণের সময়েই সংস্কৃতাকারে ইহার 'বরেন্দ্র' নাম হইয়া থাকিবে। খ্রিস্টিয় ১৩শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মিন্হাজ তাবকাত্-ই-নাসিরি নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'গঙ্গার ধারে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দুইটি পক্ষ, তন্মধ্যে পশ্চিমাংশ 'রাল' নামে এবং পূর্বাংশ 'বরিন্দ' নামে পরিচিত। পশ্চিমাংশে লখ্নোর এবং পূর্বাংশে দেওকোট অবস্থিত।'[২] মিন্হাজের উক্তি হইতে মনে হয় যে, লখ্নোর (লক্ষ্মণনগর) বর্তমান বীরভূম জেলাস্থ রাজনগর রাঢ়ের এবং বর্তমান দিনাজপুর জেলাস্থ দেওকোট বরেন্দ্রের শাসনকেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল—গঙ্গার দক্ষিণকূল হইতে রাঢ় এবং বামকূল হইতে বরেন্দ্রবিভাগ আরম্ভ।

প্রায় তিন শত বর্ষপূর্বে রচিত কবিরামের দিগ্বিজয় প্রকাশে লিখিত আছে—

'পদ্মা নদীর পূর্বধারে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে নানা নদনদীযুত বরেন্দ্র নামক দেশ। এই দেশ শর্তার্ধযোজন বিস্তৃত ও কুশকাসাদি-সংযুত, উপবঙ্গের নিকট ও মলদের দক্ষিণে অবস্থিত। যেখানে ঘর্ঘরা নামক ক্ষুদ্র সরিৎ নিয়ত প্রবাহিত, যেখানে ইন্দ্রের নিকট পর্বতগণের দর্পচূর্ণ হইয়াছিল, যেখানে বহু সংখ্যক কায়স্থের বাস ও কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের মন্ত্রিত্ব করিয়া থাকে, স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণের রাজত্ব, যেখানকার অধিবাসী প্রায়শ মৎস্যাশী এবং সাধারণে দেবীভক্ত বা বিষ্ণুভক্ত।'[৩]

আবার ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড নামক গ্রন্থে বারেন্দ্রের সংস্থান এইরূপ বিবৃত হইয়াছে

"পদ্মা নদীর পূর্বভাগে এক জলময় দেশ আছে, তাহা বরেন্দ্র নামে খ্যাত ও সর্বদা শস্যপূর্ণ। কলিকালে বরেন্দ্রের লোকেরা সকলেই প্রায় শিবভক্ত ও মদ্যমাংসরত।'[৪]

উদ্ধৃত বিবরণ কয়টি হইতে মনে হয় যে, বর্তমান মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া ও পাবনা এই কয় জেলা এবং রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহের কতকাংশ লইয়া বরেন্দ্র। ইহার উত্তরে কোচরাজ্য, দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে মহানন্দা ও পূর্বে করতোয়া।

প্রাচ্য সভ্যতার লীলাস্থলী, ঐতিহাসিক ঘটনার রঙ্গভূমি, প্রাচ্য স্থাপত্য ও প্রাচ্য অতীত শিল্পের কেন্দ্র,—প্রাচ্য জনপদের অতীত গৌরব গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্ধন যে বরেণ্য জনপদের অঙ্ক বিভূষিত করিয়াছেন, তাহাই প্রথিত বরেন্দ্রভূমি। যাঁহারা বহু পূর্বকাল হইতে এই বরেন্দ্রভূমে বাস করিয়া আসিতেছেন, অথবা যাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ শ্রেণীবিভাগকালে এই অঞ্চলে বাস করিতেন, তাঁহারাই স্থান-নামানুসারে বারেন্দ্র নামে পরিচিত। বহু প্রাচীনকাল হইতেই বরেন্দ্রভূমে ব্রাহ্মণ গমন ঘটিয়াছে, সে কথা পূর্বেই লিখিয়াছি।[৫]

রাজসাহী হইতে কুমারগুপ্তের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, এখানে খ্রিস্টিয় ৫ম শতাব্দেও বেদবিদ্-ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। সম্ভবত তাহার অনতিকাল পরে এখানে বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তারের সহিত বৈদিক কর্মকাণ্ড নিপুণ ব্রাহ্মণের অভাব হইতেছিল, তাই খ্রিস্টিয় ৭ম শতাব্দে আদিশূরের অভ্যুদয়কালে এখানে বৈদিক ক্রিয়াকুশল উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় নাই, সেজন্যই গৌড়াধিপতিকে তৎকালীন বৈদিকচর্চার প্রধান স্থান কনোজরাজসভা হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল।

কি কারণে আদিশূর এখানে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, পূর্বেই তাহার বিশদ পরিচয় দিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।[৬]

কি রাঢ়ীয় কি বারেন্দ্র এই উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহের মতে ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণ গমন হইয়াছিল।[৭]

কনোজগত ব্রাহ্মণের সংখ্যানির্ণয়

বৌদ্ধনৃপালবর্গকে পরাজয় করিয়া খ্রিস্টিয় ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ আদিশূরের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এখন যে রীতিপদ্ধতিতে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে, সেই সময় হইতেই তাহার সূত্রপাত ;—সেই সময় হইতেই বঙ্গে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের সূচনা। গৌড়ে বৈদিকাচার পুনঃপ্রবর্তনের জন্যই বহুশাস্ত্রবিৎ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশ, ভরদ্বাজগোত্রীয় মেধাতিথি, কাশ্যপগোত্রীয় বীতরাগ, বাৎস্যগোত্রীয় সুধানিধি ও সাবর্ণগোত্রজ সৌভরি এই পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্র স্ত্রী, পুত্র ও পরিজন সহিত গৌড়রাজসভায় আহূত হইয়াছিলেন।[৮] উক্ত পঞ্চ সাগ্নিকের মধ্যে ক্ষিতীশের পাঁচ পুত্র—দামোদর, শৌরি,

বিশ্বেশ্বর, শঙ্কর ও ভট্টনারায়ণ; মেধাতিথির পুত্র নয়টির অধিক—শ্রীহর্ষগৌতম, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, রবি শশী ও ধ্রুবাদি; বীতরাগের চারি পুত্র—দক্ষ, সুষেণ, ভানুমিশ্র ও কৃপানিধি; সুধানিধির দুই পুত্র—ছান্দড় ও ধরাধর; সৌভরির চার পুত্র—বেদগর্ভ, রত্নগর্ভ, পরাশর ও মহেশ্বর।[৯] কুলগ্রন্থে সপুত্র এই ৩১ জন কনোজীয় বিপ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের সহিত সমাগত পরিজনবর্গের নাম কোন ব্রাহ্মণ-কুলগ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই।

শ্রেণীভেদের কারণ

মহেশ মিশ্র রচিত নির্দোষ-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,

"দামোদরো হি বরেন্দ্রদেশে বসতিত্বাদ্বারেন্দ্র ইতি বিখ্যাতঃ, শৌরির্দাক্ষিণাত্যঃ, বিশ্বম্ভরো বেদবিহিতত্বাৎ বৈদিকঃ, শঙ্করো হি পাশ্চাত্যঃ ভট্টনারায়ণো রাঢ়ী রাঢ়দেশবসতিত্বাৎ।"

বরেন্দ্রদেশে বাসহেতু দামোদর বারেন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত, শৌরি দাক্ষিণাত্য, বিশ্বম্ভর বেদবিহিত আচরণ দ্বারা বৈদিক, শঙ্কর পাশ্চাত্য এবং ভট্টনারায়ণ রাঢ়দেশে বাসহেতু রাঢ়ীয় বলিয়া গণ্য হন। মহেশ মিশ্র আরও লিখিয়াছেন,

"বেদগর্ভস্ততো জাতস্তস্মাদ্বিষ্ণুরুদারধীঃ।
তস্মাৎ শরণিশর্মা চ ততোহভূৎ কোলসংজ্ঞকঃ॥
কোলপুত্রাবিমৌ জাতৌ নাম্না ধীরধুরন্ধরৌ।
ধীরস্তরীয়ো রাঢ়ীয়ো দাক্ষিণাত্যো ধুরন্ধরঃ॥"

(বাৎস্য সৌভরির পুত্র) বেদগর্ভ, তাঁহা হইতে উদারচরিত বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুত্র শরণিশর্মা, তাঁহা হইতে কোল নামে এক ব্যক্তি; এই কোলের দুই পুত্র জন্মে, তাঁহাদের নাম ধীর ও ধুরন্ধর; ধীর রাঢ়ীয় ও ধুরন্ধর দাক্ষিণাত্য। এতদ্ভিন্ন উক্ত নির্দোষকুলপঞ্জিকায় ভরদ্বাজগোত্রজ শ্রীহর্ষের বংশপরিচয়স্থলে লিখিত আছে,—

"জনকো দিব্যসিংহশ্চ হরির্নীলাম্বরস্তথা।
বেদগর্ভসুতা এতে সর্বে বিখ্যাতপৌরুষাঃ॥ দিব্যসিংহো মধ্যদেশী॥"

অর্থাৎ শ্রীহর্ষের অধস্তন পঞ্চম পুরুষে শত ডিণ্ডীসাঁই জন্ম গ্রহণ করেন, তৎপুত্র বেদগর্ভ, এই বেদগর্ভের বিখ্যাত চারি পুত্র জন্মে—জনক, দিব্যসিংহ, হরি ও নীলাম্বর, এতন্মধ্যে দিব্যসিংহ মধ্যদেশী।[১০]

বহু সংখ্যক কনোজীয় ব্রাহ্মণাগমনের কারণ

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশ হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে, কনোজাগত সাগ্নিক বিপ্রসন্তানগণের মধ্যে কেহ বারেন্দ্র কেহ রাঢ়ীয়, কেহ বৈদিক, কেহ পাশ্চাত্য, কেহ দাক্ষিণাত্য, কেহ বা মধ্যদেশীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। একই ব্যক্তির বিভিন্ন সন্তান বিভিন্ন শ্রেণীজাত হইলেন কিরূপে? ইহার কারণানুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুই বাসস্থানভেদে শ্রেণীভেদ ছাড়া, কনোজজাত বিপ্রগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্বাগত দাক্ষিণাত্যসমাজে মিশিলেন তাঁহারা দাক্ষিণাত্য,[১১] যাঁহারা পশ্চিমের সহিত সম্বন্ধ রাখিলেন তাঁহারা পাশ্চাত্য, এবং যাঁহারা মধ্যরাঢ়ে সপ্তশতী বা সারস্বতসমাজে মিশিয়া গেলেন, তাঁহারা মধ্যদেশী বলিয়া গণ্য হইলেন।[১২] সুতরাং দেখা যাইতেছে, কনৌজ হইতে বহু সংখ্যক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মহারাজ আদিশূরের সভায় আগমন করেন ও তাঁহাদের সন্তানগণ সকলেই গৌড়বাসী হইয়া নানা শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। এদেশীয় সাধারণের বিশ্বাস যে, পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, সেই পঞ্চ হইতেই বিরাট রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র

ব্রাহ্মণসমাজের উৎপত্তি ; কিন্তু সে বিশ্বাস এখন দূর হইতেছে। এতদ্ভিন্ন আদিশূরের যজ্ঞকালেই যে কেবল ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণই একেবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাও আমাদের বিশ্বাস হয় না। আদিশূরের যজ্ঞকালে এবং তাঁহার রাজ্য বিস্তারের সহিত নানা স্থানে হিন্দুধর্ম-প্রচারের আবশ্যকতা হওয়ায় বহু সংখ্যক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেজন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণগণের আনান অসম্ভব নহে। এছাড়া ৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে বৈদিকমার্গপ্রবর্তক কনোজপতি যশোবর্মদেবের মৃত্যু হওয়ায়[১৩] এবং তৎপুত্র চক্রায়ুধ-আমরাজ জৈনধর্ম গ্রহণ করায়[১৪] ও সেই সঙ্গে কনোজে জৈনপ্রভাব বিস্তৃত হওয়ায়[১৫] স্বধর্মনিরত বৈদিক বিপ্রগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করাই শ্রেয়োজ্ঞান করিয়াছিলেন। স্বধর্মরক্ষা হইবে ও সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিবেন ভাবিয়াই তাঁহারা গৌড়ে আগমন করেন এবং বৈদিকভক্ত মহারাজ আদিশূরের নিকট শাসনলাভ করিয়া তাঁহারা গৌড়বাসী হইয়াছিলেন।

আদি শাসনগ্রাম

বঙ্গীয় কুলাচার্য হরি মিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্র আদিশূর কর্তৃক পঞ্চ সাগ্নিককে পঞ্চ শাসনগ্রামদানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[১৬] কিন্তু ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে খ্রিস্টিয় ১১শ শতাব্দে খোদিত ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি ও খৃঃ ১১শ শতাব্দে রচিত নারায়ণের 'ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রকাশ' আলোচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যেমন বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ কনোজ হইতে এদেশে আগমন করেন, তাঁহাদের সুখে বসবাসের জন্য গৌড়পতি তেমনি বহু সংখ্যক শাসনগ্রামও দান করিয়াছিলেন।[১৬] তন্মধ্যে সাবর্ণগোত্রজ ভবদেব ভট্টের পূর্বপুরুষ ১ম ভবদেব গৌড়পতির নিকট "শ্রীহস্তিনী" নামে তাঁহার মনোমত শাসন পাইয়াছিলেন।[১৮] এইরূপে নারায়ণের আদিপুরুষ বাৎস্যগোত্রজ ধর্ম "কাঞ্জিবিল্লী" শাসন লাভ করেন। এইরূপে আরও কত ব্যক্তি শাসন পাইয়াছিলেন, প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধারের সহিত সে সকল গ্রামের নামও বাহির হইতে পারে।

যতদিন আদিশূর জীবিত ছিলেন, ততদিন কনোজাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ গৌড়মণ্ডলে বৈদিক ধর্মপ্রচারের সুযোগ ও অবসর পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনাবসানকালে পশ্চিমোত্তর গৌড়ে ও মগধে বৌদ্ধ জনসাধারণ একত্র হইয়া বপ্যটের পুত্র গোপালকে মগধে অভিষিক্ত করিল এবং তাঁহার দ্বারা পুনরায় বৌদ্ধপ্রাধান্য স্থাপনের আয়োজন চলিতে লাগিল।[১৯] কিন্তু মগধপতি গোপাল বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ আদিশূরের প্রভাব খর্ব করিতে সমর্থ হন নাই।

ধর্মপালের অভ্যুদয়

দীর্ঘকাল পঞ্চগৌড় শাসন করিয়া মহারাজ আদিশূর ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তৎপুত্র ভূশূর পৌণ্ড্রবর্ধনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি পিতার মত সাহসী, রাজনীতিকুশল ও শক্তিশালী ছিলেন না। তাঁহারই সময়ে মগধপতি গোপালের পুত্র ধর্মপাল (প্রায় ৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে) পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া যথেষ্ট বলসঞ্চয় করিতেছিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ ও আধিপত্য অল্পদিন-মধ্যে সমস্ত উত্তরগৌড়ে বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে দাক্ষিণাত্যের প্রবলপরাক্রান্ত রাষ্ট্রকূটপতি গোবিন্দ-শ্রীবল্লভ[২০] এবং উত্তর-ভারতে যশোবর্মপুত্র চক্রায়ুধ আমরাজ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ দুই পরাক্রান্ত নৃপতির সহিত বৌদ্ধরাজ ধর্মপাল আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।[২১] এইরূপে বলদৃপ্ত হইয়া বৌদ্ধভূপতি ধর্মপাল মহারাজ ভূশূরের রাজ্য পৌণ্ড্রবর্ধন-বিজয়ের উদ্যোগ করিলেন। আদিশূরের পুত্র

ভূশূর বৌদ্ধ-অভিযান কিছুতেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি ধর্মপালের নিকট পৌণ্ড্রবর্ধন হারাইয়া রাঢ়দেশ আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। যে রাঢ়বাসী সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে আদিশূর পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন,[২২] এখন তাঁহাদের বংশধরগণ ভূশূরকে আশ্রয়দান করিলেন। ধর্মপাল ও তৎপরবর্তী পালরাজগণ একপ্রকার সমস্ত পূর্বভারতের অধীশ্বর হইলেও সমস্ত রাঢ়দেশ অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। ধর্মপাল রাঢ়দেশ অধিকারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার তাম্রশাসন হইতেই জানা যায় যে, তিনি রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিবার জন্য পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে তাঁহাদিগকে বহু সমৃদ্ধ গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু ধর্মপালের সকল কৌশল ব্যর্থ হইয়াছিল। ভূশূর ও তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল ব্রাহ্মণ্যধর্ম-রক্ষাপূর্বক স্বাধীনভাবে রাঢ়ভূমি ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

রাঢ়দেশবাসী সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের এরূপ অদ্বিতীয় প্রভাবের কারণ কি? রাঢ়ীয় কুলাচার্য নূলাপঞ্চানন তাহার এইরূপ অস্ফুট পরিচয় দিয়াছেন,—

"সাতশতী দ্বিজগণে, পটু শূদ্রের যাজনে,
নাহি যাতে বেদ অধিষ্ঠান।
বিধিসিদ্ধ ক্রিয়াদায়, শূদ্রেও যে গোত্র পায়,
যে যার চরণে লয় স্থান।।...
সাতশতী দ্বিজ যারা, আগে শূদ্র জাতি ধারা,
যে হেতু ব্রাহ্মণ্যে ছিল বাম।...
* * * * * *
সাতশতী দ্বিজ যারা, মিশেল হইল তারা,
কান্যকুব্জ দ্বিজ সমাগতে।।"

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সমস্ত রাঢ়দেশবাসী এই সকল সপ্তশতী ব্রাহ্মণের অনুরক্ত ভক্ত ছিল। সমস্ত রাঢ়দেশে সাধারণের উপর তাঁহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল এবং নীচ জাতিকে উচ্চ করিয়া লইবার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল; কিন্তু আদিশূরের অভ্যুদয়ে রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বর্তমান অবস্থা চিরদিন সমান থাকিবে না। তাঁহারা ব্রাহ্মণসন্তান হইলেও নবাগত বেদবিৎ ব্রাহ্মণসমাজের নিকট শূদ্রবৎ হেয় হইতেছেন এবং কনোজবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণের প্রতি আদিশূরের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়াই তাঁহারা নবীন রাজার নিকট যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদালাভে বঞ্চিত হইতেছেন, তাহাও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়ের সহিত যদি বৌদ্ধাধিকার বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে আর তাঁহাদের স্থান হইবে না;—আজ তাঁহারা জনসাধারণের উপর যেরূপ কর্তৃত্ব চালাইতেছেন, এই অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তি জলবুদবুদ্‌বৎ বিলীন হইবে। বিচক্ষণ রাজা আদিশূরও নবলব্ধ রাজ্যের সামাজিক ব্যবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের প্রাচীন-ব্রাহ্মণ-বংশের প্রতি তখন দেশের সাধারণ লোকের অচল অটল বিশ্বাস ও ভক্তি বর্তমান। রাজশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে সমাজশক্তি আয়ত্ত করা আবশ্যক। সপ্তশতী বিপ্রগণ তৎকালে সমাজশক্তির এক প্রকার পরিচালক ছিলেন। তাই মহারাজ আদিশূর সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগকে সম্মানিত করিয়া এবং তাঁহাদিগকে গ্রামনগরাদি শাসনদান করিয়া স্বীয় রাজ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সংবর্ধনার সময়েই সপ্তশতীয় গাঞির উৎপত্তি হইয়াছিল। সপ্তশতী

ব্রাহ্মণেরাও পূর্বোক্ত পরিণাম চিন্তা করিয়াই আদিশূরের আহ্বানে রাঢ়দেশের বীরপুত্রগণকে লইয়া গৌড়াধিপের ছত্রতলে উপনীত হইয়াছিলেন। গৌড়াধিপ তাঁহাদিগের সামাজিক সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং কনোজাগত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত পরে তাঁহাদিগকে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া শূদ্রাপবাদ হইতে তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণশক্তির সংস্রবে আদিশূরের রাজশক্তি সংবর্ধিত হইয়াছিল। পরে যখন ধর্মপালের সময় আবার প্রবল বৌদ্ধবন্যায় শূর-রাজশক্তি ভাসিয়া যাইবার উপক্রম ঘটিল, তখন সেই ব্রাহ্মণশক্তিই আপনার সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য আশ্রয়ে শূররাজবংশকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় রাঢ়দেশে হিন্দুধর্মপ্রচারের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল।

প্রথম রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজ

পৌণ্ড্রবর্ধন বৌদ্ধ নৃপতি ধর্মপালের করায়ত্ত হইলে দেশের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধসংঘর্ষে একটা আন্তর্জাতিক বিপ্লব উপস্থিত হইল। এই বিপ্লবের সময়ে উক্ত সাগ্নিক বিপ্রগণের সন্তানগণ মধ্যে কেহ পৌণ্ড্রবর্ধনের নিকটবর্তী বরেন্দ্রভূমে স্ব স্ব শাসনগ্রামে রহিলেন, কেহ বা তাঁহাদের আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক শূর-নৃপতির সহিত রাঢ়দেশবাসী হইলেন। কেহ দাক্ষিণাত্য কেহ বা পাশ্চাত্যসমাজে মিশিলেন। যে কয়জন রাঢ়দেশে আগমন করেন, তাঁহাদের মধ্য শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ দক্ষ, বাৎস্য ছান্দড়, ভরদ্বাজ শ্রীহর্ষ ও সাবর্ণ বেদগর্ভ এই পঞ্চ মহাত্মার নাম রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। ঐ পাঁচ জন ছাড়া পঞ্চগোত্রের মধ্যে আরও অনেকে যে রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন, নারায়ণের "ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ" ও ভবদেবভট্টের কুল প্রশস্তি হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। তাঁহাদের সদাচার, বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য ও কর্মনিষ্ঠায় রাঢ়দেশে আবার সনাতন হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্রমে নবাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহাদের বংশধরগণ রাঢ়বাসী জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সময় হইতেই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রের সমাজগত প্রভেদ দৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল।

রাঢ়ীয় কুলাচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে, ভূশূরের পুত্র রাজা ক্ষিতিশূর রাঢ়বাসী ৫৬ জন সাগ্নিক বিপ্রসন্তানকে ৫৬ খানি শাসন বা কুলস্থান দান করিয়াছিলেন। সেই ৫৬ খানি কুলস্থান হইতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৫৬ গাঞি (গ্রামী) প্রচলিত ছিল; কিন্তু তদপেক্ষা প্রাচীনতম প্রমাণ হইতে পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, মহারাজ আদিশূরের সময়েই সাবর্ণগোত্র রাঢ়দেশে "হস্তিনী" গ্রাম ও বাৎস্যগোত্র "কাঞ্জিবিল্লী" গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। এ ছাড়া রাঢ়ের অধিবাসী যে সকল বিপ্রের সাহায্যে আদিশূর আপন রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশধরগণ যাঁহাদের প্রভাবে রাঢ়দেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সকল বিপ্রগণও রাঢ়াগত সাগ্নিক বিপ্রদিগকে বহু শাসন বা কুলস্থান প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন, নারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রকাশ হইতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৩]

বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি রাঢ়ীয় কুলাচার্যগণের মতে, বাৎস্যগোত্রজ ছান্দড়ের পুত্রগণের মধ্যে গুণাকর চৌৎখণ্ডী অর্থাৎ চতুর্থখণ্ডবাসী, নারায়ণ কাঞ্জারি বা কাঞ্জিবিল্লী ও মহাযশা বাপুলী গ্রামবাসী অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তি হইতেই ঐ সকল গাঞি আরম্ভ।[২৪] এখন কিন্তু কাঞ্জিবিল্লীয় নারায়ণের উক্তি হইতে জানিতেছি যে, গুণাকর, নারায়ণ, অথবা মহাযশা ঐ সকল গ্রাম লাভ করেন নাই, কাঞ্জিবিল্লী বা কাঞ্জারি-গ্রামলাভ বহু পূর্বেই ঘটিয়াছিল। উক্ত কাঞ্জারি-গ্রামের অংশ সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের অধিকারে ছিল। বাচস্পতি মিশ্রই লিখিয়াছেন

যে, মহারাজ আদিশূর সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগকে যে ২৮ খানি গ্রাম দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "কাশ্যপকাঞ্জারী" একটি।[২৫] পূর্বকালে কাশ্যপকাঞ্জারী সপ্তশতীগণ ধনে মানে অতি ক্ষমতাশালী ছিলেন। পার্শ্ববর্তী কনৌজীয় বাৎস্য কাঞ্জারিদিগের সহিত তাঁহাদের আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল। এই আত্মীয়তাসূত্রেই কাঞ্জিবিল্লীয় পরিতোষ রাঢ়ের ভূম্যধিকারী সপ্তশতী বিপ্রগণের নিকট হইতে তালবাটি, চতুর্থখণ্ড, পিশাচখণ্ড, বাপুলী ও হিজ্জল গ্রাম লাভ করিয়া 'বসুধাভুজ' অর্থাৎ ভূম্যধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ঐ পঞ্চগ্রামের মধ্যে তালবাটি[২৬] ও পিশাচখণ্ড এই দুই গ্রামের নাম কুলগ্রন্থে নাই। পরিতোষের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রকাশকার কাজিবিল্লীর নারায়ণের নাম অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিল ; তাঁহার বহু শতাব্দী পরবর্তী বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি রাঢ়ীয় কুলাচার্যগণ সম্ভবত এই নারায়ণ হইতেই কাঞ্জিবিল্লী বা কাঞ্জারি গাঞির উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। বারেন্দ্র-সমাজেও এইরূপে বহু গাঞির উৎপত্তি হইয়াছে, সে কথা পরে লিখিব। রাজা আদিশূর কর্তৃক সপ্তশতী বিপ্রগণ রাজসম্মানিত ও তাঁহার চেষ্টায় কনৌজীয় বিপ্রগণ কেহ কেহ সপ্তশতী বিপ্রসহ সম্বন্ধস্থাপন করিলেও নিষ্ঠাবান অধিকাংশ সাগ্নিক বিপ্রসন্তান প্রথমত এ দেশীয় বিপ্রগণের সহিত সম্মিলিত হইতে প্রস্তুত হন নাই। গৌড়রাজধানী বৌদ্ধ-কবলিত হইলে স্বধর্মহানির ভয়ে তাঁহারা নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময়েই যিনি যেরূপ সুবিধা বোধ করিয়াছিলেন, তদানুসারে বিভিন্ন সমাজে মিশ্রিত হইলে তাঁহাদের বংশধরগণ বারেন্দ্র, রাঢ়ীয়, পাশ্চাত্য বা দাক্ষিণাত্য, বৈদিক ইত্যাদি আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। রাঢ়দেশে আসিয়া কিছুদিন মধ্যেই তাঁহাদের সহিত বিশেষভাবে সপ্তশতী-সংস্রব ঘটে ; ধন, মান ও ঐশ্বর্য-লাভ তাহার প্রধান কারণ। তাঁহারা যে রাঢ়দেশে আসিয়া কেবল সপ্তশতী বিপ্রগণের নিকট গ্রাম লাভ করিয়া 'গ্রামণী' বা ভূম্যধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা নহে। রাঢ়াগত ভূশূরবংশীয় নৃপতিগণের নিকট হইতেও তাঁহারা নানা শাসনগ্রাম লাভ করিয়া তত্তদ্‌গ্রাম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বহুদিন পূর্বে আমরা লিখিয়াছিলাম—

(রাঢ়ীয় বিপ্রগণের) "৫৬ গ্রামের অবস্থান নির্ণয় করিবার সময় দেখা গেল, যে সকল গ্রাম নাম হইতে সপ্তশতীগণের গাঞি নির্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকল গ্রামের অধিকাংশই উপরোক্ত সীমার মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে। এতদ্বারা বোধ হইতেছে, আদিশূর বা তৎপুত্র ভূশূরের সময় সপ্তশতীগণের গাঞি নিরূপিত হয় নাই। ক্ষিতিশূরের সময়ে তাঁহারই যত্নে প্রথমে ২৮টি এবং তাঁহার মৃত্যুর বহু শতবর্ষ পরে আরও কতকগুলি গাঞির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।" (জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১ম অংশ ১ম সংস্করণ, ১২৫ পৃঃ)

এখন কিন্তু আলোচনায় বুঝিতেছি, ঐ উক্তি ঠিক নহে। সপ্তশতীগণ বহু পূর্বেই রাজা আদিশূরের নিকট শাসনগ্রাম লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই পরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে যথাসর্বস্য অর্পণ করিয়া স্ব স্ব অধিকারমধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। এরূপস্থলে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের গাঞিমালার সৃষ্টির পূর্বেই সপ্তশতীদিগের গাঞি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ক্রমে রাঢ়াগত কনৌজীয় বিপ্রসন্তানগণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ও শূর-নরপতিগণের নিকট বহু বিত্ত ও কুলস্থান লাভ করিয়া পাণ্ডিত্যে ও ঐশ্বর্যে অসাধারণ শক্তিশালী হইয়া পড়িলেন। এখানকার দেশাধিপ হইতে অতি দীনদুঃখী পর্যন্ত সকলেই তাঁহাদের পদানত ও একান্ত ভক্ত হইয়া পড়িল। যে সারস্বত বিপ্র এক সময়ে রাঢ়ের এক প্রকার সর্বময় প্রভু

হইয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহাদের বংশধরগণ কনৌজীয় বিপ্রগণের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা যে যে গ্রামের গ্রামণী বলিয়া এক সময়ে পূজিত ও বিশ্রুত ছিলেন, এখন সেই সকল গ্রাম কনৌজীয় বিপ্রগণের অধিকারভুক্ত হইতে লাগিল। এমন কি কুলস্থানসমূহের সংস্থান আলোচনা করিলে, অনায়াসেই মনে হইবে যে, রাঢ়দেশের প্রায় অর্ধাংশ ভূমি পরে কনৌজীর বিপ্রগণের ভোগ্য হইয়াছিল।[২৭] এখন হইতে রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ বলিলে আর কেহ রাঢ়ের পূর্বতন অধিবাসী সপ্তশতী বিপ্রগণকে বুঝিত না, কনৌজীয় ব্রাহ্মণের রাঢ়াগত বংশধরগণই রাঢ়ীয় নামে প্রখ্যাত হইলেন। রাঢ়ের সেই পূর্ব ব্রাহ্মণগণ তখন হইতেই সপ্তশতী শ্রোত্রিয় নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

বৈদিকমার্গ-চ্যুতির কারণ

দুঃখের বিষয়, কিছুকাল পরেই রাঢ়াগত কনৌজীয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সন্তান-সন্ততিগণ অনেকেই ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া সনাতন বৈদিকমার্গ পরিত্যাগে উদ্যত হইলেন। বরেন্দ্র ও পৌণ্ড্রবর্ধনে তৎকালে বৌদ্ধরাজগণের প্রশ্রয়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। বরেন্দ্র অঞ্চলে যে সকল সাগ্নিক বিপ্রসন্তানগণ বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা পূর্বেই রাজসম্মান লাভের আশায় আপাত মনোরম বৌদ্ধতান্ত্রিক মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। খ্রিস্টিয় ১০ম শতাব্দে বৌদ্ধতন্ত্রানুরক্ত পাল নৃপতিগণ উত্তররাঢ় অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে তৎকালে উত্তররাঢ়েও বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছিল।[২৮] নারায়ণের ছন্দোগ-পরিশিষ্ট প্রকাশ হইতে জানা যায় যে, প্রথমত বেদবিৎ কনৌজীয় ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ রাজগণের ক্রিয়াকলাপ ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। তাঁহাদের প্রতিগ্রহ করিতে কেহই সম্মত হন নাই। অবশেষে কাঞ্জিবিল্লীর উমাপতি প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ প্রভূত বিত্তলাভাশায় রাজা জয়পালের নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করেন। বলিতে কি, এই রাজানুগ্রহ লাভের সময় হইতেই রাঢ়ীয় বৈদিক বিপ্রগণের বেদবিচ্যুতি ঘটিবার সূত্রপাত হইল। বলিতে কি তৎপরে উত্তররাঢ়ে রাঢ়ীয় বিপ্রগণের মধ্যে প্রকৃত বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

উত্তররাঢ়ের পাল নরপতিগণের মধ্যে মহীপাল একজন সর্বপ্রধান ; এক সময়ে বারাণসী পর্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহারই সময়ে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতান্ত্রিক শ্রীজ্ঞান অতীশের অভ্যুদয় হয়। অতীশ পূর্ববঙ্গবাসী, তিনি অসাধারণ যোগজ্ঞানপ্রভাবে "দীপঙ্কর" খ্যাতি লাভ করেন। স্বয়ং গৌঁড়পতি মহীপাল শ্রীজ্ঞানের নিকট বৌদ্ধ তারামন্ত্র গ্রহণ করেন. তদ্‌বধি মহীপালের মুদ্রায় তারামূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। অল্পদিনের মধ্যেই মহীপালের বিশাল অধিকাব মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ তারাদেবীর ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং বৈদিকমার্গ এককালেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুখের বিষয়, দক্ষিণরাঢ় হইতে তখনও বেদবিদ্ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের এককালে অভাব ঘটে নাই।

সুদূর দাক্ষিণাত্যের তিরুমলয়-শৈললিপি হইতে জানা যায়, দিগ্বিজয়ী মহাবীর রাজেন্দ্র চোলের অভ্যুদয়কালে দক্ষিণরাঢ়ের প্রভাব ও সমৃদ্ধির কথা দিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তখনও দক্ষিণরাঢ় শূরবংশীয় নৃপতির শাসনাধীন ছিল।[২৯] তৎকালে বারেন্দ্র ও উত্তরাঢ়ের সিংহাসনে মহীপাল, দণ্ডভুক্তি বা বিহারে ধর্মপাল, পূর্ববঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র এবং দক্ষিণরাঢ়ে রণশূর অধিষ্ঠিত ছিলেন। সূর্যবংশীয় রাজেন্দ্র চোল দিগ্বিজয় উপলক্ষে (প্রায় ১০১২ খ্রিস্টাব্দে) উক্ত নৃপতিচতুষ্টয়কে পরাজিত করিয়া গঙ্গাতীর পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন।[৩০] তাঁহারই অনতিকাল পরে মহাবীর হরিবর্মদেব প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার

তাম্রশাসন ও রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের 'ভবভূমিবার্তা' হইতে জানিতে পারি যে, মহারাজ হরিবর্মদেব দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত জৈন এবং বৌদ্ধ নৃপতিগণকে পরাস্ত করিয়া একাম্রকাননে হরিহর বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবদেবীর শত শত মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[৩১] সেই জৈন ও বৌদ্ধ নৃপালবর্গের নাম কুলগ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও সে সময়ের ঐতিহাসিক ও অন্যান্য ঘটনাপরম্পরা অনুসরণ করিলে তন্মধ্য হইতে আমরা দক্ষিণাপথপতি রাজেন্দ্র চোল ও গৌড়-নরনাথ মহীপালকে গ্রহণ করিতে পারি। তিরুমলয়-শৈলের জিনালয়সমূহে যে সকল দানের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়, তাহাতে রাজেন্দ্র চোল ও তাঁহার পরিবারবর্গের কেবল জৈনধর্মানুরাগই সূচিত হইয়াছে। এইরূপ মহীপালের শিলালিপিতে তাঁহার প্রবল তান্ত্রিকবৌদ্ধ ধর্মানুরাগ লক্ষিত হয়। মহারাজ হরিবর্মদেব ঐ সকল প্রবলপরাক্রান্ত জৈনও বৌদ্ধ-ভূপতিকে পরাজিত করিয়া বঙ্গ ও কলিঙ্গের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেবব্রাহ্মণভক্তি ঘোষণা করিবার জন্য ভুবনেশ্বরে শত শত দেবকীর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণরাঢ়ের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণশিরোমণি অশেষশাস্ত্রবিদ্ ভবদেব ভট্ট তাঁহার বিশ্রামসচিব হইয়াছিলেন। এই সময় মহাত্মা ভবদেব বৌদ্ধপ্রভাব হইতে রাঢ়ীয় সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য নানা বৈদিক ও দার্শনিক নিবন্ধ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি নিজ সমাজভুক্ত ব্রাহ্মণসন্তানকে বৈদিককর্মনিরত রাখিবার জন্য "সংস্কার-পদ্ধতি" প্রচলিত করেন। পূর্বেই লিখিয়াছি, তৎকালে উত্তররাঢ় হইতে বৈদিকাচার এককালে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়, দক্ষিণরাঢ়েও সেই সংক্রামক ব্যাধি যে কিছু না কিছু প্রবেশ করিতেছিল, এমন নহে। ভবদেবের অভ্যুদয়ে দক্ষিণরাঢ় বৈদিকতা পরিশূন্য হইতে পারে নাই। রাঢ়ীয় কুলতিলক সেই ভবদেবের ঐকান্তিক যত্নে বঙ্গে ও কলিঙ্গে বৈদিক ও পৌরাণিক আচার অক্ষুণ্ণ ছিল।

মহারাজ হরিবর্মদেবের সময়েই সুলতান মামুদ কান্যকুব্জ আক্রমণ করেন। মুসলমান আক্রমণ ও ধর্মলোপের আশঙ্কায় বহু সংখ্যক বৈদিকব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে পলাইয়া আসিয়াছিলেন।[৩২] তাঁহাদের আগমনে বঙ্গদেশে বৈদিকাচার রক্ষার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল।

মহারাজ হরিবর্মদেবের প্রভাব গঙ্গার উত্তরতীরে বিস্তৃত হয় নাই। উত্তররাঢ় ও গঙ্গার পরপারস্থ বারেন্দ্র হইতে গয়া পর্যন্ত তখনও বৌদ্ধাধিকার চলিতেছে। রাজেন্দ্র চোল (প্রায় ৯৪৩ শকে) যখন উত্তররাঢ় পর্যন্ত জয় করেন, তৎকালে দক্ষিণাপথের বহু সামন্তনৃপতি তাঁহার বলবৃদ্ধি করিতেছিলেন। রাজেন্দ্র চোলের প্রত্যাবর্তন কালে সকল সামন্তই যে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। তন্মধ্যে সামন্ত সেনের নাম শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে বাহির হইয়াছে। মহারাজ হরিবর্মদেবের অভ্যুদয় কালে দাক্ষিণাত্য রাজবংশীয় সামন্ত সেন (সম্ভবত তাঁহারই অধীন সামন্তরূপে) ভাগীরথী তীরে তীর্থবাস করিতে ছিলেন।[৩৩] তিনি অথবা তাঁহা পুত্র হেমন্ত সেন দক্ষিণরাঢ়ের শূরবংশীয় নৃপতির কন্যা বিবাহ করিয়া অনেকটা সহায়সম্পত্তিশালী হইয়াছিলেন।[৩৪] হেমন্ত সেনের অসাধারণ বীরত্ব, অপূর্ব সাহস ও তৎকর্তৃক পরাক্রান্ত নৃপালবর্গের পরাজয় কাহিনী মহাকবি উমাপতি ধরের লেখনী দ্বারা জ্বলন্ত ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে।

হেমন্ত সেন প্রথমে রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী মতে, (দক্ষিণ রাঢ়ের) শূরবংশীয় শেষ নৃপতি স্ববংশ ধ্বংস করিয়া স্বর্গলাভ করিলে তাঁহার

রাজ্যে অরাজকতা ঘটিয়াছিল। ঐ সময়ে হেমন্ত সেন সেই অরাজক রাজ্য অধিকার করিয়া "শ্রীধর" উপাধি গ্রহণ করেন।[৩৫] অধিক সম্ভব, অপুত্রক অবস্থায় দক্ষিণরাঢ়ের শেষ শূররাজ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে রাজ্যাধিকার লইয়া প্রথমে একটু গোলযোগ ঘটিয়াছিল, তৎপরে দৌহিত্রবংশ বলিয়া হেমন্ত সেন দক্ষিণরাঢ় অধিকার করেন। ক্রমে তিনি প্রভূত বলসঞ্চয় করিয়া বিপক্ষ নৃপতিগণকে জয় করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিলেন। তাঁহার অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত উত্তররাঢ় বৌদ্ধ পাল নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু হেমন্ত সেনের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া মহীপালপুত্র নয়পাল প্রায় ৯৬৫ শকে বিক্রমশিলায়[৩৬] রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন, সেই সঙ্গে উত্তররাঢ় হেমন্ত সেনের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু তখনও গঙ্গার উত্তর তীর বারেন্দ্র হইতে গয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ পালরাজগণের অধীন ছিল।

নয়পালদেব একজন গোঁড়া বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে প্রধান ইষ্টদেব ভাবিয়া অনেক সময় তাঁহার পদতলে বসিয়া পরমার্থ উপদেশ শুনিতেন। নয়পালের উৎসাহে ও শ্রীজ্ঞানের যত্নে ঐ সময় বৌদ্ধ-তান্ত্রিকমত গৌড়ের সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। তৎকালে তিব্বত প্রভৃতি বহু দূরদেশ হইতে শত শত পণ্ডিত বৌদ্ধতান্ত্রিক উপদেশ লাভ করিবার জন্য বিক্রমশিলায় আগমন করিতেন। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ সকলেই তান্ত্রিক তারাদেবীর উপাসনায় ও তান্ত্রিক গুহ্যসাধনে আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। এমন কি, শ্রীজ্ঞানের তত্ত্বোপদেশপূর্ণ বক্তৃতায় ও অমানুষিক ক্রিয়াকলাপদর্শনে সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল, গৌড়বঙ্গ তন্ত্রময় হইয়া উঠিতেছিল।

পূর্বেই লিখিয়াছি, মহারাজ হরিবর্মদেবের উৎসাহে এবং তাঁহার বেদবিদ্‌মন্ত্রিগণ ও কনোজাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে রাঢ় ও বঙ্গে বৈদিকাচার প্রবর্তনের সুবিধা হইতেছিল, কিন্তু পালরাজগণের নিকট পূজিত শ্রীজ্ঞানপ্রমুখ তান্ত্রিকগণের প্রভাবে আবার সেই গতি ফিরিবার উপক্রম হইল। বিজয় সেনের শিলালিপি হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সামন্ত সেন, হেমন্ত সেন ও তৎপুত্র মহারাজ বিজয় সেন ইহারা সকলেই বৈদিকাচারনিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং প্রথমত সেন-নৃপতিগণও যে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণকে নিরস্ত করিবার জন্য উপায় অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেনবংশের সহিত দাক্ষিণাত্যের বৈদিকাচার রাঢ়দেশে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। হেমন্তপুত্র মহারাজ বিজয় সেন গৌড়, রাঢ়, বঙ্গ ও উৎকল অধিকার করিয়া ৯৯৪ শকে গৌড়মণ্ডলে এবং তাঁহার প্রিয়পুত্র শ্যামল বর্মা বিক্রমপুরে (সম্ভবত যৌবরাজ্যে) অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে শুনক, শৌনক, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ প্রভৃতি সম্মানিত পাশ্চাত্য বৈদিক বিপ্রগণ গৌড়বাসী হইয়াছিলেন।[৩৭] পিতাপুত্রের উদ্যোগে গৌড়মণ্ডলে বিশেষভাবে বৈদিকাচার প্রবর্তনের চেষ্টা হইতেছিল। কনোজাগত পাশ্চাত্য-বৈদিকগণ রাজশাসন লাভ করিয়া গৌড়বঙ্গের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। রাজা বিজয় সেনের শাসনকালে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরে প্রবাহিত গঙ্গা হইতে দক্ষিণে উৎকলের সীমা পর্যন্ত সর্বত্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচারের বিপুল আয়োজন চলিয়াছিল। তিনি দেবব্রাহ্মণভক্ত ও বৈদিকাচার-প্রবর্তনে বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন বলিয়া, কুলগ্রন্থকারগণ তাঁহাকে ২য় আদিশূর নামে পরিচিত ও তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। বলিতে কি, মহারাজ বিজয় সেন ও তৎপুত্র শ্যামল বর্মার প্রভাবে রাঢ়দেশের উচ্চজাতীয় জনসাধারণ মধ্যে বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম বদ্ধমূল হইতে পারে নাই।

মহারাজ বিজয় সেন ও শ্যামল বর্মা তখনকার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসমাজের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। সকলেই বিজয় সেনকে হিন্দুধর্মের রক্ষক বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারই প্রভাবে তৎপুত্র মহারাজ বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ সমাজেরও ব্যবস্থাপক হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১. বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ, "পালরাজবংশ" শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।
২. Col. Raverty's Tabakat-i. Nasiri, p.545-46.
৩. "পদ্মানদ্যাঃ পূর্বধারে ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে। বরেন্দ্রসংজ্ঞকো দেশো নানানদনদীযুতঃ।। ৭৫৫
শতার্ধযোজনৈর্যুক্তো দেশো দূর্ভাদিসংযুতঃ। উপবঙ্গসমীপে চ মলদস্য চ দক্ষিণে।। ৭৫৬
ঘর্ঘরা সরিতাং ক্ষুদ্রা বহতে যত্র বৈ সদা। পর্বতানাং নিরসনং যত্র শক্রেণ কারিতম্।। ৭৫৭
কায়স্থা বহুলা যত্র ব্রাহ্মণস্য চ মন্ত্রিণঃ। স্থানে স্থানে দ্বিজাঃ সর্বে ভাবিনো রাজ্যকারিণঃ।।
মৎস্যানাং জলজন্তূনাং খাদকাঃ প্রায়শো জনাঃ। দেবীভক্তা বিষ্ণুভক্তাঃ প্রাণিনো হি বরেন্দ্রকাঃ।। ৭৬৩"
(দিগ্বিজয়প্রকাশ)
৪. "পদ্মাবত্যাঃ পূর্বভাগে দেশো জলময়ো মহান্। বরেন্দ্রদেশো বিজ্ঞেয়ঃ শস্যাঢ্যঃ সর্বদা নৃপ।।
বরেন্দ্রবাসিনঃ সর্বে শিবভক্তিপরায়ণাঃ। মদ্যমাংসরতাঃ প্রায়া ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।"
৫. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ, (২য় সংস্করণ) ৬১ হইতে ৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৬. ঐ ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ ১০০-১১২ পৃষ্ঠা এবং কায়স্থকাণ্ডে আদিশূরের বিস্তৃত পরিচয় দ্রষ্টব্য।
৭. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ, (২য় সংস্করণ) ১০৫ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা পাঠ করুন।
৮. "আয়াতা বিপ্রবর্যাঃ শুচিতরহৃদয়াঃ পঞ্চ কোলাঞ্চদেশাৎ।
সস্ত্রীকাঃ পুত্রযুক্তাঃ পরিজনসহিতাঃ সাগ্নয়ঃ কান্তিমন্তঃ।।" (বাচস্পতি মিশ্র—কুলরাম)
৯. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম অংশ, ১০৩ ও ১০৪ পৃষ্ঠা।
১০. মেদিনীপুরবাসী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে "মধ্যদেশী" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে রাঢ়দেশের মধ্যভাগই মধ্যদেশ বা মধ্যরাঢ় বলিয়া গণ্য ছিল।
১১. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড), ৬ষ্ঠ অংশ, ৩ পৃষ্ঠার দাক্ষিণাত্য-পরিচয় দ্রষ্টব্য।
১২. মধ্যদেশ বা মধ্যরাঢ়ই সপ্তশতীগণের প্রধান সমাজ। যে সকল গ্রাম হইতে সপ্তশতীগণের গাঞি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রধান গ্রামগুলি এই মধ্যরাঢ়েই অবস্থিত। [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ ১মাংশ ৯৯ পৃষ্ঠা ও ২য় ভাগ ৪র্থ অংশ ৮৬ ও ১১৩ পৃষ্ঠা।]
১৩. Dr. R Bhandarkar's Report on the Search of Sanskrit Mss. (1887) P. 18.
১৪. রাজশেখরের প্রবন্ধকোষ ও প্রভাবকচরিত দ্রষ্টব্য।
১৫. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ১১শ ভাগ ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
১৬. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম অংশ (২য় সংস্করণ) ১১১-১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
১৭. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম অংশ (২য় সংস্করণ) ৩০৯ পৃষ্ঠা।
১৮. "স শাসনং গৌড়নৃপাদবাপ শ্রীহস্তিনীদিষ্টমহীষ্টভূমিঃ!" (ভবদেবের কুলপ্রশস্তি ৭ম শ্লোক)
১৯. খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত ধর্মপালের শিলালিপি।
২০. মুঙ্গের হইতে আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটপতি শ্রীবল্লভের কন্যা রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার গর্ভে দেবপালের জন্ম।
২১. ভাগলপুর হইতে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন এবং প্রভাবকচরিত দ্রষ্টব্য।
২২. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১মাংশ, সপ্তশতী বিবরণ দ্রষ্টব্য।
২৩. সাধারণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য পরে (বাৎস্যগোত্রজ) নারায়ণের স্বরচিত বংশপরিচয় উদ্ধৃত হইল—
"যস্যাজ্ঞা জয়তি শ্রুতিস্মৃতিময়ী যৎপাদপাথোময়ো
ধর্মঃ কৈশ্চিদুপাস্যতে সুকৃতিভির্গঙ্গেত্যভিক্ষাং গতঃ।
যং জ্যোতির্ময়মন্তরুত্তমতমশ্ছেত্তং পুরস্কুর্বতে
সন্তঃ পাতু জগচ্চতুর্মুখগিরামর্থঃ স দেবো হরিঃ।

ইহ জগতি বন্দিতপদাঃ সদা নরেন্দ্রৈঃ পবিত্রজন্মানঃ।
বসুধাভুজঃ তিনাভূষণ্ কাঞ্জিবিল্লীয়াঃ।।[২]
অবতি মহতি যেষামন্বয়ে সোমপীথী
সমজনি পরিতোষশ্ছন্দসাং দেহবন্ধঃ।
অলভত স হি বিপ্রাচ্ছাসনং তালবাটীং
তদিহ ভজতি পূজামুত্তরা যেন রাঢ়া।।[৩]
তস্মাচ্চতুর্থখণ্ডং পিশাচখণ্ডং তথা চ বাপুলী।
হিজ্জলবনাদিকমপরং নিঃসৃতমনঘং কুলস্থানম্।।[৪]
যজ্ঞেহথ ভুবনত্রয়পাবনহেতুরেকঃ
শ্রৌতে বিধৌ সততনির্মলধীপ্রসারঃ।
প্রাক্‌পূজিতো বিবিধ-সংসদি ধর্মনামা
নামানুরূপচরিতঃ পরিতোষসূনুঃ।।[৫]
তস্মাদজায়ত সদায়তনং গুণানাং
ভদ্রেশ্বরো নিখিল-কোবিদবন্দনীয়ঃ।
মধ্যে সতাং ক্ষিতিমতাং প্রথমাভিধেয়ঃ
সেবাভিষক্ত-হৃদয়ঃ পদয়োর্মুরারেঃ।।[৬]
তস্মাদ্‌গদাধর ইতি দ্বিজচক্রবর্তী
রাজপ্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ-মানসোহভূৎ।
পুণ্যানি কেবলমহর্নিশমর্জ্জয়ন যঃ
শান্তশ্চিরায় সময়ং গময়াম্বভূব।।[৭]
তস্মাদ্ভুবিতসাব্ধিভূমিবলয়ঃ শিষ্যোপশিষ্যব্রজৈ-
বিদ্বন্মৌলিরভূদুমাপতিরিতি প্রাভাকরগ্রামণীঃ।
ক্ষ্মাপালাজ্জয়পালতঃ স হি মহাশ্রাদ্ধং প্রভূতং মহা-
দানং চার্থিগণার্হণার্দ্র হৃদয়ঃ প্রত্যগ্রহীৎ পুণ্যবান্।।[৮]
তস্যাত্মজঃ সুকৃতবানথ কৃতসর্বস্বদক্ষিণো বহুধা।
উদিয়ায় গোননামা গুরুরিব তন্ত্রে পুরাণজ্ঞঃ।।[৯]
শশ্বদ্বিপ্রজনীননির্মলগুণে ভূলোকবাচস্পতৌ
প্রেঙ্খৎকীর্তিসরিৎপ্রবাহনিবহ প্রক্ষালিতাশামুখে।
যস্মিন্ কৃষ্ণপদৈকলীনহৃদয়ে ধর্মাধিকারাস্পদং
বিভ্রাণে দ্বিজমন্দিরাণ্যধিবসন্ নিধুতদোষাঃ শ্রিয়ঃ।।[১০]
জাতস্ততঃ স্মৃতিপুরাণবিদাদুপাস্যবিদ্যাপ্রভাকরমতস্থিতিলব্ধকীর্তিঃ।
নম্রঃ সতাং সদসি বিপ্রজনেষু চ শ্রীনারায়ণঃ সততকৃষ্ণপরায়ণাত্মা।।[১১]
ছন্দোগপরিশিষ্টস্য সর্বাত্মা লোকহেতবে।
পরিশিষ্টপ্রকাশাখ্যশ্চক্রে তেনৈব ধীমতা।"[১২]

ভাবার্থ—যাঁহার আজ্ঞাই শ্রুতিস্মৃতিময়ী, যাঁহার পাদপাথোময় গঙ্গাস্বরূপেই অভিহিত ধর্ম সুকৃতিগণ কর্তৃক উপাসিত, (অপরপক্ষে শ্রীহরিচরণপরায়ণ যে ধর্মের কথাই শ্রুতিস্মৃতি ভাবিয়া সদাচারী ব্যক্তিগণ যাঁহার উপাসনা করিত।) যে জ্যোতির্ময়কে সেবা করিলে মানসজাত অন্ধকারজাল বিচ্ছিন্ন হয়, ব্রহ্মবাক্যপ্রতিপাদক সেই দেব হরি জগতের রক্ষা করুন। সর্বদা নরেন্দ্রবৃন্দবন্দিত পবিত্রজন্মা কাঞ্জিবিল্লীয় (ধর্মবংশীয়) কত মহাত্মাই ভূম্যধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশাল বংশের ভূমি-শাসনকালে ছন্দোগপরিশিষ্ট গ্রন্থপ্রণেতা সোমপায়ী পরিতোষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে তালবাটী শাসন লাভ করেন। তাহাতেই উত্তররাঢ় জগতে পূজিত হইয়াছে। তাঁহা হইতে চতুর্থখণ্ড, পিশাচখণ্ড, বাপুলী, হিজ্জলবন প্রভৃতি অন্যান্য পবিত্র কুলস্থান হইয়াছিল। তদনন্তর ধর্ম নামক পরিতোষের পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। নির্মলমতি, নামানুরূপচরিত্র সেই মহাত্মা বিবিধ সভায় সম্মানিত হইয়া বেদোক্ত নিয়মানুষ্ঠানে ভূমণ্ডল পবিত্র করিয়াছিলেন। কোবিদবৃন্দ-বন্দনীয়, নিখিল সদ্‌গুণাশ্রয়, শ্রীহরির চরণচিন্তাপরায়ণ, সাধুগণেব অগ্রণী ভদ্রেশ্বর তাঁহা হইতে জন্ম লাভ করেন। ভদ্রেশ্বরের পুত্র দ্বিজচক্রবর্তী গদাধর রাজপ্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হইয়া সর্বদা কেবল পুণ্যরাশি উপার্জন করিয়াই সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। প্রভাকর-গ্রামণী উমাপতি তাঁহার পুত্র। সেই পণ্ডিতকুলচূড়ামণি উমাপতির শিষ্য ও উপশিষ্যবর্গে সসাগরা

ধরা পরিব্যপ্ত হইয়াছিল। পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা যাচকবৃন্দের সৎকারে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া মহারাজ জয়পালের নিকট হইতে অতিশ্রদ্ধাসহকারে দেয় প্রভূত মহাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র গোণ পুরাণশাস্ত্রে পারদর্শী ও তন্ত্রশাস্ত্রে বৃহস্পতিসদৃশ অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। পুণ্যাত্মা গোণ বহু বার সর্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র কীর্তিপ্রবাহে দিঙ্মণ্ডল বিধৌত হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণবর্গের মঙ্গলকর নির্মল গুণাবলীতে সর্বদা ভূষিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে ধর্মাধিকার প্রভুত্ব ব্রাহ্মণগৃহে ন্যস্ত থাকায় শ্রী কলঙ্কবিরহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্তান শ্রীনারায়ণ পুরাণশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। পণ্ডিতসভায় ও ব্রাহ্মণবর্গের নিকট নম্রস্বভাব সর্বদা কৃষ্ণপরায়ণ নারায়ণ উপাস্য বিদ্যা ও প্রভাকর মত স্থাপন দ্বারা কীর্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনিও লোকহিতার্থে ছন্দোগপরিশিষ্টের সর্বশ্রেষ্ঠপরিশিষ্ট প্রকাশাখ্য টীকা রচনা করেন।

২৪. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম অংশ (২য় সংস্করণ) ১১৮ পৃষ্ঠা।
২৫. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম অংশ (২য় সংস্করণ) ৯১ পৃষ্ঠা।
২৬. কুলগ্রন্থে "তৈলবাটি" নাম পাওয়া যায় ; কেহ ঐ তৈলবাটি ও তালবাটি এক মনে করিতে পারেন, কিন্তু দুইটি এক নহে। তালবাটি বাৎস্যগোত্রের, কিন্তু তৈলবাটি শাণ্ডিল্যগোত্রের কুলস্থান।
[জাতীয় ইতিহাস ১মাংশ (২য় সংস্করণ) ১২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]
২৭. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম অংশ ১২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
২৮. পর অধ্যায়ে বল্লাল সেন-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক মতের পার্থক্য লিপিবদ্ধ হইল।
২৯. E. Hultzsch's South Indian Inscriptions, Vol. I. p. 99.
৩০. তিরুমলয়-শৈলা লিপি।
৩১. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৩য় অংশ ৬ দ্রষ্টবা।
৩২. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৩য় অংশ ৬ দ্রষ্টব্য।
৩৩. দেওপাড়া হইতে আবিষ্কৃত বিজয় সেনের শিলালিপি।
৩৪. রাঢ়ীয় কুলাচার্যকারিকা।
৩৫. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৩য় অংশ ১৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
৩৬. কাহারও মতে বর্তমান ভাগলপুরের নিকট সুলতানগঞ্জ নামক স্থানে, কাহারও মতে বর্তমান নাম শিলাও, বেহার মহকুমার নিকট।
৩৭. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৩য় অংশে বৈদিক বিবরণ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বারেন্দ্র গাঞি-বিবরণ

পূর্ব অধ্যায়ে সংক্ষেপে দেখাইয়াছি, আদিশূরের সময় সাগ্নিক ব্রাহ্মণাগমনকাল হইতে গৌড়াধিপ বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেন সময় পর্যন্ত গৌড়বঙ্গের ব্রাহ্মণসমাজে কিরূপ ঘন ঘন রাজপরিবর্তনের সঙ্গে আচার-পরিবর্তনেরও সূত্রপাত হইতেছিল। রাঢ়দেশে কিছুকাল বৈদিক প্রভাব থাকিলেও গৌড় বা বারেন্দ্র অঞ্চলে রাজা ভূশূরের গৌড় ত্যাগের সঙ্গে বৌদ্ধপ্রভাবই সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছিল।

পূর্বেই জানাইয়াছি, শাণ্ডিল্যগোত্রজ ক্ষিতীশ, ভরদ্বাজগোত্রজ তিথিমেধা বা মেধাতিথি, কাশ্যপগোত্রজ বীতরাগ, বাৎস্যগোত্রজ সুধানিধি এবং সাবর্ণগোত্রজ সৌভরি এই পঞ্চ ধর্মাত্মা গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন। কিন্তু কি হেতু জানি না, বারেন্দ্রকুলজ্ঞগণ এই সকল নাম এককালে পরিত্যাগ করিয়া যথাক্রমে উক্ত পঞ্চমহাত্মার পুত্র শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণ, ভরদ্বাজ গৌতম, কাশ্যপ সুষেণ, বাৎস্য ধরাধর ও সাবর্ণ পরাশর এই পঞ্চ মহাত্মাকেই পশ্চিম হইতে প্রথম গৌড়াগমনকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।[১] রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ যে এক পিতার সন্তান, যেন এ কথা বলিতেও কুণ্ঠিত! কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলজ্ঞগণ পূর্ব পিতার নাম গোপন করিয়া যান নাই।[২] এমন কি বহু পরবর্তীকালেও রাঢ়বাসী বৈষ্ণবগ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন—

"রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিয়া আন।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান।।"

(যদুনন্দন দাসের প্রেমবিলাস)

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই উভয় সমাজ মধ্যে তৎকালে বিশালকায়া গঙ্গা ব্যবধান, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাজগণের অধিকার এবং পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র গাঞি নামে পরিচয় দিবার প্রথা প্রচলনের সঙ্গে সম্ভবত এই দুই সমাজ মূলে এক হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে, যে সময় হইতে গাঞি নামে পরিচয় দিবার প্রথা প্রচলিত হইল, সেই সময় হইতেই উভয় সমাজের আত্মীয়তা উভয়ে বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। কিরূপে বারেন্দ্র-সমাজে বিভিন্ন গাঞি প্রচলিত হইল, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি—

গৌড়ের পালরাজগণ সাধারণত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও তাঁহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গোঁড়ামি ছিল না, বরং তাঁহারা ধর্মনির্বিশেষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। গৌড়াধিপ ধর্মপাল একজন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ছিলেন. খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত তাঁহার তাম্রশাসন-পাঠে জানা যায়, তিনি লাট (বা রাঢ়) বাসী ব্রাহ্মণ কয়েকজনকে বুদ্ধ ভট্টারকের পূজায় নিযুক্ত করেন ও গৌড়ের নিকটই চারিখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই চারিখানি গ্রামের নাম ক্রৌঞ্চশ্বভ্র, মাঠাশাল্মলী, পলিতক ও গোপীপ্পলী। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময়ে কনোজাগত সাগ্নিক বিপ্রসন্তানগণের মধ্যে রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র এরূপ কোন শ্রেণীবিভাগ হয় নাই। সুতরাং ধর্মপালের শাসনগৃহীতা উক্ত লাটদ্বিজগণকে

রাঢ়ের পূর্বতন সারস্বত বা সাতশতী ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়। এদিকে বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থ হইতে পাইতেছি—ধর্মপাল বারেন্দ্রবীজী শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝাকেও যজ্ঞান্তে দক্ষিণাস্বরূপ স্বর্ণরৌপ্যাদি সহ গঙ্গাতীরে 'ধামসার' গ্রাম দান করেন।[৩] এরূপ স্থলে বৌদ্ধরাজ ধর্মপালের নিকট এখানকার পূর্বতন ব্রাহ্মণ ও কনোজাগত ব্রাহ্মণ সন্তান উভয় পক্ষই শাসনগ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থে আদি গাঞি ওঝার প্রকৃত নামের উল্লেখ নাই, সম্ভবত তিনিই প্রথমে গ্রাম লাভ করিয়া প্রথম গ্রামণী বা আদিগাঞি নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

কেবল শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঞি ওঝা বলিয়া নহে, দিনাজপুর জেলাস্থ বুদালের গরুড়-স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায়, শাণ্ডিল্য-গোত্রোদ্ভব বীরদেবের প্রপৌত্র দর্ভপাণি মিশ্র পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে পালরাজগণের নিকট সম্মানিত ও মন্ত্রিত্ব করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গরুড়স্তম্ভলিপিতেই লিখিত আছে, দর্ভপাণি মিশ্রের মন্ত্রণাগুণে দেবপালের রাজ্য দক্ষিণে বেবা হইতে উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। দর্ভপাণির পুত্র সোমেশ্বর 'পরমেশ্বর-বল্লভ' অর্থাৎ গৌড়রাজের অতিপ্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। সোমেশ্বরের পুত্র কেদার মিশ্রও শূরপালের মন্ত্রিত্ব করিয়া গিয়াছেন। 'মাতঃ শৈলসুতা সপত্নী বসুধা' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গঙ্গাস্তব-প্রণেতা গুরব মিশ্র উক্ত কেদার মিশ্রেরই পুত্র এবং নারায়ণ পালের মন্ত্রী ছিলেন। বলা বাহুল্য রাজমন্ত্রিত্বকালে এই শাণ্ডিল্যগোত্রজ ব্রাহ্মণগণ যে বহু শাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

খৃস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দে রচিত চতুর্ভূজ মিশ্রের "হরিচরিত" নামক কাব্য হইতে জানা যায়, কাশ্যপগোত্রীয় বিপ্রবর স্বর্ণরেখ রাজা ধর্মপাল হইতে 'করঞ্জ' নামক গ্রাম লাভ করেন। এই গ্রামে বহুতর শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ ও কাব্যশাস্ত্রবিশারদ বিপ্রগণ বাস করিতেন। উক্ত কাশ্যপ স্বর্ণরেখের বংশধর ভল্লু উক্ত স্থানে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক আচার্যপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই ভল্লুকাচার্যের পুত্র আচার্য প্রবর দিবাকর।[৪] বারেন্দ্রকুলগ্রন্থসমূহে এই দিবাকরকে করঞ্জগ্রামী বলা হইয়াছে। পূর্ব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি, নারায়ণের বহুপুরুষ পূর্বে শাসনলাভ ঘটিলেও নারায়ণপাল হইতেই যেরূপ রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থসমূহে কাঞ্জারী গাঞির উৎপত্তি নিদৃষ্ট হইয়াছে, আচার্য দিবাকর হইতেও করঞ্জ গাঞির উৎপত্তি-কথা সেইরূপ বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ করঞ্জগ্রামদাতা রাজা ধর্মপালকে গৌড়াধিপ প্রথম ধর্মপাল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বারেন্দ্র কাশ্যপগোত্রের আদিবংশাবলী পাঠ করিলে কখনই তাহা স্বীকার করা যায় না। পূর্বে বলিয়াছি, ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঞি রাজা ধর্মপালের নিকট শাসনগ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। ঐ ভট্টনারায়ণের সমসাময়িক সুষেণের অধস্তন অষ্টমপুরুষে স্বর্ণরেখ জন্মগ্রহণ করেন। এরূপস্থলে স্বীকার করিতে হইবে, আদি গাঞি ওঝার ৬।৭ পুরুষ পরে অর্থাৎ গৌড়াধিপ প্রথম ধর্মপালের দ্বিশতাধিক বর্ষ পরে করঞ্জগ্রামদাতা অপর ধর্মপাল আবির্ভূত হন। [ঐতিহাসিক পারম্পর্যনির্দেশার্থে ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে শাণ্ডিল্য ও কাশ্যপগোত্রের আদিবংশাবলী উদ্ধৃত হইল।]

দক্ষিণাপথের অধীশ্বর রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয়-শৈললিপি হইতে জানা গিয়াছে, যখন তিনি এদেশে দিগ্বিজয় উপলক্ষে আগমন করেন, তৎকালে দক্ষিণরাঢ়ে রণশূর, উত্তররাঢ়ে মহীপাল এবং দণ্ডভুক্তিতে ধর্মপাল রাজত্ব করিতেছিলেন। খৃস্টিয় একাদশ শতাব্দের প্রথম অংশে রাজা রাজেন্দ্র চোল উক্ত শূর ও পাল নৃপতিদিগকে পরাজয় করিয়া গিয়াছেন।

খৃস্টিয় নবমশতাব্দীর প্রথমাংশে ধামসারগ্রামদাতা ধর্মপালের অভ্যুদয়, এরূপ স্থলে পাল

বংশের ইতিহাস, তিরুমলয়-শৈললিপি ও বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে প্রথম ধর্মপাল হইতে দ্বিতীয় ধর্মপাল দুই শত বর্ষ পরবর্তী হইতেছেন।

শাণ্ডিল্যগোত্র

১. ভট্টনারায়ণ
|
২. আদিগাঞি ওঝা
(ধামসারগ্রাম প্রাপ্ত)
|
৩. জয়মাণভট্ট
|
৪. হরিকুজ
|
৫. বিদ্যাপতি
|
৬. রঘুপতি
|
৭. শিবাচার্য
|
৮. সোমাচার্য
|
৯. উগ্রমণি
|
১০. তপোমণি
|
১১. সিন্ধুসাগর
|
১২. বিন্দুসাগর

*১৩. জয়সাগর (বারেন্দ্র) — মণিসাগর (রাঢ়ী)

জয়সাগর (বারেন্দ্র):
১৪. আদিমাধব (চম্পটিগাঞি) — মৌনভট্ট (নাম্ন্যাসীগাঞি) — স্বর্ণরেখ (সিহরিগাঞি) — পীতাম্বর (লাহেড়ীগাঞি)

পীতাম্বর (লাহেড়ীগাঞি):
১৫. সাধু বাগছী (বল্লালীকুলীন) — রুদ্র বাগছী (বল্লালীকুলীন) — লোকনাথ লাহেড়ী (বল্লালীকুলীন)

কাশ্যপগোত্র

১. সুষেণ
২. ব্রহ্মাই ওঝা
৩. দক্ষ
৪. পীতাম্বর
৫. হিরণ্যগর্ভ
৬. বেদগর্ভ
৭. ভৃগর্ভ বা জিগনি

৮ স্বর্ণরেখ — ভবদেব (রাঢ়ী) — হরদেব — নরদেব — ভূদেব

৯ সন্দুক্য ওঝা — বিন্দুমিশ্র — অঙ্গদ — কৃষ্ণাত্রি

১০ কৈতাই (ভাদুড়িকুল) — মৈতাই (মৈত্রকুল) — গরুড় (দত্তক) — ধনঞ্জয় — বিনায়ক মিশ্র (মৌহাল) — শক্তিধর (রাণিহারি) — সত্যাচার্য

সঞ্জয়

১১ সঙ্কর্ষণ — বাসুদেব — ১১ স্থির

শান্তিকর — ধৃতিকর (পারিসান) — বসুদেব (মধুগ্রামী) — সুমতি (বালষষ্টিক)

১২ ভাল্লুকাচার্য (ভল্ল) — ডাঁসওঝা — ১২ দৌরাচার্য

১৩ মহানিধি

৭ ভৃগর্ভ

১৩ যোগেশ্বর (ভাদুড়ি গাঞি) — দিবাকর (করঞ্জগাঞি) — (মৈত্রগাঞি)

৮ নরদেব

১৪ ভিকু (দানে পতিত বর্ণব্রাহ্মণ) — ১৪ বৃহস্পতি

৯ কৃষ্ণার্তি

১০ সত্যাচার্য (মসগ্রামী) — সত্যসিংহ (ভদ্রগ্রামী) — ভূপতিমিশ্র (কলগ্রামী) — কৌশিকমিশ্র (সহগ্রামী) — অনন্ত (বটগ্রামী) — সংগ্রীব (বেলগ্রামী)

১৫ শূল (সাতটা সমাজ) — কূপ (মধ্যগ্রাম সমাজ)

৭ভৃগর্ভ

৮ অজয়

১৮ ভূরাম্বর (সাতটা) — কেশবওঝা (আঙ্গারো) — মাধব (বাচড়া)

৯ ভূরিশ্রবা

১০ গণপতি (কুঞ্জগ্রামী) — রুদ্রপতি (বীজগ্রামী) — বিষ্ণুমিশ্র (ঘোষগ্রামী) — সুদর্শন (ছবিগ্রামী)

'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' রচয়িতা মহিমাচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন "বল্লাল সেনের রাজত্বের বহুপরেও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে নতুন নতুন গাঞির সৃষ্টি হইয়াছে।" কিন্তু আমাদের মনে হয়, গৌড়াধিপ বল্লাল সেনের সময়ে ও তাঁহার পূর্বেই বিভিন্ন রাজার নিকট বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন সময়ে যে সকল শাসন লাভ করিয়াছিলেন, বল্লাল সেনের সময়েই তাঁহাদিগের একশত গাঞি স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, বল্লাল সেন যখন কুলমর্যাদা প্রদান করেন, তৎকালে গৌড়ে ১০০, মগধদেশে ৫০, ভোটদেশে ৬০ জন, রভাঙ্গদেশে ৬০ জন, উৎকলে ২২ জন ও মোড়ঙ্গে ২২ জন এইরূপ সর্বত্র ব্রাহ্মণস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন।[৫]

বারেন্দ্রকুলে যে একশত গাঞি নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তন্মধ্যে কাশ্যপগোত্রে আঠার, শাণ্ডিল্যগোত্রে চৌদ্দ, বাৎস্যগোত্রে চব্বিশ, ভরদ্বাজগোত্রে চব্বিশ ও সাবর্ণগোত্রে বিংশতি গাঞি।[৬] যথা— মৈত্র, ভাদুড়ী, করঞ্জ, বালয়ষ্ঠি, মোধাগ্রামী, বলিহারী, মোয়ালি, কিরল, বীজকুঞ্জ, শরগ্রামী, সহগ্রামী, কটিগ্রামী, মধ্যগ্রামী, মঠগ্রামী, গঙ্গাগ্রামী, বেলগ্রামী, চমগ্রামী ও অশ্রুকোটি কাশ্যপগোত্রে এই আঠার গাঞি।[৭] রুদ্রবাগছি, লাহেড়ি, সাধুবাগছি, চম্পটী, নন্দনাবাসী, কামেন্দ্র, সিহরী, তাড়োয়ালবিশী, মৎস্যাশী, চম্প, সুবর্ণ, তোটক, পূষাণ ও বেলুড়ি শাণ্ডিল্যগোত্রে এই চতুর্দশ গাঞি।[৮] সান্ন্যাল, ভীমকালী, ভট্টশালী, কামকালী, কুড়মুড়ি, ভাড়িয়াল, লক্ষ, জামরুখী, সিমলী, ধোলালি, তানুরি, বৎসগ্রামী, দেউলি, নিদ্রালী, কুক্কুটী, বোঢ়গ্রামী, শ্রুতবটী, অক্ষগ্রামী, সাহরি, কালীগ্রামী, কালিহয়, পৌণ্ড্রকালী, কালিন্দী ও চতুরাবন্দী বাৎস্যগোত্রে এই চতুর্বিংশতি গাঞি।[৯] ভাদড়, লাড়ুলি, ঝামাল (ঝম্পটি), আতুর্থী, রাই, রত্নাবলী, উচ্ছরখি, গোচ্ছাসি, বাল, শাকটি, শিম্বিবহাল, সরিয়াল, ক্ষেত্রগ্রামী, দধিয়াল, পুতি, কাছটি, নন্দীগ্রামী, গোগ্রামী, নিখটি, পিপ্পলী, শৃঙ্গখোর্জার ও গোস্বালম্বি, ভরদ্বাজগোত্রে এই চতুর্বিংশতি গাঞি।[১০] সিংদিয়াড়, পাকড়ী, দধি, শৃঙ্গী, মেদড়ি, উন্ধুড়ি ধুন্ধুড়ি, তাতোয়ার, সেতু, নইগ্রামী, নেধুড়ি, কপালী, টুট্টরি, পঞ্চবটী, খণ্ডবটী, নিকড়ি, সমুদ্র, কেতুগ্রামী, যশোগ্রামী ও শীতলী সাবর্ণগোত্রে এই বিংশতি গাঞি নির্দিষ্ট হইয়াছিল।[১১] কিন্তু "কুলশাস্ত্রদীপিকা" নামক গ্রন্থে কাশ্যপগোত্রে মৈত্র, ভাদুড়ী, করঞ্জ, বালযষ্টিক, মধুগ্রামী, রানিহরি, মৌহানি, কিরিণী, বিজকুঞ্জ, সহগ্রামী, বিষোৎকটা, পারিস্বামী, মঠগ্রামী, মধ্যগ্রামী, গঙ্গাগ্রামী, বলগ্রামী, আথর্বীজ, কটিগ্রামী এবং বেলগ্রামী। শাণ্ডিল্যগোত্রে রুদ্রবাগছি, লাহিড়ী, সাধুবাগছি, চম্পটী, মন্দনাবাসী, কামেন্দ্র; শিহরী, ভড়াল, বিশাখা (বিশীগাঞি), মৎস্যাশী, জম্বু, সুবর্ণ, তোড়ক, পূসলা, বেলড়ী, বিল্বগ্রামী, থুড়থুড়ী, বেতগ্রামী ও তাড়য়াল। বাৎস্যগোত্রে—সঙ্গামিনী (সান্ন্যাল), ভীমকালী, ভট্টশালী, কামকালী, কুড়মুড়ি, ভারিয়াল, লক্ষ, জমরুখি, শীতল, তালড়ী, দেবলী, বাৎস্যগ্রামী, নিদ্রালী, কুর্কটী, পৌণ্ড্রবর্ধনী, বোড়গ্রামী, স্রোতবটী; অক্ষগ্রামী, কটগ্রামী, কালীগ্রামী, কালীহায়, ঘোষগ্রামী, তন্ত্রকেলী, নাগাশূর, শিবতটা ও বৈশালী। ভরদ্বাজগোত্রে—ভাদড়, লাউল, ঝাঞো, আতর্থী, রাই, রত্নাবলী, ওশ্রুখী, গোচণ্ডী, বাল, কাঁচড়ী, সিংবহাল, সাড়িয়াল, ক্ষত্রিগ্রামী, দধিয়াল, পুতি, বৃহতী, নন্দগ্রামী, পিপ্পলী, খর্জ্জুরী, গোসালাক্ষী, গোগ্রামী, নিঘটী, বোলোৎকটা ও ভগ্রামী এবং সাবর্ণগোত্রে—সিংদিয়াড়, পাপূড়ী, দধি, শৃঙ্গী, মেদড়ী, উখড়ি, ধুকড়ি, বাড়গ্রামী, আলস্য, শেতকগ্রামী, নৈগ্রামী, কলাপী, টুট্টরী, পুণ্ড্রবর্ধনী, পঞ্চবটী, খণ্ডবটী, নিখটী, সমুদ্র ও শীতলী গাঞির নাম দৃষ্ট হয়।

ইহা ব্যতীত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে যেরূপ গ্রামনাম বা পাঠান্তর পাইয়াছি, এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা গেল। যথা—

কাশ্যপগোত্রে—মোদাগ্রামী স্থলে মধুগ্রামী, বলিহারী স্থলে রানিহারী, মোয়াঁলি স্থলে মৌহালি, কিরল স্থলে কিরণ; সরগ্রামী স্থলে ছবিগ্রামী, সহগ্রামী স্থলে সুস্থগ্রামী, কটিগ্রামী স্থলে কটগ্রামী, মধ্যগ্রামী স্থলে পারিশ, গঙ্গাগ্রামী স্থলে ভদ্রগামী, অশ্রুকোটী স্থলে ঘোষকচ্ছ নাম দৃষ্ট হয়। এইরূপ শাণ্ডিল্যগোত্রে—কামেন্দ্র স্থলে কালিন্দী, তাড়োয়াল স্থলে তটগ্রামী, পুষাণ স্থলে পুড়াল। বাৎস্যগোত্রে—কুড়ম্ব স্থলে কুড়মুড়ি সিমলী স্থলে শীতলী, ধোসালি স্থলে বিশালা, তানুরি স্থলে তালুড়ি, শ্রুতবটী স্থলে স্রোতবটী, সাহরি স্থলে শিব, পৌণ্ড্রকালী স্থলে পৌণ্ড্রবর্ধনী। ভরদ্বাজ গোত্রে—গোচ্ছাসি স্থলে গোৎসাস, সরিয়াল স্থলে কাঞ্চগ্রামী এবং সাবর্ণগোত্রে—সিংদিয়াড় স্থলে সিংহদিদলক, পাকড়ী স্থলে পাঁপড়ী, মেদড়ি স্থলে লেদড়ি, উন্ধুড়ি ধুন্ধুড়ি স্থলে উকুড়ি ধুকুড়ি, তাতোয়ার স্থলে তালোয়ার, সেতুক স্থলে সেতক, নেধুড়ি স্থলে কলাপ, কপালী স্থলে তুত্তরি, টুটুরি স্থলে পুন্দরি, যশোগ্রামী স্থলে যগ্রামী, শীতলী স্থলে পুষ্পহাটী গাঞির নাম দৃষ্ট হয়।

যাহা বারেন্দ্র সমাজে কুলস্থান বলিয়া বহু কাল পরিচিত, সেই সকল নাম সম্বন্ধেও এরূপ গোলযোগ কেন? সম্ভবত মহারাজ বল্লাল সেনের পূর্বে পালাধিকারকালে বারেন্দ্র সমাজে শতাধিক কুলস্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বল্লাল সেন সেই সমস্ত কুলস্থানের ব্রাহ্মণদিগকে গ্রহণ না করিলেও এবং প্রকৃত প্রস্তাবে বল্লালী কুলমর্যাদা বারেন্দ্র সমাজে উপযুক্ত রূপে প্রচলিত না হওয়াতেও সকল কুলস্থান বা শাসনের ব্রাহ্মণই স্ব স্ব পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন, এজনাই সম্ভবত বারেন্দ্র-কুলজ্ঞদিগের মধ্যে একশত ঘর পূরণকালে সকলে একমত হইতে পারেন নাই। বস্তুত অধুনা অনেক গাঞির সন্ধানই পাওয়া যায় না।[১২]

১. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ (২য় সংস্করণ) ১০৫-১০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
২. ঐ ব্রাহ্মণকাণ্ড—১ মাংশ, ১০৩-১০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৩. "গুম্ফোৎফুল্লাসাপদ্মে স্ফুরতি সচকিতং বেদবেদাঙ্গবাণী
মানীকোদণ্ডপাণিঃ পবনগতিহয়ঃ কৌঞ্চিকোষ্ণীবমৌলিঃ।
কণ্ঠে শ্রীশৈলচক্রং মলয়জতিলকৈরেতি কোলাঞ্চদেশাৎ
সাক্ষান্নারায়ণশ্রীঃ সনিজপরিকরৈর্ভট্টনারায়ণোহয়ং।।
রাজা শ্রীধর্মপালঃ সুখমমরধুনীতীরদেশে বিধাতুং
নায়াদিগাঞিযিপ্রং গুণযুতভনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্ধামদারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশ্যং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ।।
শাণ্ডিল্যগোত্রজাতানাং বরেন্দ্রেহসৌ দ্বিজন্মনাং।
আদিস্তুতো জয়মনির্ভট্টো জজ্ঞে তু নন্দনঃ।।" (বারেন্দ্র-কুলপঞ্জী)
৪. "গ্রামোত্তমোহস্ত্যমলমঞ্জুগুণৈকপুঞ্জঃ শ্রীমান করঞ্জ ইতি বন্দ্যতমো বরেন্দ্র্যাম্।
যত্র শ্রুতিস্মৃতিপুবাণপদপ্রবীণাঃ সচ্ছাস্ত্রকাব্যনিপুণাঃ স বসন্তি বিপ্রাঃ।।
কীর্ণঃ প্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণকামঃ শ্রীস্বর্ণরেখ ইতি বিপ্রবরোহবতীর্ণঃ।
তাং গ্রামমগ্রগণীয়গুণং সমগ্রং জগ্রাহ শাসনবরং নৃপধর্মপালাৎ।
তদম্বয়ক্ষীরসমুদ্রচন্দ্রে। বভূব ভল্লু রিতি ভূসুরেন্দ্রঃ।
আর্যৈর্য আচার্যবরোহভিষিক্তঃ...সুরাণাং গুরুণাপি...।
ত্রয়োপরঃ কাশ্যপগোত্র ভাস্কর স্তৎপুত্র আচার্যবরো দিবাকরঃ।।" (হরিচরিতকাব্য।)
See M. M. Haraprasad Shastri's Nepal Catalogue, (1905), p. 135.

৫. "গৌড়ে শতং নৃপতিনা পঞ্চাশন্মগধে তথা।
ভোটে ষষ্টি সমাখ্যাতাঃ মৌরঙ্গে চ তথাবিধাঃ।।
উৎকলে দ্বাবিংশতিশ্চ রসাঙ্গে চ তথাবিধাঃ।
এবং স্থিতিঃ ব্রাহ্মণানাং সর্বদেশনিবাসিনাম্।।" (বারেন্দ্রকুলপঞ্জী)

কিন্তু 'গৌড় ব্রাহ্মণে' এইরূপ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

"বরেন্দ্রেতু তদা সার্দ্ধাং ত্রিশতান্যগ্রজন্মনাং।
রাঢ়ায়াস্তু দ্বিজাশ্চাসন্ সার্দ্ধাস্তোধিশতানি চ।।
বরেন্দ্রবাসিবি প্রাণাং মধ্যে চৈকশতদ্বিজাঃ।
বরেন্দ্ররক্ষিতা রাজ্ঞা সদাচারপরায়ণাঃ।।
দ্বিশতাধিক পঞ্চাশদ্বারেন্দ্রাণাং দ্বিজন্মনাং।
পঞ্চাশন্মগধে ষষ্টিভোটে ষষ্টিঃ রভাঙ্গকে।।
চত্বারিংশদুৎকলে চ মৌড়ঙ্গেপি তথাঙ্ককাঃ।
দত্তা নৃপতিনা হর্ষং বল্লালেন মহাত্মনা।।" (গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৮৮ পৃঃ)

অর্থাৎ বরেন্দ্রদেশে ৩৫০ এবং রাঢ়দেশে ৭০০ জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বরেন্দ্রবাসী বিপ্রগণের মধ্যে সদাচারপরায়ণ একশত জনকে রাজা বল্লাল সেন বরেন্দ্রে রাখিয়া দিয়াছিলেন। অপর ২৫০ জনের মধ্যে ৫০ জন মগধে, ৬০ জন ভোটে, ৬০ জন রভাঙ্গে, ৪০ জন উৎকলে ও ৪০ জন মৌড়ঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন।

'গৌড়ে ব্রাহ্মণ'-ধৃত উক্ত শ্লোকাবলি আমাদের সংগৃহীত পুথিতে পাই নাই। বল্লাল সেন বরেন্দ্রবাসী ৩৫০ জনের ২৫০ জনকে কেনই বা অন্যদেশে পাঠাইলেন? আর রাঢ়বাসী ৭৫০ জনের মধ্যে কাহাকেও অন্য স্থানে পাঠাইলেন না কেন? পর অধ্যায়ে ইহার মীমাংসা দেখিতে পাইবেন।

৬. "কাশ্যপেহষ্টাদশজ্ঞেয়াঃ শাণ্ডিল্যে চ চতুর্দশ।
চতুর্বিংশতির্বাৎস্যেহপি ভরদ্বাজে তথাবিধঃ।।
সাবর্ণে বিংশতির্জ্ঞেয়াঃ গ্রামাহি গাঞিনামকাঃ।"

৭. "মৈত্রশ্চ ভাদুড়িশ্চৈব করঞ্জো বালয়ষ্টিকঃ।
মোধাগ্রামী বলিহারী মোয়ালিঃ কিরলস্তথা।।
বীজকুঞ্জঃ সরগ্রামী সহগ্রামী কটিস্তথা।
মধ্যগ্রামী সর্বগ্রামী গঙ্গাগ্রামী তথৈব চ।
বেলগ্রামী চমগ্রামী চাশ্রুকোটিস্তথাপরে।
অষ্টদশ মিতা এতে কাশ্যপে পরিকীর্তিতাঃ।।"

৮. "রুদ্রাখ্যো বাগছিশ্চৈব লাহেড়িঃ সাধুবাগ্ছিকঃ।
চম্পটি নন্দনাবাসী কামেন্দ্রঃ সিহরী তথা।
তাড়োয়ালা-বিশীগ্রামী মৎস্যাশী চম্পসংজ্ঞকঃ।
সুবর্ণতোটকশ্চৈব পুষাণো বেলুড়িস্তথা।
শাণ্ডিল্যে কথিতাশ্চৈতে গ্রামিণোহত্র চতুর্দশঃ।।"

৯. "সপ্তামিনী ভীমকালী ভট্টশালী তথৈব্চ।
কামকালী কুড়ম্বশ্চ ভাড়িয়ালশ্চ লঙ্ককঃ।
জামরুখী সিমলী চ ধোদালিস্তানুরিস্তথা।
বৎসগ্রামী দেউলিচ নিদ্রালী কুক্কুটী তথা।।
বোড়গ্রামী শ্রুতবটী চাক্ষগ্রামী চ সাহরিঃ।
কালীগ্রামী কালীহয় পৌণ্ড্রকালী তথৈব চ।
কালিন্দী চুতুরাবন্দী বাৎস্যাগোত্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ।।"

১০. "ভাদড়ো লাডুলিঝামঃ আতুর্থিঃ রাইসংজ্ঞকঃ।
রত্নাবলী চোচ্ছরখি গোচ্ছাসি বালসংজ্ঞকঃ।।
শাকটিশ্চ তথা শিম্বিরহালঃ সরিয়ালকঃ।
ক্ষেত্রগ্রামী দধিয়ালঃ পূতিঃ কাছটিরেব চ।
নন্দীগ্রামী গোগ্রামী চ নিখটি চ সমুদ্রকঃ।
পিপ্পলী শৃঙ্গখোর্জারো গোস্বালম্বি স্তথৈব চ।
চতুর্বিংশ মিতাএতে ভরদ্বাজে প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

১১. "সিংদিয়াড় পাকড়ী চ শৃঙ্গী তথা চ মেদড়িঃ।
উদ্ধড়ি-ধুদ্ধড়িশ্চৈব তাতোয়ারশ্চ সেতুকঃ।
নইগ্রামী নেধুড়িশ্চ কপালী টুট্টরীস্তথা।
পঞ্চবটী খণ্ডবটী নিকড়িশ্চ সমুদ্রকঃ।
কেতুগ্রামী যশোগ্রামী শীতলী চ তথাপরঃ।
সাবর্ণে কথিতা এতে গ্রামাহি বিংশতিঃ স্মৃতাঃ।।"

১২. পরিশিষ্টে প্রাচীন গাঞি নির্দেশক কুলস্থানগুলির বর্তমান অবস্থান দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

বল্লালী বারেন্দ্র সমাজ

পূর্ব অধ্যায়ে আভাস দিয়াছি যে, গৌড় বা বারেন্দ্র অঞ্চলে খৃস্টিয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে রাজা বিজয় সেনের বিদ্যমানকাল খৃস্টিয় ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত বৌদ্ধ পাল নৃপতিগণের শাসন অব্যাহত ছিল। তাঁহারা অপরের ধর্ম সম্বন্ধে অনেকটা নিরপেক্ষ ছিলেন বটে, কিন্তু তৎকালে রাজধর্মের প্রভাব উচ্চ নীচ সকল সমাজেই বদ্ধমূল হইয়াছিল। পালরাজসম্মানিত বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজও যে সেই ধর্মপ্রভাবের বাহিরে থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

রাজা বিজয় সেনের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি গৌড়পতিকে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিলেন এবং কামরূপপতিকে বিদূরিত করিয়াছিলেন,[১] কিন্তু উত্তর গৌড়ে তাঁহার অধিকার স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তিনি গৌড়াধিপ পালরাজকে পরাজিত করিয়া বরেন্দ্রভূমে বিজয় চিহ্ন স্বরূপ প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেও, তাঁহার নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের সহিত ভাগীরথীর উত্তরতীরবর্তী অধিকাংশ জনপদ আবার পালবংশের শাসনাধীন হইয়াছিল। ১০৪১ শকে (১১১৯ খ্রিস্টাব্দে) মহারাজ বল্লাল সেন পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি রাজপদে আসীন হইয়াই গৌড় হইতে পালবংশকে বিতাড়িত করিয়া মিথিলা পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। মিথিলা বিজয়কালেই তাঁহার প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণ সেন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন. সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই তিনি লক্ষ্মণাব্দ (লং সং) প্রচলিত করিয়াছিলেন;—মিথিলা হইতে সমস্ত গৌড়ে এক সময়ে এই অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল।[২]

বল্লাল সেনের পিতা ও পিতামহ সকলেই বেদনিষ্ঠ শৈব ছিলেন ; বল্লাল সেনও প্রথমে সেইরূপ পৈতৃক বিশ্বাস ও ধর্মে একান্ত আস্থাবান ছিলেন। কিন্তু সমস্ত গৌড়রাজ্য অধিকার ও গৌড়নগরে রাজপাটস্থাপনের সহিত বল্লাল দেখিলেন যে, তাঁহার অধিকাংশ প্রজাই বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মানুরত; —বহু চেষ্টাতেও তাঁহার পিতা পিতামহ বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব খর্ব করিতে সমর্থ হন নাই। এমন কি প্রাচীন কুলকারিকা হইতে জানা যাইতেছে যে, গৌড়ে বল্লাল সেন কর্তৃক রাজধানী প্রতিষ্ঠার পূর্বে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ অনেকেই বৌদ্ধধর্মানুরক্ত ও বৈদিক সংস্কারচ্যুত ছিলেন। ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থ হইতেই জানা যাইতেছে যে, বৈদিক-ধর্মনিষ্ঠ মহারাজ বিজয় সেন গৌড়াধিকার করিবার পর বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে পুনরায় বৈদিকাচারে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।[৩] সুতরাং বল্লাল সেনের অভ্যুদয়কালে তাঁহারা পূর্বধর্মমত ও বিশ্বাস যে এককালে বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধহয় না। বিশেষত বারেন্দ্রবাসী অনিরুদ্ধ ভট্ট নামে একজন সারস্বত ব্রাহ্মণ বল্লালের গুরু হইয়াছিলেন।[৪] পূর্বেই লিখিয়াছি যে, রাঢ়ের পূর্বতন প্রভাবশালী সারস্বত (সপ্তশতী) ব্রহ্মণদিগকে হস্তগত করিবার জন্য ধর্মপালপ্রমুখ পালরাজগণ অনেক রাঢ়ীয় সারস্বত বিপ্রকে আনিয়া বরেন্দ্রভূমে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পরে পালরাজগণের অনুকরণে ও

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রমুখ তান্ত্রিকগণের ধর্মোপদেশগুণে সেই সকল সারস্বত-বিপ্রের বংশধরগণও বৌদ্ধতন্ত্রে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট ঐ সকল সারস্বত-বিপ্রগণের মধ্যে একজন ; তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের সঙ্গে বল্লাল সেনেরও মতিগতি ফিরিয়াছিল। তিনি প্রথমত বৌদ্ধতান্ত্রিক মতেই অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে অতি নিচ জাতীয়া রমণী ও বেশ্যাদি লইয়া ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, তজ্জন্য তাঁহার পিতা ও পিতামহের সময়কার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসন্তানগণ বল্লালের আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধভাব বল্লালের হৃদয় অধিকার করিয়াছে ভাবিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণমাত্রেই বল্লালের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষেই তাঁহার চর্মকার বা ডোমকন্যার পাণিগ্রহণ-প্রবাদ রটিয়াছিল। এমন কি, বৈদিক বিপ্রগণের ষড়যন্ত্রে লক্ষ্মণ সেন পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ঐ সময় রাজনীতিকুশল রাজা বল্লাল একদিকে নিজ রাজপদ রক্ষা ও অপরদিকে প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার অভিপ্রায়ে প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণের চরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় সিংহগিরিনামে এক তান্ত্রিকসিদ্ধ আসিয়া বল্লাল সেনের সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অসাধারণ অনৈসর্গিক ক্ষমতা দেখিয়া বল্লাল সেন চমৎকৃত হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, পরে মহারাজ বল্লাল সেন ও অনিরুদ্ধ ভট্ট তাঁহার নিকট প্রাচীন হিন্দুতন্ত্রোক্ত ধর্মই[৫] আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নিকট শাক্ত তন্ত্রানুসারে পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর সারস্বত অনিরুদ্ধ ভট্ট বেদার্থস্মৃতিসঙ্কলনে মনোযাগী হইলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় ১০৯১ শকে (১১৬৯ খ্রিস্টাব্দে) বল্লাল সেনের "দানসাগর" নামক দানবিষয়ক প্রসিদ্ধ নিবন্ধগ্রন্থ রচিত হয়।

তখনও এদেশে হিন্দুতন্ত্রগুলি বৈদিকের নিকট বেদবিরোধী বলিয়াই গণ্য ছিল। এই সময়ের হিন্দু ও বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের মত কতকটা মহানির্বাণতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। মহানির্বাণতন্ত্রকার লিখিয়াছেন,—

"এখন বৈদিকমন্ত্র সকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্যহীন হইয়াছে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ঐ সকল মন্ত্র সফল হইত, এখন মৃততুল্য হইয়াছে। ভিত্তিতে চিত্রিত পুত্তলিকা যেরূপ সকল বহিরীন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও স্বকার্যসাধনে অসমর্থ, কলিতে বৈদিক মন্ত্র সমুদায়ও প্রায় সেইরূপ। বন্ধ্যা স্ত্রীর সঙ্গমে যেমন কোন ফল হয় না, সেইরূপ বৈদিক মন্ত্র দ্বারা কার্য করিলে ফল সিদ্ধি হয় না, উহা কেবল শ্রমমাত্র। এই কলিকালে বৈদিকাদি অন্য শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে নির্বোধ তৃষ্ণাতুর হইয়া গঙ্গাতীরে কূপ খনন করে। কলিযুগে একমাত্র তন্ত্রোক্ত মন্ত্রই শীঘ্র ফলপ্রদ।[৬]

মহারাজ বল্লাল সেনও তান্ত্রিক গুরুর অনুবর্তী হইয়া প্রথমত ঐরূপ বেদবিরুদ্ধ মতই প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে এদেশীয় বৈদিক বিপ্রসমাজ, বল্লাল সেনের কোন কোন আত্মীয় এবং উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ বল্লাল সেনের বিরোধী হইয়াছিলেন। এদিকে আবার আদিশূরানীত কনৌজীয় বিপ্রবংশধর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ বল্লাল সেনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। সপ্তশতী বিপ্রগণও তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। সেনবংশের সম্পর্কিত কায়স্থ সমাজও বল্লাল সেনের মতানুবর্তী হইয়াছিলেন।

যে যে সমাজ গৌড়াধিপের তান্ত্রিক ধর্ম অনুমোদন করিয়াছিলেন, বল্লাল সেন তাঁহাদিগকে পাইয়া নতুন সমাজ গঠন করিলেন ; তাহা হইতেই বল্লাল সেন প্রবর্তিত অভূতপূর্ব কৌলীন্য-মর্যাদার সৃষ্টি। বল্লাল সেনের অনুবর্তী হইয়া যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে

কুলাচারী[৭] হইয়াছিলেন, গৌড়াধিপ তাঁহাদিগকেই কুলীন বলিয়া সম্মানিত করেন। রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীতে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, বল্লাল সেন মহাশক্তির উপাসক ছিলেন। কুললক্ষ্মীর পূজা করিয়া দেবীর প্রত্যাদেশ অনুসারেই তিনি কুললক্ষ্মণ প্রকাশ করেন।

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, বল্লালের পিতা মহারাজ বিজয় সেন বরেন্দ্র-বিজয় করিলেও তৎকালে গঙ্গার উত্তরকূলবর্তী সমুদায় উত্তরবঙ্গ (বর্তমান রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহ জেলা) বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মে এককালে সমাচ্ছন্ন ছিল। এমন কি, তৎকালে অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণও বৌদ্ধধর্মানুরাগপ্রযুক্ত বহুপুরুষ হইতে বৌদ্ধাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। বারেন্দ্র সমাজে বৈদিকাচারের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইলেও তান্ত্রিক কুলাচার ও পূর্ব বিশ্বাস কেহই সহজে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বৌদ্ধতন্ত্র ছাড়িয়া হিন্দুতন্ত্র আশ্রয় করিয়াছিলেন মাত্র। গৌড়াধিপ বল্লালের তান্ত্রিক ধর্মানুরাগ অবগত হইয়া তাঁহারাই প্রথমে রাজার দলপুষ্টি করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে বল্লাল বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কুলাচারী ও তান্ত্রিকক্রিয়ায় সুদক্ষ ব্রাহ্মণদিগকেই সর্বপ্রথমে সম্মানিত করেন এবং তাঁহারাই প্রথমে 'কুলীন' বলিয়া বল্লালসভার পূজিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই যত্নে তাঁহাদের পূর্বারাধ্য কোন কোন বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবী হিন্দুতান্ত্রিকগণের পূজার্হ হইয়াছিলেন।[৯]

এই সময় পঞ্চমকারের সেবা মুখ্য ধর্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এমন কি, শ্রুতিস্মৃতি মতে বেদমাতা সাবিত্রীজপই ব্রাহ্মণত্বের মুখ্য লক্ষ্মণ বলিয়া নির্দিষ্ট থাকিলেও কৌলিকী সুরাপানই ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল।[১০] শূরবংশ ও বল্লালের পূর্ববর্তী সেনরাজগণের যত্নে রাঢ়ের ব্রাহ্মণগণ বৈদিকধর্মের কতকটা পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ততটা তান্ত্রিক হইয়া পড়েন নাই। তাঁহারা বল্লালের বিরোধী না হইলেও বারেন্দ্র-প্রবর্তিত তান্ত্রিকধর্ম প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত ও বেদবিরুদ্ধ বলিয়াই মনে করিতেন। এ কারণেও তাঁহারা এক কনোজ বিপ্রবংশধর হইলেও পরস্পরে আত্মীয়তা স্থাপনে পরাঙ্মুখ হইতে ছিলেন। এ কারণে পরবর্তী রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ সমূহে বারেন্দ্র সম্পর্ক নিতান্ত দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এমন কি পূর্বতন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ প্রকাশ্যে বৌদ্ধাচারী এবং পরে কথঞ্চিৎ বৈদিকাচারী হইয়াছেন, একথাও রাঢ়ীয় প্রাচীন কুলজ্ঞগণ ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, পূর্বেই তাহার আভাস দিয়াছি।

গৌড়াধিপ বল্লাল সেনের হিন্দু-তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণের সহিত তাঁহার মতানুবর্তী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণও অনেকেই গৌড়াধিপের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

১. "গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়।" (বিজয় সেনের শিলালিপি ২১ শ্লোক)

২. Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1896, pt. I. pp. 26.

৩. "এক বাপের দুই বেটা দুই দেশে বাস।
যুদ্ধ পাইয়া জাত খাইয়া করল সর্বনাশ।।
পৈতা ছিঁড়িয়া পৈতা চার বৈদিকে দেয় পাতি।
কর্ম খাইয়া ধর্ম পাইল বারেন্দ্র অখ্যাতি।।"
(দিগ্‌শুলনিবাসী আনন্দচন্দ্র ঘটকরাজের সংগৃহীত প্রাচীন কারিকা ও তৎপৌত্র প্রিয়নাথ ঘটক প্রদত্ত।)

৪. "বেদার্থস্মৃতিসঙ্কলাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলবীচিল্লাসনয়নঃ সারস্বতং ব্রহ্মণি।
ষট্‌কর্মভাবোদার্যশীলবিনয়ঃ প্রখ্যাতসত্যব্রতো
বৃত্রারেরিব গীষ্পতের্নরপতেরস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ।।" (দানসাগর— উপক্রম)

৫. ভারতে নানা দার্শনিক মতভেদে যেমন পূর্ব হইতে বহু সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইতেছিল, সেইরূপ পূর্বতন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, বৌদ্ধ প্রভৃতি শ্রেণীভেদ ঘটিয়াছিল। নিশ্বাসাখ্য তন্ত্রের প্রমাণে জানা যায় যে, এক সময়ে ভারতবাসী তান্ত্রিক-মত বা তান্ত্রিক-দীক্ষা বেদবাহ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন, আবার রুদ্রযামল, কুব্জিকা প্রভৃতি কোন কোন তন্ত্রমতে সর্ববেদের নিদান অথর্ববেদ হইতেই তান্ত্রিকাচারের উৎপত্তি। যাহা হউক, বেদবিরোধী বৌদ্ধগণ অতীশ দীপঙ্করাদি প্রবর্তিত জ্ঞানমূলক তান্ত্রিক ধর্ম ছাড়িয়া উপাসনার সহিত আমোদ ও সহজ মুক্তিলাভের আশায় পরে সহজেই তান্ত্রিক মতানুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এ কারণে গৌড় ও মগধে বজ্রযান মতের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকের সংখ্যাই বৃদ্ধি হইয়াছিল। এবং সাধারণকে তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত করিবার জন্য শত শত বৌদ্ধতন্ত্র রচিত হইল। তাহাতে বুদ্ধদেবের মূল ধর্মসূত্র একপ্রকার লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, বুদ্ধমতপ্রতিপাদ্য শাস্ত্রসমূহে পঞ্চমকারের নিন্দা ও গ্রহণে দোষ কীর্তিত হইলেও আপাতমনোরম ও সহজসাধ্য অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধসাধারণে তান্ত্রিকধর্মে অভিষিক্ত ও পঞ্চমকারের উপাসক হইয়াছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত হইলেও বুদ্ধের উপদেশ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদিক ও পৌরাণিক নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ অতি ঘৃণার চক্ষেই তাঁহাদিগকে দেখিতেন। তাঁহাদিগের সঙ্কীর্ণ মত হইতে প্রজাসাধারণকে উদারনৈতিক করিবার জন্য প্রথমে আদিশূর-প্রমুখ শূরবংশীয় নৃপতিগণ, বঙ্গাধিপ হরিবর্মদেব, এবং সেনবংশীয় মহারাজ বিজয় সেন ও তৎপুত্র শ্যামল বর্মা নানা স্থান হইতে সমাগত বৈদিক বিপ্রগণের সাহায্যে বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

প্রাচীন হিন্দুতান্ত্রিকগণ বৌদ্ধতান্ত্রিকদিগের ন্যায় পঞ্চমকারের সেবক হইলেও ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ নানা দেবদেবীর উপাসক হইয়া পড়িলেও তাঁহাদের ধর্মে সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদিও হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতেও প্রায় সৃষ্টিতত্ত্ব, লয়, মন্ত্র, যন্ত্র, দেবতা, ডাক, ডাকিনী, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রগুলির চরম লক্ষ্য সাংসারিক সুখলাভ। বৈদিক গ্রন্থে যে সকল পশুবধ বৈধ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, অধিকাংশ হিন্দুতন্ত্রে সেই সকল মাংসই বিশুদ্ধ ও ভক্ষ্য বলিয়া গণ্য ; কিন্তু অহিংসারই যাহাদের নিকট পরম ধর্ম, সেই বৌদ্ধদিগের তন্ত্রে যে কোন পশুমাংস বৌদ্ধতান্ত্রিকের ভক্ষ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এমন কি, বৌদ্ধতন্ত্রে শূকরমাংস পরম আদরের ভক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত। হিন্দুতান্ত্রিকগণ দক্ষিণাবর্ত ক্রমে ন্যাস করিয়া থাকেন, কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকের নিকট বামাবর্তবিধানে ন্যাসই প্রশস্ত। হিন্দুতন্ত্রে মহাবিদ্যার উপাসনাই মুখ্য, কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্র মতে বজ্রডাক ও বজ্রডাকিনীর পূজাই প্রধান। হিন্দুতন্ত্রে চক্রস্থ সাধক যে কোন বর্ণের হউন, দ্বিজোত্তম বলিয়া গণ্য, কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ বুদ্ধের সাম্যবাদ বিসর্জন দিয়া বিশেষরূপে বর্ণভেদ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধতন্ত্রগুলি আলোচনা করিলে মনে হইবে, আদি হিন্দুতন্ত্রসমূহের আদর্শেই বৌদ্ধতন্ত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের তন্ত্র অপেক্ষা বৌদ্ধদিগের তন্ত্রে বরং নানা বিষয়ের জটিলতা, কঠোরতা ও সঙ্কীর্ণতা সাধিত হইয়াছে। হিন্দুতন্ত্রে শক্তি যেরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্যা, বৌদ্ধতন্ত্রে আর্যতারা ও মন্ত্রদাতা বীরনায়ক গুরুই সেইরূপ পূজার্হ। হিন্দুতন্ত্রে দিব্য, বীর ও পশু এই ত্রিবিধ আচারের উল্লেখ থাকিলেও প্রধানত হিন্দুতান্ত্রিকগণ দিব্য ও পশ্বাচার অনুসারে চলিয়া থাকেন। কিন্তু বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ একমাত্র বীরাচারি। অনেকের বিশ্বাস যে বীরাচার বৌদ্ধদিগেরই প্রবর্তিত।"

৬. "নির্বীর্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন কলৌ তে মৃতকা ইব।।
পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাঃ কার্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ।।
অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতাং কর্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা।
ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্।।
কলাবন্যোদিতৈর্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্মতিঃ।।
কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তর্ণফলপ্রদাঃ।।" (মহানির্বাণতন্ত্র)

৭. রুদ্রযামলে এইরূপ কুলাচারের প্রসঙ্গ আছে—
"শৃণুস্ব কমলাশম্ভো (?) কুলাচারবিধিং শৃণু।
নিত্যশ্রাদ্ধং তথা সন্ধ্যাবন্দনং পিতৃতর্পণম্।
দেবতাদর্শনং পীঠদর্শনং তীর্থদর্শনম্।।
গুরোরাজ্ঞাপালনঞ্চ দেবতানিত্যপূজনম্।

পশুভাবস্থিতো মর্ত্যো মহাসিদ্ধিং লভেদ্ধ্রুবম্।।
পশূনাং প্রথমং ভাবং বীরস্য বীরভাবনম্।
দিব্যানাং দিব্যভাবস্তু তিস্রো ভাবাস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।।
স্বকুলাচারহীনো যঃ সাধকঃ স্থিরমানসঃ
নিষ্ফলার্থী ভবেৎ ক্ষিপ্রং কুলাচাররভাবতঃ।। (রুদ্রযামল ২য় পটল ৪-৭শ্লোক)

অর্থাৎ নিত্যশ্রাদ্ধ, তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনা, পিতৃতর্পণ, দেবতাদর্শন, পীঠদর্শন, তীর্থদর্শন, গুরুর আজ্ঞাপালন, তান্ত্রিক ইষ্টদেবতার নিত্যপূজা, ইহাই কুলাচার। পশ্বাচারী মানব এইরূপ ভাবে থাকিলে মহাসিদ্ধি লাভ করেন। পশুর ভাবই প্রথম, বীরের আচারই বীরভাব, দিব্যাগণের আচারই দিব্যভাব—এই তিনপ্রকার ভাব কুলাচারের অন্তর্গত। সে স্থিরমতি সাধক নিজ কুলাচারহীন, কুলাচারঅভাবে তাহার সকল বাসনাই নিষ্ফল হয়।

উক্ত কুলাচারের উপর লক্ষ করিয়াই মহারাজ বল্লাল সেন আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা শান্তি, তপঃ ও দান এই নয়টী কুললক্ষণ স্থির করিয়াছিলেন। ইহা অনেকটা সদাচারসম্মত হইলেও বৈদিকাচার হইতে ভিন্ন ছিল।

৮. "প্রত্যাদিষ্টৈর্নৃপৈস্তস্টৈর্ভূবিভক্ত্যপচারতঃ।
কুললক্ষ্মীং পূজায়িত্বাং কথিতং কুললক্ষণম্।।" (কুলমঞ্জরী)

৯. যথা—অক্ষোভ্য, অমিতাভ, বৈরোচন, শঙ্খপাণ্ডুর, পদ্মপাণি, অসিতাঙ্গ ইত্যাদি। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বৈরোচনের শক্তি বজ্রধাত্বেশ্বরী, অক্ষোভ্যে শক্তি লোচনা, রত্নসম্ভবের শক্তি মামকা, অমিতাভের শক্তি পাণ্ডরা, অমোঘসিদ্ধের শক্তি তারা এবং বজ্রসত্ত্বের শক্তি বজ্ররেখার পূজা করিয়া থাকেন। হিন্দুতান্ত্রিকগণের নিকট ঐ সকল শক্তি পুংদেবতাস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। (ব্রহ্মানন্দ অবধূত-রচিত তারারহস্যে ষড়ঙ্গন্যাস প্রকরণ দ্রষ্টব্য)

এমন কি, তারারহস্যের সৃষ্টিপ্রকরণ পাঠ করিলে মহাযান বৌদ্ধগণের শূন্যবাদেরই সমর্থন দেখা যায়। যথা—

' এতেন তারা সংজাতা শীর্ষেহক্ষোভ্যো ভুজঙ্গমঃ।
মহাকালঃ স এব স্যাত্তারারূপং জগত্রয়ে।।
যস্যাশ্চ স্মরণে সদ্যো ভোগমোক্ষঃ করস্থিতঃ।
এবংভূতা মহাদেবী ব্রহ্মাণ্ডশূন্যমধ্যগা।।
সৃষ্টিকর্ত্রী মহাদেবী তারারূপা ত্রয়ান্বিতা।
শূন্যে দ্বিতীয়ে চণ্ডে চ সুবিরাড় রূপধারিণী।।
তৃতীয়ে চ মহাশূন্যে তড়িৎকোটিসমপ্রভা।
নিরাকারা নিরাধারা তারা সর্বার্থসাধিকা।
চতুর্থে শূন্যমাশ্রিত্য বিষ্ণুঃ পালয়তে ধ্রুবম্।
তস্মাজ্জাতশ্চতুবক্ত্রঃ সৃষ্টিং বিতনুতে ধ্রুবম্।।
পঞ্চশূন্যে মহাদেবী শিবরূপা ত্রিলোচনা।
লয়ং লয়াত ব্রহ্মাণ্ডং মহাকালেন লালিতা।।
পুনর্ব্রহ্মাণ্ডসিদ্ধার্থং মহাবিদ্যা চ তারিণী।
সর্বান্তে কালিকাং মূর্ত্তিং ত্যক্ত্বা বস্ত্রং পুনর্যযৌ।।
ষষ্ঠে শূন্যময়ং ব্রহ্ম বিশ্বং বিশ্বেশ্বরং তথা।
মহামহাশব্দপরা কালিকা বীজতারকা।
পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা সর্বান্তে কালিকা স্থিতা।'

১০. বীরাচারি তান্ত্রিকগণ ইহার পরিপোষক তান্ত্রিক বচনও উদ্ধৃত করেন—
বেদমাতা-জপৈরেব ব্রাহ্মণো নহি শৈলজে।।
ব্রহ্মজ্ঞানং যদা দেবি তদা ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
দেবানামমৃতং ব্রহ্মং তদীয়ং কৌলিকী সুরা।
সুরান্নং ভোগমাত্রেণ বহির্দীপ্তো ভবেন্নরঃ।।
শাপমোচনমাত্রেণ সুরা মুক্তিপ্রদায়িনী।
অতএব হি দেবেশি ব্রাহ্মণঃ পানমাচরেৎ।।
স ব্রাহ্মণঃ স বেদজ্ঞ সোহগ্নিহোত্রী স দীক্ষিতঃ।" (মাতৃকাভেদতন্ত্র ৩য় পটল)

চতুর্থ অধ্যায়

বারেন্দ্র কুলীন-সমাজ

বঙ্গজ কায়স্থগণের কুলগ্রন্থে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, মহারাজ বল্লাল সেন গৌড় হইতেই কুলবিধি প্রচার করেন। রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীতে বিবৃত হইয়াছে—

'রাজা বল্লাল সেন ভাগীরথীতটে যোগিনীঘট্ট নামক স্থানে কুলবিধি সংস্থাপনের জন্য এক বর্ষ কাল কুললক্ষ্মীর আরাধনা করেন। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ও তাঁহাকে অভীপ্সিত বর প্রদান করিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন। দেবী কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া ও কুললক্ষ্মীর পূজা করিয়া তিনি এইরূপে কুললক্ষ্মণ প্রকাশ করেন ঃ—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি,—তপঃ ও দান এই নয়টি কুললক্ষ্মণ। এইরূপ লক্ষ্মণ যুক্ত ভূদেবগণেরই কৌলীন্য। অমরগণের ন্যায় এই কলিকালে কৌলদিগের মধ্যেই এই নিয়ম প্রচলিত থাকিবে।'[১]

কুলমঞ্জরীর প্রমাণেও বলিতে পারি যে, রাজা বল্লাল সেন একজন দেবীভক্ত তান্ত্রিক কুলাচারী ছিলেন। কৌল বা তান্ত্রিক কুলাচারীর জন্য তাঁহার কুলবিধি।

বারেন্দ্রপটীব্যাখ্যা নামক কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

''নারায়ণস্তু শাণ্ডিল্যঃ সুষেণঃ কাশ্যপস্তথা।
বাৎস্যো ধরাধরো দেবো ভরদ্বাজস্তু গৌতমঃ।।
সাবর্ণস্তু পরাশর এতে পঞ্চ ধরামরাঃ।।

'পঞ্চগোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন ক'রে, গৌড়মণ্ডল পবিত্র ক'রে, আদিশূর রাজার স্বর্গারোহণ। কিছুকাল পরে তাঁহার বংশে দৌহিত্র সন্তান জন্মিলেন বল্লাল সেন। সে বল্লাল সেন কি মত?

শ্রীমৎবল্লালসেনৈঃ সকলগুণযুতৈঃ পার্থিবৈঃ পূজ্যমানঃ
সংবীক্ষ্যাশেষবিপ্রানন্নচিতসমতাং ভজ্জমানাথনাথঃ।
ইত্যনুষ্ঠানধৈর্য প্রণয়গুণতপঃধৈর্যাবিদ্যাদিযৌগে
নির্মিত্যাদিকুলীনকৈঃ কমলজনরতৌ শ্রোত্রিয়াদিককষ্টান্।।

'এই বল্লাল সেন কহিলেন যে, যেমন মাতামহ কুলেতে জন্মেছিলেন মহারাজ আদিশূর, তিনি পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন ক'রে গৌড়মণ্ডল পবিত্র করেছেন। সেই পঞ্চগোত্রের মধ্যে কত ঘর ব্রাহ্মণ হয়েছে বিবেচনা করে দেখলেন যে পঞ্চগোত্রের মধ্যে ১১০০ ঘর ব্রাহ্মণ হয়েছে। তন্মধ্যে রাঢ়দেশে যাহাকে পাইলেন তাহাকে করিলেন রাঢ়ী। গৌড়মণ্ডলে যাহাকে পাইলেন তাহাকে করিলেন বারেন্দ্র। এই কালে অন্যান্য দেশের রাজগণ ব্রাহ্মণ যাজ্ঞা করে পাঠালেন যে, বল্লাল সেন তোমার মাতামহকুলেতে জন্মিয়াছিলেন মহারাজ আদিশূর, তিনি পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করে গৌড়মণ্ডল পবিত্র করেছেন। আমরা বৌদ্ধাক্রান্ত দেশেতে বাস করি।

আমাদিগের দেশে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ প্রদান করে আমাদিগের দেশ পবিত্র কর। ইত্যবকালে রাজা বল্লাল সেন বিবেচনা করিলেন যে—

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলেতি সংসাবং কীর্ত্তিরেব হি নিশ্চলা।। রাজা কহিলেন অবশ্য কর্ত্তব্য।—

গৌড়ে শতং নৃপতিনা পঞ্চাশন্মগধে তথা।
ভোটে ষষ্টি সমাখ্যাতাঃ মৌরঙ্গে চ তথাবিধাঃ।।
উৎকলে দ্বাবিংশতিশ্চ রসাঙ্গে চ তথাবিধঃ।
এবং স্থিতির্ব্রাহ্মণানাং সর্বদেশনিবাসিনাম।।

সর্বদেশে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ প্রদান করে সর্বদেশ পবিত্র করলেন। গৌড়মণ্ডলে দিলেন একশত ঘর। এই একশত ঘরে করিলেন একশত গাঞি।

'কাশপেহষ্টাদশগ্রামা শাণ্ডিল্যে চ চতুর্দশঃ।
চতুর্বিংশতিকং বাৎস্যে ভরদ্বাজেহপি তৎস্থিতম্।
সাবর্ণে বিংশতিকায়া গোত্রগ্রামেণ ঈরিতে।।'

ইহার মধ্যে কুলীন করিলেন শ্রোত্রিয় করিলেন। কুলীন শ্রোত্রিয় কো ভেদঃ?

'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা শান্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষ্মণম্।।'

নবগুণবিশিষ্টত্বং কুলীনত্বং। নবগুণে যাহাকে পাইলেন তাহাকে করিলেন কুলীন। অষ্ট গুণে যাহাকে পাইলেন তাহাকে করিলেন সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়। সপ্তগুণে যাহাকে পাইলেন তাহাকে করিলেন সাধ্য শ্রোত্রিয়। পরে কষ্টানাং কষ্টঃ। এই সকল ব্যাপার করিয়া বল্লাল সেনের স্বর্গারোহণ। কিন্তু কুলীনের কন্যা শ্রোত্রিয়েতে লন। শ্রোত্রিয়ের কন্যা কুলীনেতে লন। তার কিছু বিশেষ্য বিশেষণ করিলেন না।" (বারেন্দ্রপটী-ব্যাখ্যা)

উদ্ধৃত কুলগ্রন্থের প্রমাণে স্থির হইতেছে যে, রাজা বল্লাল সেন বারেন্দ্র বিপ্র সমাজে কুলীন, সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ও সাধ্য শ্রোত্রিয় এই তিন প্রকার মর্যাদা প্রচলিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা বল্লালের মতানুবর্তী ছিলেন না অথবা তৎকাল প্রচলিত তান্ত্রিক কুলাচার মানিতেন না, অর্থাৎ বল্লালী সমাজের বাহিরে ছিলেন তাঁহারা কষ্ট-শ্রোত্রিয় বলিয়া নিন্দিত হইলেন। বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থে নবলক্ষণের একটি লক্ষ্মণ "শান্তি", কিন্তু রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে শান্তির স্থলে "আবৃত্তি" পাট দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, 'শান্তি' পাঠই বল্লালী কুলবিধি-সঙ্গত। কারণ তান্ত্রিক আচার্যগণের শান্তিকার্য প্রধান কর্তব্য বলিয়াই গণ্য। 'আবৃত্তি' অর্থাৎ পরস্পর কুলীনের মধ্যে আদান-প্রদান বল্লালের সময়ে বারেন্দ্র সমাজে প্রচলিত ছিল না, তাহা উদ্ধৃত বারেন্দ্রকুলগ্রন্থ হইতেই প্রমাণিত হইতেছে।[২]

পূর্বেই আভাস দিয়াছি যে, বল্লাল সেন দিব্য, বীর ও পশু এই ত্রিবিধ তান্ত্রিক কুলাচার লক্ষ করিয়া কুলীন, সিদ্ধশ্রোত্রিয় ও সাধ্যশ্রোত্রিয় এই ত্রিবিধ কুল স্থির করেন। ইহার মধ্যে মুখ্য কুলীনের আচার বা দিব্যাচারই সর্বশ্রেষ্ঠ ও অতি কঠিন। এই বিশ্ব দেবতাস্বরূপ, সমস্ত জগৎ স্ত্রীময় ও পুরুষই শিবরূপী এই অভেদজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তিনিই দিব্য। যাঁহার মন্ত্রে দৃঢ়জ্ঞান, শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান, যিনি সর্বদা সত্যবাদী, কখন মিথ্যা কথা বলেন না[৩], মানসস্নান, মানসভোজন ও মনে মনে পঞ্চতত্ত্বসাধনে অধিকারী হইয়াছেন[৪], পরমেশ্বরী মহাশক্তিই যাঁহার একমাত্র উপাস্য, তিনিই দিব্য বা সর্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক, কুলাচারের ঐক্য জ্ঞান দ্বারা তিনিই দেবময় হইয়া থাকেন। বাস্তবিক এরূপ দিব্যপুরুষ কয়জন পাওয়া যায়? ৭৫০ ঘর রাঢ়ীয় ও

৩৫০ ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে বল্লাল সেন রাঢ়ীয় ৮ ও বারেন্দ্র ৭ জন মাত্র দিব্য বা শ্রেষ্ঠ কুলীন পাইয়াছিলেন। তন্ত্রানুসারে দিব্য ও বীরভাবের উদ্দেশ্যে বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও আচারে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পঞ্চমকার ও শক্তি ব্যতীত বীরাচার হয় না। বীরাচারির পূর্ণাভিষিক্ত হওয়া আবশ্যক। পরস্ত্রী ব্যতিত বীরের জপাদি এবং মাংস ব্যতিত বীরের দেবীপূজাদি চলে না।[৫] পূজা, ধ্যান ও আচার ব্যতীত কেবল মাত্র জ্ঞান দ্বারাও বীর মুক্ত হইতে পারেন। বীরাচারির নানা সিদ্ধি সহজে আয়ত্ত ছিল, এজন্য বীরাচারিগণ 'সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়' বলিয়া পরিচিত হইলেন। বীরাচারে সিদ্ধ হইলে তবে দিব্যভাব, কিন্তু কয়জনের ভাগ্যে তাহা ঘটে বলা যায় না। একমাত্র শাক্তই দিব্য ও বীরভাবের অধিকারী। বৈষ্ণব দিব্য ও বীর হইতে পারেন না, তিনি কেবল পশু হইতে পারেন। পশু নিত্য শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা ও দুর্গাপূজা এবং বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডে অধিকারী, অর্থাৎ যাঁহারা অর্ধতান্ত্রিক ও অর্ধবৈদিক ভাবাপন্ন, তাঁহারাই পশু বলিয়া তন্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছেন।[৬] তাঁহারা সাধনে অধিকারী বলিয়া 'সাধ্য শ্রোত্রিয়' বলিয়া অভিহিত হন।

ঐ ত্রিবিধ ভাবের মধ্যে গৌড়বঙ্গবাসী সাধারণে বীরভাবেই বেশি অনুরক্ত ছিলেন। ধর্মের দোহাই দিয়া নানা প্রকার সুখ সম্ভোগ করিতে সহজেই সকলে অভিলাষী হইলেন ও স্বল্প অনুষ্ঠানের সুবিধা করিবার জন্য তন্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যাও অনেকে গ্রহণ করিতেছিলেন। বাস্তবিক বীরাচারিরা বলিয়া বেড়াইতেন যে, ভোগেই যোগ, ভোগেই সিদ্ধি, আবার ভোগেই মোক্ষলাভ হয়।[৭] বিশেষত বীরাচারিদিগের নানা কর্মানুষ্ঠানে বৌদ্ধতান্ত্রিকতা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। কুলবিধি প্রচার কালে রাজা বল্লাল সেন বৌদ্ধবিদ্বেষী হইলেও তাঁহার সম্মানিত গৌণকুলীন বা সিদ্ধশ্রোত্রিয়রূপী বীরাচারিরা গোপনে গোপনে বৌদ্ধতান্ত্রিকাচার সমর্থন করিতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা হিন্দুতন্ত্রেরও দোহাই দিয়া চলিতেন।[৮] মহারাজ বল্লাল সেন শেষাবস্থায় অনেক সময় বিক্রমপুর অঞ্চলেই বাস করিতেন। রাজপ্রিয় অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণও এ সময়ে বিক্রমপুর অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ বিক্রমপুর অঞ্চলে অদ্যাপি বাস করিতেছেন, ইঁহাদের মধ্যে কুলীনের সংখ্যা বিরল, কিন্তু সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের সংখ্যাই বেশি। রাজা বল্লাল সেনের সময় যে সকল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরে আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শক্তি, বিষ্ণু ও সূর্যমূর্তি এখনও বিক্রমপুরের নানা স্থানে দৃষ্ট হয়, কোন কোন দেবমূর্তির পাদপীঠে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের নাম পর্যন্ত উৎকীর্ণ রহিয়াছে। বল্লালের উপযুক্ত পুত্র লক্ষ্মণ সেন কখন উত্তররাঢ়ে লক্ষ্মণনগরে (বর্তমান রাজনগরে), কখন বা দক্ষিণরাঢ়ে নবদ্বীপে অবস্থান করিতেন। বারেন্দ্র সমাজের সহিত তাঁহার বড় সম্বন্ধ ছিল না।

বল্লালী কুলীন

পূর্বেই বলিয়াছি, রাজা বল্লাল সেন ৩৫০ ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে হইতে মাত্র ৭ জনকে কুলীন বলিয়া সম্মানিত করেন। এই ৭ জনের মধ্যে কাশ্যপগোত্রে মৈতে (মৈত্রেয়) মৈত্র ও কৈতে (ক্রতু) ভাদুড়ী[৯] এই দুই জন বাৎস্যগোত্রে লক্ষ্মীধর সণ্ডামিনী (সান্যাল) ও জয়মান মিশ্র ভীমকালী এই দুই জন, শাণ্ডিল্যগোত্রে রুদ্র বাগছী, সাধু বাগছী ও লোকনাথ লাহেড়ী এই তিন জন মোট ৭ জন বল্লাল সেন নির্দিষ্ট কুললক্ষ্মণাক্রান্ত ছিলেন। বল্লাল সেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৮ জনকে কুলমর্যাদা প্রদান করেন। পরে বারেন্দ্রদিগের মধ্যেও সেই সংখ্যা পূরণ করিবার জন্য ভরদ্বাজগোত্রে ভাস্করবেদান্তীর পুত্র সায়ণাচার্য ভাদড়ও কুলীন বলিয়া গৃহিত হইলেন। এ কারণে ভাদড় 'পংক্তিপূরক' বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন।

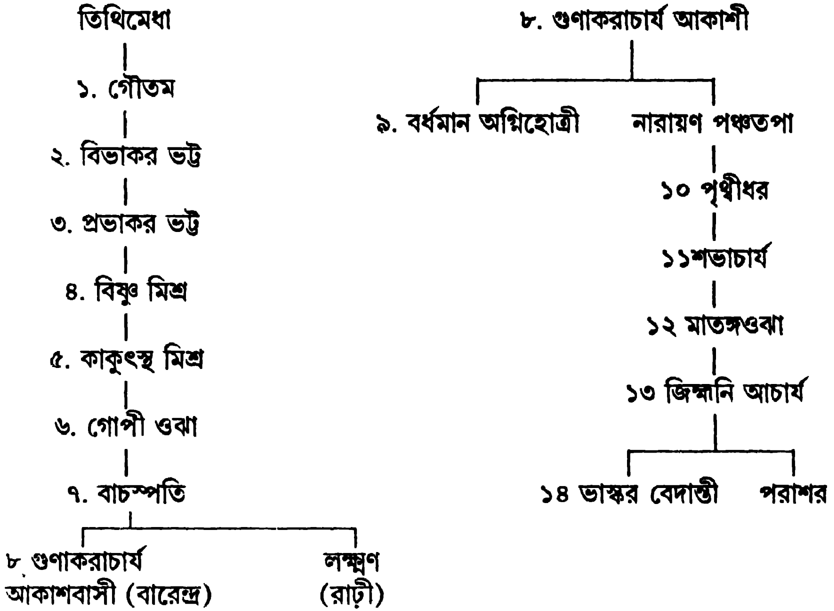
এতদ্ভিন্ন কাশ্যপগোত্রে করঞ্জ, শাণ্ডিল্যগোত্রে চম্পটি ও নন্দনাবাসী, বাৎস্যগোত্রে ভট্টশালী ও কামকালী (কামদেব কালীহয়) এবং ভরদ্বাজগোত্রে লাউড়ী বা নাড়িয়াল, ঝম্পটি বা ঝামাল ও আতুর্থী মোট এই ৮ ঘর সিদ্ধশ্রোত্রিয়[১০]এবং সিহরী, রাই, কুড়মুড়িয়াল, গোচ্ছাসী, খর্জুরী, বিশী, উচ্ছরখি ও জামরুকি এই আট গাঞি সাধ্য শ্রোত্রিয় বলিয়া চিহ্নিত হইলেন। অবশিষ্ট ৭৬ গ্রামী কষ্টশ্রোত্রিয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আধুনিক বারেন্দ্রকুলজ্ঞগণ কুলীন ৮ ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ৮ এই ১৬ গাঞি ব্যতীত অপর ৮৪ গাঞিকে কষ্টশ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন।[১১] রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যেমন পঞ্চগোত্রেয় হইতেই ৮ জন কুলীন নির্বাচিত হইয়াছিলেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সেরূপ পঞ্চগোত্র সম্মানলাভ করেন নাই। বল্লাল সেনের নিকট সাবর্ণগোত্র এককালে উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। এমন কি সাবর্ণ গোত্রের কেহ সিদ্ধশ্রোত্রিয় বলিয়াও গৃহীত হন নাই। অথচ রাজা বল্লাল সেন যখন শ্রেণীনির্বাচন করেন, তৎকালে সাবর্ণ গোত্র তাঁহার সভায় উপস্থিত ছিলেন। [১৯ ও ২০ পৃষ্ঠায় শাণ্ডিল্য ও কাশ্যপ গোত্রের আদিবংশাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে, পর পৃষ্ঠায় বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণগোত্রের আদিবংশাবলি উদ্ধৃত হইল।]

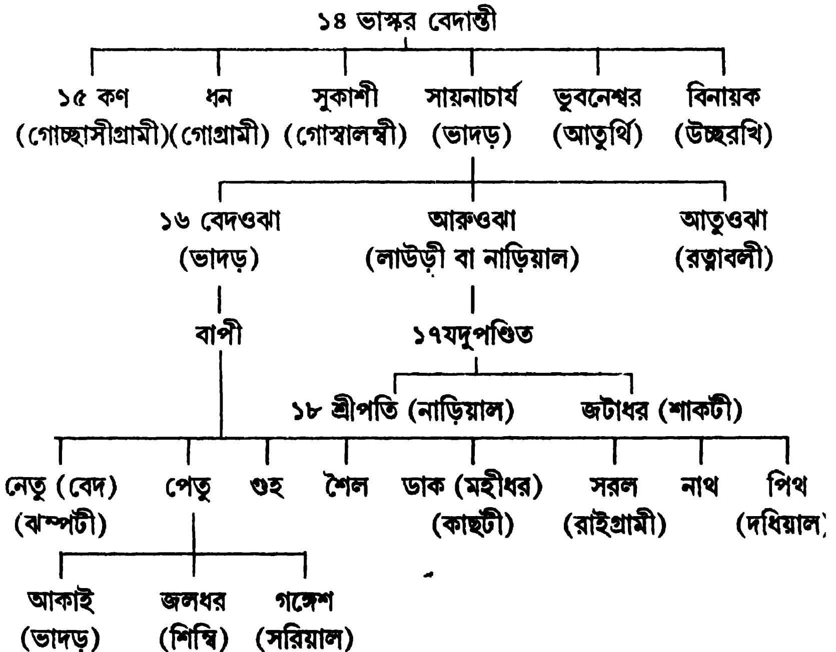
পঞ্চগোত্রের বংশাবলী আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, আদিশূরানীত বীজপুরুষ হইতে শাণ্ডিল্য গোত্রে অধস্তন ১৪শ, কাশ্যপগোত্রে অধস্তন ১৫শ, ভরদ্বাজগোত্রে ১৩শ, সাবর্ণগোত্রে ১৩শ এবং বাৎস্যগোত্রে অধস্তন ৪র্থ পুরুষ বল্লালের সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কাশ্যপগোত্রের বংশাবলী যেরূপ সন্দেহজনক[১২], বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের বাৎস্যগোত্রের বংশাবলীও সেইরূপ সন্দেহজনক। অপর চারি গোত্রের বীজপুরুষের সন্তানগণের মধ্যে ১৩শ হইতে ১৫শ পুরুষ পর্যন্ত যখন পাওয়া যাইতেছে, তখন বাৎস গোত্রে মাত্র ৪ পুরুষ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। হয় বাৎস্যগোত্রের আদিবংশাবলী নষ্ট হইয়াছে, নয় বাৎস্যগোত্রের বীজপুরুষ ধরাধর ১ম আদিশূরের সময় না আসিয়া পরবর্তীকালে আসিয়া থাকিবেন।

বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায় যে, মহারাজ বল্লাল সেন কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর শাসন গ্রাম বা কুলস্থান দান করিয়াছিলেন।[১৩] সীতাহাটী হইতে নবাবিষ্কৃত বল্লাল সেনের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি বিক্রমপুর হইতে শাসনগ্রাম দান করিলেও সেই গ্রাম কিন্তু রাঢ়দেশের মধ্যে এবং যাঁহার উদেশ্যে শাসন দেওয়া হইয়াছে, তিনিও রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণ। এরূপ স্থলেঁ তিনি বারেন্দ্র কুলীনদিগকে যে সকল গ্রাম দান করিয়াছিলেন, অধিক সম্ভব তাহা বারেন্দ্র মধ্যেই অবস্থিত ছিল। শেষাবস্থায় বল্লাল সেনের বিক্রমপুরে অবস্থিতিকালে অনেক বারেন্দ্র শ্রোত্রিয় বিক্রমপুরবাসী হইলেও বারেন্দ্র কুলীনগণ কেহই স্ব স্ব কুলস্থান ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে যাইতে পারেন নাই। এ কারণে লক্ষ্মণ সেন যখন পিতৃপূজিত কুলীনগণের সমীকরণের আয়োজন করিলেন, তৎকালে তিনি কেবল রাঢ়ীয় কুলীন লইয়া সমীকরণ করিয়াছিলেন, তিনি কোন বারেন্দ্র কুলীনকে নিকটে পান নাই ; এ কারণে বারেন্দ্র-সমাজে লক্ষ্মণ সেনের কুলব্যবস্থা ও সমীকরণ গৃহীত হয় নাই।

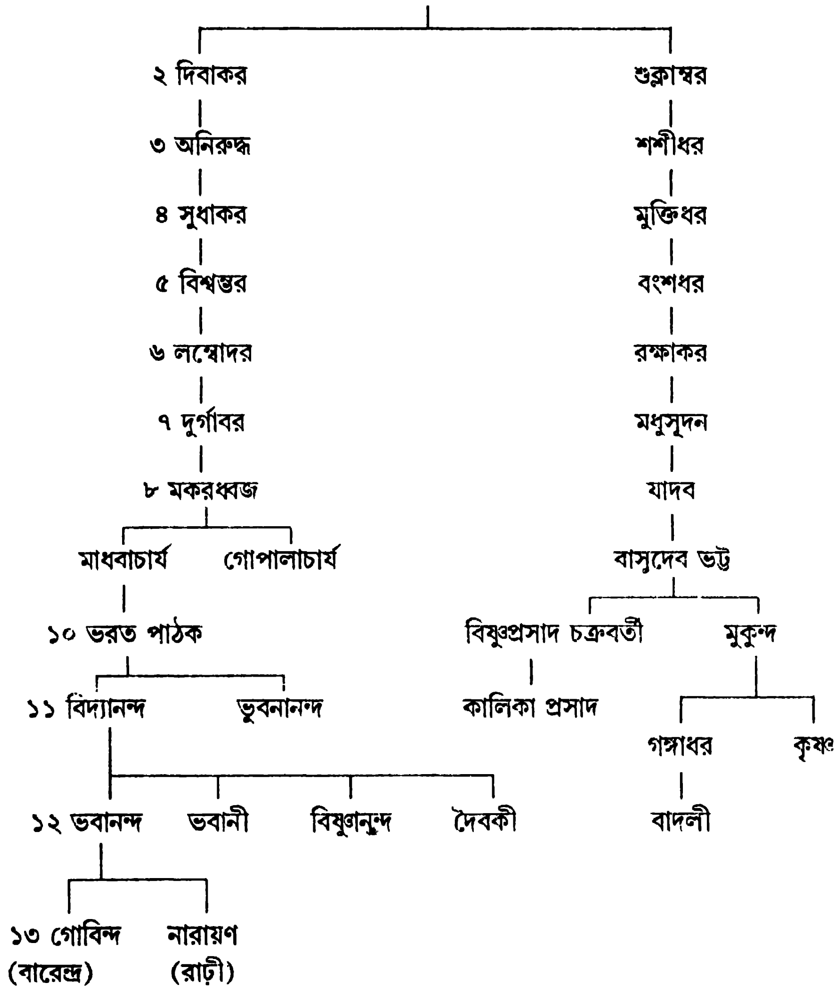
লক্ষ্মণ সেন একজন পরম বৈষ্ণব, আজন্ম দেব ও বৈদিকভক্ত, তাঁহার পিতামহাদি বৈদিক সদাচার-প্রবর্তনে অগ্রণী ছিলেন,—তিনি পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া দেখিলেন যে, যদিও শেষাবস্থায় বল্লাল সেন নাস্তিক উচ্ছেদ ও বেদাভ্যুদয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কারণেই হিন্দুসমাজে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচার প্রসারিত হইয়াছে। এ দিকে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ পিতার আদেশ পালনে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ, কুলবিধি সংরক্ষণে অনুরুদ্ধ ;

ভরদ্বাজগোত্র


তিথিমেধা
১. গৌতম
২. বিভাকর ভট্ট
৩. প্রভাকর ভট্ট
৪. বিষ্ণু মিশ্র
৫. কাকুৎস্থ মিশ্র
৬. গোপী ওঝা
৭. বাচস্পতি
৮ গুণাকরাচার্য আকাশবাসী (বারেন্দ্র)
লক্ষ্মণ (রাঢ়ী)
৮. গুণাকরাচার্য আকাশী
৯. বর্ধমান অগ্নিহোত্রী
নারায়ণ পঞ্চতপা
১০ পৃথ্বীধর
১১শভাচার্য
১২ মাতঙ্গওঝা
১৩ জিষ্ণানি আচার্য
১৪ ভাস্কর বেদান্তী
পরাশর

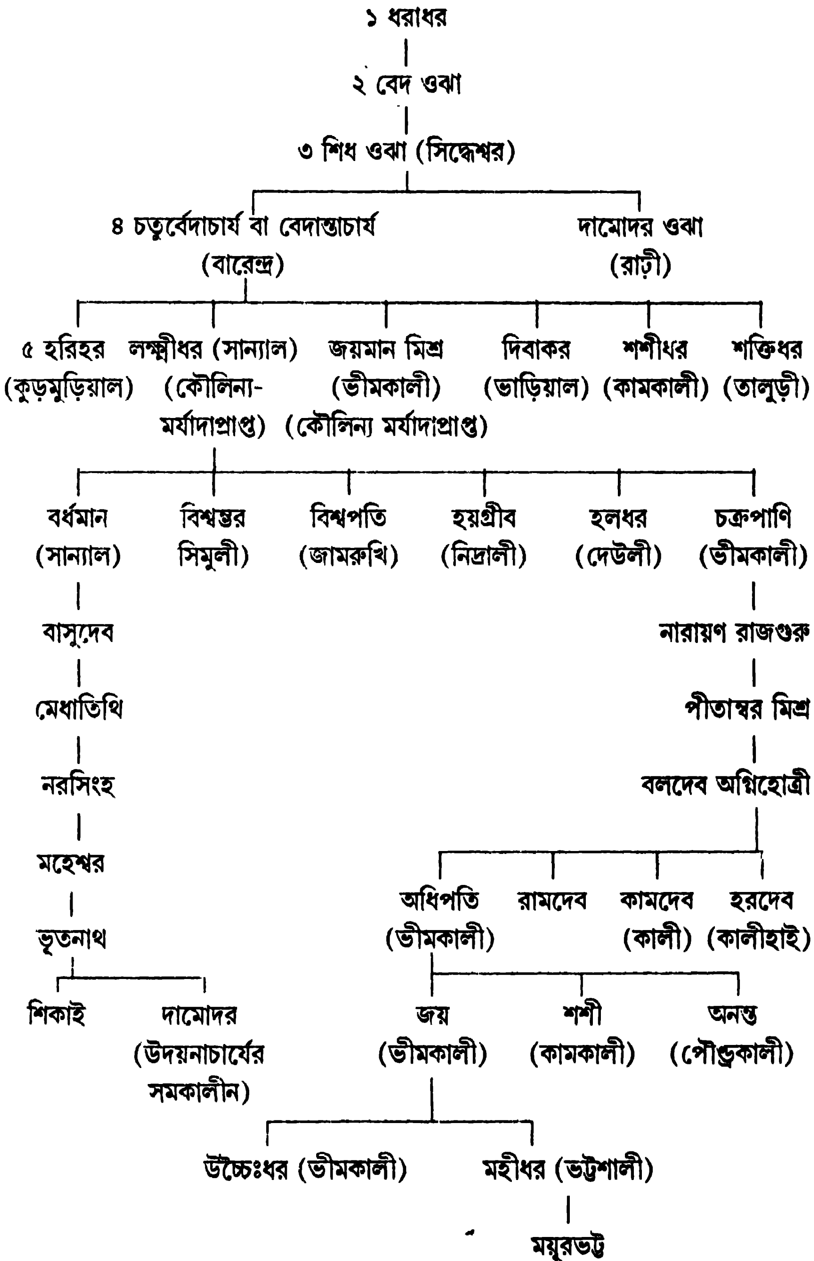

১৪ ভাস্কর বেদান্তী
১৫ কণ (গোচ্ছাসীগ্রামী)
ধন (গোগ্রামী)
সুকাশী (গোস্বালম্বী)
সায়নাচার্য (ভাদড়)
ভুবনেশ্বর (আতুর্থি)
বিনায়ক (উচ্ছরখি)
১৬ বেদওঝা (ভাদড়)
আরুওঝা (লাউড়ী বা নাড়িয়াল)
আতুওঝা (রত্নাবলী)
বাপী
১৭যদুপণ্ডিত
১৮ শ্রীপতি (নাড়িয়াল)
জটাধর (শাকটী)
নেতু (বেদ) (ঝম্পটী)
পেতু
গুহ
শৈল
ডাক (মহীধর) (কাছটী)
সরল (রাইগ্রামী)
নাথ
পিথ (দধিয়াল)
আকাই (ভাদড়)
জলধর (শিম্বি)
গঙ্গেশ (সরিয়াল)

সাবর্ণ গোত্র


সৌভরি
১ পরাশর
২ দিবাকর
৩ অনিরুদ্ধ
৪ সুধাকর
৫ বিশ্বম্ভর
৬ লম্বোদর
৭ দুর্গাবর
৮ মকরধ্বজ
মাধবাচার্য
গোপালাচার্য
১০ ভরত পাঠক
১১ বিদ্যানন্দ
ভুবনানন্দ
১২ ভবানন্দ
ভবানী
বিষ্ণুানন্দ
দৈবকী
১৩ গোবিন্দ
(বারেন্দ্র)
নারায়ণ
(রাঢ়ী)
শুক্লাম্বর
শশীধর
মুক্তিধর
বংশধর
রক্ষাকর
মধুসূদন
যাদব
বাসুদেব ভট্ট
বিষ্ণুপ্রসাদ চক্রবর্তী
কালিকা প্রসাদ
মুকুন্দ
গঙ্গাধর
বাদলী
কৃষ্ণ

বারেন্দ্র কুলীন-সমাজ

বাৎস্য গোত্র



—নিজমত ও ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও তিনি পিতার কুলধর্মের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না! উপযুক্ত মন্ত্রী ও সচিবগণের সহিত যুক্তি করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এরূপভাবে কুলাচারের প্রশ্রয় দিলে কঙ্কালসার সনাতন বৈদিকধর্ম নামমাত্রে পর্যবসিত হইবে। অবৈদিক ভোগবিলাসময় বৌদ্ধাচার সমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। তাই তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পশুপতি ও হলায়ুধের সাহায্যে অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হইলেন। সে সময়ে তান্ত্রিকগণ তন্ত্র ব্যতীত অপর কোন শাস্ত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। সুতরাং লক্ষ্মণ সেনকেও তন্ত্রের আশ্রয় লইতে হইল। তাঁহার প্রধান ধর্মাধিকারী পরমপণ্ডিত হলায়ুধ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের সারসংগ্রহপূর্বক সেই সময়ের উপযোগী "মৎস্যসূক্ত" নামে এক মহাতন্ত্র প্রচার করিলেন। হিন্দু সমাজের সদাচার রক্ষা হয়, অথচ সাধারণ তান্ত্রিকগণ বিরোধী না হয়, যেন এই মহদভিপ্রায়েই মৎস্যসূক্তমহাতন্ত্র রচিত হইয়াছে। প্রথমেই মৎস্যসূক্ততন্ত্রে বীরাচারিদিগের অভিমত তারাকল্প, একজটা, উগ্রতারা এবং ত্রিপুরা দেবীর পূজাক্রম ও মন্ত্রোদ্ধার, তৎপরে বৌদ্ধতন্ত্রানুমোদিত মহাচীনক্রম, তারার বীরসাধন ও নীলসারস্বতক্রম এবং মধ্যে মধ্যে বেদের প্রশংসা করিয়া যেন বৌদ্ধতন্ত্রানুসারেই তারার স্তব করা হইয়াছে।[১৪] প্রথমাংশ পাঠ করিলে মৎস্যসূক্ত যেন বীরাচারির প্রিয়বস্তু বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু বীরাচারির সমর্থন করা মৎস্য-সূক্ততন্ত্রকার হলায়ুধের উদেশ্য নহে। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে যে সদাচারের বিধান আছে, মৎস্যসূক্তের পরবর্তী পটল হইতে গ্রন্থসমাপ্তি পর্যন্ত অংশে তাহারই তিনি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ যাহা সদাচার বলিয়া অদ্যাবধি পালন করিতেছেন, বর্তমান শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবগণের প্রধানত অনুষ্ঠেয় আহ্নিক ও মাসকৃত্য, বারব্রত এবং নানা দেবদেবীর পূজামন্ত্রাদি মৎস্য-সূক্তের অধিকাংশে ভূষিত। মৎস্যসূক্তের ৩১শ পটল হইতে ৪১শ পটল পর্যন্ত আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে, মন্বাদির প্রাচীন স্মৃতিতে শৌচাশৌচ, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, চাতুর্বর্ণের অবশ্য কর্তব্য ও প্রায়শ্চিত্তাদি যাহা নিরূপিত হইয়াছে, হলায়ুধ তাহারই যেন সারসংগ্রহ করিয়া মৎস্যসূক্তে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে তারা প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া বীরাচারিদিগকে হাতে আনিয়াছেন. তৎপরে মদ্য[১৫] মাংসাদির যথেষ্ট নিন্দা করিয়া তাহার অসাত্ত্বিকতা ও প্রায়শ্চিত্তার্হতা প্রতিপাদন করিয়াছেন[১৬]। অবশেষে বৌদ্ধাদির যথেষ্ট নিন্দা করিতেও মৎস্যসূক্তকার পশ্চাৎপদ হন নাই।[১৭]

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন একদিকে যেমন মৎস্যসূক্ততন্ত্র প্রচার করাইয়া সাধারণ তান্ত্রিকগণের কাদাচার বর্জনের উপায় করিলেন, অপর দিকে আবার বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণের জন্য প্রধান মন্ত্রী পশুপতি দ্বারা "সংস্কার পদ্ধতি" এবং রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বিপ্র সমাজের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্য হলায়ুধ কর্তৃক "ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব" প্রচার করাইলেন। এই সময়েই হলায়ুধের অপর ভ্রাতা পণ্ডিতবর ঈশান গৌড় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের জন্য "আহ্নিক-পদ্ধতি" প্রচার করেন। লক্ষ্মণ সেন কিরূপে বঙ্গের হিন্দু সমাজকে উন্নত করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত চারিখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিশেষত মৎস্যসূক্ত আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, লক্ষ্মণ সেন যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, প্রায় সেই প্রণালীতেই বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ আজও পরিচালিত হইতেছে।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন বৃদ্ধ বয়সে গোঁড়া বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছিলেন। জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীর মধুর আস্বাদনেই তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

ভাগবতের দশম স্কন্ধ এই সময় লক্ষ্মণের সভায় নিত্য পাঠ্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রভাব রাজধানীর সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে যে হলায়ুধ "শৈবসর্বস্ব" লিখিয়া গৌড়রাজের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাকেই "বৈষ্ণবসর্বস্ব" লিখিতে হইল। ভাগবতধর্মের গূঢ় রহস্য সাধারণের সহজবোধ্য নহে। সাধারণের পক্ষে তাহা বিপরীত ফল উৎপাদন করিয়াছিল। এই সময়ের রাজকবি ধোয়ীর "পবনদূত" পাঠ করিলে দেখিতে পাইব,—বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেনের রাজধানীতে বিলাসিতার স্রোত সতেজে প্রবাহিত হইতেছিল, প্রকাশ্য রাজপথ বার-বিলাসিনীগণের মঞ্জীরনিক্কণে মুখরিত, নিশীথে স্বেচ্ছাচারিণী অভিসারিকাগণের অব্যাহত গতিতে সেনরাজধানী সচকিত ও নগরের উদ্যানসমূহ নাগর-দোলায় ঘূর্ণমানা, নাগর নাগরীগণের প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী যেন বিকশিত! তাহারই পরিণাম গৌড়ীয় সেনাবিভাগে যথেষ্ট স্বেচ্ছাচার, বিলাসিতা ও চরিত্রহীনতা প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল! তাহারই ফলে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের হস্ত হইতে ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে গৌড়রাজধানী মুসলমান কবলিত হইল। বৌদ্ধাচার বিপ্লাবিত হিন্দুসমাজকে ক্রমশ উন্নত করিবার জন্য মহারাজ লক্ষ্মণ সেন যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, বঙ্গবাসী হিন্দুসাধারণের দুরদৃষ্টক্রমে আর তাহা সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিল না।

গৌড়াধিপ নবদ্বীপ-রাজধানী পরিত্যাগ করিলে তৎপুত্র কেশব গৌড়ে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া একবার মুসলমানগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারী সৈন্যগণ লইয়া তিনি পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সমর্থ হইলেন না, অবশেষে তিনি মুসলমান ভয়ে গৌড় পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে পালাইয়া গেলেন।[১৮] তখনও বিক্রমপুরে লক্ষ্মণ সেনের অপর পুত্র মহাবল বিশ্বরূপ রাজত্ব করিতেছিলেন। যেরূপ ঘোরতর ষড়যন্ত্রে বৃদ্ধ নৃপতি লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তৎপুত্র বিশ্বরূপের সভায় সেরূপ কোন বিশ্বাসঘাতকতা বা ষড়যন্ত্রের অভিনয় হয় নাই, অথবা স্বেচ্ছাচার বা বিলাসিতায় তখনও পূর্ববঙ্গ আচ্ছন্ন হয় নাই। তাই বিশ্বরূপ মুসলমান-আক্রমণ হইতে পূর্ববঙ্গ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[১৯] তাঁহার সভায় গিয়া কেশব সেন কুলীন ব্রাহ্মণগণসহ উপযুক্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন।[২০]

বিশ্বরূপ আপনার রাজ্যরক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। সে জন্য সমাজ সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে সুবিধা পান নাই! তিনি পিতৃ-প্রবর্তিত তান্ত্রিকনামধেয় প্রচ্ছন্ন বৈদিকাচারেরই সমর্থন করেন এবং বৈদিক বিপ্রদিগকে বহুতর শাসনগ্রাম দান করিয়া বৈদিক-প্রিয়তাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময় হইতেই লক্ষ্মণ-সংস্কৃত কুলীনসমাজের ন্যায় বৈদিকসমাজেও মিশ্র বৈদিক-তান্ত্রিকাচার প্রবেশলাভ করিতেছিল। তৎপরে সেনবংশীয় মহারাজ দনৌজামাধবের সময় উক্ত মিশ্রাচারই পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুসমাজে বিস্তৃতি লাভ করিল। বৈদিকসমাজে স্পষ্টত স্বীকৃত না হইলেও ঐ সময়ের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-সমাজে তান্ত্রিক ও বৈদিক উভয় আচারই শ্রুতিসম্মত বলিয়া গণ্য হইল।[২১]

১. "ততো ভক্তিং প্রকৃত্যাদৌ ভক্তদাভীষ্টদায়িনীম্।
উপাসে সলিলাহারৈর্বধমেকং সমাহিতঃ।।
যোগিনীঘট্টমাশ্রিত ভাগীরথ্যান্তটালয়ে।
তপসা তোষিতাদেবী সুখমোক্ষপ্রদায়িনী।
তদীপ্সিতং বরং দত্ত্বা তদেবান্তর্দধে দিবি।।

প্রত্যাদিষ্টৈর্নৃপৈস্তুষ্টিভু বি ভক্ত্যুপচারতঃ।
কুললক্ষ্মীং পূজায়িত্বা কথিতং কুললক্ষ্মণম্।।
আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষ্মণম্।।
এতল্লক্ষণলক্ষাণাং ভূসুরাণাং কুলীনতাম্।
কুলয়ামি কলৌ কৌলে ভবিষ্যন্ত্যমরা ইব।।" (রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী)

২. লক্ষ্মণ সেনের সময় সমীকরণ প্রচলিত হইবার কালে রাঢ়ীয় কুলীন সমাজে 'শান্তি' স্থানে 'আবৃত্তি' পাঠ গৃহীত হয়। কিন্তু বারেন্দ্রসমাজে লক্ষ্মণ সেনের মত কোন দিন গৃহীত হয় নাই।

৩. "বিশ্বঞ্চ দেবতারূপং ভাবয়েৎ কুলসুন্দরি।
স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্বং পুরুষং শিবরূপিণম্।।
অভেদে চিন্তয়েদযস্তু স এব দেবতাত্মকঃ।
মন্ত্রে চৈব দৃঢ়জ্ঞানং পিতৃদেবার্চনং তথা।।
বলিবশ্যং তথা শ্রাদ্ধং নিত্যকার্যং শুচিস্মিতে।।
শত্রুমিত্রসমং দেবি চিন্তয়েত্তু মহেশ্বরি।
অন্নঞ্চৈব মহেশানি সর্বেষাং পরিবর্জয়েৎ।।
সত্যঞ্চ কথয়েদ্দেবি ন মিথ্যা চ কদাচন।
কেবলং দিব্যভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।।" (কুব্জিকাতন্ত্রে ৭ম পটল)

৪. "মানসং ভগরোমাদিমানসং ভগপূজনম্।
সর্বঞ্চ মানসং কুর্যাত্তেন সিদ্ধতি সাধকঃ।।" (পিচ্ছিলাতন্ত্র ১০ম পটল)

৫. "বিনা শক্তিং ন পূজাস্তি মৎস্যং মাংসং বিনা প্রিয়ে।
মুদ্রাঞ্চ মৈথুনঞ্চাসি বিনা নৈব প্রপূজয়েৎ।।
স্ত্রীভগং পূজনাধারঃ স্বর্ণরূপ্যাত্মকঃ কুশঃ।" (পিচ্ছিলাতন্ত্র ১০ম পটল)
"অভিষিক্তো ভবেৎ বীরো অভিষিক্তা চ কৌলিকী।
এবঞ্চ বীরশক্তিঞ্চ বীরচক্রে নিয়োজয়েৎ।" (নিরুত্তরতন্ত্র ১০ম পটল)

৬. "দুর্গাপূজাং বিষ্ণুপূজাং শিবপূজাঞ্চ নিত্যশঃ।
অবশ্যং হি যঃ করোতি স পশুরুত্তমঃ স্মৃতঃ।।
বেদোদ্ভবং ক্রিয়ার্থঞ্চ পশুভাবং হি চাধমঃ।" (রুদ্রযামল, উত্তরখণ্ড)

৭. "ভোগেন লভতে যোগং ভোগেন কুলসাধনম্।
ভোগেন সিদ্ধিমাপ্নোতি ভোগেন মোক্ষমাপ্ন য়াৎ।।
তস্মাদ্ভোগঃ সদা কার্য্য বাহ্যপূজা যথেচ্ছয়া।।" (মাতৃকাভেদ ৩য় পঞ্জী)

৮. "জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূঞ্চৈব বৌদ্ধাচারঞ্চ যোগিনম্।
কর্ম-শুভাশুভঞ্চৈব মহাবীরো না নিন্দয়েৎ।।" (রুদ্রযামল ২২ পঞ্জী)

৯. "আদৌ মৈত্রস্তথা ভীমো রুদ্রঃ সপ্তামিনী তথা।
লাহিড়ী ভাদুড়ী সাধুঃ ভাদড়ঃ পংক্তিপূরকঃ।।" (বারেন্দ্রকুলপঞ্জী)

১০. "করঞ্জনন্দনাবাসী ভট্টশালী চ লাউড়ী।
চম্পটীঃ ঝম্পটিশ্চৈব আতুর্থী কামদেবকঃ।।"

১১. যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত কুলশাস্ত্রদীপিকা ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১২. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ (২য় সং) ১৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৩. "ব্রাহ্মণায় কুলস্থানং দত্তবান্ ভুবি দুর্লভমূল।" (হরি মিশ্র)

১৪. বৌদ্ধতন্ত্র-মতে তারা লোকেশ্বর বুদ্ধের কন্যা এবং তাঁহার একটি প্রধান নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। মৎস্য সূক্ততন্ত্রে ৭ পটলে—
"লোকেশস্য সুতাপ্যথমতা বালা বৃদ্ধা কালী শ্বেতা স্বাহা স্বধা বিধেয়া।"
ঐ পটলে—"জয় জয় তারে দেবি নমস্তে প্রভাবতি ভবতি যদিহ সমগ্রে।
প্রজ্ঞাপারমিতামিতচরিতে প্রণতজনানাং দুরিতক্ষরিতে।।"

এইরূপে মৎস্যসূক্তে তারা লোকেশসুতা ও প্রজ্ঞাপারমিতা নামে কীর্তিতা।

১৫. "নারিকেলঞ্চ খর্জুরং পনসঞ্চ তথৈব চ।
ঐক্ষবং মধুকং টঙ্কং তালঞ্চৈব চ মাক্ষিকম্।।

দ্রাক্ষান্তু দশমং জ্ঞেয়ং গৌড়ীং চৈকাদশং স্মৃতম্।
পৈষ্টীন্তু দ্বাদশং প্রোক্তং সর্বেষমধমং স্মৃতম্।।
মধ্যামং মধুজং গৌড়ং শেষঞ্চোত্তমমিষ্যতে।
এতদ্দ্বাদশকং মদ্যং ন পাতব্যং দ্বিজৈঃ কচিৎ।।"
কামাৎ পীত্বা সুরাং বিপ্রো মরণান্তিকমাচরেৎ।" (মৎস্যসূক্ত ৩৬ পটল)

১৬. "যো যজ্ঞেনাশ্বমেধেন মাসি মানি যতব্রতঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্‌যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমং।।
দ্বাদশাব্দং ত্যজেদ্‌যস্তু ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
সংবৎসরন্তু দেবোশি সর্বযজ্ঞফলং লভেৎ।।
যাবজ্জীবং ত্যজেদ্‌যস্তু সোহস্মাকং সমতাং ব্রজেৎ।
নৈত্যিকং পৈতৃকং কাম্যং সর্বত্রৈব বিবর্জয়েৎ।
যেন মাংসং পরিত্যক্তং সোহপি মৎস্যং ন ভক্ষয়েৎ।।" (মৎস্যসূক্ত ৩৭ পটল)

১৭. "অস্পৃশ্যমথ বক্ষ্যামি তাং শৃণুব বরাননে। ...
বৌদ্ধান্ পাশুপতাংশ্চৈব লোকায়তিকনাস্তিকান্।
বিকর্মস্থং দ্বিজাং স্পৃষ্ঠা সচেলো জলমাবিশেৎ।।"

(মৎস্যসূক্ত ৩৮ পটল ১ম শ্লোক)

১৮. হরি মিশ্রের কারিকা।

১৯. এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (১৮৯৬ খ্রি অঃ) প্রকাশিত বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য।

২২. এড় মিশ্রের কারিকা।

২৩. 'তান্ত্রিকী বৈদিকী চৈব দ্বিবিধা শ্রুতিঃ কীর্তিতা।" (মনুটীকায় কুল্লূকভট্ট।)

পঞ্চম অধ্যায়
উদয়নাচার্যের কুলবিধি

পূর্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে বল্লাল সেন কুলমর্যাদা প্রদান করিলেও এবং কুলীনগণ রাজসম্মানহেতু সমস্ত বারেন্দ্র সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিলেও কুলীন ও শ্রোত্রিয় মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদানের কোন প্রকার বিধি-নিষেধ ছিল না, কুলীন ও শ্রোত্রিয় মধ্যে অবাধে বিবাহ চলিতেছিল। রাঢ় ও বঙ্গে যেমন সেনরাজবংশের উৎসাহে এবং প্রধান প্রধান কুলীন ও কুলাচার্যগণের চেষ্টায় পুনঃ পুনঃ সমাজসংস্কারের আয়োজন চলিয়াছিল, বল্লাল সেনের গৌড় ত্যাগ ও বিক্রমপুরে বাস এবং তাহার কিছুদিন পরে গৌড়ে মুসলমান প্রভাব বিস্তারহেতু বারেন্দ্র কুলীন সমাজের সংস্কারের দিকে কেহ বিশেষ লক্ষ করেন নাই। পূর্বেই লিখিয়াছি যে, গৌড়ে বল্লাল সেন বেশি দিন অবস্থান করিতে পারেন নাই, তাঁহার অভ্যুদয়কালে এখানে বৌদ্ধাচারই বিশেষ প্রবল ছিল। তাঁহার মত পরিবর্তনের সঙ্গে উচ্চ ব্রাহ্মণ সমাজ প্রকাশ্যে বৌদ্ধাচার পরিত্যাগ করিলেও গোপনে অনেকেই পূর্বাচার রক্ষণ করিয়া চলিতেন, বৈদিকাচারের বড় ধার ধারিতেন না। সেই সময়ের অবস্থা লক্ষ করিয়াই মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণসর্বস্বে লিখিয়াছেন,—

"এই কলিকালে আয়ু, প্রজ্ঞা, উৎসাহ ও শ্রদ্ধাদি হ্রাসপ্রযুক্ত কেবল পাশ্চাত্যাদি ব্রাহ্মণেরাই বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ অধ্যয়ন না করিয়া কেবল কিয়দংশ বেদার্থের কর্মমীমাংসানুসারে যে ইতিকর্তব্যতা বিচারমাত্র করিয়া থাকেন, তাহাতে মন্ত্রার্থ বা বেদার্থের কর্মমীমাংসানুসারে যে ইতিকর্তব্যতা বিচারমাত্র করিয়া থাকেন, তাহাতে মন্ত্রার্থ বা বেদার্থজ্ঞান কিছুই হয় না। অথচ মন্ত্রার্থজ্ঞানেরই বিশেষ প্রয়োজন। যেহেতু তৎপরিজ্ঞানেই শুভফল, আর তাহার অপরিজ্ঞানে দোষই শুনা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেদাধ্যয়ন বিষয়ে বেদমন্ত্রার্থজ্ঞানই তাৎপর্য। কিন্তু রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ কেবল অনুচিতাচার করেন। এই উভয় ব্রাহ্মণেরই গ্রন্থার্থানুসারে বেদজ্ঞান একেবারেই নাই। ... এ সম্বন্ধে যম বলিয়াছেন, শূদ্রকে বৃষল বলা যায় না, বেদই বৃষ, যে বিপ্র সেই বেদ বা বৃষহীন, তিনি বৃষল নামে অভিহিত।"[১] এইরূপ ভাবে হলায়ুধ বুঝাইয়াছেন—'সন্ধ্যা, আহ্নিক ও নিত্য নৈমিত্তিক কার্যে ব্রাহ্মণের যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, সে সমস্ত ভাল করিয়া জানা, তাহার মর্ম ও সরহস্য শ্রুতি অবগত হওয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণের কর্তব্য। নচেৎ কেবল মাত্র গায়ত্রীস্মরণে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা হয় না। তাই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের ব্রাহ্মণত্বরক্ষার জন্য 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' রচিত হইয়াছে।[২]

হলায়ুধের উক্তি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময়ে সাগ্নিক বিপ্রবংশধর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণের মধ্যে প্রকৃত বৈদিকাচার একপ্রকার লোপ পাইয়াছিল, আবার বৈদিকাচার-প্রবর্তনের উদ্দেশ্যেই হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব সঙ্কলিত হইয়াছিল। যাহা হউক, মহামতি হলায়ুধের উদ্দেশ্য রাঢ়-বঙ্গে কতকটা সিদ্ধ হইলেও বৌদ্ধবিপ্লাবিত বারেন্দ্র-সমাজে উপযুক্ত প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তাই

বারেন্দ্র-অঞ্চলে বল্লাল সেনের তিরোধান ও মহামতি উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর অভ্যুদয়ের পূর্বে কোন শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিবন্ধ বা সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

১২০০ খ্রিস্টাব্দ হইতে গৌড়মণ্ডলে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। রামাই পণ্ডিত রচিত শূন্যপুরাণের "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক অংশ পাঠ করিলে মনে হইবে গৌড়ে যে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারাও মূলে বৌদ্ধাচারী সদ্ধর্মীদিগের ষড়যন্ত্র। সাধারণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য ঐ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—

"মালদহে লাগে কর, না চিনে আপন পর,
জালের নাহিক দিসপাস।
বলিষ্ঠ হইল বড়, দস বিস হয়্যা জড়,
সদ্ধর্মীরে করএ বিনাস।।
বেদে করে উচ্চারণ, বের্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন,
দেখিআ সভাই কম্পমান।
মনে ত পাইআ মম্ম, সভে বোলে রাখ ধম্ম,
তোমা বিনে কে করে পরিত্তান।।
এইরূপে দ্বিজগণ, করে সৃষ্টি সংহারণ,
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিআ ধম্ম, মনেতে পাইআ মম্ম,
মায়াত হোইল অন্ধকার।।
ধম্ম হইল যবনরূপী, মাথাঅত কাল টুপি,
হাতে সোভে তিরুচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়,
খোদাঅ বলিআ এক নাম।।
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈল্য ভেস্ত অবতার,
মুখেত বলেত দম্বদার।
যত্তেক দেবতাগণ, সভে হয়্যা একমন,
আনন্দেত পরিল ইজার।।
ব্রহ্মা হৈল মহামদ, বৈষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল্যা শূলপাণি।
গণেশ হইল্যা গাজী, কার্তিক হইল্যা কাজি,
ফকির হইল্যা মহামুনি।।
তেজিয়া আপন ভেক, নারদ হৈলা সেখ,
পুরন্দর হইল মৌলানা।
চন্দ সূর্জ্জ আদি দেবে, পদাতিক হয়্যা সেবে,
সভে মিলি বাজান বাজনা।।
আপুনি চণ্ডীকা দেবী, তিঁহ হৈল্যা হায়া বিবি,
পদ্মাবতী হ'ল্যা বিবিনূর।
যত্তেক দেবতাগণ, হয়্যা সভে একমন,
প্রবেশ করিল জাজপুর।।

দেউল দেহারা ভাঙ্গে, কাড়্যা ফিড়্যা খাঅ রঙ্গে,
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিআ ধম্মের পাঅ, রামাঞি পণ্ডিত গাএ,
ই বড় বিসম গণ্ডগোল।।"

শূন্যপুরাণের উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, মালদহ বা প্রাচীন গৌড় অঞ্চলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সদ্ধর্মীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। পূর্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, বারেন্দ্র-সমাজে বৌদ্ধাচার প্রচলিত ছিল এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বৈদিকাচারী হইয়াছিলেন।

বিজয় সেন, লক্ষ্মণ সেন ও তাঁহার বংশধরগণ সকলেই বৈদিক ব্রাহ্মণানুরক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, তৎকালে বৈদিক ব্রাহ্মণের অদম্য প্রভাব। গৌড়ে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বৈদিকাচার প্রচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, রাজপূজিত বলিয়া আপামর সকলেই তাঁহাদিগকে ভয় ও ভক্তি করিত। সদ্ধর্মী বা বৌদ্ধগণ তাঁহাদিগকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিল। যে তাঁহাদিগকে কর না দিত বা অসম্মান করিত, বহু বৈদিক একত্র হইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিত। এরূপ অত্যাচার ক্রমেই সদ্ধর্মীদিগের অসহ্য হইল। প্রতিবিধানের জন্য তাহারা মুসলমানগণকে আহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মুসলমানগণ আসিয়া মালদহ লুট করিল—দেবদেবী ও দেবালয় ভাঙ্গিল, সদ্ধর্মীদিগের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। এই ঘটনার সহিত মহম্মদ্-ই বখ্তিয়ারের গৌড়াক্রমণের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, কে বলিতে পারে? বস্তুত কথা এই, দেশের জনসাধারণ কতকটা রাজদ্রোহী বা ধর্মদ্রোহী না হইলে কি মুষ্টিমেয় মুসলমান-সৈন্য আসিয়া সহজে গৌড়রাজ্য অধিকার করিতে পারে?

যাহা হউক, গৌড়ে মুসলমান প্রভাব বিস্তারের সহিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সমাজ-সংস্কারে বাধা পড়িল। এ সময় যে বারেন্দ্র-সমাজে নিষ্ঠাবান বৈদিক ধর্মনুরাগী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ না ছিলেন, এমন নহে, কিন্তু হিন্দুরাজ শাসন লোপের সঙ্গে তাঁহারাও স্ব স্ব সামাজিক প্রভুত্ব হারাইতে ছিলেন। এ সময়ে পূর্বতন বহুবিধ বৌদ্ধাচার, বল্লাল সেন-প্রবর্তিত হিন্দুতান্ত্রিকাচার, লক্ষ্মণ সেন-নির্দিষ্ট ও হলায়ুধ-প্রবর্তিত নব্য বৈদিকাচার এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের নবীন ইসলাম আচার ইত্যাদি বহুবিধ সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক আচার-ব্যবহারে বারেন্দ্র অঞ্চলে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। নিষ্ঠাবান অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এই সমাজবিপ্লব হইতে দূরে থাকাই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ পূর্ববঙ্গে সেনবংশের অধিকারে এবং কেহ বা হিন্দুর সর্বপ্রধান পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে পূর্ববঙ্গবাসী নরসিংহ নাড়িয়াল, কাশীবাসী উদয়নাচার্য ভাদুড়ী ও কুল্লুকভট্ট নন্দনাবাসীর নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। তৎকালে বারেন্দ্র অঞ্চলে নানা প্রকার সাম্প্রদায়িক আচার প্রচলিত থাকিলেও বৌদ্ধগণই প্রবল। নিগূঢ়কল্প ও বারেন্দ্র-পটীব্যাখ্যা নামক গ্রন্থেও লিখিত আছে—

"এই সকল ব্যাপার করিয়া বল্লাল সেনের স্বর্গারোহণ। কিন্তু কুলীনের কন্যা শ্রোত্রিয়েতে লন, শ্রোত্রিয়ের কন্যা কুলীনেতে লন। তার কিছু বিশেষ্য বিশেষণ করিলেন না। কিছুকাল পরে ভাদুড়ী কুলেতে জন্মিলেন উদয়নাচার্য ভাদুড়ী। সেই উদয়নাচার্য কিমৎ

'যৎকীর্তিবিমলে ধরামরকুলে অদ্যাপি সংদীপিতা'।

উদয়নাচার্য সাক্ষাৎ সূর্য সাক্ষাৎ অবতীর্ণ, বৌদ্ধক্রান্ত দেশ ছিল, বৌদ্ধনিগ্রহ করেন, বেদ উদ্ধার করেন, ধর্মসংস্থাপন করেন, পরিবর্ত মর্যাদা করেন।"

'গৌড়ে ব্রাহ্মণ'-ধৃত সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভাদুড়ী বংশাবলীতে লিখিত আছে—'যোগেশ্বর ভাদুড়ীর পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ, তৎপুত্র বৃহস্পতি, ইনিই উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর জনক। বৃহস্পতি বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া আচার্যপদ লাভ করেন, তাঁহাদের সহিত বৌদ্ধাচার্য জিহ্মাণির বিচার হয়, সেই বিচারে বৃহস্পতি পরাস্ত ও অপমানিত হইয়া বনে গিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র ধর্মসংস্থাপন ও বৌদ্ধবিধ্বংসহেতুই শঙ্করাচার্যের ন্যায় উদয়নাচার্য নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। পিতার পরাভব ও তজ্জন্য মৃত্যু এবং বৌদ্ধদিগের জয়বার্তা শুনিয়া তিনি ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইলেন এবং যথাকালে বৌদ্ধগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশার্থ কুসুমাঞ্জলি নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। তিনিই কুল্লূকভট্ট, ময়ূরভট্ট ও মঙ্গল ওঝা এই তিন জন শুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের সাহায্যে কুলগৌরব-রক্ষার্থ কুলীনগণের মধ্যে করণ ও পরিবর্ত মর্যাদা এবং শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে তিলক্যদানের প্রথা চালাইয়া যান।[৩]

সুতরাং বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে, উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর সময় পর্যন্ত বারেন্দ্র বৌদ্ধপ্রভাব ছিল। উদয়নের পিতা যে বৌদ্ধাচার্যের নিকট পরাজিত হন, তাঁহার নাম জিহ্মাণি। বারেন্দ্রকুলগ্রন্থে পঞ্চগোত্রের ব্রাহ্মণমধ্যে এরূপ নামের অভাব নাই। বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, 'উদয়নাচার্য মৃত্যুপণ করিয়া বৌদ্ধাচার্যের সঙ্গে বিচারে অগ্রসর হন ও জয়লাভ করেন। পণ অনুসারে বৌদ্ধাচার্যের প্রাণদণ্ড হয়। বৌদ্ধাচার্য ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইজন্য উদয়নাচার্যে ব্রহ্মহত্যাপাপ স্পর্শে। ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্তির আশায় তিনি জগন্নাথক্ষেত্রে যাত্রা করেন, কিন্তু জগন্নাথ তাঁহাকে দর্শন দিলেন না, তাহাতে উদয়নাচার্য হতাশ না হইয়া যেমন রাজা জনমেজয় পূর্বপুরুষের গুণকীর্তন ও শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন, তিনিও সেইরূপ পাপমোচনমানসে কুলশাস্ত্র-সংগ্রহ ও কুলীনগণের মধ্যে পরিবর্তমর্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন।'[৪] এই প্রমাণেও জানিতে পারিতেছি যে, তৎকালে বারেন্দ্র-সমাজে ব্রাহ্মণগণমধ্যেও বৌদ্ধাচারের অভাব ছিল না।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে উদয়নাচার্য সাক্ষাৎ সূর্যস্বরূপ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। এরূপ প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার অভ্যুদয়কাল লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নের প্রকৃত সময় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার লক্ষ্মণাবলীর শেষে এইরূপ গ্রন্থ রচনা কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে—

"তর্কাম্বরাঙ্ক প্রমিতেষ্বতীতেষু শকান্ততঃ।
বর্ষেষূদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষ্মণাবলীম্।।"

অর্থাৎ শকনরপতির ৯০৬ বর্ষ গত হইলে (উক্ত) অব্দে উদয়ন সহজবোধ্য লক্ষ্মণাবলী রচনা করেন। সকলেই স্বীকার করিবেন, ৯০৬ শকাব্দে (৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে) গৌড়ে পালবংশের অধিকার, এ সময় সেনবংশের অভ্যুদয়ই ঘটে নাই। এরূপ স্থলে কুসুমাঞ্জলিকার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য ও বল্লাল সেনের বহু পরবর্তী উদয়নাচার্য ভাদুড়ী কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। সম্ভবত উদয়ন ভাদুড়ী কাশী হইতে পাঠ শেষ করিয়া আসিবার সময় কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ আনিয়া গৌড়ে প্রচার করেন, উভয়ের নামে ঐক্য থাকায় পরবর্তী কালে উদয়ন ভাদুড়ীর উপর কুসুমাঞ্জলির আরোপ করা কিছু অসম্ভব নহে।

উদয়নাচার্যের কালনিরূপণ

কাহারও মতে উদয়নাচার্য খৃস্টিয় ১৫শ শতাব্দীর লোক। গৌড়ে-ব্রাহ্মণ-রচয়িতার মতে উদয়নাচার্য ১২৫০ শকে (১৩২৮ খ্রিস্টাব্দে) বিদ্যমান ছিলেন। "যিনি বিচারে বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করেন, তাঁহার পক্ষে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রণয়ন কঠিন কার্য নহে।"[৫] কিন্তু উদয়নাচার্য

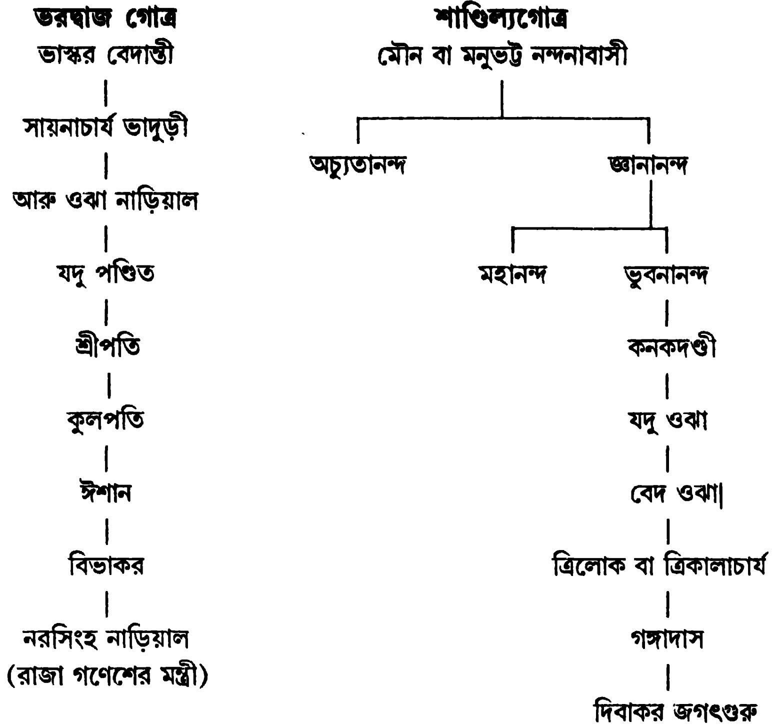
ভাদুড়ীর বংশাবলী ও সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য-রচিত গ্রন্থাবলী আলোচনা করিলে উক্ত উভয় মতের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। পূর্বেই লিখিয়াছি, ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা বল্লাল সেন পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার আরব্ধ ও তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেনের হস্তে 'পরিসমাপ্ত' অদ্ভুতসাগর নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ১১৬৯-৭০ খ্রি অব্দের মধ্যে বল্লাল সেন ইহলোক ত্যাগ করেন।[৬] এরূপ স্থলে তাঁহার মৃত্যুর ৩০ বর্ষ পূর্বে ও সিংহাসনারোহণের ২০ বর্ষ পরে তাঁহার কুলব্যবস্থা প্রচলনকাল এবং তৎপূজিত কুলীনদিগকে ১১৩৯ খ্রিস্টাব্দের সমকালে পাইতেছি। পূর্বেই লিখিয়াছি যে, উদয়নাচার্য ভাদুড়ী ও কুল্লূকভট্ট উভয়ে সমসাময়িক। এদিকে উদয়নের পূর্বপুরুষ ক্রতু ভাদুড়ী ও কুল্লূক ভট্টের পূর্বপুরুষ মৌন ভট্ট বল্লাল সেনের সমকালীন। বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ নরসিংহ নাড়িয়ালও উদয়নের সমকালীন বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ ভাস্কর বেদান্তী বল্লাল সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি। ক্রতু, মৌনভট্ট ও ভাস্কর বেদান্তী এই তিন ব্যক্তি হইতেই উদয়নাচার্য প্রভৃতির মধ্যে ৮ পুরুষ ব্যবধান, পর পৃষ্ঠায় বংশতালিকা দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন —সুতরাং ৮ পুরুষে মোটামুটি ২৫০ বর্ষ ধরিয়া লইলে (১১৩৯+২৫০=) ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে উদয়নাচার্য প্রভৃতিকে দেখিতে পাই। ঈশাননাগরকৃত অদ্বৈতপ্রকাশ নামক বৈষ্ণবগ্রন্থে নরসিংহ নাড়িয়াল সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ের বাদশাহ মারি গৌড়ের হইল রাজা।।"

৭৮৭ হিজিরায় বা ১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা গণেশের অভ্যুদয়। দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনে থাকিয়া গৌড়বাসী এই গণেশ নৃপতির সময়ে কিছুদিনের জন্য স্বাধীনতার উজ্জ্বলমূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন। এই সুদিনে গৌড়ের ব্রাহ্মণ সমাজেও সমাজ সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই শুভ অবসরে স্মার্তপ্রবর কুল্লূকভট্ট ও সমাজতত্ত্ববিৎ উদয়নাচার্য ভাদুড়ী আসিয়া মিলিত হইলেন। বহুদিন হইতেই এখানকার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণগণ সেনবংশের অভ্যুদয়কাল হইতে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য রক্ষায় উদ্যোগী ছিলেন, কিন্তু বিধর্মী মুসলমানের শাসন ও বৌদ্ধাচারের প্রবল বন্যায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে নাই। এখন হিন্দুরাজের অধিকারে ও ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর শাসন-সুযোগে তাঁহারা সকলে মস্তকোত্তোলন করিলেন। এই স্থানীয় ব্রাহ্মণসমাজ-সংস্কার-ব্যাপারে উদয়নাচার্য ও কুল্লূকভট্ট অগ্রণী হইয়াছিলেন।

কাশ্যপগোত্র

কৈতে বা ক্রতু ভাঁদুড়ী (বল্লালী কুলীন)
|
সঙ্কর্ষণ
|
ভৃগু বা ভল্লুকাচার্য
|
যোগেশ্বর
|
পুণ্ডরীক বা পুণ্ডরীকাক্ষ
|
বিশ্বম্ভর আচার্য
|
লক্ষ্মীপতি আচার্য
|
বৃহস্পতি আচার্য
|
উদয়নাচার্য ভাদুড়ী



কুল্লূক ভট্ট

এক ব্যক্তি বল্লাল-পূজিত শ্রেষ্ঠ কুলীন সন্তান ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত, বৌদ্ধপরাজিত করিয়া সমাজে প্রতিষ্টা লাভ করিয়াছেন, অপর ব্যক্তি (মনুসংহিতার টীকাকার) অদ্বিতীয় স্মার্ত। বলিতে কি, তাঁহার মত স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ তৎকালে গৌড়মণ্ডলে কেহই ছিলেন না। হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ও হিন্দুধর্মানুরাগী রাজা গণেশের সভায় তাঁহারা যে সর্বপ্রধান সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তি বশতঃই, সমাজে তাঁহারা যে ব্যবস্থা চালাইয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবনত শিরে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বলিতে কি, বৌদ্ধাচার বিপ্লাবিত ও মুসলমান শাসিত বারেন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজে এই সময়েই বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্মের সমন্বয়ে নবীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইল। এই সময়ে মহামতি কুল্লূক ভট্ট তান্ত্রিক কার্যও শ্রুতিসম্মত বলিয়া ঘোষণা করিলেন।[৬] লক্ষ্মণ সেনের সময়ে রাঢ়ে বঙ্গে হলায়ুধ, ঈশান ও পশুপতির চেষ্টায় যেরূপ ব্রাহ্মণ সমাজ-সংস্কারের আয়োজন হইয়াছিল, এখন গৌড়মণ্ডলেও সেইরূপ সংস্কারধর্ম অনুকৃত হইল। এদিকে হিন্দুরাজ প্রভাবে যেরূপ প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ সন্তান রাজকীয় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া যথেষ্ট সহায় সম্পত্তিশালী হইতে লাগিলেন, অপর দিকে সদাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তানগণের মধ্যে বেদের ও তন্ত্রোদিত ক্রিয়ার যথেষ্ট অনুশীলন এবং বিশেষ ভাবে আর্যশাস্ত্রচর্চা চলিতে লাগিল। ঐ সকল ব্রাহ্মণপ্রবরের চেষ্টাতেই সম্ভবত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচার বা বীরাচার উচ্চ বারেন্দ্র সমাজ হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল।

উদয়নাচার্য ভাদুড়ী কুলীন সমাজের বিশুদ্ধিতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই করণ পদ্ধতি ও পরিবর্ত মর্যাদা প্রচলিত করিয়াছিলেন। এখন যিনি যাহাই বলুন, তিনি যে সাধু উদ্দেশ্যে তৎকালোপযোগী নিজ ব্রাহ্মণ সমাজ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। উদয়নাচার্য দেখিলেন, সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ট শ্রোত্রিয়ের পুত্রেরা কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিতেছেন এবং কুলীনপুত্রগণ উপরোক্ত শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতেছেন। মহারাজ বল্লাল সেন তাহার কোন বিশেষ ব্যবস্থা করেন নাই। এইরূপ আদান-প্রদান প্রচলিত থাকিলে ভবিষ্যতে কুলীনদিগের কুলমর্যাদা রক্ষা করার সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য তিনি স্থির করিলেন যে, কুলীনের পুত্র কন্যা কুলীনেই গ্রহণ করিবে অর্থাৎ কুলীনেরা পরস্পর পরিবর্ত করিবে। পুত্র কন্যা পরস্পর পরিবর্তে আদান-প্রদান করিলে ছোট বড় বলিয়া কোন কুলীন আপত্তি করিতে পারিবেন না। সিদ্ধ ও সাধ্য শ্রোত্রিয়েরা কুলীন পুত্রে কন্যা দান করিতে পারিবেন। মহাত্মা উদয়নাচার্য এই সমস্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া তৎপরে 'করণ' নামে একটি প্রথা প্রচলিত করিলেন। ইহাতে শ্রোত্রিয়েরা কুলীনের আশ্রয়ে থাকিয়া করণাদির ব্যয়ভার বহন করিবেন। এইরূপ ব্যবস্থায় সকলেই সম্মতি দান করিলেন। ময়ূরভট্ট, কুল্লুকভট্ট ও মঙ্গল ওঝা নামক তিনজন শ্রোত্রিয়কে অবলম্বন করিয়া উদয়নাচার্য ভাদুড়ী মহাশয় পরিবর্ত মর্যাদা সৃষ্টি করিলেন। ময়ূরভট্ট কন্যা দেন উদয়নাচার্য ভাদুড়ীতে, কুল্লুকভট্ট কন্যা দেন নৃসিংহ সালুকি মৈত্রে, মঙ্গল ওঝা কন্যা দেন সিকাই সান্যালে। এইরূপে তিনজন শ্রোত্রিয় স্ব স্ব কন্যা তিন কুলীনে দান ও মালাচন্দন করিয়া সিদ্ধশ্রোত্রিয় পদমর্যাদা লাভ করেন। তৎপরে কুলীনেরা সাত গাঞি একত্র হইয়া করণ করিয়া পরিবর্ত করেন। যথা—উদয়নাচার্য ভাদুড়ী ও বল্লভাচার্য লাহিড়িতে পরিবর্ত, নৃসিংহ সালুকি মৈত্র ও ধূর্জটি বাগছিতে পরিবর্ত, আনুয়াই লাহিড়ি ও অনন্ত বাঙ্গাল ওঝায় পরিবর্ত। এই সকল করণকারণান্তে পরিবর্ত করিয়া উদয়নাচার্য লীলাবতী নাম্নী কন্যা বল্লভাচার্যকে সম্প্রদান করেন, তৎপরে বল্লভাচার্যের কুশে উদয়নাচার্যের গঙ্গালাভ হয়। উদয়নাচার্যের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে ভূপতি, ভবানীপতি, রুদ্রাণীপতি, উমাপতি, গৌরীপতি, চণ্ডীপতি এবং দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে পশুপতি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

একদা উদয়নাচার্যের প্রথমা পত্নী স্বামীর পুজার্চনার সময়ে কুসুম-সম্ভার ও নানাবিধ বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া সহাস্য বদনে স্বামী সকাশে গমন করিলে, উদয়ন তদ্দর্শনে অতিশয় কুপিত হইয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "তুমি প্রবীণা, ছয় পুত্রের জননী, এরূপ অবস্থায় তোমার ভাবভাব সহকারেই আমার নিকট আসা উচিত হয় নাই। অদ্য হইতে তোমার গর্ভজাত ছয় পুত্র সহ তোমাকে উপেক্ষিত অর্থাৎ পরিত্যাগ করিলাম।" মহাত্মা উদয়নাচার্য বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ ও সমাজাধ্যক্ষ হইয়া একটি সামান্য মাত্র দোষে যে ছয় পুত্র সহ পত্নীকে বর্জন করিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। বোধ হয়, তাঁহাদের অন্য কোন রূপী দোষ দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, "উপেক্ষিতং কুলং নাস্তি" ইহাই শাস্ত্রের বচন। এই কারণে ভূপতি আদি ছয় পুত্র নিষ্কুল হইলেন। তাঁহার অপর পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পশুপতি ভাদুড়ী কুলীনপদ পাইলেন। আট পটির কুলীন মধ্যে যে সমস্ত ভাদুড়ী আছেন, তাঁহারা পশুপতি ভাদুড়ীর অধস্তন বংশধর।

উদয়নাচার্যের করণ

মহাত্মা উদয়নাচার্য ভাদুড়ী করণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা—কুলজ করণ, কন্যা-আদান প্রদান বিষয়ক করণ এবং উপকারে করণ। তিনি পরিবর্ত-মর্যাদার প্রচলন করিয়া

কুলীনগণকে পরস্পর কন্যা আদান-প্রদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। যে যে কুলীনে পরস্পর আদানপ্রদান হইবে, কুলজ ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সহিত কোন জলাশয়ে যাইবেন ও জলপূর্ণ ভাণ্ড বা কলস ধারণ করিয়া কন্যা-আদানপ্রদান বিষয়ক মন্ত্র পাঠ করিবেন, এরূপ ভাবে জলমগ্ন করাকেই কন্যা আদান-প্রদান বিষয়ক করণ কহে। যে কুলীনের কন্যা বা ভগিনী নাই, তিনি ঐ দানগ্রহণকারী কুলীনকে আপন কন্যা বা ভগিনী পরিবর্ত করিতে পারিবেন না এবং ঐ কন্যার কুলীন বরের সহিত বিবাহ হইতে পারিবে না, সগোত্রেও করণ হইতে পারিবে না। পিতা বর্তমানে পুত্রের করণ করিবার অধিকার থাকিবে না। যে গ্রামীণ কুলীনের সহিত একবার করণ করা হইবে, তিনি অন্য গ্রামীণ কুলীনের সহিত আর করণ না করিয়া থাকিলে তাহার সহিত পুনর্বার করণ হইতে পারিবে না।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্র, কন্যা বা ভগিনী দ্বারা যে পরিবর্ত হয়, তাহার নাম কুলজ করণ। জন্ম ও পরিবর্ত দ্বারা কুল স্থাপন হয়। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই করণ না করিলে তাহার কুল থাকিবে না এবং ঐ করণ না করিলে এক ভ্রাতার দোষে অপরে দোষাশ্রিত হইবে। এইরূপ দোষকে 'ভাই-করা দোষ' কহে। আর পিতা বর্তমান থাকিলে পুত্র কন্যা শ্রোত্রিয়ে বিবাহ দিলে পিতার 'পোকরা দোষ' ঘটিবে।

কুলীন দোষাশ্রিত হইলে, যে করণ দ্বারা অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন, তাহার নাম উপকারে করণ। শ্রোত্রিয় কন্যা গ্রহণ করা কুলীনের পক্ষে প্রশস্ত নহে। এ কারণে শ্রোত্রিয় কন্যা গ্রহণকারী কুলীনের বা তদভাবে তাঁহার পুত্রের এই করণ করিতে হইবে।

করণের পদ্ধতি

উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর পরিবর্ত মর্যাদা অনুসারে কুলীন কন্যার পিতা এবং কুলীন-পাত্রের পিতা অভাবে পাত্রীর ভ্রাতা কিম্বা পিতামহ এবং পাত্রের পিতামহ কিম্বা ভ্রাতা কন্যা পক্ষ হইতে পিতলের হাঁড়ি কিম্বা বগুনা নিতান্ত অসমর্থ পক্ষে মৃত্তিকার হাঁড়ি গ্রহণ করিয়া উভয়ে নববস্ত্র পরিধান করিবেন। নববস্ত্র পাত্রীপক্ষ হইতে দিতে হইবে। তৎপরে নতুন বস্ত্র পরিয়া কুশময়ী কন্যা ও উক্ত হাঁড়ি জলপূর্ণ করিয়া উভয়ে দেবখাত ভিন্ন অন্য জলাশয়ের জলমধ্যে দণ্ডায়মান হইবেন। কন্যাকর্তা পূর্বমুখ ও বরকর্তা পশ্চিমমুখ হইয়া দাঁড়াইবেন। বরকর্তা হস্তে ঐ পূর্বোক্ত কুশময়ী কন্যা এবং বরকর্তা ও কন্যাকর্তা উভয়ের হস্তেই ঐ জলপূর্ণ হাঁড়ি থাকিবে। গোত্র, প্রবর এবং যে বেদের অন্তর্গত সেই বেদ, তাহার শাখা উল্লেখ করিয়া, পাত্রীর প্রপিতামহ হইতে কুশময়ী পাত্রী পর্যন্ত এবং বরের প্রপিতামহ হইতে বর পর্যন্ত গোত্র প্রবর উচ্চারণপূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন ঃ—

বর 'এষাং কুশময়ীং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুশময়ী কন্যা কন্যাকর্তার হস্তে দিবেন, কন্যাকর্তাও 'স্বস্তি' বলিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন। পরে উভয়ে স্থান পরিবর্তন করিয়া উপবেশন করিবেন অর্থাৎ বরকর্তা পূর্বমুখ ও কন্যাকর্তা পশ্চিমমুখ হইয়া উপবেশন করিবেন। পূর্বোক্ত হাঁড়ি তখনও উভয়ের হস্তেই থাকিবে।

এই করণ না করিয়া ক্রমান্বয়ে ছয়টি শ্রোত্রিয় কন্যা গ্রহণ করিলে তাঁহার বংশে ছয় শ্রোত্রিয় দোষ ঘটিবে। প্রথম একটি উপকারে করণ করিয়া তৎপরে পুনরায় দুইবার করণ করিলে এই দোষ হইতে অব্যাহতি ঘটে।

কাপোৎপত্তি

এদিকে ভূপতি ভাদুড়ী আদি উদয়নাচার্যের ছয়পুত্র পিতৃকর্তৃক নিষ্কুল হইয়া পরস্পরে স্থির

করেন, "পিতা আমাদিগকে বিনা দোষে ত্যাগ করায় আমরা নিষ্কুল হইয়াছি। তিনি যেরূপ কুলীনের কুশবারি সংযুক্ত পরিবর্ত মর্যাদা সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরাও তদ্রূপ দ্বিতীয় মর্যাদা সৃষ্টি করিব।" এই সময়ে ও কিছু পরে তের কুলীনে তেরটি আঘাত জন্মিল। কিন্তু সেই তের জন কুলীন অন্যান্য কুলীনের সহিত করণ করিয়া কুলরক্ষা করিয়াছিলেন।[৬] তন্মধ্যে ভরতাঘাতে আঠার সমাজের কুলীনের কুলপাত হইয়া তাহাদের ছিটায় অর্থাৎ সংস্পর্শে অন্য ১২ ঘর কুলীন আবদ্ধ হইয়াছিলেন।[৭] আঠার সমাজের নাম যথা—সাতাইর ঘর, বরিয়া, ভূয়াগ্রাম, গাঙ্গুনি, গয়নাকান্দির শক্তিধর, উপলসরের মনোজপ, কুদি-পুখুরের বিষ্ণাই, ভয়তাই বংশের ডাউর মাঝি, পুখুরিয়ার মানাই, কেশাই, মানাইর বংশের ছোট চাঁদাই, বাউনিয়ার চতুর্ভুজ, চতুর্ভুজ শিঙ্গাবাঘা, ভীম, চামারি, কৈলমোহর, বেনে খুরি ও মাটীকোপা। ইহার মধ্যে ১২ ঘর কুলীন ছিটায় আবদ্ধ থাকিলেন। তাঁহাদের নাম—১ কুদি-পুখুরিয়ার রামকমল সান্যাল, ২ মীনকেতন সান্যাল, ৩ গুড়নের জানু মৈত্র, ৪ সাতোটের পুরুষোত্তমভট্ট মৈত্র, ৫ নাখাই লাহিড়ী, ৬ আচু লাহিড়ী, ৭ রঘু লাহিড়ী, ৮ শ্রীগর্ভ সান্যাল, ৯ শ্রীগর্ভ ভাদুড়ী, ১০ যদুনাথ সান্যাল ও যদু ভাদুড়ী। এই সময়ে নৃসিংহ নাড়িয়াল করণ করিয়া নিজ কন্যা মধুই মৈত্রে সম্প্রদান করায় মধুই মৈত্রের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রেরা প্রচার করিলেন যে নৃসিংহ নাড়িয়াল শ্রোত্রিয়, তাঁহার সঙ্গে পিতা করণ করিয়াছেন, এই কারণে তিনি পতিত হইয়াছেন। শাস্ত্রে আছে—"পতিতাঃ পিতরস্ত্যাজ্যাঃ" অর্থাৎ পিতা যদি পতিত হন, তাহা হইলে পুত্র পিতাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। তদনুসারে মধুই মৈত্রকে তাঁহার রক্ষতাই পুত্র ভিন্ন অপর ছয় পুত্র (নন্দাই, গদাই, মাধাই, আনন্দাই, আনাই ও অর্জুনাই) তাঁহাকে ত্যাগ করেন ও তাঁহাদের পিতামহের একোদ্দিষ্ট করিতে থাকেন।

মহানুভব উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর পরলোকান্তে সমাজ সংস্কার ও সংরক্ষণের ভার তৎকালীন কুলীন মধুমৈত্র ও ধেঁয়াই বাগছির উপর অর্পিত হইয়াছিল। একদা মধুমৈত্র ও ধেঁয়াই বাগছি 'বালা' নামক গ্রামে শুকদেব আচার্যের পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুর বৃদ্ধ প্রপিতামহ নরসিংহ নাড়িয়ালও ঐ শ্রাদ্ধে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মধুমৈত্র ও ধেঁয়াই বাগছি মহাশয় নাড়িয়াল মহাশয়ের সহিত একত্র ভোজন করিতে অস্বীকৃত হইলে তিনি আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া মধুমৈত্রের কুল নষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পরে একদিন তিনি একখানি নৌকায় একটি শালগ্রাম শিলা, একটি গো ও আপনার একটি অবিবাহিত কন্যা লইয়া মৈত্র মহাশয়ের বাটি মাজগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে মৈত্র মহাশয় বাটির সমীপবর্তী আত্রাই নদীতে অবগাহন করিতেছিলেন, নরসিংহ নাড়িয়ালও ঠিক সেই সময় তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং তাহা না করিলে তাঁহার সম্মুখে সর্বসমেত নৌকা জলমগ্ন করাইয়া প্রাণবিসর্জন করিবেন, এই ভয় দেখাইলেন। মৈত্র মহাশয় গোব্রাহ্মণ ও স্ত্রীবধ আশঙ্কা করিয়া ও উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। পরে সত্যপথভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কায় ঐ কন্যার পাণিগ্রহণও করিয়াছিলেন। ইহার পর মধু মৈত্র পুত্র আনাই ও অর্জুনাই নিজ নিজ কুলধ্বংসের আশঙ্কায় পিতামহের শ্রাদ্ধ করেন। ঐ সময়ে ধেঁয়াই তথায় উপস্থিত হইয়া মধুর কুলধ্বংস হয় নাই সিদ্ধান্ত করিলেন এবং আনাই ও অর্জুনাইকে 'কাপ' করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে কুলীন সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে সকল কুলীন ও শ্রোত্রিয় নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অর্জুনাইর বাটি হইতে মধুর বাটিতে আসিতে বাধ্য হইলেন এবং

এখানে ভেজন করিয়া মধুর কুলরক্ষা করিলেন। 'এইরূপে মধুর দ্বিতীয় পক্ষের দুই পুত্র উপেক্ষিত থাকিলেন। উদয়নাচার্যের উপেক্ষিত ভূপতি আদি ছয় পুত্র ও মধু মৈত্রের আনাই ও অর্জুনাই দুই পুত্র এবং ভট্টাঘাতে ১৮ সমাজের কুলপাতের ব্যক্তিরা একত্র হইয়া করণপূর্বক স্বতন্ত্র পরিবর্ত মর্যাদার সৃষ্টি করেন। কুলজ্ঞ, কুলীন ও শ্রোত্রিয়েরা সেই পরিবর্ত দেখিয়া বলিয়াছিলেন ইহারা কি 'কাপ' ব্যবহার করিতেছে। এই কথানুসারে উক্ত ব্যক্তিরা 'কাপ' নামে অভিহিত হইলেন। বর্তমান সময়েও সেই 'কাপ' নাম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তৎপরে মৈত্রের পুত্রদ্বয় মহাত্মা উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর ছয় পুত্রের সহিত দলবদ্ধ হইয়া বলপূর্বক বহু সংখ্যক কুলীনের কুল দোষাশ্রিত করিয়া ফেলিলেন।

মধু মৈত্রের পুত্র আনাই এবং অর্জুনাই কাপ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের বংশধরেরাই 'মুড়াইত কাপ'। ইহা ভিন্ন অন্যান্য বংশের মধ্যে যে কাপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহাদের সহিত করণ দ্বারাই হইয়াছে।

উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর পরিত্যক্ত ছয়পুত্র 'ছয়ঘরিয়া' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। উহাদের বংশের সহিত মধুর পুত্রদ্বয় একত্র হইয়া পরস্পর করণ দ্বারা ক্রমে একটি প্রবল সমাজের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সমাজই 'কাপ' নামে পরিচিত।

১. "অত্র কলৌ আয়ুঃপ্রজ্ঞোৎসাহশ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাৎ তৎকেবলপাশ্চাত্যাদিভির্বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈস্তু অধ্যয়নং বিনা কিয়দেব বেদার্থস্য কর্মমীমাংসাদ্বারেণ যশ্চেতিকর্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে। ন চৈতেনাপি মন্ত্রার্থকবেদার্থজ্ঞানং। মন্ত্রার্থজ্ঞানস্যৈব চ প্রয়োজনং। যতস্তৎপরিজ্ঞান এব শুভফলং তদজ্ঞানে চ দোষঃ লয়তে। ... ... অত্র বেদাধ্যয়নে বেদমন্ত্রার্থজ্ঞানে হি তাৎপর্যং। এতৈস্তু রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈরনুচিতাচার এব কেবলং ক্রিয়তে। এবং চোভয়োরপি গ্রন্থার্থতো দেবজ্ঞানং নাস্ত্যেব। ... ... তথা চ যমঃ
"ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদো হি বৃষ উচ্যতে।
তস্য বিপ্রস্য তেনালং স বৈ বৃষল উচ্যতে।।" (ব্রাহ্মণ সর্বস্ব)

২. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ৩য় অংশ, ২-৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩. "যোগেশ্বরস্যাত্মজো যঃ পুণ্ডরীকাক্ষকঃ স্মৃতঃ।
ততো বৃহস্পতির্জজ্ঞে দিবি দেবগুরুর্যথা।।
বেদজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ স আচার্যপদমাপ্তবান্।
বৌদ্ধচার্যজিগ্মনিনা বিচাররণমূর্দ্ধণ।।
বিজিতোঽপমানিতশ্চ বনং গত্বা মমারচ।
বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্ ভুবি বিখ্যাতমঙ্গলঃ।।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় বৌদ্ধবিধ্বংসহেতবে।
খ্যাত উদয়নাচার্য বভুব শঙ্করো কথা।।
সন্দেশং পিতৃনাশস্য তথা পিতৃপরাভবং।
বৌদ্ধানাং বিজয়ঞ্চৈব শ্রুত্বা জজ্বাল মন্যুনা।।
ততঃ কালেন কিয়তা বৌদ্ধান্‌ক্রিত্বা বিচারতঃ
ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশায় চকার কুসুমাঞ্জলিং।।
স এবোদরানাচার্যো বৌদ্ধবিধ্বংসকৌতুকী।
কুম্ভকং ভট্টমাশ্রিত্য ভট্টাখ্যং ম্যুরস্তথা।।
মঙ্গলোঝেতি বিখ্যাতং শ্রোত্রিয়ং শুদ্ধবংশজং।
কুলগৌরবরক্ষার্থং কৃতবান্ কুলীনেষু চ।
করণং পরিবর্তঞ্চ তিলকং শ্রোত্রিয়েষু চ।।" (ভাদুড়ী কুলের বংশাবলী)

৪. গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ১০৫ পৃষ্ঠা।

৫. গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ১০৬ পৃষ্ঠা।

৬. বিশ্বকোষ ১৭শ ভাগ "বল্লাল সেন" শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৭. সপ্তম অধ্যায়ে আঘাতের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৮. "ভরতাঘাতসম্পর্য্যাৎ দোষেণ তাড়িতং ধ্রুবম্।
অষ্টাদশ সমাজস্য কাপসৃষ্টিস্ততো ভবেৎ।।" (বারেন্দ্র-কাপব্যাখ্যা)

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রধান প্রধান সমাজনির্ণয়

সমাজস্থান

মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে যেরূপ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে একশত গাঞি নির্দিষ্ট হইয়াছিল, উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর সমাজ সংস্কার কালে সেইরূপ প্রধান ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বাসস্থান ভিন্ন ভিন্ন সমাজ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। আজও তাঁহাদের বংশধরগণ সেই সেই সমাজের নামে পরিচয় দিয়ে থাকেন। যে যে গোত্রে যে যে বংশে যে যে সমাজ হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা উদ্ধৃত হইল :

কাশ্যপগোত্র মৈত্রবংশের—বৃহস্পতির দুই পুত্র সোলওঝা এবং কূপওঝা। সোলের সমাজ সাতোটা এবং কূপের সমাজ মধ্যগ্রাম। মৈত্রগ্রামীদের প্রথমে এই দুই সমাজ হয়। কূপের দুই পুত্র গণ্ড এবং নরসিংহ। নরসিংহের ছয় পুত্র—সুকি, বুকি, মনোহর, তপস্বী, হিঙ্গাই এবং ন্যাঙ্গট। সুকির সমাজ মধ্যগ্রাম, বুকির খাগজানা, মনোহরের বাউনিয়া, তপস্বীর মণ্ডলজানি, এবং হিঙ্গাই ও ন্যাঙ্গটের বালিয়াখৈর। সুকির পুত্র মধু মৈত্র এবং উৎসাকর। মধুর সমাজ মধ্যগ্রাম এবং উৎসাকরের কোটাস্ত। মধুর পুত্রগণের নাম আনাই, অর্জুনাই, রক্ষিতাই, আন্দাই, নন্দাই, গদাই ও মাধাই। আনাই অর্জুনাইর সমাজ লাড়ুয়া, রক্ষিতের মধ্যগ্রাম, আন্দাইর গুড়নই, নন্দাইর গাঙ্গইল, গদাইর বাগসর এবং মাধাইর মাটিকোপা। রক্ষতাই বা রক্ষিতের পুত্রগণের নাম লক্ষ্মীধর, ধরাধর, বিনায়ক ও কৃষ্ণ। ধরাধরের সমাজ চামারি, লক্ষ্মীধরের পুত্র দিবোদাস, বিভুদাস ও বিষ্ণুদাস। দিবোদাসের সমাজ বাসুলিয়া।

বাসুলিয়া সমাজের মনোহর মৈত্রের আট পুত্র যথা—আকাই, বাকাই, সানাই, সারাই, নাভাই, নাথাই, ঘগাই ও পুয়াই। বাকাইর সমাজ মনোহরা, সানাইর মাণিকহাট, সারাইর বীরদহ, নাভাইর কোদড়ি, নাথাইর একপোয়া, ঘগাইর আচলকোট, এবং পুয়াইর বাগডোর। মধুমৈত্রের পুত্র আন্দাইর শ্রীপতি প্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মে। শ্রীপতির সমাজ ভূয়াগ্রাম। সাতোটা সমাজের সোল ওঝার ভূয়াম্বর, কেশব ও মাধব নামক তিন পুত্র জন্মে। কেশব ওঝার সমাজ আঙ্গোরা, মাধবের বাচড়া, এবং অম্বরের পুত্র নিশাইর সমাজ হাটাইল।

করঞ্জ গাঞি—মঙ্গল ওঝা পরিবর্ত-মর্যাদা-সংস্থাপন-কালে উদয়নাচার্যের যথেষ্ট সহায়তা করেন। আমহাটির রায়, বাহিরবন্দরের রায়, নারিটির ভট্টাচার্য, মাগুড়িয়ার চৌধুরী, রূপপুরের অধিকারী, ডাঙ্গার চৌধুরী ব্রাহ্মণীকুণ্ডার মল্লিক এবং বেথুরের চক্রবর্তীগণ মঙ্গল ওঝার বংশ।

সাধু বাগছির বংশে—ঋষিদীক্ষিত সাধুকুলে অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—সিয়াই, ধিয়াই, গদাধর, আহুমিশ্র এবং গুছিপাণ্ডব। সিয়াইর সমাজ কড়কড়া, বিয়াইর ধামসার এবং আহুমিশ্রের সমাজ রৌহা। রৌহার ভট্টাচার্য মহাশয়েরা আহুমিশ্রের সন্তান। বিয়াইর হরিহর অগ্নিহোত্রী, শ্রীকণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ এবং মন্দারদীক্ষিত নামে চারি পুত্র জন্মে। শ্রীকণ্ঠ

বাগছি ছয়ঘরিয়া সমাজভুক্ত। হরিহর অগ্নিহোত্রীর বলাই প্রভৃতি পাঁচ পুত্র। বলাই বাগছির সহিত উচ্চৈঃধর ভীম কালিহাইর পরিবর্ত হইয়াছিল। বলাই বাগছির ধিয়াই, বামন প্রভৃতি আটপুত্র। ধিয়াই ধেঞি বাগছি নামে পরিচিত। উদয়নাচার্য এই ধেঞি বাগছির উপর সমাজ রক্ষার ভার দিয়া যান।

রুদ্র বাগছির বংশে—রুদ্র বাগছির পুত্র হরবেদ, হরদেবের পুত্র বামদেব, তৎপুত্র কামদেব, কামদেবপুত্র অনঘাচার্য, অনঘ-পুত্র জিগ্‌নিওঝা। তাঁহার পুত্র রেক প্রভৃতি চারিজন।

রেকের পুত্র—শম্ভু মহানিধি, তাঁহার পুত্র ধুমাই প্রভৃতি। ধুমাইর পুত্র ছিয়াই, ছিয়াইপুত্র সুয়াই, লুয়াই ও ধনঞ্জয়। সুয়াইর পুত্র মানাই, শ্রীপতি এবং গোপাই। মানাইর সমাজ বোয়ালজানি, শ্রীপতির সিমুলিয়া এবং গোপাইর সমাজ গয়নাকান্দি।

লাহিড়ী বংশে—বল্লভাচার্যের তিন পুত্র, যথা—অর্ক (আকাই), কেশব (কেশাই) এবং দনুজারি (দনাই)। এই তিন ভ্রাতা হইতে লাহিড়ীবংশের তিন সমাজ পত্তন হয়। অর্কের সমাজ ঢাকঢোর কেশবের নকড়িয়া এবং দনুজারির চয়ড়া। দনুজারি লাহেড়ী চণ্ডীপতি ভাদুড়ীর উপকারের করণে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া ছয়ঘরিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হন। নকড়িয়াবাসী কেশব লাহেড়ীর বংশধরগণই লাহিড়ীকুলে শ্রেষ্ঠ।

নন্দনাবাসী—মৌনভট্টের দুই পুত্র—অচ্যুতানন্দ ও জ্ঞানানন্দ। জ্ঞানানন্দের পুত্র মহানন্দ ও ভুবনানন্দ। ভুবনের পুত্রের নাম কনকদণ্ডী, তৎপুত্র যদু উপাধ্যায়, তৎপুত্র বেদ উপাধ্যায়। বেদপুত্র ত্রিলোকাচার্য, ত্রিলোকপুত্র গঙ্গাদাস উপাধ্যায়, গঙ্গাদাসপুত্র দিবাকরভট্ট জগৎগুরু। দিবাকরের চারিপুত্র—পুরুষোত্তম বেদান্তী, খোঁড়া আচার্য, কুল্লুকভট্ট ও মকরন্দ মিশ্র।

পুরুষোত্তম টুটইহলা, কুল্লুকভট্ট গুয়াখরা এবং মকরন্দ মিশ্র জামরুখি গ্রামে বাস করায় প্রথমে নন্দনাবাসীদিগের টুটইহলা, গুয়াখরা এবং জামরুখি এই তিন সমাজের সৃষ্টি হয়। বংশাবলীগ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, গুয়াখরা গ্রামে কুল্লুকভট্টের সন্তানেরা বসতি করিয়াছিলেন।

সিহরী গাঞি—স্বর্ণরেখের পুত্র কিঙ্কিণিদেব। কিঙ্কিণিদেবের দুই পুত্র অচল এবং চল। অচল উত্তর বারেন্দ্রভূমিতে বাস করায় তাঁহার পুত্রেরা উত্তরবারেন্দ্র এবং চল দক্ষিণবারেন্দ্রে বসতি স্থাপন করায় তাঁহার সন্তানেরা দক্ষিণবারেন্দ্র নামে খ্যাত হন। কালক্রমে দক্ষিণ শব্দ লোপ হইয়া বারেন্দ্র এবং উত্তরবারেন্দ্র আখ্যা চলিয়াছে। চলের সন্তানেরাই বারেন্দ্রশ্রেণীর সিহরী গাঞি হইলেন। চলের পুত্র মাঙ্গলি, মাঙ্গলির পুত্র ধরাধর, ধরাধরপুত্র ভূদেব, তৎপুত্র বজ্রধর। বজ্রধরের চারিপুত্র, যথা—অভয়, বেদ, নিধ ও মাধব। অভয়ের সমাজ অমৃতকুণ্ডা, বেদের গঙ্গাবাড়ি, নিধের পুখরিপাড় এবং মাধবের কাপাশকান্দা। এইরূপে সিহরী গাঞি মধ্যে চারিটি সমাজের সৃষ্টি হয়।

বাৎস্যগোত্রে সান্যাল বংশে—লক্ষ্মীধর সঞ্জামিনী বা সান্যাল গাঞি, জয়মান মিশ্র, ভীম কালিহাই, দিবাকর ভাড়িয়াল এবং হরিহর কুড়মুড়িয়াল গাঞি বলিয়া খ্যাত হন। লক্ষ্মীধরের তিন পুত্র বর্ধমান, বিশ্বম্ভর ও বিশ্বপতি। বিশ্বপতি জামরুখি এবং বিশ্বম্ভর সিমুলী গাঞি। লক্ষ্মীধরপুত্র বর্ধমান প্রথমে কুড়মইল গ্রামে স্বীয় পিতৃব্য হরিহর সহ বাস করিতেন, পরে পিতৃভূমি সঞ্জামিনী গ্রামে গিয়া বাস করেন, তাহাতেই বর্ধমান সঞ্জামিনী গ্রামী ও কুলীন হন। বর্ধমানের পুত্র বাসুদেব, বাসুদেবপুত্র মেধাতিথি, তৎপুত্র নরসিংহ। নরসিংহের পুত্র মহেশ্বর, তৎপুত্র ভূতনাথ। ভূতনাথের পুত্র শিকাই ও দামোদর। শিকাই উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর পরিবর্ত মর্যাদা-প্রচলনের সময় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীনারায়ণ লাহিড়ীর সহিত শিকাই সান্যালের করণ

এবং পরিবর্ত হইয়াছিল। শিকাইর পুত্র কানাই, বলাই এবং পিয়াই প্রভৃতি। বলাই সান্যাল চণ্ডীপতি ভাদুড়ীর উপকার করণে লিপ্ত হইয়া ছয়ঘরিয়াদল সৃষ্টি করেন, তৎপরে নিষ্কুল হন। বলাইর সমাজ গাঁড়াদহ। পিয়াইর পুত্র আনুয়াই, এই আনুয়াইর সমাজ কুজিল।

বাৎস্যগোত্র ভীম কালিহাই বংশে—ভোজের পুত্র অনন্তবাঙ্গাল ওঝা, ইহার সহিত আনাই লাহিড়ির করণ এবং পরিবর্ত হইয়াছিল। অনন্তের চারি পুত্র ধামাই, ধূমাই, বরাই ও অচ্যুত। ধামাইর সমাজ পয়ালসুর, ধূমাইর ধুরাইল, বরাইর হাপানিয়া এবং অচ্যুতের বোয়ালিয়া। বরাইর পুত্র ধরাই, শশধর, পদ্মনাভ, মিতাই, মধু, ডাকুয়াই, অগ্রবিন্দ এবং অরবিন্দ। ধরাইর সমাজ হাপানিয়া, শশধরের আড়ঙ্গাইল, পদ্মনাভ এবং মিতাইর বায়সা। মধু, ডাকু, অগ্রবিন্দ এবং অরবিন্দ চারি ভ্রাতাই পাঁচুড়িয়া দোষে কুলভ্রষ্ট।

ভট্টশালী বংশে—ভট্টশালী বাণভট্টের পুত্র নীলমেঘ ভট্ট। তাহেরপুরের রাজবংশের পূর্বপুরুষ কামদেব ভট্ট নীলমেঘের কন্যাকে বিবাহ করেন। নীলমেঘ ভট্টের পুত্র ফণাধর ভট্ট এবং দানবারি ভট্ট। দানবারির চারি পুত্র ইতিহাস, পুরন্দর, ভূতনাথ এবং দিগম্বর ভট্ট। ইতিহাসের সমাজ সিমুলতল, পুরন্দর ও ভূতনাথের বায়রা এবং দিগম্বরের নাউনাড়া।

কামদেব কালিহাই বংশে—শশিকামদেব কালিহাইর চারি পুত্র সোমনাথ, ভূতনাথ, পুণ্ডরীকাক্ষ ও ভৈরব। ভৈরবের পুত্র প্রজাপতি। প্রজাপতির পুত্র রাম, ভীম এবং জগন্নাথ। জগন্নাথের ৫ পুত্র গোয়ীচন্দ্র, গঙ্গানন্দ, বরাই, শশধর ও অভয়। গোয়ীচন্দ্রের সমাজ পঞ্চক্রোশী, গঙ্গানন্দ ও বরাইর কানসোনা, শশধরের কৈজুড়ি এবং অভয়ের জয়ন্তীপুর।

ভরদ্বাজগোত্র ভাদড় বংশে—আকাইর পাঁচ পুত্র নরপতি, রাজপতি, উমাপতি, বিদ্যাপতি এবং বৃহস্পতি। নরপতির সমাজ পায়রা, রাজপতির শৈলকোপা এবং উমাপতির সাতবাড়িয়া। উমাপতির পাঁচ পুত্র—জিয়াই, আন্দাই, বলাই, মাধাই ও সুয়াই। আন্দাইর সমাজ ফেটকা বলাই ও মাধাইর লক্ষ্মীকোল এবং সুরাইর খাগজানা।

সপ্তম অধ্যায়

আঘাতের বিবরণ

রাজা গণেশের অভ্যুদয়ের সহিত বারেন্দ্র সমাজে যে সুদিন আসিয়াছিল, হিন্দুগণের দুরদৃষ্টক্রমে এ সুযোগ স্থায়ী হইল না। ছয় বর্ষ মাত্র রাজত্বের পর ১৩৯২ খ্রিস্টাব্দে রাজা গণেশ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তৎপুত্র জিৎমল বা যদু ঘটনাচক্রে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং 'জলাল্‌উদ্দীন্ মহম্মদশাহ্ বিন গণ্‌শা' নাম ধারণপূর্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই সঙ্গে আবার মুসলমান-শাসন আসিল। রাজা গণেশের পূর্ববর্তী আচারনিষ্ঠ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজ মুসলমানরাজ প্রভাব হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসিতেন, কিন্তু রাজা গণেশের আধিপত্যকালে রাজসংসার ও হিন্দুরাজসভার সহিত নানা প্রকারে তাহাদের সংস্রব ঘটিতেছিল, তাহার আভাস পূর্বেই দিয়াছি। এদিকে অল্পদিন পরেই যখন তাহাদের বড় আশার ও আশ্রয়ের স্থল হিন্দুরাজপুত্র মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিলেন, তখন ষট্‌কর্মনিরত নিষ্ঠাবান বারেন্দ্র বিপ্রগণ আসন্ন বিপদ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহার রাজসংস্রবে ঐশ্বর্যের আপাতমনোরম আস্বাদ পাইয়াছিলেন, তাহারা রাজপুত্রের আদর্শে কতকটা মুসলমানী আদব কায়দার পক্ষপাতী হইতেছিলেন, এই সময়ে তাহাদের মধ্যে যাহারা রাজকীয় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে মুসলমান প্রভাবজ্ঞাপক "চৌধুরী' 'খান্" প্রভৃতি উপাধি চলিয়াছিল। ১৪২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গণেশ বংশ গৌড়ের মসনদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহারা হিন্দু সমাজের উপর বিশেষ অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, বরং তাহাদের উৎসাহে অনেক কবি ও পণ্ডিত রাজসম্মানে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন।[১] কেহ কেহ মুসলমানী রীতিনীতির পক্ষপাতী হইলেও এ সময়ে বারেন্দ্র সমাজ কতকটা শান্তি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। তবে মধ্যে মধ্যে মুসলমান রাজপুরুষগণ কোন কোন প্রধান কুলীনকে নিকটে পাইয়া তাহার উপর অত্যাচার বা অপমান করিবার চেষ্টা না করিয়াছে এমন নহে। তাহা হইতেই আঘাতের সূত্রপাত। কিন্তু গণেশ বংশের গৌরবরবি অস্তমিত ও গৌড়ের সিংহাসনে উচ্চশ্রেণীর মুসলমান বংশের আধিপত্য বিস্তৃত হইলে, হিন্দু সমাজের উপর অত্যাচারস্রোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেই স্রোতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজও বিচলিত হইয়াছিলেন। সমাজের বিশুদ্ধি ও উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য কুলজ্ঞগণ বিধিমতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এ কারণে মুসলমান সংস্রবে যাহারা কোনরূপে অপমানিত হইয়াছিলেন, প্রথমত তাহাদিগের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপনেও উচ্চবংশীয়গণ ইতস্তত করিতেছিলেন। সেই সময়ে মুসলমানের অত্যাচার ফলেই বারেন্দ্র সমাজে ১৩ আঘাতের সৃষ্টি। এই আঘাতের কারণ অনেক কুলীনের কুলপাত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে সেই সময়ের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে কখনই আমরা দোষী করিতে পারি না, বরং বিশাল সমাজের মধ্যে কয়েক ঘরের আঘাতের কাহিনী আলোচনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার ও আত্মরক্ষায়

অসমর্থ ব্যক্তির উপর কিরূপ অযথা উৎপীড়ন চলিয়াছিল! প্রকৃত-প্রস্তাবে সেই সকল নিরীহ ব্যক্তির কোন দোষ না থাকিলেও ব্রাহ্মণ সমাজ তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে কিরূপ শাসনে রাখিয়াছিলেন!—পাছে কাহারও পবিত্র ভাব অপবিত্র হয়, পাছে কেহ মুসলমান সংস্রবের পক্ষ সমর্থন করেন, এই আশঙ্কায় কুলজ্ঞসমাজ তাঁহাদের উপরও তীব্র মন্তব্য ঘোষণা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। বারেন্দ্রকুলগ্রন্থসমূহে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যে যে কুলীন সন্তানের উপর যে যে আঘাত হইয়াছিল, ঐতিহাসিক পৌর্বাপর্যরক্ষার জন্য তাহাদের পূর্বপুরুস বল্লালপূজিত ১ম কুলীন হইতে তাহাদের প্রত্যেকের বংশক্রম উদ্ধৃত হইল :

১ম। ভরতাঘাত—ভরতাই সান্যালে।

পাতসাহী সোয়ারে ভরতাচার্য ঠাকুরকে বিরূপ করিয়াছিল। চামটা সমাজের ভরতাই সান্যালের পুত্র ভরতাই ঠাকুরের কন্যাকে বিবাহ করেন, এই কারণে ভরতাই সান্যালে ভরতাঘাত। পূর্বে নিধাই মৈত্র বিবাহ করেন ভরতাই সান্যালের কন্যা, এই সম্পর্কে ভরতাই সান্যালের ঘরে ভোজন করেন নিধাই মৈত্র। এই জন্য কুলজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন—

"নিতাই এড়ে বেটা কেশাই এড়ে ভাই।
ভরতাঘাতে কুলীন টোটে লেখাজোখা নাই ॥"

[নিচে ভরতাই সান্যালের পূর্ববংশক্রম দ্রষ্টব্য।]

ভারতাই সান্যালের পূর্ববংশ

১. লক্ষ্মীধর সান্যাল (বল্লালী কুলীন)
|
২. বর্ধমান মিশ্র
|
৩. বাসুদেব আচার্য

৪. মেধাতিথি
২য় পক্ষে

৫. নৃসিংহানন্দ — হরদেব — মুরদেব — পুরদেব

৬. মহেশ্বর — সোমেশ্বর — গোপাল আচার্য — মুরারি পাঠক
|
৭. বাপী
|
৮ ভূতাই (ভূতানন্দ)

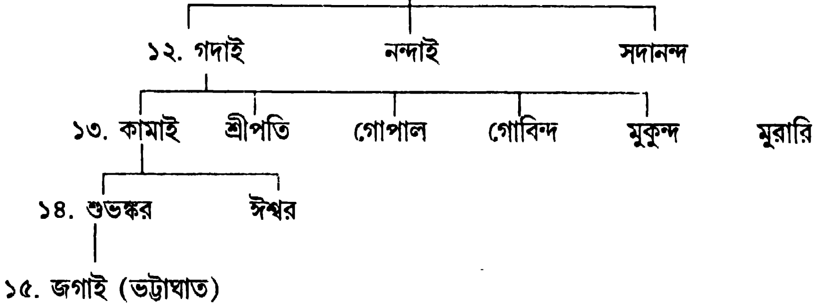
৯. শিকাই — দামাই বা দামোদর (উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর সমসাময়িক)

১০ কানাই — পিয়াই — পুরাই — বৈকুণ্ঠ — অচ্যুতাই — মহীয়াই — শঙ্কর মিশ্র (একরেতে)

ভরতাই (চামটা-উপলসর) (ভরতাঘাত) — আনন্দাই (সুত্রিগ্রাম) — গঙ্গাদাস ওঝা (রূপসী)

২। ভট্টাঘাত—জগাই সান্যালে (রূপসী সমাজ)

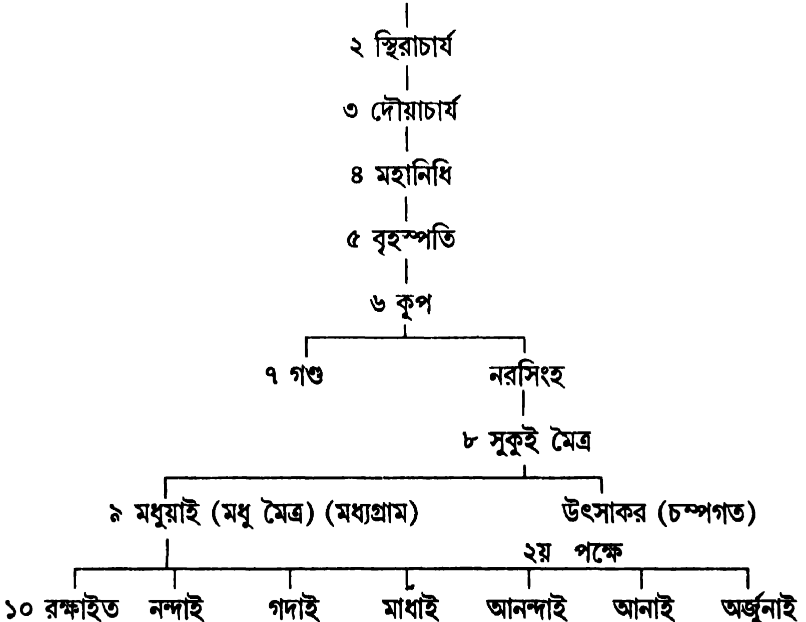
পাতসাহী সোয়ারে কামদেব ভট্টের কোন প্রকার অপমান করিয়াছিল। তাঁহার এক কন্যা লন উপলসরের মনোজপ সান্যাল, আর এক কন্যা লন জগাই সান্যাল। জগাই সান্যাল ও অংশুমান্ ভাদুড়ীতে পরিবর্ত, তাহাতে ভট্টাঘাত-নিষ্কৃতি।

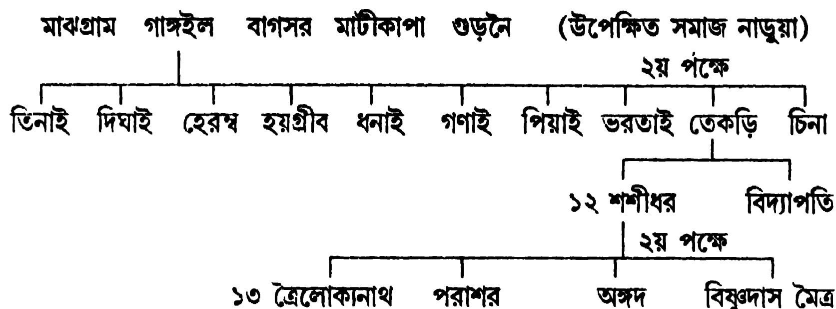


৩। বউ নেয়া আঘাত—বিষ্ণুদাস মৈত্রে

মৌলিক কেদারে বউ নেয়া অপবাদ হয়। বিষ্ণুদাস মৈত্র তাঁহার কন্যা লন। তাহাতে বিষ্ণুদাস (মতান্তরে বিপ্রদাস) মৈত্রে বউ নেয়া আঘাত।

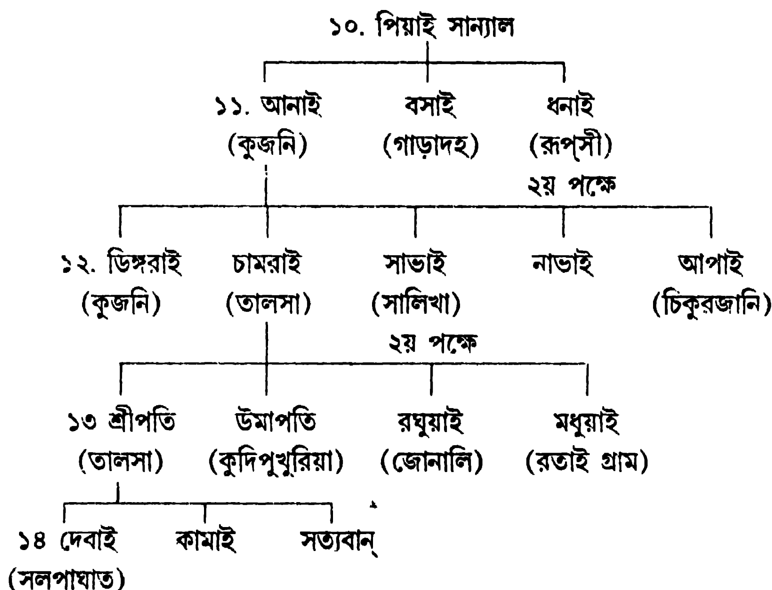
বিষ্ণুদাস মৈত্রের পূর্ববংশ





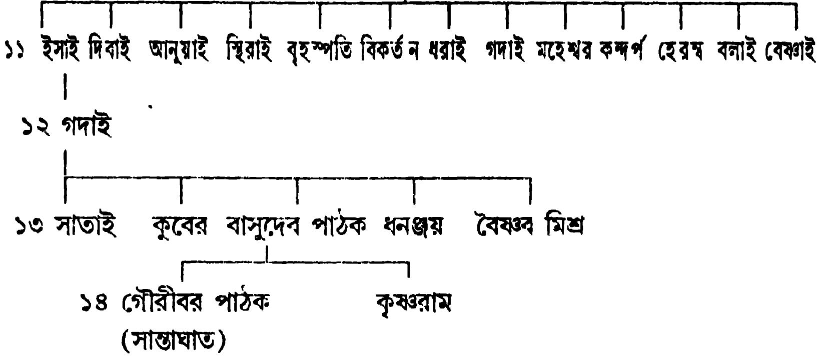
৪। সল্লাঘাত—দেবাই সান্যালে

সলপ্ খাঁর সোয়ারে বিদ্যাপতি রায় ভাদড়কে অপমান করিয়াছিল। বিদ্যাপতি রায় ভাদড় কন্যা দেন কামাই সান্যালে। পূর্বে কামাই সান্যালের টুট কামাই হাজরাতে। কামাই সান্যালের ঘরে ভোজন করেন দেবাই সান্যাল। এই জন্য দেবাই সান্যালে সল্লাঘাত।



৫। সান্তাঘাত—গৌরীবর পাঠক সান্যালে।

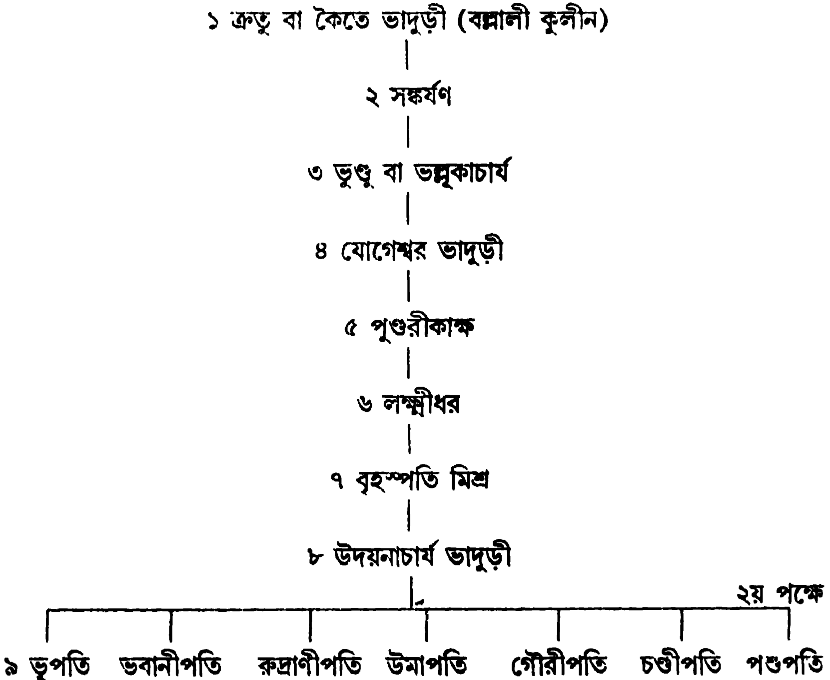
সানত্ আলী কুমারহট্টের বিধু চৌধুরীকে বিরূপ করিয়াছিল। বিধু চৌধুরীর ভগিনীকে রাম সান্যাল এবং এক কন্যাকে যদু মৈত্র বিবাহ করেন। যদু মৈত্র কন্যা দেন চাঁদাই লাহিড়ীকে। এই সময়ে ঠাকুর কংসারিতে রামের টুট হয়। গৌরীবর পাঠক সান্যাল সেই রামের ঘরে ভোজন করেন, এই জন্য গৌরীবর পাঠক সান্যালে সান্তাঘাত।

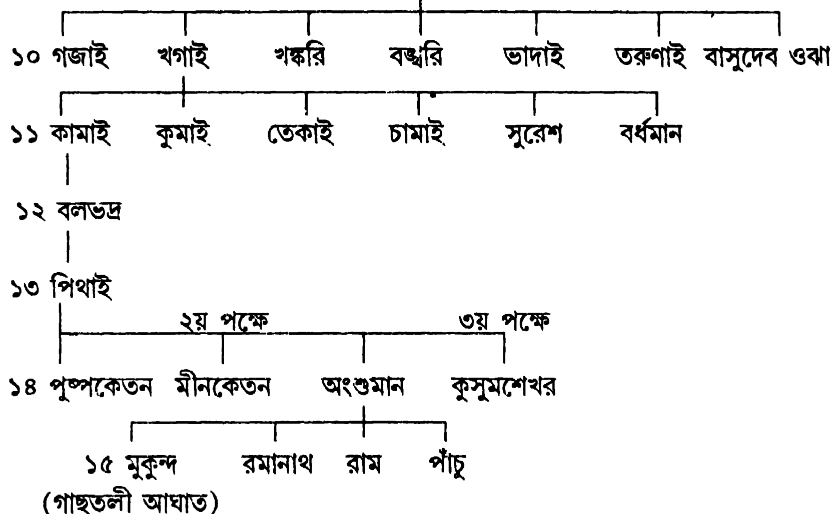


৬। গাছতলী আঘাত—মুকুন্দ ভাদুড়ীতে

কাশীতে অক্ষয়বট তলায় মামুদ খাঁ বিনোদন কড়কড়িয়াকে অপমান করেন। বিনোদন কড়কড়িয়ার কন্যা লন মৌলিক কেদার। মৌলিক কেদারের কন্যা লন বিষ্ণুদাস মৈত্র ও মুকুন্দ ভাদুড়ী। এই জন্য মুকুন্দ ভাদুড়ীতে গাছতলী আঘাত।

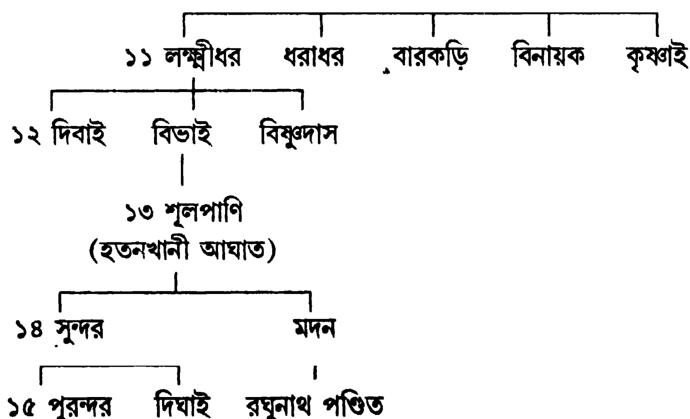
মুকুন্দ ভাদুড়ীর পূর্ববংশ





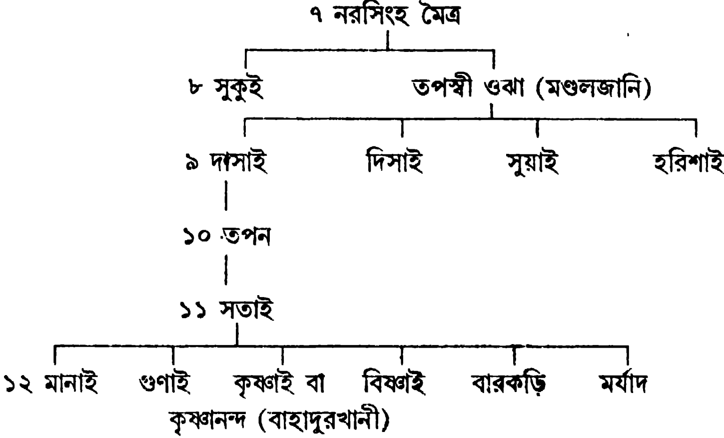
৭। হতনখানী আঘাত—শূলপাণি মৈত্রে

হতন খাঁর সোয়ারে শশীধর পাঠককে বিরূপ করিয়াছিল। শশীধর পাঠক আর পুষ্পকেতন ভাদড়ে করণ। পুষ্পকেতন ও জগাই বিন্দাদাড়িতে করণ। পরে পুষ্পকেতন ভাদড় অদৃষ্টকন্যা দেন ধরাই সান্যালে। ধরাই সান্যালের পুত্র ভিক্ষাকর, কংসারি, দ্বিতীয়পক্ষে পুরাই, মুরাই, তৃতীয়পক্ষে বৎস। ভিক্ষাকর বর্তমানে পুরাই ও মুরাইর টুট বিদ্যানন্দ আচার্যে। এইজন্য বৎস সান্যালে হতনখানী আঘাত। রঘুনাথ পণ্ডিত ও মধুই বাগছিতে করণ হতনখানী-নিষ্কৃতি।



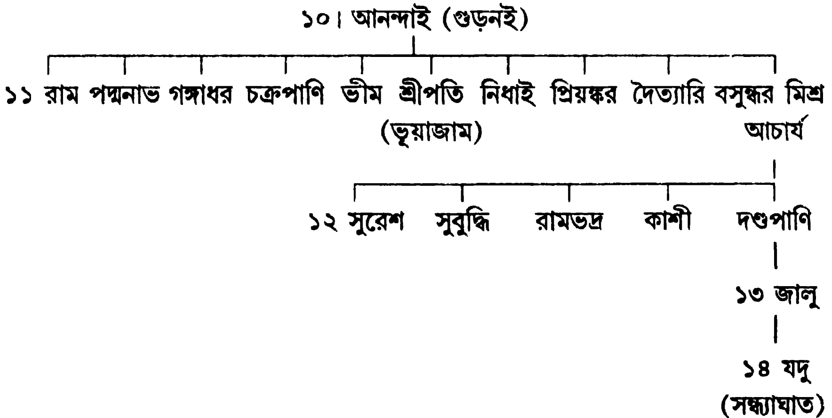
৮। বাহাদুরখানী আঘাত—কৃষ্ণানন্দ মৈত্রে

বাহাদুর খাঁ পুষ্করাক্ষ মজুমদারকে বিরূপ করিয়াছিল। পুষ্করাক্ষ মজুমদারের ঘরে ভোজন করেন কৃষ্ণানন্দ মৈত্র। এই সময়ে শিবদাসের টুট শতাবধান ভট্টাচার্যে, তাঁহার ঘরে ভোজন করেন কৃষ্ণানন্দ মৈত্র। এইজন্য কৃষ্ণানন্দ মৈত্রে বাহাদুরখানী আঘাত।



৯। সন্ধ্যাঘাত—যদু মৈত্রে

গুড়নই-সমাজের জানু মৈত্র কাপের ছিটায় আবদ্ধ ছিলেন। জানু মৈত্রের পুত্র যদু মৈত্র সন্ধ্যাকালে পুত্রবধূকে অপমান করিয়াছিলেন, এইজন্য যদু মৈত্রে সন্ধ্যাঘাত।

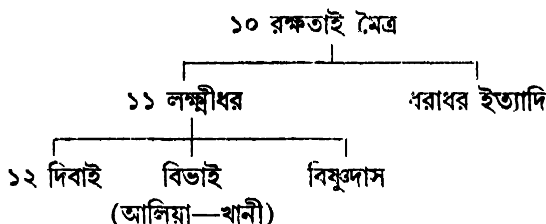


১০। আলিয়া-খানী আঘাত—বিভাই মৈত্রে

লক্ষ্মীধরের পুত্র দিবাই, বিভাই ও বিষ্ণুদাস। বিভাইর স্ত্রী সন্নাইর শ্যালিকাকে আলিয়া খাঁর সোয়ারে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে বাসুনিয়ার কন্যা গ্রহণে দিবাইর টুট।

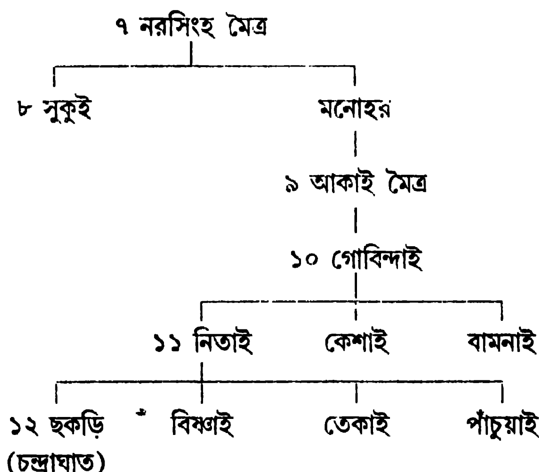
বিষ্ণু দাসের টুট ঠাকুর কালিদাসে। আলিয়া-খানী আঘাতে বিভাই আস্তাড়িত হন। এই সময় এইরূপ একটি তরজা হইয়াছিল—

"যে পথে গিয়াছিল সে পথে তিলের গোঁজা।
যে নিয়ে গিয়াছিল সে খোজা, যে দিন গিয়াছিল সে দিন রোজা ॥"



১১। চন্দ্রাঘাত—ছকড়ি মৈত্র

নিতাই সুখপাতের পুত্র বাউনের ছকড়ি মৈত্র। ছকড়ি মৈত্র বিবাহ করেন চন্দ্রজিৎ খাঁর কন্যা। সেই ছকড়ি মৈত্রের ঘরে ভোজন করেন বাসুদেব পাঠক। বাসুদেব পাঠক চন্দ্রাঘাতে আবদ্ধ হইলেন। বাসুদেব পাঠক সান্যাল ও মহামিশ্র লাহিড়ীতে করণ, তাহাতে চন্দ্রাঘাত-নিষ্কৃতি।



১২। কামিনী আঘাত—রামভদ্র লাহিড়ীতে

রামভদ্র লাহিড়ী কামিনীহত্যা করিয়াছিলেন, এই কারণে রামভদ্র লাহিড়ীতে কামিনী আঘাত।

১৩। কাফুরখানী আঘাত—অনন্ত লাহিড়ীতে

কাফুর খাঁর সোয়ারে ডেবড়ার পুরন্দর আচার্যকে বিরূপ করিয়াছিল। পুরন্দর আচার্যের কন্যা লন চিরঞ্জীব সান্যাল, মুকুন্দ সান্যাল চিরঞ্জীব সান্যালের ঘরে ভোজন করেন। মুকুন্দ সান্যাল আর অনন্ত লাহিড়ীতে করণ। এই করণ অনন্তে কাফুরখানী আঘাত।

[পর পৃষ্ঠায় রামভদ্র ও অনন্ত লাহিড়ীর পূর্ববংশক্রম দ্রষ্টব্য।]

১ লোকনাথ লাহিড়ী (বল্লালী কুলীন)

২ ভূতনাথ

৩ দিগম্বর

৪ ভূগর্ভ

৫ পীতাম্বর

৬ সনাতন

৭ টুট ওঝা

২য় পক্ষে

৮ হলি (নাটুয়া ব্রাহ্মণ) বলি (বল্লভ) বৎস (মস্তলে লাহিড়ী) পুণ্ডরীকাক্ষ (ভাওয়ালগত) সোম দিবাকর

৯ আকাই (ঢাকঢোল) কেশাই (নকড়ি) দনাই (চয়ড়া) মান

১০ শ্রীনারায়ণ খেঁকাই

২য় পক্ষে

১১ আনুয়াই মাধাই সারঙ্গাই ঈশান দামোদর শ্রীকরাই শ্রীবৎসাই

১২ শ্রীধরাই শশাই পজাই মানাই

২য় পক্ষে ৩য় পক্ষে

১৩ বাণীনাথ গণাই নৃসিংহ সহদেব কামদেব শুভঙ্কর চক্রবর্তী কোকাই

১৪ মদন (ছাগীপোড়া) চতুরানন

২য় পক্ষে ৩পক্ষে ৪র্থ পক্ষে

১৫ চাঁদাই সত্যবান্ বৈকুণ্ঠ মনসিজ হিরণ্য মধুয়াই দনাই সুন্দর ভগবান্

২য় পক্ষে

১৬ রামেশ্বর মন্মথ রঘু রাঘব অনন্ত মঙ্গল

১৭ অনন্ত লাহিড়ী (কাফুরখানী) গঙ্গাধর গোপীকান্ত নয়ান

রামভদ্র (কামিনী আঘাত)

উক্ত তেরটি আঘাতের মধ্যে বউ নেয়া, সন্ধ্যাঘাত ও কামিনী আঘাত ভিন্ন অবশিষ্ট ১০টি আঘাতই মুসলমান সংস্রবে ঘটিয়াছিল। এই সময়ের হিন্দু সমাজের অবস্থা লক্ষ করিয়া যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার (বারেন্দ্র) "কুলশাস্ত্রদীপিকায়" যথার্থই লিখিয়াছেন, "ভাগ্যচক্রের আশ্চর্য গতি। কালের আশ্চর্য মহিমা। মুসলমানদিগের আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহার পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইল। যে আর্যজাতি এক সময়ে সমস্ত ভারতের শীর্ষস্থানে সমারূঢ় ছিলেন, যাঁহারা মুসলমানের ছায়া স্পর্শ করিলে স্নান না করিয়া আপনাকে পবিত্র বোধ করিতেন না, সেই হিন্দু জাতি যে বিনা আপত্তিতেই বিজাতীয় সংস্রব গ্রহণ করিবেন, ইহা কিছুতেই অনুমিত হইতে পারে না, কিন্তু আর্যগণ নিতান্ত নিরুপায়। মুসলমানগণ সংহারমূর্তিতে ভারতে প্রবেশ করিল। হিন্দুগণ ক্রমে ক্রমে বিধ্বস্ত ও নিস্তেজ হইতে লাগিলেন। মুসলমানগণের ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হইল। আর্যজাতির অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ মুসলমান কর্তৃক স্থানে স্থানে অপহৃত এবং কোন কোন স্থানে বলপূর্বক বিবাহিত হইতে লাগিল। যে সকল ব্রাহ্মণগণ মুসলমান কর্তৃক কোনরূপ নিষ্পীড়িত হন নাই, তাহাদিগের নিষ্পীড়িত দলের সামাজিক গোলযোগ ও দলাদলি উদ্ভব হইল। হিন্দু রাজত্বের অধঃপতনের পর মুসলমানদিগের অভ্যুদয় সময়ে যে সকল হিন্দু স্থানে স্থানে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন, মুসলমান কর্তৃক বিধ্বস্ত ব্রাহ্মণগণ উক্ত ধনাঢ্য ও ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় পাইতে লাগিলেন। সুতরাং উক্ত জাতীয় বিবাদে কোন পক্ষের জয় পরাজয় স্থিরীকৃত হইল না। এতদ্ব্যতীত যে সকল সামাজিক গোলযোগ ঐ সময়ে উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাও উপরি উক্ত গোলযোগের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। এই সময়ে যে ব্যক্তি কর্তৃক যে ভাবে দলাদলির উদ্ভব হইল, ঐ সকল ঘটনার সুখ্যাতি ও অপবাদের নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের অভিধান প্রদত্ত হইল। ইহাই কুলজ্ঞ গ্রন্থে 'আঘাতে কাপ ও অবসাদে পটী' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।"[৩]

১. এই সময়ে অমরকোষের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ব্রাহ্মণপ্রবর বৃহস্পতি "রায়মুকুট" এবং তাঁহার প্রিয়পুত্র কবীন্দ্র শ্রীরাম "বিশ্বাস" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

২. এ সম্বন্ধে "কাপব্যাখ্যা" নামক গ্রন্থে এইরূপ সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে
"ভরতাঘাতসম্পর্কাৎ দোষেণাস্তাড়িতং ধ্রুবম্।
অষ্টাদশ সমাজো হি কাপসৃষ্টিস্ততো ভবেৎ ॥"

৩. কুলশাস্ত্রদীপিকা, ১ম সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়

অবসাদের বিবরণ

পূর্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, রাজা গণেশের অভ্যুদয়ের সহিত শ্রেষ্ঠ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণও রাজসংসারে নানাকর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ক্রমে এই সংক্রামক ব্যাধি সর্বত্র প্রসারিত হইল। রাজা গণেশের তিরোধান ও পুনরায় মুসলমান-আধিপত্য-বিস্তারের সহিত ব্রাহ্মণগণ মুসলমান রাজ-সংসারে অনেকটা প্রতিপত্তি হারাইলেও তাহারা ঐশ্বর্যলিপ্সা ও চাকুরীর মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। রাজকীয় কর্মসূত্রে মুসলমান রাজপুরুষগণের সহিত নানা দিক্‌ দিয়া স্পর্শদোষ বা মুসলমান সান্নিধ্য হেতুই বারেন্দ্র সমাজে নানা কুলীনে 'আঘাত' ঘটিয়াছিল। প্রথম প্রথম যাহাদের উপর আঘাত হয় এবং তাহাদের সংস্রবে যে সকল কুলীন সন্তান লিপ্ত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে কুলচ্যুত হইয়া 'কাপ' সমাজভুক্ত হন। কিন্তু কুলজ্ঞেরা যখন দেখিলেন যে, অনেক কুলীন ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয় সন্তান মুসলমান সংস্রবে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, রাজ-কর্মহেতু অনেকেই খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও বিপুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইতেছেন, তখন তাহারা সঙ্গে সঙ্গে দোষনিষ্কৃতির উপায়ও বাহির করিতে লাগিলেন। তাহারই ফলে অনেক আঘাতের নিষ্কৃতি হইয়াছে, তাহার পরিচয় পূর্বেই দিয়াছি। কেবল ভট্টাঘাত, ভরতাঘাত ও বউ নেয়া আঘাতের আর নিষ্কৃতি হইল না, এই তিন আঘাতের কুলীনগণ কুলচ্যুত হইয়া, কাপ সমাজভুক্ত হইলেন। কুলজ্ঞগণ প্রথম প্রথম ভাবিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত সামাজিক দণ্ডবিধানের পর দোষনিষ্কৃতি হইলে কুলীনগণ সকলেই সাবধান হইবেন, ভবিষ্যতে কেহ কুলবিধি লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইবেন না। কিন্তু বারেন্দ্র সমাজের দুরদৃষ্ট ক্রমে উত্তরোত্তর মুসলমান সংস্রব বৃদ্ধির সঙ্গে দারুণ মুসলমান অত্যাচারও চলিয়াছিল। প্রধানত সেই মুসলমান অত্যাচারের ফলেই বারেন্দ্র কুলীন সমাজে বহুতর 'অবসাদ' বা দোষের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। এই সকল অবসাদ বা দোষের নাম—

১ দর্পনারায়ণী, ২ শুভরাজখানী, ৩ নবরঙ্গখানী, ৪ সাদেখানী, ৫ পীতাম্বর তকী, ৬ পয়নালী, ৭ পরাণ-মৌলিকী, ৮ আলেখানী, ৯ তের আনী, ১০ খোজাম্বরী, ১১ মুদাখানী, ১২ রেটাচোয়াই, ১৩ রোহেলা, ১৪ বগা, ১৫ ছাগীপোড়া, ১৬ ভেলার দাগ, ১৭ কালির দাগ, ১৮ আসামী দোষ, ১৯ সাধকনামাদোষ (ভবানীপুরী), ২০ রাঙ্গাবড়ু, ২১ মল্লিক যদুনাথী, ২২ কালাপুরা, ২৩ সাতসিঁড়ি উমানন্দী, ২৪ নাটুয়াডাঙ্গা, ২৫ আল্‌মস্‌খানী, ২৬ জুগেবাদ, ২৭ পেয়ারি, ২৮ উমানন্দী, ২৯ আবদুল রহিমানী, ৩০ অদৃষ্টকন্যক, ৩১ ওরাখানী, ৩২ হাড়ী, ৩৩ বক্তারি, ৩৪ চাঁদি, ৩৫ হাসনখানী, ৩৬ রতিগুরুরঞ্জিৎখানী, ৩৭ ভগাই, ৩৮ সুরখানী, ৩৯ কপর্দখানী, ৪০ সৈয়দ্‌খানী, ৪১ গরবাহাদুরী, ৪২ পহরখানী, ৪৩ সেরখানী, ৪৪ নসিব্‌খানী, ৪৫ পীরালী, ৪৬ কাঁকশেয়ালী, ৪৭ পেগম্বরী, ৪৮ হিরণ্যতকী, ৪৯ চড়িয়াদোষ, ৫০ আউলখানী, ৫১ সিম্বিদোষ, ৫২ দুই শ্রীগর্ভের দংশিত, ৫৩ সুজাখানী, ৫৪ রামেশ্বরী, ৫৫ শশীকলা, ৫৬ সনাতনী, ৫৭ কিংবদন্তী, ৫৮ দেশাবাদ

ও বিশ্বপাণিদোষ, ৫৯ মহৎখানী, ৬০ বাঁওবাজু, ৬১ কুতবখানী, ৬২ ছোটখানী, ৬৩ পাঁড়ে আলী, ৬৪ আয়রাখানী, ৬৫ মথুরাকোপা, ৬৬ সাহাবাজখানী, ৬৭ এক্তারখানী ও ৬৮ দোষাবাদ।

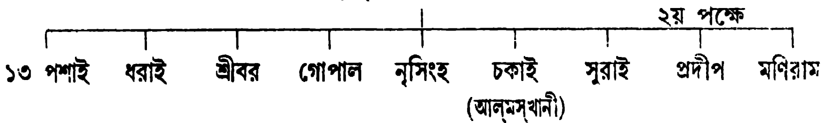
উপরে যে ৬৮টি অবসাদ বা দোষের নাম দিলাম, ঐ সকল অবসাদের ইতিহাস আলোচনা করিলেও বেশ বুঝিতে পারি যে, আচারনিষ্ঠ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ কতদূর সতর্ক ছিলেন, মুসলমানরাজ সংশ্লিষ্ট ঐশ্বর্যগর্বিত ব্রাহ্মণগণ যেরূপ পদে পদে মুসলমান হস্তে লাঞ্ছিত ও স্ব স্ব সমাজে অপমানিত হইতেছিলেন, তাহা লক্ষ করিয়াই ধর্মভীরু ব্রাহ্মণগণ তাহাদের সংস্রব নিতান্ত দোষাবহ করিয়া মনে করিয়াছিলেন। এমন কি, যাহারা কোনরূপে দোষী ছিলেন না, এরূপ সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যক্তিকেও কুলজ্ঞগণ দূর সংস্রব দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাহারা বহু কষ্ট ও নিগ্রহ ভোগের পর সমাজপতি ও কুলজ্ঞগণের কৃপায় অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। 'নিগূঢ়কল্প' নামক বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ হইতে অবসাদের ইতিহাস সম্যক্ আলোচনা করিলে সেই সময়ের হিন্দু মুসলমানের সমাজচিত্রও কতকটা দেখিতে পাই, বিশেষত বারেন্দ্র সমাজে কোন্ কোন্ ব্যক্তি রাজকীয় কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, কোন্ কোন্ ব্যক্তি রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ মুসলমান নবাব বা প্রধান কর্মচারী হিন্দুদিগের উপর কঠোর আচরণ করিতেন, মুসলমান অধিপতিগণের মধ্যে সময় সময় রাজবিপ্লব ও রাজবংশ-পরিবর্তনের সহিত কিরূপ সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের উপর কোন্ কোন মুসলমান রাজপুরুষের সুদৃষ্টি বা কুদৃষ্টি ছিল, এই অবসাদের বিবরণ হইতে আমরা তাহার কতক কতক আভাস পাইয়াছি, যাহা অপর কোন সূত্রে জানিবার উপায় নাই। এই কারণ অতি সংক্ষেপে পূর্বাপর বংশ ও কালক্রমানুসারে অবসাদের পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। আল্‌মস্‌খানী অবসাদ—চকাই সান্যালে

আল্‌মস্ খাঁর সোয়ারে বিরূপ করিয়াছিল সিধু কড়িয়ালকে। সিধু কড়িয়ালের কন্যা লন চকাই সান্যাল, চকাই সান্যালের ঘরে ভোজন করেন অনন্ত সান্যাল, অনন্ত ও পিথাই ভাদুড়ীতে করণ। এই কারণ পিথাই ভাদুড়ী আল্‌মস্‌খানীর ছিটা। পরে চকাই সান্যাল ও পিথাই ভাদুড়ীতে করণ আল্‌মস্‌খানী নিষ্কৃতি।

(সাদেখানী অবসাদে বংশলতা দ্রষ্টব্য।)

১২ হয়গ্রীব সান্যাল

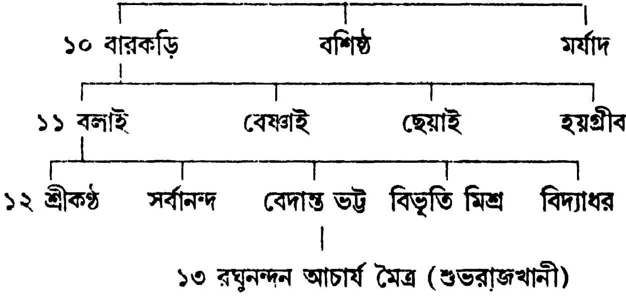


২। শুভরাজখানী অবসাদ—ধ্রুব জগন্নাথ বাগছিতে

শুভরাজ খাঁ বিরূপ করিয়াছিল সরলাই গাঞ্জিকে। সরলাই গাঞ্জির কন্যা লন রঘুনন্দন আচার্য মৈত্র। রঘুনন্দন ও ধ্রুব-জগন্নাথ বাগছিতে করণ। ধ্রুব জগন্নাথের ঘরে ভোজন করেন ভারতীনাথ বাগছি। ভারতীনাথের ঘরে ভোজন করেন লখাই বাগছি, এই কারণে লখাই শুভরাজখানীর ছিটা। পরে ধ্রুব-জগন্নাথ বাগছি ও পাঁচুয়াই সান্যালে করণ শুভরাজখানী নিষ্কৃতি। লক্ষ্মণতলাপাত্র ভোজন দেন ধ্রুব-জগন্নাথ বাগছিকে, ধ্রুব জগন্নাথ

বাগছি ও মাধব সান্যালে করণ শুভরাজখানী নিষ্কৃতি।

৬ শূলপাণি মৈত্র (সাতোটা)
|
৭ অম্বু ওঝা
|
৮ কুয়াঞি
|
৯ সাকাই

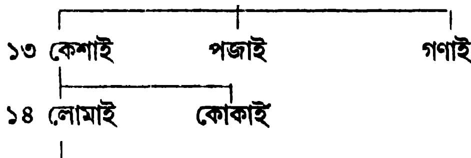


৩। কালির দাগ অবসাদ—শুভঙ্কর চক্রবর্তী লাহিড়ীতে

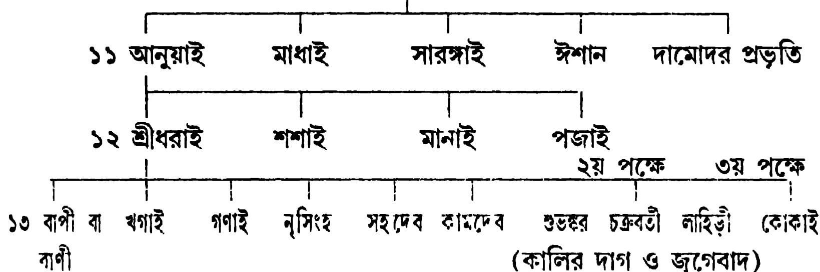
সাতোটার সাকাইর পুত্র বারকড়ি, বশিষ্ঠ ও মর্যাদ। বারকড়ি মৈত্র ও হয়গ্রীব কালিহাইয়ে করণ। বারকড়ির পুত্র বলাই, বেঞ্চাই, ছেয়াঞি ও হয়গ্রীব। বলাই আর গোপাল সান্যালে করণ, গোপাল ও দনাই ভাদুড়ীতে করণ, দনাই ভাদুড়ী আর চক্রবর্তী লাহিড়ীতে করণ, এই কারণ চক্রবর্তী লাহিড়ী ও দনাই ভাদুড়ীতে কালিহাই বা কালির অবসাদ। পরে সাতশত খাদি বিক্রয় করিয়া চক্রবর্তী লাহিড়ী ও সাতাই সান্যালে করণ—কালির দাগ নিষ্কৃতি।

কালির দাগ অবসাদে গঙ্গাদাস সান্যালবংশ মারা পড়েন। ব্যবস্থা যায় ধ্রুব জগন্নাথ বাগছিতে। ছয় বৎসরের ধ্রুব জগন্নাথ কুশের মেখলা গলায় দিয়া পুরাই সান্যালের সহিত করণ। কালির অবসাদ নিষ্কৃতি করিয়া ধ্রুবের উচ্চ নাই, জগাইর পর কুলীন নাই, নাম হইল জগন্নাথ-ধ্রুব।

১১ সুয়াই বাগছি
|
১২ মানাই



৪। জুগেবাদ অবসাদ—চক্রবর্তী লাহিড়ীতে।



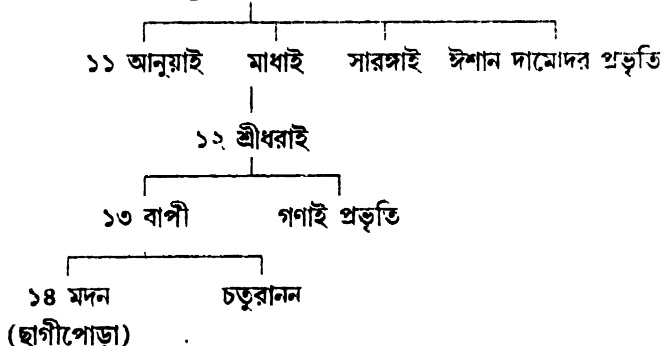
(কামিনী আঘাতে লাহিড়ীবংশ দ্রষ্টব্য।)

৫। ছাগীপোড়া অবসাদ—মদন লাহিড়ীতে

মদন লাহিড়ীর পত্নী নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা সমাজে প্রকাশ হওয়ায় মদন লাহিড়ী স্থগিত থাকেন, পরে মদন লাহিড়ী ঐ বধূর মৃত্যু হইয়াছে রটনা করিয়া একটা মৃত ছাগলকে শ্মশানে লইয়া দাহ করেন। এই কথা প্রকাশ হওয়ায় সমাজস্থ কুলীন ও কুলজ্ঞেরা মদন লাহিড়ীকে ছাগীপোড়ানদোষে ছাগীপোড়া অবসাদ দিয়া স্থগিত করেন। মদন লাহিড়ী ছাগীপোড়াদোষে বিয়াল্লিশ বৎসরকাল স্থগিত থাকেন। মদনের বাড়িতে আত্মীয় কুটুম্ব ভোজনাদি করেন না, ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণবেরাও ভিক্ষা করিতে যায় না। কুলজ্ঞেরা তরজা করিলেন—

"বধূ বধূ করিয়া মদন বেড়ায়।
শ্মশানে যাইয়া মদন ছাগী পোড়ায় ॥
ওরে অবুঝ মদন তোরে বুঝাই।
বাগছিতে বড় পণ্ডিত শুভাই ॥"

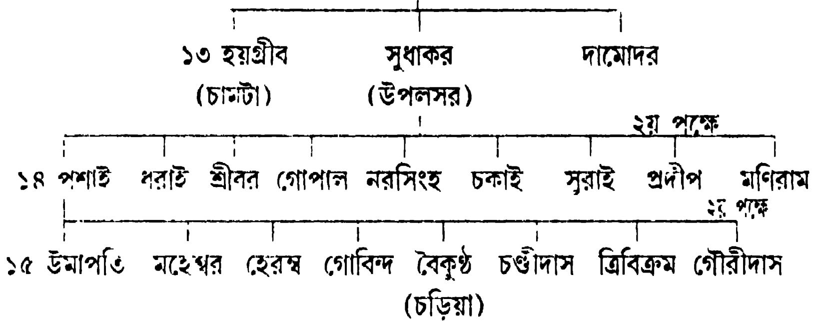
পরে সমাজস্থ ব্যক্তিরা একতায় করণ করেন। পরমানন্দ সান্যাল ও মদন লাহিড়ীতে করণ ছাগীপোড়াদোষ নিষ্কৃতি।



৬। চড়িয়া-দোষ—বৈকুণ্ঠ সান্যালে

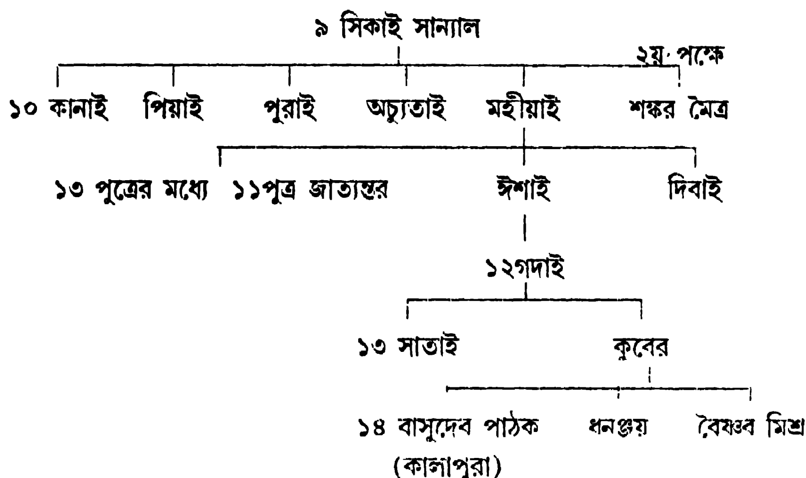
চড়িয়ার (সারঙ্গার) কামাইর কন্যা লন বৈকুণ্ঠ সান্যাল, বৈকুণ্ঠের ঘরে ভোজন করেন চাঁদাইলাহিড়ী, চাঁদাইর ঘরে ভোজন করেন দনাই লাহিড়ী, এই কারণ দনাই লাহিড়ী চড়িয়ার ছিটা। পরে কাশী সান্যাল ও চাঁদাই লাহিড়ীতে করণ চড়িয়া নিষ্কৃতি।

(বৈকুণ্ঠ সান্যালের পূর্ববংশ)



৭। কালাপুরা অবসাদ—বাসুদেব পাঠক সান্যালে

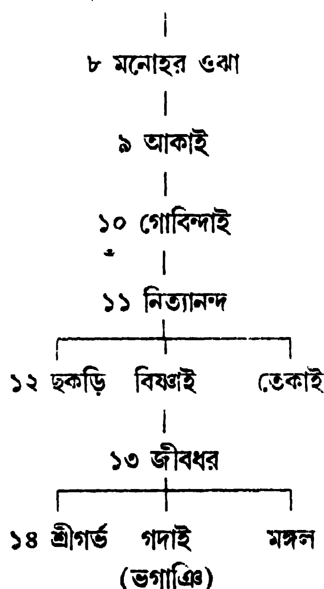
বিভাই মৈত্রে আলিয়াঘাত। বাসুদেব পাঠক পরিবর্ত করিয়া বিভাই মৈত্রের ভগিনী গ্রহণ করেন। এই কালে কুলজ্ঞেরা গিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্বে ছকড়ি মৈত্রের কুশে কুবেরের গঙ্গালাভ। কুবের-পুত্র বাসুদেব পাঠক বিভাই মৈত্রের উপকর্তা। কুলজ্ঞেরা গিয়া বলিলেন, বাসুদেব পাঠক তুমি চন্দ্র সূর্যের (ছকড়ি ও বিভাইর) উপকর্তা, আমাদিগকে বিদায় কর। বাসুদেব পাঠক অহঙ্কার করিলেন, কহিলেন, আমি এক হাত দিয়াছি বিভাইর স্কন্ধে, এক হাত দিয়াছি ছকড়ির স্কন্ধে। দেয় বিদায় বিভাই দিবে, দেয় বিদায় ছকড়ি দিবে। কুলজ্ঞদিগের উষ্মা জন্মিল। কুলজ্ঞেরা বিভাই মৈত্রের নিকট ভেদ জন্মাইলেন যে, 'বিভাই মৈত্র তোমার উপকার করিয়া বাসুদেব পাঠকের অহঙ্কার জন্মিয়াছে। আমরা বিদায় নিমিত্ত গিয়াছিলাম, তাহাতে কহিল, আমি এক পা দিয়াছি বিভাইর স্কন্ধে, এক পা দিয়াছি ছকড়ির স্কন্ধে, দেয় বিদায় বিভাই দিবে, দেয় বিদায় ছকড়ি দিবে।' পরে বিভাই মৈত্র কুলজ্ঞদিগকে বিদায় দিয়া স্তুতিবাদ করিলেন। 'কুলজ্ঞসহায় কুল, আপনারা স্বপক্ষ থাকেন, তবে ইহার প্রতিকার হবে।' বাসুদেব পাঠকের বাটীতে কালাপুরা নাম্নী এক হাড়িনী চাকরানী ছিল। কুলজ্ঞেরা তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া বলিলেন, 'কাল প্রভাতে যখন পাঠক বাহিরে আসিবেন, তুই গায়ে গোবর গোলার ছিটা দিয়া বলিবি, তুমি আমাকে যাহা দিতে চাহিয়াছিলে, দিলে না।' কুলজ্ঞেরা পরদিন প্রাতঃকালে বাসুদেব পাঠকের বাটীর নিকট দিয়া স্থানান্তরে যাইবার ভান করিয়া উপস্থিত হইলেন। হাড়িনী কুলজ্ঞদিগের কথামত সেইরূপ করিল। কুলজ্ঞেরা বাসুদেব পাঠককে কালাপুরা অবসাদে আস্তাড়ন করিলেন।



৮। ভগাঞি দোষ—গদাই মৈত্রে

ভগাঞির কন্যা লন গদাই চাঁপটান, গদাই চাঁপটার কন্যা লন বাউনিয়ার গদাই মৈত্র। গদাই আর চিরঞ্জীব সান্যালে করণ। চিরঞ্জীব সান্যালের ঘরে ভোজন করেন কাশী সান্যাল। কাশী আর শ্রীকণ্ঠ ভাদুড়ীতে করণ, পরে কাশী সান্যাল আর দনাই লাহিড়ীতে করণ, এই কারণ শ্রীকণ্ঠ ভাদুড়ী ও দনাই লাহিড়ী উভয়ে ভগাঞির ছিটা। কাশী সান্যালের পুত্র মুকুন্দ সান্যাল। পরে মুকুন্দ সান্যাল আর রাম লাহিড়ীতে করণ ভাগাঞি নিষ্কৃতি।

৭ নৃসিংহ শালুকি মৈত্র

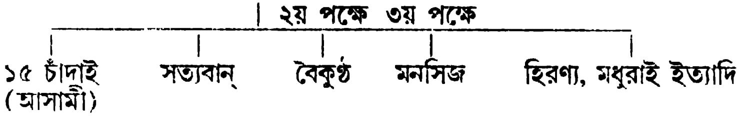


৯। আসামী-দোষ—চাঁদাই লাহিড়ীতে

আসামের ভবানন্দ খাঁর কন্যা লন চাঁদাই লাহিড়ী, তজ্জন্য চাঁদাই আসামী-দোষে আস্তাড়িত হন। পরে তিনি কুমারহট্টের কন্যা গ্রহণ করেন। চাঁদাই লাহিড়ী ও পুরুষোত্তম সান্যালে করণ আসামী-দোষ নিষ্কৃতি।

(কাকুরখানী আঘাতে পূর্ব বংশ দ্রষ্টব্য)

১৪ মদন লাহিড়ী (ছাগীপাড়া)

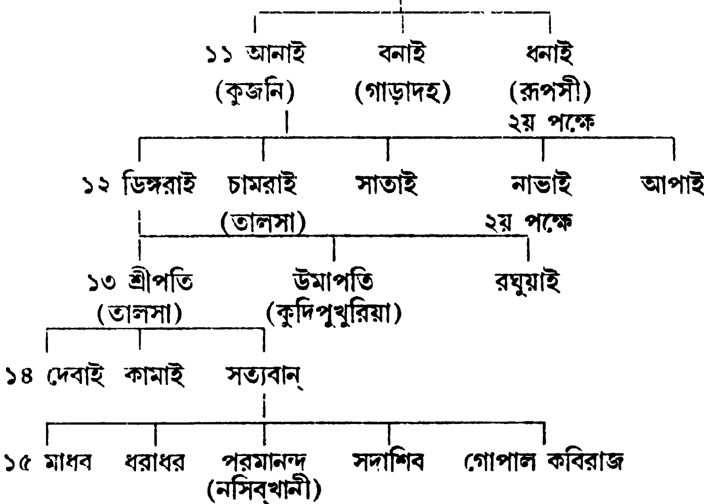


১০। নসিবখানী অবসাদ—পরমানন্দ সান্যালে

নসিব খাঁ বিদ্রূপ করিয়াছিল পরমানন্দ সান্যালকে। পরমানন্দ সান্যালের কন্যা লন হৃষীকেশ মজুমদার, হৃষীকেশ মজুমদারের কন্যা লন শ্রীরাম মৈত্র। শ্রীরামের ঘরে ভোজন করেন বদন মৈত্র, বদনের ঘরে ভোজন করেন গদাই সান্যাল, এই কারণ গদাই সান্যাল নসিবখানীর ছিটা। পরে শ্রীরাম মৈত্র ও রাম লাহিড়ীতে করণ নসিবখানী নিষ্কৃতি।

(পরমানন্দ সান্যালের পূর্ববংশ)

১০ পিয়াই



১১। সৈয়দখানী অবসাদ—আধুই সান্যালে

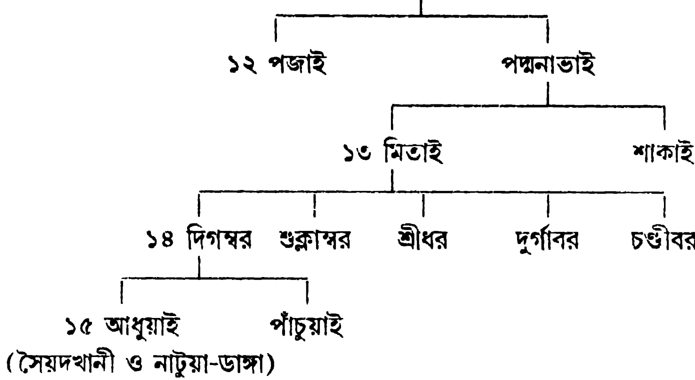
সৈয়দ খাঁ বিদ্রূপ করিয়াছিল আধুই সান্যালকে, আধুই সান্যালের ঘরে ভোজন করেন পিথাই ভাদুড়ী, এই কারণ পিথাই ভাদুড়ী সৈয়দখানীর ছিটা। পরে আধুই সান্যাল-পৌত্র হিরণ্য সান্যাল ও লখাই লাহিড়ীতে করণ—সৈয়দখানী নিষ্কৃতি।

(আধুই সান্যালের পূর্ববংশ পরে নাটুয়া-ডাঙ্গা অবসাদে দ্রষ্টব্য।)

১২। নাটুয়াডাঙ্গা অবসাদ—আধুই সান্যালে

চণ্ডীদাস মজুমদার বাদশাহের নাটুয়া (নর্তক) ছিলেন, চণ্ডীদাস মজুমদারের কন্যা লন আধুই সান্যাল, আধুই সান্যালের ঘরে ভোজন করেন রঘুনন্দন আচার্য, এই কারণ রঘুনন্দন আচার্য নাটুয়া ডাঙ্গা অবসাদের ছিটা। পরে আধুই সান্যাল ও মীনকেতন ভাদুড়ীতে করণ— নাটুয়া-ডাঙ্গা নিষ্কৃতি।

১১ আনন্দাই সান্যাল (সুগ্রিগ্রাম)

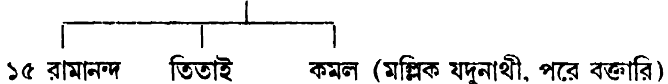


১৩। মল্লিক যদুনাথী দোষ

যদুনাথের চরিত্র-দোষ ছিল। কানাই হাজরার পুত্র গন্ধর্ব খাঁ, বামন খাঁ, শ্রীচন্দ্র খাঁ ও মোহন হাজরা। রমেন খাঁর পুত্র জগদানন্দ, তৎপুত্র মল্লিক জানকীবল্লভ জ্ঞাতিসম্পর্কে মল্লিক যদুনাথের ঘরে ভোজন করেন। মল্লিক জানকীবল্লভ কন্যা দেন কমল লাহিড়ীর পৌত্র রামভদ্র লাহিড়ীকে। কমল লাহিড়ীর ঘরে ভোজন করেন গোপাল বাগছী, নিধি বাগছী, সুরানন্দ ধর্মরায় ভাদুড়ী ও দুর্গাদাস সান্যাল, এই কারণে গোপাল আদি পাঁচ কর্তা মল্লিক যদুনাথের ছিটা। পরে কমল লাহিড়ী ও যদুনাথ ভাদুড়ীতে করণ—মল্লিক যদুনাথী-নিষ্কৃতি।

(মুদাখানীতে পূর্ব বংশ দ্রষ্টব্য)

১৪ শেখর লাহিড়ী



১৪। বক্তারি অবসাদ—কমল লাহিড়ীতে

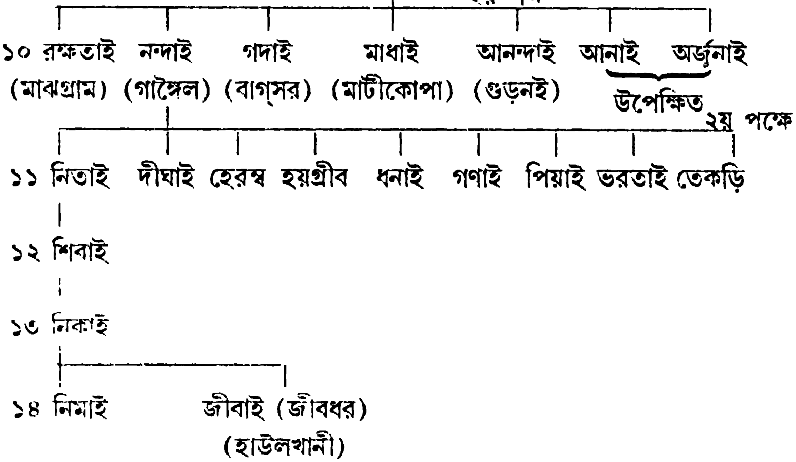
বক্তার খাঁর জীবন সুবুদ্ধি রায়কে বিরূপ করিয়াছিল। নারায়ণ উপাধ্যায়ের কন্যার সহিত জীবন সুবুদ্ধি রায়ের পুত্রের বিবাহ হয়। নারায়ণের কন্যা লন পুরাই সান্যাল। পুরাই সান্যাল ও মৃত্যুঞ্জয় মৈত্রে করণ, পরে পুরাই সান্যাল ত্রিপুরারি তলাপাত্রের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সেই ত্রিপুরারি তলাপাত্রের আর কন্যা লন সুরানন্দ ধর্মরায় ভাদুড়ী, ধর্মরায়ের ঘরে ভোজন করেন শ্রীকণ্ঠ ভাদুড়ী, এইরূপে শ্রীকণ্ঠ ভাদুড়ী বক্তারির ছিটা। পরে সুরানন্দ ধর্মরায় ভাদুড়ী ও কমল লাহিড়ীতে করণ—বক্তারি নিষ্কৃতি।

(যদুনাথী অবসাদে পূর্ব্ববংশ দ্রষ্টব্য)

১৫। হাউলখানী অবসাদ—জীবধর মৈত্রে

নিবাস কালের তোয়াই পাতসা সাহা মামুদের কর্ম্ম করিতেন, তাঁহার দেউড়ির চাকর ছিল হাউল খাঁ। সেই হাউল খাঁর সওয়ারে তোয়াইয়ের অপমান করে। তোয়াইর কন্যা লন জীবধর মৈত্র, জীবধরের ঘরে ভোজন করেন শক্তিধর মৈত্র, শক্তিধরের ঘরে ভোজন করেন সিধাই মৈত্র, এই কারণে সিধাই মৈত্র হাউলখানীর ছিটা। পরে জীবধর মৈত্র আর শুকাই বাগ্ছীতে করণ—হাউলখানী নিষ্কৃতি।

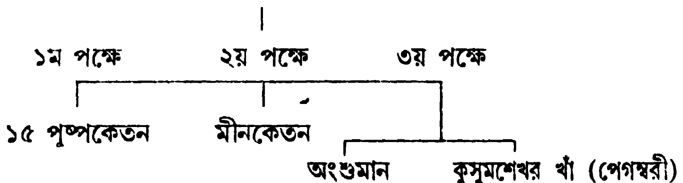
(জীবধর মৈত্রের পূর্ব্ববংশ)



১৬। পেগম্বরী অবসাদ—কুসুমশেখর খাঁ ভাদুড়ীতে

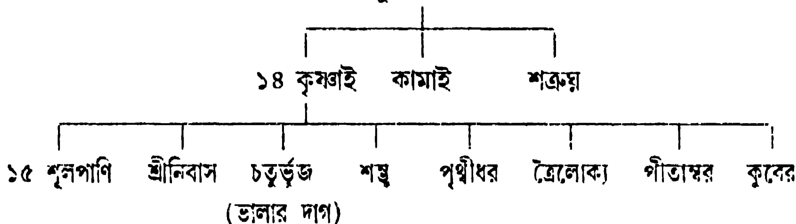
পেগম্বর খাঁ বিদ্রূপ করিয়াছিল মাধাই ভট্টশালীকে। মাধাইর কন্যা লন কুসুমশেখর ভাদুড়ী। কুসুমশেখর ও মদন সান্যালে করণ, মদনের ঘরে ভোজন করেন গণাই লাহিড়ী। গণাইর ঘরে ভোজন করেন কোকাই লাহিড়ী, এই কারণে কোকাই লাহিড়ী পেগম্বরীর ছিটা। পরে মদন লাহিড়ী পুত্র চাঁদাই লাহিড়ী ও পশাই সান্যালে করণ—পেগম্বরী নিষ্কৃতি।

কুসুমশেখর ভাদুড়ীর পূর্ব্ববংশ



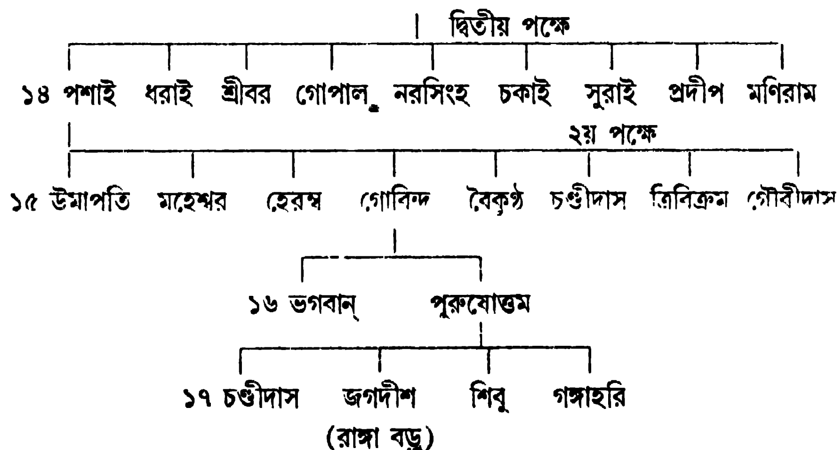
১৭। ভালারদাগ অবসাদ—চতুর্ভুজ সান্যালে

নওরঙ্গ খাঁর পুত্র মামুদ খাঁ বনমালী ভালার ব্রাহ্মণীকে লইয়া যায়। বনমালীর কন্যা লন উপলসরের চতুর্ভুজ সান্যাল। চতুর্ভুজের ঘরে ভোজন করেন শূলপাণি সান্যাল, এই কারণে শ্রীনিবাস সান্যাল ভালার দাগের ছিটা। পরে চতুর্ভুজ সান্যাল ও রঘুপতি লাহিড়ীতে করণ, রঘুপতি লাহিড়ী ও মিশ্র আচার্যের করণ, মিশ্র আচার্য ও কৃষ্ণ সান্যালে করণ—ভালার দাগ নিষ্কৃতি।



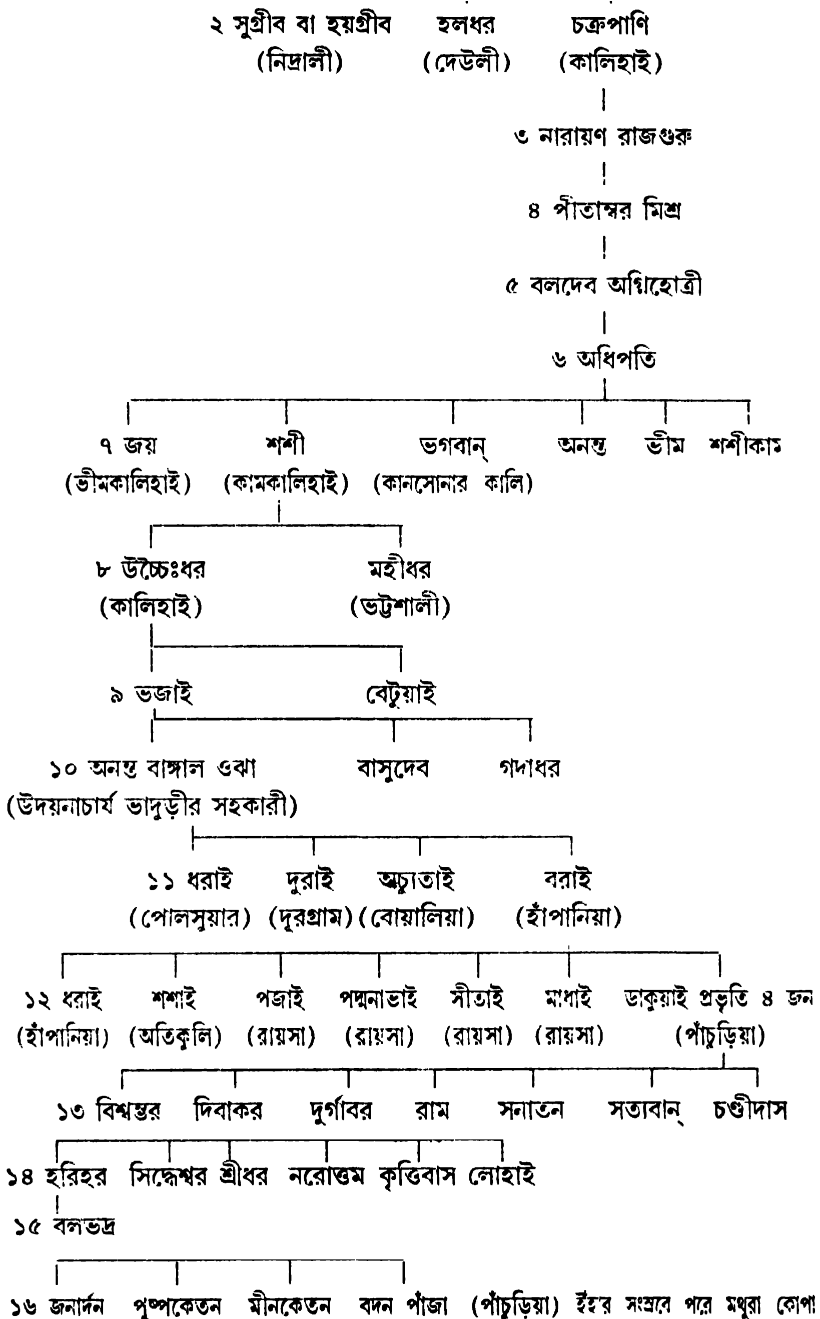
১৮। রাঙ্গাবড়ু অবসাদ—চাম্‌টা সমাজের জগদীশ সান্যালে।

জগদীশ সান্যালের পুত্রবধূ পাক করিতেছিল, জগদীশ সান্যাল সেই পাকঘরের ঝরকাতে হাত দিয়া বড়া চাহিলেন, জগদীশ সান্যালের পুত্রবধূ তপ্ততৈল সহিত বড়া তুলিয়া হাতে দিলেন। তপ্ততৈল পড়িয়া রাঙ্গা হইয়া জগদীশের হাতে ফোস্কা হইল। জগদীশ সান্যাল ও পুরুষোত্তম পঞ্চাননে করণ, পুরুষোত্তম ও কৃষ্ণানন্দ ঢোলে করণ, কৃষ্ণানন্দ ও চণ্ডীদাস আচার্যে করণ, চণ্ডীদাস-পুত্র রামভদ্র চক্রবর্তী, রামভদ্র কন্যা দেন শিবরাম সান্যালের পুত্র মহাদেব সান্যালে। শিবরাম সান্যাল ও রামহরি বাগ্‌ছীতে করণ; এইরূপে রামহরি বাগ্‌ছী রাঙ্গা বড়ুর ছিটা। রামহরি ও ভূপতি ভাদুড়ীতে করণ—রাঙ্গা বড়ু নিষ্কৃতি।



১৯। মথুরকোপা অবসাদ—গৌরীকান্ত মৈত্রে

বলভদ্রের পুত্র পুষ্পকেতন, মীনকেতন ও বদন পাঁজা। বদন পাঁজার কন্যা লন সহর মঙ্গলার বাণীনাথ, বাণীনাথের কন্যা লন মথুরা কোপা। মথুরা কোপার কন্যা লন রঘুরাম মজুমদার। রঘুরাম মজুমদার ও রাজারাম খাঁয়ে করণ। রাজারাম অদৃষ্ট কন্যা দেন রঘুদেব লাহিড়ীর পুত্রে, পরে কন্যা দেন মহেশ লাহিড়ীর পুত্র রঘুদেবে। রঘুদেব ও জানকীবল্লব রায়ে করণ, মহেশে ও গৌরীকান্ত মৈত্রে করণ। রঘুদেব, জানকীবল্লভ, মহেশ ও গৌরীকান্ত এই চারিজন কুলীনকে তাহেরপুরের রাজা উদয়নারায়ণ মথুরাকোপার পাছ দিয়া আস্তাড়িয়া কাশীরাম খাঁকে দিয়া বাহির নিরাবিল পত্তন করেন। কমলনয়ন সান্যাল ভাঙ্গেন কাশীরাম খাঁয়ের কুলজ। কাশীরাম খাঁ ভাঙ্গেন গোপাল চক্রবর্তী লাহিড়ী কুলজ। কাশীরাম খাঁ ও বলরাম সান্যালে করণ। কাশীরাম খাঁ ভাঙ্গেন বিনোদগোপাল চক্রবর্তী লাহিড়ী কুলজ। কাশীরাম খাঁ ও রঘুরাম বাগছীতে করণ। মথুরা-কোপার পর রঘুদেব সান্যালের গঙ্গালাভ। তৎপুত্র গোপীনাথ, রাধানাথ, শিবনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, দেবনারায়ণ ও জীবননারায়ণ। এই কালে গৌরীকান্ত মৈত্র ভাঙ্গেন, গোপীনাথ লাহিড়ী কুলজ। গোপীনাথ লাহিড়ী, জানকীবল্লভ, গৌরীকান্ত মৈত্র ও মহেশ সান্যাল এই চারিকুলীন ছাতিন গ্রামে কবিভূষণ চক্রবর্তীর নিকট গিয়া কহিলেন,—আমরা মথুরা কোপায় আবদ্ধ। আমাদিগের করণ করাইয়া কুলরক্ষা করুন। কবিভূষণ চক্রবর্তী কুলজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা ব্যবস্থা করেন। মথুরাকোপা নিষ্কৃতি হয় কিরূপে? কুলজ্ঞেরা কহিলেন, এক রাজায় আস্তাড়িলেন, আর এক রাজা সম্বরণ করেন, তবে নিষ্কৃতি হয়। রাজা উদয়নারায়ণের আস্তাড়িত, রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ও রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ দুই রাজার অধিষ্ঠিত। আপনারা কন্যাদান-পূর্বক করণ কারণ করান। কবিভূষণ চক্রবর্তীর পুত্র গঙ্গারাম চক্রবর্তী, শ্রীরাম চক্রবর্তী ও রঘুনাথ চক্রবর্তী। জয়নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র রামকৃষ্ণ চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী, গঙ্গানারায়ণ চৌধুরী ও রামনারায়ণ চৌধুরী। পূর্বে গঙ্গারাম চক্রবর্তীর কন্যা (কবিভূষণ চক্রবর্তীর পৌত্রী) দেন শ্রীপতি ভাদুড়ীকে। জয়নারায়ণ চৌধুরীর পৌত্রী রামকৃষ্ণ চৌধুরী কন্যা দেন কাশীরাম খাঁয়ের পুত্রে। এই কালে দুই রাজা অধিষ্ঠাতা থাকিয়া আর পৌত্রী (শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর কন্যা) দেন জানকীবল্লভ বর্তমানে রামকৃষ্ণ রায়ের পুত্র শ্যাম রায়ে। এই ভাবে শিবনারায়ণ লাহিড়ীর কুশে জানকীবল্লভ রায়ের গঙ্গালাভ। জানকীবল্লভ রায়ের পুত্র রামকৃষ্ণ রায়, জয়কৃষ্ণ রায় ও হরেকৃষ্ণ রায়। জানকীনাথ মৈত্রের পুত্র রামকৃষ্ণ মৈত্র। এই কালে শিবনারায়ণ লাহিড়ী ভাঙ্গেন রামকৃষ্ণ রায়ের কুলজ, রামকৃষ্ণ ও দুর্গাদাস সান্যালে করণ, হরেকৃষ্ণ রায় ও গোপাল চক্রবর্তী লাহিড়ীতে করণ, রামকৃষ্ণ মৈত্র ও গোপীনাথ লাহিড়ীতে করণ, গৌরীকান্ত মৈত্র ও নৃসিংহ চক্রবর্তী সান্যালে করণ—মথুরা-কোপা নিষ্কৃতি। [পর পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য]

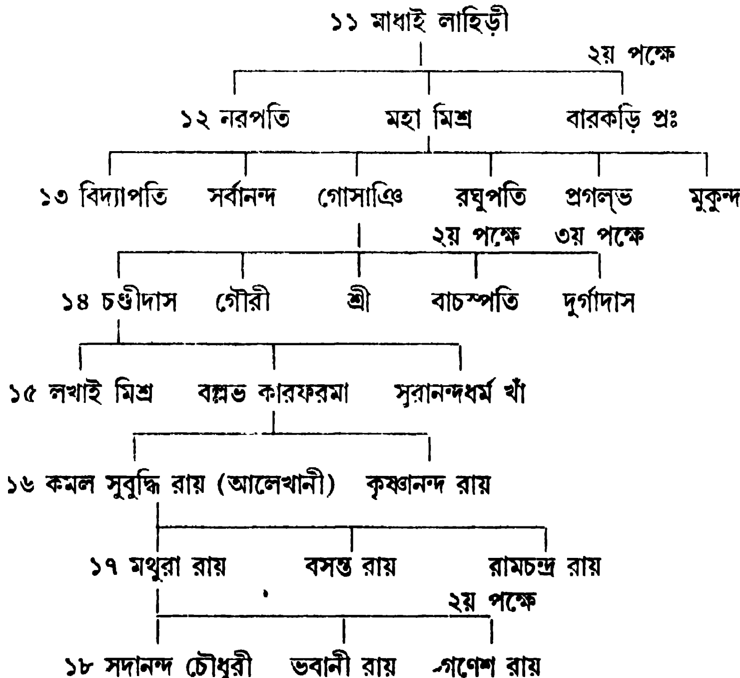

১ জয়মান মিশ্র কালিহাই
২ সুগ্রীব বা হয়গ্রীব (নিদ্রালী)
হলধর (দেউলী)
চক্রপাণি (কালিহাই)
৩ নারায়ণ রাজগুরু
৪ পীতাম্বর মিশ্র
৫ বলদেব অগ্নিহোত্রী
৬ অধিপতি
৭ জয় (ভীমকালিহাই)
শশী (কামকালিহাই)
ভগবান্ (কানসোনার কালি)
অনন্ত
ভীম
শশীকাম
৮ উচ্চৈঃধর (কালিহাই)
মহীধর (ভট্টশালী)
৯ ভজাই
বেটুয়াই
১০ অনন্ত বাঙ্গাল ওঝা (উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর সহকারী)
বাসুদেব
গদাধর
১১ ধরাই (পোলসুয়ার)
দুরাই (দূরগ্রাম)
অচ্যুতাই (বোয়ালিয়া)
বরাই (হাঁপানিয়া)
১২ ধরাই (হাঁপানিয়া)
শশাই (অতিকুলি)
পজাই (রায়সা)
পদ্মনাভাই (রায়সা)
সীতাই (রায়সা)
মাধাই (রায়সা)
ডাকুয়াই প্রভৃতি ৪ জন (পাঁচুড়িয়া)
১৩ বিশ্বম্ভর
দিবাকর
দুর্গাবর
রাম
সনাতন
সত্যবান্
চণ্ডীদাস
১৪ হরিহর
সিদ্ধেশ্বর
শ্রীধর
নরোত্তম
কৃত্তিবাস
লোহাই
১৫ বলভদ্র
১৬ জনার্দন
পুষ্পকেতন
মীনকেতন
বদন পাঁজা (পাঁচুড়িয়া) ইঁহার সংগ্রহে পরে মথুরা কোপা

২০। আলেখানী—কমলসুবুদ্ধি রায়ে

আলেখাঁর সোয়ারে বিরূপ করিয়াছিল কমলসুবুদ্ধি রায় লাহিড়ীকে। কমলসুবুদ্ধি রায়ের ঘরে ভোজন করেন সুরানন্দ ধর্ম খাঁ লাহিড়ী। সুরানন্দের পুত্র গোপীনাথ। গোপীনাথ আর শ্রীমুখ সান্যালে করণ। এই কারণে শ্রীমুখ সান্যাল আলেখানীর ছিটা। কমলসুবুদ্ধি রায়ের পুত্র মথুরা, বসন্ত ও রামচন্দ্র রায়। মথুরা রায়ের পুত্র সদানন্দ চৌধুরী। সদানন্দ ও লঘুভট্টে করণ, পরে সদানন্দ ও শিবরাম ভাদুড়ীতে করণ। শিবরাম ও রামকৃষ্ণ বাগ্ছীতে করণ। রামকৃষ্ণ ও লঘুভট্টে করণ। জয়রাম সান্যাল ও সদানন্দ চৌধুরীতে করণ। পরে জয়রাম ও লঘুভট্টে করণ —আলেখানী নিষ্কৃতি।

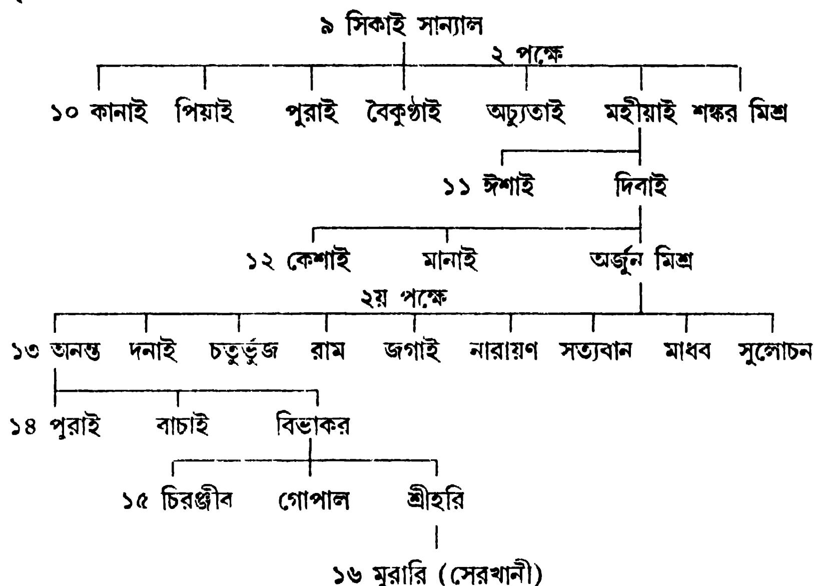
মতান্তরে আলেখানীর পর কমলসুবুদ্ধি রায়ের গঙ্গালাভ। তৎপুত্র মথুরা রায়, বসন্ত রায় ও রামচন্দ্র চৌধুরী। মথুরা, বসন্ত ও রামচন্দ্র রায়ের অকরণে গঙ্গালাভ। মথুরা রায়ের পুত্র ১ম পক্ষে সদানন্দ চৌধুরী ও ২য় পক্ষে গণেশ রায়। সদানন্দ চৌধুরী ও লঘুভট্টে করণ, জয়রাম সান্যাল ও সদানন্দ চৌধুরীতে করণ, পরে জয়রাম সান্যাল ও মাধবভট্ট মৈত্রে করণ—আলেখানী নিষ্কৃতি। পরে লক্ষ্মীকান্ত সান্যাল ও সদানন্দ চৌধুরীতে করণ—পরাণ-মৌলিকী নিষ্কৃতি। এই কালে রঘুদেব ও নয়নানন্দে করণ, তাহাতে সুজাখানী জাগে। পরে মথুরা মৈত্র ভাঙ্গেন জনার্দন বাগ্ছীর কুলজ।

কমল সুবুদ্ধি রায়ের পূর্ব বংশ



২১। সেরখানী বা সুরখানী অবসাদ—মুরারি সান্যালে

সের খাঁ বিরূপ করিয়াছিল মুরারি সান্যালকে। মুরারি সান্যালের ঘরে ভোজন করেন বৎস সান্যাল, বৎস সান্যালের ঘরে ভোজন করেন পরমানন্দ সান্যাল, এই কারণ পরমানন্দ সান্যাল সেরখানীর ছিটা। পরে পরমানন্দ সান্যাল ও শশাই বাগছীতে করণ—সেরখানী নিষ্কৃতি।



২২। পহরখাগী অবসাদ—কংসারি সান্যালে

পাতসাহী কামরায় কংসারি সান্যাল খাগ জ্বালিয়াছিল। এই কারণে পাতসাহী হামারখোরে এক প্রহর সর্বাঙ্গে খাগ জ্বালিবেক, এমত হুকুম হইল। সেই কংসারি সান্যালের ঘরে ভোজন করেন পুরাই সান্যাল, পুরাইর ঘরে ভোজন করেন ভিক্ষাকর সান্যাল। এই কারণে ভিক্ষাকর সান্যালে পহরখাগীর ছিটা। ভিক্ষাকর সান্যাল ও ছকড়ি মৈত্রে করণ। ছকড়ি পুত্র শ্রীনিবাস মৈত্র। শ্রীনিবাস ও দেবাই সান্যালে করণ, তৎপরে বামন ও দেবাই সান্যাল উপকর্তা।

১৩ কৃষ্ণাই সান্যাল (উপলসর)

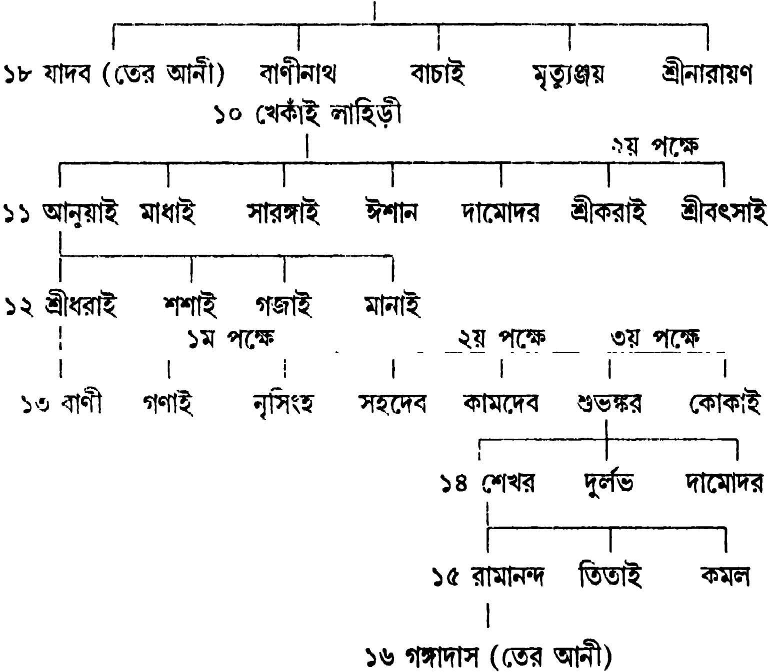
১৪ শূলপাণি শ্রীনিবাস চতুর্ভুজ শম্ভু পৃথ্বীধর ত্রৈলোক্যনাথ পীতাম্বর কুবের

১৫ ধ্রুব শিখর সিতিকণ্ঠ

১৬ কংসারি সান্যাল (পহরখাগী) সর্বানন্দ

২৩। তের আনী অবসাদ—যাদব লাহিড়ী ও গঙ্গাদাস লাহিড়ীতে

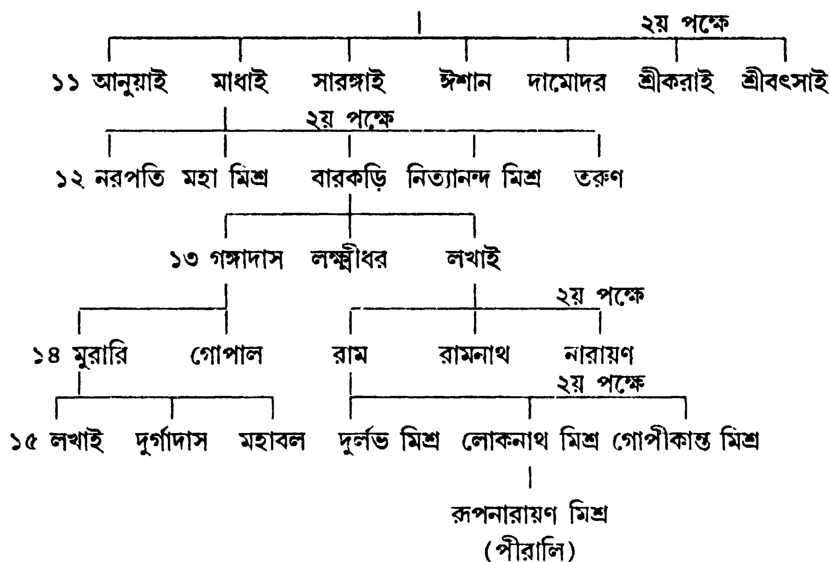
নবাবজাদির সহিত বাণীনাথ করঞ্জ গাঞির প্রণয় হইয়াছিল। তাহাতে নবাবজাদি বাণীনাথ করঞ্জকে তের আনী ভূমি দিয়াছিলেন। সেই বাণীনাথ করঞ্জের কন্যা লন কবিভূষণ চক্রবর্তী। কবিভূষণ কন্যা দেন যাদব লাহিড়ীর পৌত্রে, যাদবলাহিড়ীর ঘরে ভোজন করেন গঙ্গাদাস লাহিড়ী। এই কারণে গঙ্গাদাস লাহিড়ী তের আনীর ছিটা। পরে যাদব লাহিড়ী ও যদুনাথ ভাদুড়ীতে করণ—তের আনী নিষ্কৃতি।



২৪। পীরালি অবসাদ—রূপনারায়ণ চক্রবর্তী লাহিড়ীতে

রূপনারায়ণ চক্রবর্তী লাহিড়ী পীরালি ব্রাহ্মণের কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপনারায়ণ লাহিড়ী পীরালিদোষ সংগোপন করিয়া রঘুনাথ রায়ের উঠানে রামকৃষ্ণ রায়ের অদৃষ্টকন্যা লন। রূপনারায়ণ পীরালির কন্যা লন রঘুনাথ রায়ের পুত্র গোবিন্দ রায়। রঘুনাথ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র রাধাকান্ত রায়। রঘুনাথ রায় বর্তমানে রাধাকান্ত রায় অদৃষ্টকন্যা দেন বশিষ্ঠ সান্যালের পুত্রে, পরে কন্যা দেন কৃষ্ণদাস লাহিড়ীতে। কৃষ্ণদাসের ঘরে ভোজন করেন বাণীনাথ লাহিড়ী, এই কারণে বাণীনাথ লাহিড়ী পীরালির ছিটা। তৎপরে কৃষ্ণ বিষ্ণু হরিরাম ছয় কর্তার উপকর্তা আত্মারাম।

[পর পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।]



২৫। পীতাম্বর তকি—মুকুন্দ ভাদুড়ীতে

পীতাম্বর তকির কন্যা লন মুকুন্দ ভাদুড়ী। মুকুন্দ ও হিরণ্য সান্যালে করণ। মুকুন্দ ভাদুড়ী ও বংশধর বাগছী করণ, এই কারণে বংশধর বাগছী পীতাম্বর তকির ছিটা। পরে মুকুন্দ ভাদুড়ী ও মনসিজ সান্যালে করণ—পীতাম্বর তকি নিষ্কৃতি।

২৬। পয়নালী অবসাদ—মুকুন্দ ভাদুড়ীতে

পুরাই ভাড়িয়াল পাতসাহের চাকরী করিতেন। পাতসাহ পলাইয়া সপ্তাহ পুরাই ভাড়িয়ালের বাড়িতে ছিলেন। সেই পুরাই ভাড়িয়ালের ঘরে ভোজন করেন মুকুন্দ ভাদুড়ী, মুকুন্দ ভাদুড়ীর ঘরে ভোজন করেন পাঁচু ভাদুড়ী, পাঁচু ভাদুড়ীর ঘরে ভোজন করেন ডাক ভাদুড়ী, এই কারণে ডাক ভাদুড়ী পয়নালীর ছিটা। পরে মুকুন্দ ভাদুড়ী ও রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ—পয়নালী নিষ্কৃতি। উপকার ব্যবস্থা যায় রামচন্দ্র সান্যালে। পয়নালী অবসাদের পর রামচন্দ্র মুকুন্দের উপকর্তা। এ সম্বন্ধে ঢাকুরে আছে—

"ভাদুড়ীকুলের সার, আঠার পালট্ যার,
রামচন্দ্র তোমা দিয়ে উনিশ বিষ গুণী।
পাইয়ে তোমার কুলের জল, মুকুন্দ হইল নির্মল,
হেলায় ভাঙ্গিলা পয়নালী ॥"

২৭। পেয়ারী অবসাদ—অনন্ত লাহিড়ীতে

নবাব পেয়ার খাঁর শ্যালীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর প্রণয় ছিল, শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর ঘরে ভোজন করেন রাম লাহিড়ী, পরে শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর ঘরে ভোজন করেন গঙ্গাধর ভাদুড়ী, গঙ্গাধর ভাদুড়ীর ঘরে ভোজন করেন ডাক ভাদুড়ী, এই কারণে ডাক ভাদুড়ী পেয়ারীর ছিটা। পরে রাম লাহিড়ীর পুত্র অনন্ত লাহিড়ী ও মুকুন্দ ভাদুড়ীতে করণ, মুকুন্দ-পুত্র

শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী, তৎপুত্র সুবুদ্ধি খাঁ ভাদুড়ী। সুবুদ্ধি খাঁ ও লক্ষ্মণ সান্যালে করণ—পেয়ারী নিষ্কৃতি।

[কাফুরখানী আঘাতে বংশ দ্রষ্টব্য]

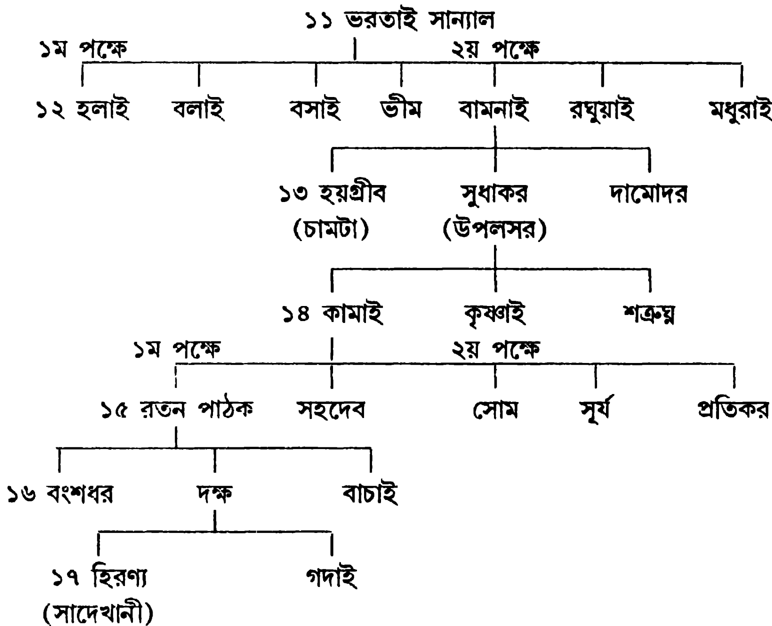
২৮। সাতখানী অবসাদ—হিরণ্য সান্যালে

হতন খাঁর পুত্র মামুদ খাঁ, ওরা খাঁ, সাদি খাঁ, কাফুর খাঁ, আইদ খাঁ ও হাদন খাঁ। এই সাত খাঁ একত্র হইয়া হিরণ্য সান্যালের বাড়ি গিয়াছিল। হিরণ্য ও মুকুন্দ ভাদুড়ীতে করণ, মুকুন্দের ঘরে ভোজন করেন পদ্মনাভ ভাদুড়ী, এই কারণে পদ্মনাভ ভাদুড়ী সাতখানীর ছিটা। পরে হিরণ্য সান্যাল ও কমল লাহিড়ীতে করণ —সাতখানী নিষ্কৃতি।

[হিরণ্য সান্যালের বংশাবলী পরবর্তী সাদেখানী অবসাদে দ্রষ্টব্য]

২৯। সাদেখানী অবসাদ—উপলসরের হিরণ্য সান্যালে

সাদে খাঁর সোয়ারে বিরূপ করিয়াছিল শ্রীনাথ কাঠুরিয়াকে। শ্রীনাথ কাঠুরিয়ার পৌত্রী লন শ্রীনাথাচার্য লাহিড়ী, শ্রীনাথ ও হিরণ্য সান্যালে করণ। পরে হিরণ্য ও মুকুন্দ ভাদুড়ীতে করণ, এই কারণে মুকুন্দ ভাদুড়ী সাদেখানীর ছিটা। পরে মুকুন্দ ভাদুড়ী ও মনসিজ সান্যালে করণ—সাদেখানী নিষ্কৃতি। নিধাই তলাপাত্র ভোজন দেন হিরণ্য সান্যালকে, পরে কমল আর হিরণ্যে করণ, মনসিজে আর মুকুন্দে করণ, তাহাতে সাদেখানী ও পীতাম্বর-তকি নিষ্কৃতি।



৩০। হিরণ্যতকি অবসাদ—হিরণ্য সান্যালে

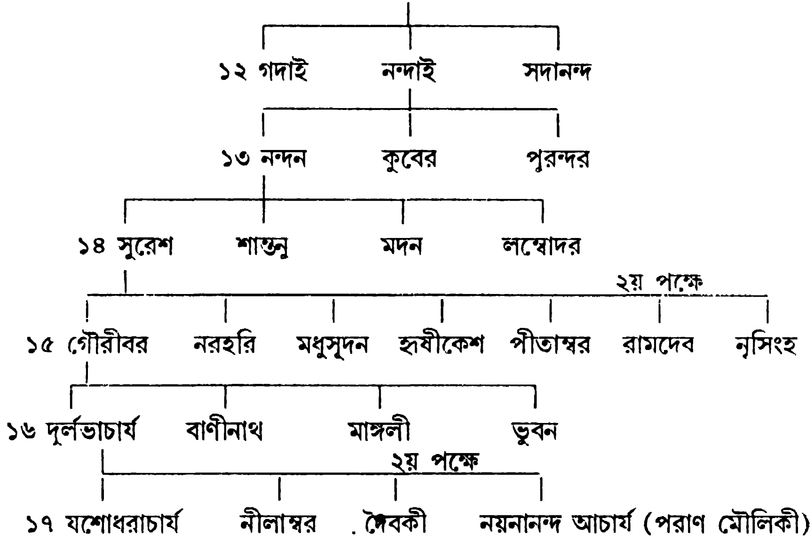
হিরণ্য তকি পসাই পাতসার তবিলদার ছিলেন। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা গরমিল করিয়াছিলেন। এই কারণে পাতসাহী গুণাগার হইল, পাতসা হিরণ্য তকির দন্ত বারণ

করিয়া দিলেন। সেই হিরণ্য তকির কন্যা লন হিরণ্য সান্যাল। হিরণ্যের ঘরে ভোজন করেন চাঁদাই লাহিড়ী, চাঁদাইর ঘরে ভোজন করেন মনসিজ সান্যাল, এইরূপে মনসিজ সান্যাল হিরণ্য তকির ছিটা। পরে চাঁদাই লাহিড়ী ও শ্রীনিবাস-সান্যালে করণ—হিরণ্য তকি নিষ্কৃতি।

[২৯ সংখ্যক অবসাদে হিরণ্য সান্যালের পূর্ববংশ দ্রষ্টব্য]

৩১। পরাণ-মৌলিকী—নয়নানন্দ আচার্য সান্যালে

পরাণ-মৌলিকে জন্মিল ব্রহ্মহত্যা। সেই পরাণের ঘরে ভোজন করেন ধ্রুব সান্যাল। ধ্রুবের ঘরে ভোজন করেন শেখর সান্যাল। শেখর সান্যাল ভগিনী দেন বাউনিয়ার জগাই পুত্র কমল মৈত্রে। কমল ও গৌরীবর মিশ্র সান্যালে 'করণ'। গৌরীবরের পুত্র দুর্লভ আচার্য। দুর্লভের অকরণে গঙ্গালাভ। তৎপুত্র নয়নানন্দ আচার্য। পরাণ মৌলিকের পর নয়নানন্দের গঙ্গালাভ। নয়নানন্দের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত আচার্য। লক্ষ্মীকান্ত ও সদানন্দ চৌধুরী লাহিড়ীতে করণ —পরাণ-মৌলিকী নিষ্কৃতি।



৩২। কপর্দখানী অবসাদ—লখাই বাগছীতে

কপর্দ খাঁ সুন্দর সমাদ্দারকে অপমান করেন। সুন্দর সমাদ্দারের কন্যা লন রঘুনাথ সান্যাল। রঘুনাথ সান্যাল ও লখাই বাগ্ছীতে করণ। লখাই বাগ্ছীর ঘরে ভোজন করেন নয়ান বাগ্ছী, নয়ান ও কৃষ্ণানন্দ মৈত্রে করণ, এই কারণে কৃষ্ণানন্দ মৈত্র কপর্দ খানীরে ছিটা। পরে লখাই বাগ্ছী ও গোবিন্দ মৈত্রে করণ—কপর্দখানী নিষ্কৃতি।

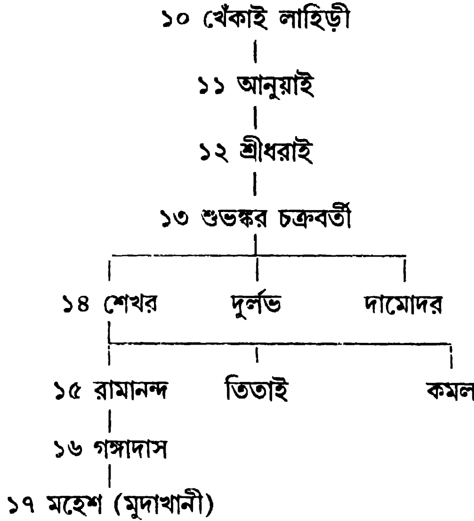
৩৩। সাতসিঁড়ি উমানন্দী—লখাই বাগ্ছীতে

উমানন্দ চৌধুরী কালীর কন্যা লন সুন্দর সমাদ্দার, সুন্দর সমাদ্দারের কন্যা লন নারায়ণ উপাধ্যায়, নারায়ণ উপাধ্যায়ের কন্যা লন জীবনসুবুদ্ধি রায়। সুবুদ্ধি রায়ের কন্যা লন

ত্রিপুরারি তলাপাত্র, ত্রিপুরারির কন্যা লন রঘুনাথ সান্যাল। রঘুনাথ ও লখাই বাগ্‌ছীতে করণ। এইরূপে সাতসিঁড়ি অন্তে উমানন্দী ধরা পড়িল। পরে লখাই বাগ্‌ছী ও গোবিন্দ মৈত্রে করণ—উমানন্দী নিষ্কৃতি।

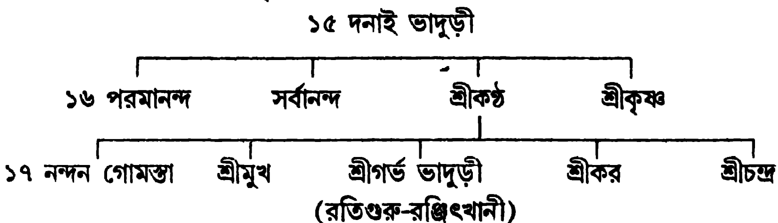
৩৪। মুদাখানী অবসাদ—মহেশ লাহিড়ীতে

মুদাখাঁর সোয়ারে মহেশ লাহিড়ীর খানাঘরে কুট মুদিয়াছিল। সেই মহেশ লাহিড়ী ও দামোদর মৈত্রে করণ, মহেশ লাহিড়ী ও রাজবল্লভ রায় ভাদুড়ীতে করণ, মহেশ লাহিড়ী ও চাঁদরায় ভাদুড়ীতে করণ, এই কারণে চাঁদরায় ভাদুড়ী মুদাখানীর ছিটা। পরে চাঁদরায় ও গোপাল সান্যালে করণ—মুদাখানী নিষ্কৃতি।



৩৫। রতিগুরু-রঞ্জিৎখানী—শ্রীগর্ভ ভাদুড়ীতে

রঞ্জিৎ খাঁর কন্যার সহিত শ্রীগর্ভ ভাদুড়ীর প্রণয় ছিল, তজ্জন্য তাঁহার পুত্রবধূকে রঞ্জিৎ খাঁর কন্যা উষ্মা করিয়া নিগ্রহ করিতে গিয়াছিল। সেখানে ছিল মামাজীউ। মামাজীউর দোহাই দিল। মামাজীউ গিয়া রঞ্জিৎ খাঁর পায়ে ধরিলেন। শ্রীগর্ভ ভাদুড়ীর ঘরে ভোজন করেন কমল ভাদুড়ী, তৎপুত্র হরিচরণ ভাদুড়ী, হরিচরণ ও শ্রীচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ, এই কারণে শ্রীচন্দ্র লাহিড়ী রতিগুরু-রঞ্জিৎখানীর ছিটা। পরে শ্রীগর্ভ ভাদুড়ী ও মল লাহিড়ীতে করণ—রতিগুরু-রঞ্জিৎখানী নিষ্কৃতি।

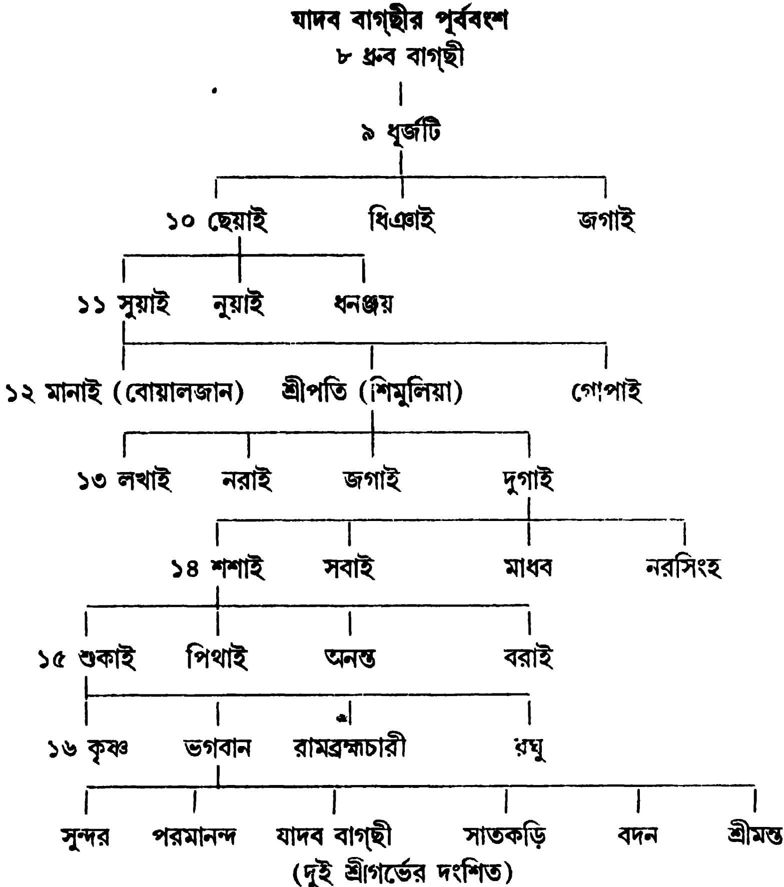


৩৬। দুই শ্রীগর্ভের দংশিত—যাদব বাগ্‌ছীতে

"দুই দিকে দুই শুঁড়ির ঘর। মধ্যে বামুন রক্ষাকর ॥"

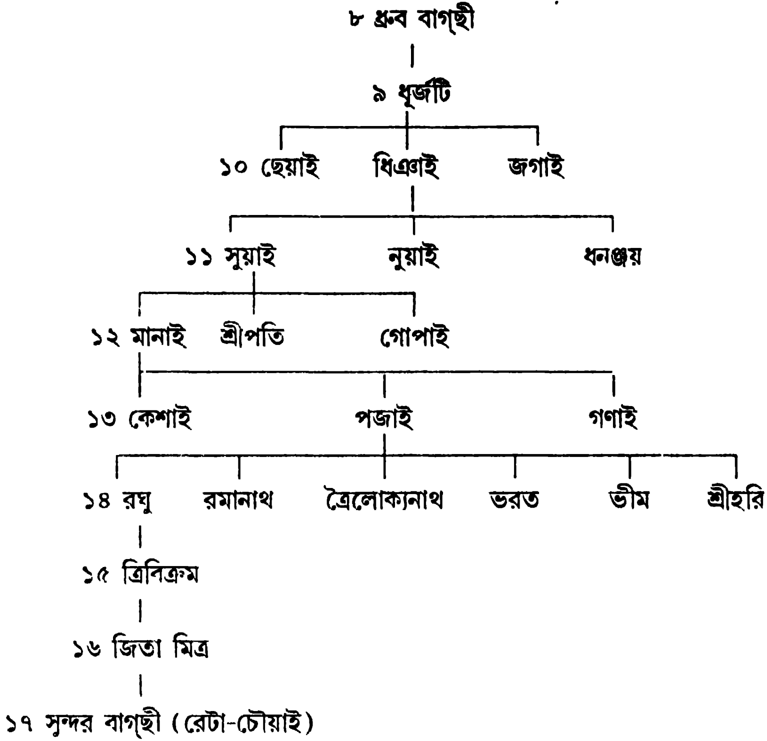
রক্ষাকর হাজরার সুরাপানদোষ ছিল। সেই রক্ষাকর হাজরার কন্যা লন রূপসীর শ্রীগর্ভ সান্যাল, শ্রীগর্ভ ও যাদববাগ্‌ছীতে করণ। পরে জনমেজয় বাগ্‌ছী অদৃষ্টকন্যা দেন রক্ষাকর হাজরার পুত্রে, পরে জনমেজয় বাগ্‌ছী ও বাউনিয়ার শ্রীগর্ভ মৈত্রে করণ, শ্রীগর্ভ মৈত্র ও যাদব বাগ্‌ছীতে করণ, এই কারণে যাদব বাগ্‌ছীতে দুই শ্রীগর্ভের দংশিত অবসাদ ঘটে।

যাদব বাগ্‌ছীর পূর্ববংশ

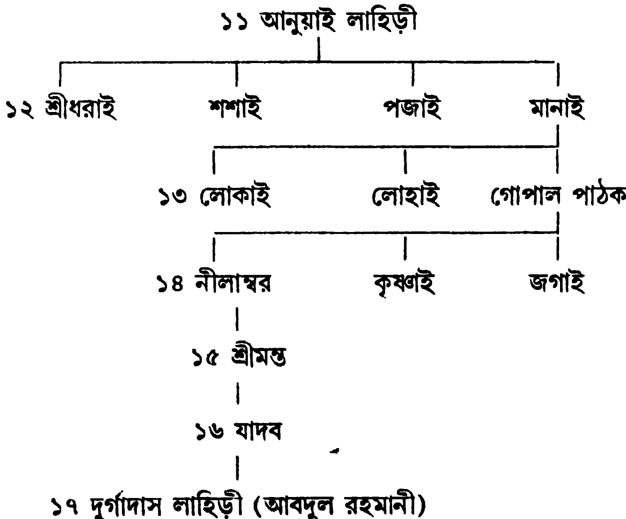


৩৭। রেটা চৌয়াই অবসাদ—সুন্দর বাগ্‌ছীতে

মেঘনার চৌয়াইর কন্যা লন রেটাই বাগ্‌ছী। রেটাই বাগ্‌ছীর ঘরে ভোজন করেন বদন মৈত্র। বদন মৈত্রে ও সুন্দর বাগ্‌ছীতে করণ, এই কারণে সুন্দর বাগ্‌ছী রেটা-চৌয়াইর ছিটা। বদন মৈত্রের পুত্র কৃষ্ণানন্দ মৈত্র, কৃষ্ণানন্দ ও কমল লাহিড়ীতে করণ—রেটা-চৌয়াই নিষ্কৃতি।



৩৮। আবদুল রহ্‌মানী-দুর্গাদাস লাহিড়ীতে



৩৯। দর্পনারায়ণী অবসাদ—মুকুন্দ ভাদুড়ীতে

দর্পনারায়ণ বড়ঠাকুরের ভাই হরিনারায়ণ ছোটঠাকুর। হরিনারায়ণ ছোটঠাকুরের কন্যা লন শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী। কুলজ্ঞেরা শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুলজ্ঞদিগকে বসিতে আসন দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের আর কোন তত্ত্ব লইলেন না। কুলজ্ঞেরা কহিলেন, হায়! শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছেন, সেই অহঙ্কারে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। দেখ, ইহার কি দোষ আছে। কুলজ্ঞেরা দেখিলেন—হরিনারায়ণ ছোটঠাকুরের কন্যা লন শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী, সেই হরিনারায়ণ ছোটঠাকুরের জ্ঞাতি দর্পনারায়ণ বড়ঠাকুর। পূর্বে দর্পনারায়ণ বড়ঠাকুরের পোতাখানায় সাতকড়ি নামে এক ব্রহ্মহত্যা হইয়াছিল। দুর্লভ মৈত্র দর্পনারায়ণ বড় ঠাকুরের কন্যা গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী দর্পনারায়ণ বড় ঠাকুরের ঘরে ভোজন করেন। কুলজ্ঞেরা শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীকে দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তাড়িলেন ও রাজার নিকট গিয়া জানাইলেন যে, মহারাজ! তোমার জামাতা শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীতে দর্পনারায়ণী অবসাদ 'জন্মেছে'। তুমি যদি জামাতাকে ভোজন দেও, তাহা হইলে তোমাকেও দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তাড়িব, নতুবা মহারাজ ভোজন দিলে পরে উপকার দর্শিবে। এই কথা বলিয়া কুলজ্ঞেরা কর্মান্তরে গমন করিলেন।

সেবার শুভযোগ শনিবার, শতভিষা নক্ষত্র, মহামহাবারুণ্য। মুকুন্দ ভাদুড়ী সুসঙ্গ ছিলেন গঙ্গাস্নানে যাইবেন। গোপীনাথ ও শ্রীকান্ত নামক পুত্রদ্বয় তাঁহাকে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি যদি বার্বকাবাদের পথে গঙ্গাস্নানে যান এবং যদি কুলজ্ঞের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে কি বলিতে কি বলিবেন। অতএব আপনি বার্বাকাবাদের পথে না গিয়া অন্যপথে গঙ্গাস্নানে যাইবেন।

মুকুন্দ ভাদুড়ী ভূষণা দিয়া মামুদপুরের পথে চুমড়ি শিবশর্মা ভট্টাচার্যের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী বিবেচনা করিলেন পিতৃদেব অন্য অন্য বার আমার এই স্থান দিয়া গঙ্গাস্নানে যান, আমাকে কুলজ্ঞেরা দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তড়িয়াছেন, একারণে পিতা ব্রস্তাল দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী বিবেচনা করিয়া বহু উপঢৌকন লইয়া সমাদরপূর্বক পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তর সেবা শুশ্রূষা দ্বারা পিতাকে বশীভূত করিলেন। কুলজ্ঞেরা শুনিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী মুকুন্দ ভাদুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তাঁহারা পরস্পরে বলাবলি করিলেন, তবে চল আমরাও যাই। আমাদিগের একযাত্রায় পৃথক ফল হবে, গঙ্গাস্নান হবে—মুকুন্দ ভাদুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎও হবে। কুলজ্ঞেরা তথায় গিয়া গঙ্গাস্নান তর্পণাদি করিয়া মুকুন্দ ভাদুড়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। শিবশর্মা ভট্টাচার্যের বাটীতে দশদণ্ড পুরাণ পাঠ হইলে পর কুলজ্ঞেরা সভাবন্দনা করিলেন :—

"অমরশ্চ মুকুন্দশ্চ শ্যামঃ কুমুদএবচ।
শিবসিদ্ধান্তবাগীশঃ পঞ্চৈতে পঞ্চদেবতা ॥"

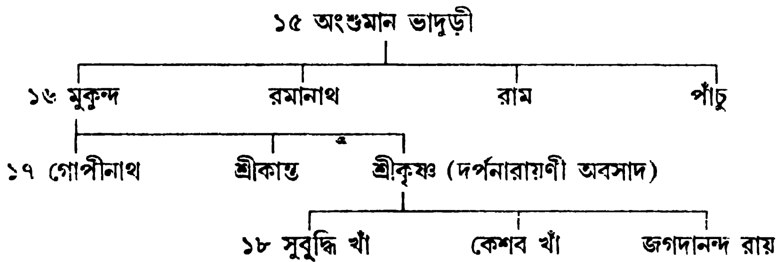
সমস্ত এক শত গাঞি এক দিক একা মুকুন্দ এক দিক। সুতরাং মুকুন্দ গরিষ্ঠ। তোমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীকে আমরা দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তাড়িয়াছি। তুমি যদি শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তুমি যে একশত গাঞির প্রধান, সেই একশত গাঞির প্রধান থাকিবে, আর যদি গ্রহণ কর তোমাতেও দর্পনারায়ণী ঘটিবে।

মুকুন্দ ভাদুড়ী বিবেচনা করিলেন, পুত্র যদি পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আবাল্য অপকার ব্যবস্থা হইবে। আর যদি গ্রহণ করি, তাহা হইলে কালসহকারে নিষ্কৃতি হইবে।

এই বিবেচনা করিয়া মুকুন্দ ভাদুড়ী কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আমার ভক্তপুত্র, দর্পনারায়ণী বুকে পিঠে। সভায় ছিলেন শ্রীগর্ভ ভাদুড়ী, শ্রীগর্ভ সান্যাল ও গঙ্গাধর ভাদুড়ী। কুলজ্ঞেরা সেই তিন কুলীনকে শুনাইয়া বলিলেন, তোমরা শুনিয়া থাকিলে, আজ অবধি মুকুন্দ ভাদুড়ী দর্পনারায়ণীতে বদ্ধ হইলেন।

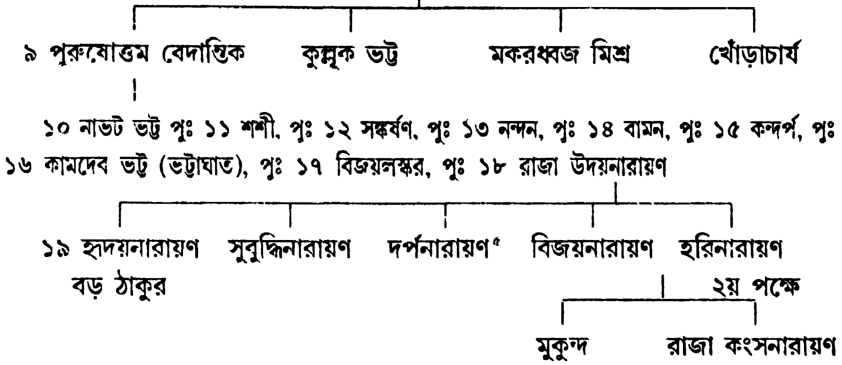
এইরূপে মুকুন্দ ভাদুড়ী দর্পনারায়ণী অবসাদে পড়িলেন। তিনি হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুরের বাটী যাইয়া বলিলেন, মহারাজ! তুমি হিন্দুর শ্রেষ্ঠ, বারেন্দ্রকুলের যূপ, সতেজকে আস্তাড়িলে নিস্তেজ হয়, নিস্তেজকে ভোজন দিলে সতেজ হয়। দর্পনারায়ণ ঠাকুরে জন্মেছে, দর্পনারায়ণী, তাঁহার ঘরে ভোজন করেন শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী ", এজন্য কুলজ্ঞেরা আমাকে দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তাড়িয়াছেন। মহারাজ কুলীন দিয়া করণ করান। এই কালে রাজা করণ কারণ করাইলেন। মুকুন্দে অনন্তে করণ, মুকুন্দে ধ্রুবে করণ, অনন্ত লাহিড়ী ও মুকুন্দ ভাদুড়ীতে করণ। এই সময়ে কুলজ্ঞেরা মুকুন্দ ভাদুড়ীর নিকট গিয়া কহিলেন, মুকুন্দ ভাদুড়ী! তুমি করণ কারণ করিলে, আমাদিগকে বিদায় কর। করণের ব্যাখ্যা শুন। মুকুন্দ ভাদুড়ী উত্তর করিলেন, গজে গজে চৌদণ্ড ভেদন কুলজ্ঞের কি প্রকাশ আছে? কুলজ্ঞেরা কহিলেন, হায়! কুলীন হয়ে কুলজ্ঞের প্রতি এত অহঙ্কার। তোমাকে আজই এমন দাড়ুকা দিই, যে তোমার তিন পুরুষে টানে। কেহ হইলেন স্বপক্ষ, কেহ হইলেন বিপক্ষ। স্বপক্ষে কহিলেন, মুকুন্দে অনন্তে করণ, এই করণে পাইল নিষ্কৃতি। বিপক্ষে কহিলেন, মুকুন্দে দর্পনারায়ণী ও অনন্তে পেয়ারী দোষ, সুতরাং উভয়ের দোষে করণে নিষ্কৃতি হয় নাই। মুকুন্দে ধ্রুবে করণ, এই করণে পাইল নিষ্কৃতি। মুকুন্দে দর্পনারায়ণী, ধ্রুবে ভোজন পেয়ারী। অনন্ত লাহিড়ী ও মুকুন্দ সান্যালে করণে, এই করণ পাইল নিষ্কৃতি। পূর্বে ভেদড়ার পুরন্দর আচার্যের কন্যা নেন চিরঞ্জীব সান্যাল। তাঁহার ঘরে ভোজন করেন মুকুন্দ সান্যাল। যে দোষ ছিল তাহা ভোজনে সংশোধন হইয়াছে। করণে কি উপকার দেখিলে? আগে মুকুন্দ, মুকুন্দ, অনন্ত, ধ্রুব ও দুর্লভ মৈত্র, এই পাঁচকর্তা দর্পনারায়ণী। এই কালে চারিকর্তা বেঁধে চারি দুয়াজিপদ যোগায়। মুকুন্দ বেঁধে গঙ্গাধর বড়, অনন্ত বেঁধে কমল বড়, ধ্রুব বেঁধে লখাই বড়, মুকুন্দ সান্যাল বেঁধে হৃদয় সান্যাল বড়। পূর্বে দুর্লভ বেঁধে মদন বড়। ব্যবস্থা যায় চারি কর্তা বাঁধিয়া চারি দুয়াজি বড় চারি কর্তার তুল্য কর্তার উপকার করিতে পারে, তবে চারি কর্তার পদ পাইবে। এই কালে গঙ্গাধরে ও নিমাই লাহিড়ীতে করণ ব্যবস্থা হয়। মুকুন্দের স্থাপিত নিমাই, তাহাকে পাইয়া গঙ্গাধর কি পদ পাইবে? মুকুন্দের ছত্রভঙ্গের মুকুন্দে রহিল, চারিকর্তার তন্তুরক্ষা। দর্পনারায়ণীর পর ধ্রুবের কুশে মুকুন্দের গঙ্গালাভ। মুকুন্দের পুত্র গোপীনাথ, শ্রীকান্ত ও শ্রীকৃষ্ণ। অকরণে তিনেরই গঙ্গালাভ। গোপীনাথের পুত্র যদুনাথ ও বাণীনাথ। শ্রীকান্তের পুত্র রত্নগর্ভ। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সুবুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ ও জগদানন্দ রায়। হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুরের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ। এই কালে সুবুদ্ধি খাঁ কুলজে হৃদয় সান্যাল সাহসখানী চলাউড়ি, পো উপেক্ষা করি পৌত্র সম্বরণ করি তথাচ বলি, হৃদয় হৃদয় হৃদয়। হৃদয় নাড়াতাল, প্রপৌত্র নাই যে বাড়ে। শ্রোত্রিয় সম্বলিত পাইল মহারাজার ব্রত্তাল। হৃদয় দর্পনারায়ণীর মুদ্দই। হৃদয়ের করণে পাইল নিষ্কৃতি নাহে, পাইল জাগে। এই কালে রাজা কংসনারায়ণ মাদা মোকামে পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিয়া ভাগিনেয় বৈদ্যনাথ তলাপাত্রকে পত্র দিলেন,—ভাগিনেয় সুবুদ্ধি খাঁ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। সুবুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ ও জগদানন্দ রায় তিন ভ্রাতা যাইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি হিন্দুর শ্রেষ্ঠ, বারেন্দ্রকুলের যূপ, সতেজকে আস্তাড়িলে নিস্তেজ হয়,

নিস্তেজকে ভোজন দিলে সতেজ হয়। মহারাজ! আমাদিগকে ভোজন দিলেন না। সেজনদিগের ভগিনী মহারাজের ভাগিনী, অরক্ষণীয়া হইয়াছে, পাত্র দেন ভগিনী সম্প্রদান করি। নতুবা যৎকুৎসিৎ ব্রাহ্মণে সম্প্রদান করিব. তাহাতে মহারাজেরই লজ্জা। এই কালে রাজা কংসনারায়ণ সভা করিয়া কুলীন কুলজ্ঞ লইয়া পরামর্শ করিলেন, সুবুদ্ধি খাঁ প্রভৃতির দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি হয় কিরূপে? কুলজ্ঞেরা ব্যবস্থা করিলেন, মহারাজ হিন্দুর শ্রেষ্ঠ. বারেন্দ্রকুলের যূপ সতেজকে আস্তাড়িলে নিস্তেজ হয়. নিস্তেজকে ভোজন দিলে সতেজ হয়। মহারাজ ভোজন দিয়া করণ করান, তবেই দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি হয়। পূর্বে ছকড়ি পণ্ডিত কন্যা দেন গদাধর-পণ্ডিতকে। গদাধর পণ্ডিত কন্যা দেন রাজা কংসনারায়ণে। রাজা কংসনারায়ণ পরে বিবাহ করেন বসন্ত রায়ের কন্যা। ব্যবস্থা যায়. পূর্ব জোনালি রাম লাহিড়ীতে করণ করিয়া রামবল্লভে জোনালি নিষ্কৃতি ও রামদুর্লভে দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি। বিজয় লস্কর কন্যা দেন বল্লভ চৌধুরীতে, অকরণে বল্লভের গঙ্গালাভ। এই কালে রাজা কংসনারায়ণ ভোজন দেন সুবুদ্ধি খাঁকে। ব্যবস্থা হয়, রাজা দেন-ভোজন. গাইল হইল তরল পাতল, কুলীনের চাই আদর। এই কালে নিরাবিল সান্যালে গণনা যায় কমল. নয়ান. লক্ষ্মণ ও দুর্গাদাস। কমলের পুত্র জ্ঞানগোবিন্দের উপকার করিয়া বড় হবে, অকরণে জ্ঞানের গঙ্গালাভ। রঘুনাথ লখাই বাগ্‌ছীর উপকার করিয়া বড় হবে। সাত সিঁড়ি দিয়া উমানন্দী ধরা পড়িল। দুর্গাদাসে আবদুল-রহমানী। নিরাবিল ছিলেন লক্ষ্মণ সান্যাল। লক্ষ্মণ সান্যালেই এখন নির্ভর, আসে লক্ষ্মণ ভাঙ্গে দর্পনারায়ণী, না আসে লক্ষ্মণ না ভাঙ্গে দর্পনারায়ণী। এই কালে দুই শ্রীগর্ভের দংশিত যাদব বাগ্‌ছী। পূর্বে জগাই ও রাম মজুমদারে করণ। রাম মজুমদারের কন্যা লন জয়রাম মৈত্র। জয়রাম ও গঙ্গাদাস লাহিড়ীতে করণ। গঙ্গাদাসের পুত্র মহেশ। এইকালে যাদব বাগ্‌ছী আর লক্ষ্মণ সান্যালে করণ, লক্ষ্মণ সান্যাল আর মহেশ লাহিড়ীতে করণ, ছাগামার্গে মহেশ লক্ষ্মণের উপকর্তা, সেই লক্ষ্মণ ও সুবুদ্ধি খাঁয়ে করণ—দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি।



শাণ্ডিল্যগোত্র-নন্দনাবাসী

৮ দিবাকর জগৎগুরু

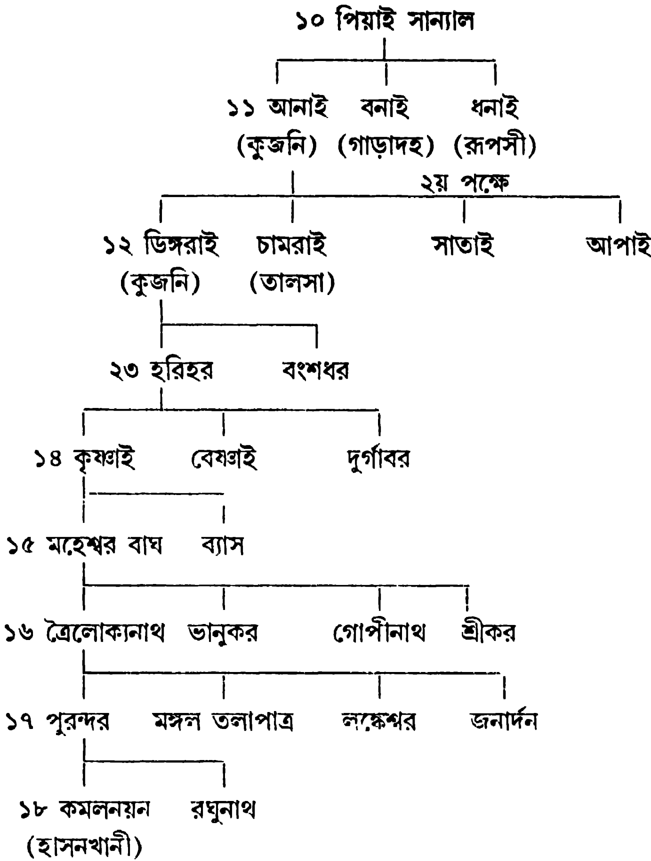


এইকালে দর্পনারায়ণী বাহির দিয়া হিরণ্যগর্ভ চক্রবর্তী, লক্ষ্মণ তলাপাত্র ও শঙ্করাচার্য এই তিন শ্রোত্রিয় অবলম্বনে আদি নিরাবিল পত্তন। হিরণ্যগর্ভ চক্রবর্তী বাণীবল্লভ ভাদুড়ীকে কন্যা দেন, লক্ষ্মণ তলাপাত্র লোকনাথ মৈত্রে কন্যা দেন এবং শঙ্করাচার্য নয়ান সান্যালে কন্যা দেন। বাণীবল্লভ ভাদুড়ী ও মধু সান্যালে করণ। তাহার পর নয়ানে নয়ানে করণ, নয়ানে লোকনাথে করণ, লোকনাথ ও রামনাথে করণ, নয়ানে বিষ্ণুদাসে করণ, নয়ানে বাণীবল্লভ ভাদুড়ীতে করণ।

"অষ্ট অষ্টকুলের রমানাথ গণি। মৈত্রে লোকনাথ ভাদুড়ীতে বাণী।
সান্যালে নয়ান বিষ্ণুদাস লাহিড়ী। দ্বিজরাজ নয়ান নয়ান লাহিড়ী ॥"

৪০। হাসনখানী অবসাদ—কমলনয়ন সান্যালে

হাসন খাঁর সোয়ারে কমলনয়ন সান্যালকে বিদ্রূপ করিয়াছিল। কমলনয়নের ঘরে ভোজন করেন শ্রীমন্ত সান্যাল। শ্রীমন্ত ও মুকুন্দ ভাদুড়ীতে করণ, এই কারণে মুকুন্দ ভাদুড়ী হাসনখানীর ছিটা। কমলনয়ন সান্যাল ও বাণীবিলাস মৈত্রে করণ—হাসনখানী নিষ্কৃতি।



৪১। উমানন্দী অবসাদ—সুবুদ্ধি খাঁ ভাদুড়ীতে

উমানন্দ চৌধুরী কালিয়াই ও শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীতে করণ। এই শ্রীকৃষ্ণ গজাইর বংশ। পরে সুবুদ্ধি খাঁ বিবাহ করেন জীবনসুবুদ্ধি রায়ের কন্যা। জীবনসুবুদ্ধি রায়ের এক কন্যা লন গোপীকান্ত চতুর্মুখ, অপর কন্যা লন শূলপাণি আচার্য লাহিড়ী, এই কারণে গোপীকান্ত চতুর্মুখ ও শূলপাণি আচার্য লাহিড়ী উভয়ে উমানন্দীর ছিটা। পরে সুবুদ্ধি খাঁ ও লক্ষ্মণ সান্যালে করণ —উমানন্দী নিষ্কৃতি।

(৩৯ দর্পনারায়ণী অবসাদে বংশলতা দ্রষ্টব্য।)

৪২। খোজাম্বরী অবসাদ—গোপীনাথ বাগ্‌ছীতে

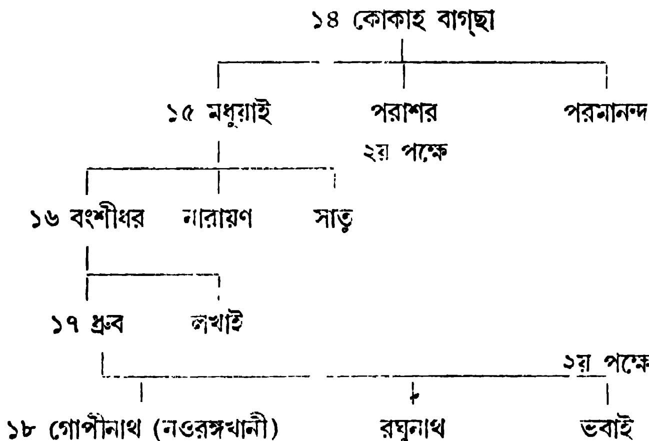
জগদানন্দ রায়ের কন্যা গোপীনাথ বাগ্‌ছীর পত্নী, তাহাকে দেখিয়াছিল খোজাম্বর খাঁ পাতশা। সেই গোপীনাথ বাগ্‌ছীর ঘরে ভোজন করেন জগদানন্দ রায়, জগদানন্দ রায় বিবাহ করেন জীবন সুবুদ্ধি রায়ের এক কন্যা, পরে জীবন সুবুদ্ধি রায়ের আর এক কন্যা লন সুবুদ্ধি খাঁ ভাদুড়ী। এই কারণে সুবুদ্ধি খাঁ ভাদুড়ী খোজাম্বরীর ছিটা। জগদানন্দ রায়ের

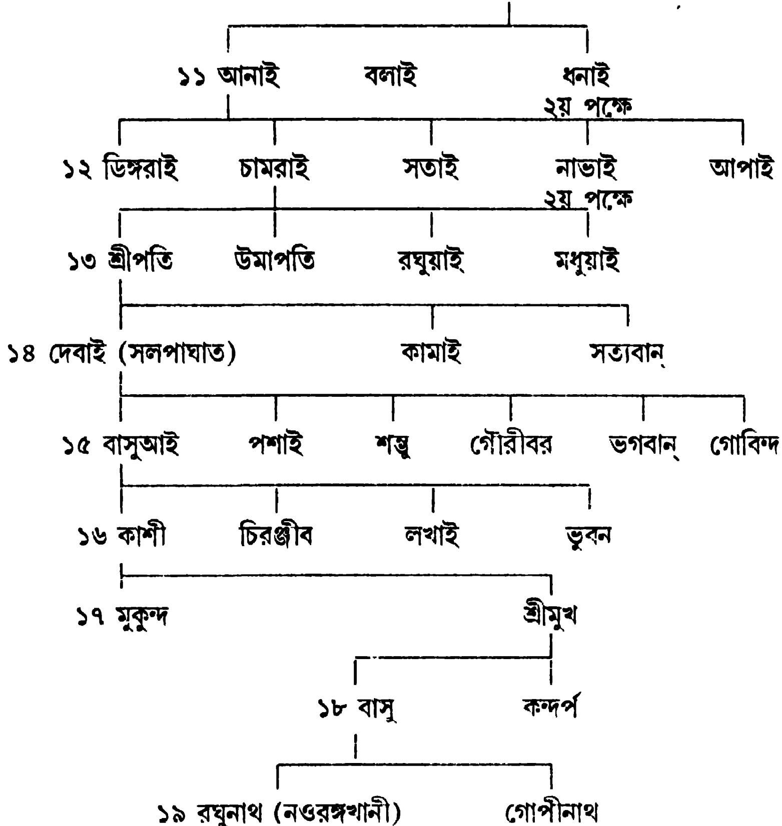
পুত্র রাজবল্লভ রায় ও গোপীনাথ বাগ্‌ছীতে করণ, তৎপরে গোপীনাথ ও কেশব খাঁর করণ—খোজাম্বরী নিকৃতি।

৪৩। নওরঙ্গখানী অবসাদ—গোপীনাথ বাগ্‌ছীতে

খোজাম্বার খাঁর পাত্‌সাব দেওয়ান জগদানন্দ রায় ভাদুড়ী। খোজাম্বার খাঁর পুত্র নওরঙ্গ খাঁ। সেই নওরঙ্গ খাঁর কন্যা হাওয়াখানাতে গিয়াছিল, দৈবাৎ জগদানন্দ রায়ের জামাতা গোপীনাথ বাগ্‌ছী সেই হাওয়াখানাতে তামাসা দেখিতে গিয়াছিলেন। নওরঙ্গ খাঁর কন্যা গোপীনাথ বাগ্‌ছীকে দেখিয়া কহিল, 'আও আও মেরা দাওয়ানকো দামাজ।' এই বলিয়া সরাপ খাইয়া মত্ত হইয়া গোপীনাথ বাগ্‌ছীর গলা ধরিল। তাহাতে দ্বারকানাথ বাগ্‌ছী ধরিতে গিয়াছিল। নবাবী সওয়ারে তলোয়ারে তাহাকে ওয়ার করিল। ইহাতে দ্বারকা গেল কাটা। সেই গোপীনাথ বাগ্‌ছীর ঘরে ভোজন করেন ভারতীনাথ বাগ্‌ছী, তারপর হাতিয়াগড়-ছত্রভোগের বাণী দালালের কন্যা লন ভারতীনাথ বাগ্‌ছী, আর কন্যা লন বাসাই লাহিড়ী। তারপর সুবুদ্ধি খাঁ, গৌরীকান্ত ও দামোদর এই তিন কর্তা ভারতীনাথ বাগ্‌ছীতে করণ করেন। ভারতীনাথ বাড়ে না একারণে সুবুদ্ধি খাঁ, দামোদর ও গৌরীকান্ত তিন কর্তা নওরঙ্গখানীর ছিটা। পরে গোপীনাথ বাগ্‌ছী ও জগদানন্দ রায়ে করণ—নওরঙ্গখানী নিকৃতি।

নওরঙ্গখানী সম্বন্ধে এরূপও লিখিত আছে—সর্বদ্বারী পৃথ্বীধর চৌধুরীর কন্যা লন গৌরীকান্ত সান্যাল। উপকার ব্যবস্থা যায় সান্যালে। গোপীনাথ বাগ্‌ছী আর গৌরীকান্ত সান্যালে করণ। গোপীনাথ যে কিছু ধন পণ পাইলেন, তাহা আপনি লইলেন। কুলজ্ঞেরা জগদানন্দ রায়ের নিকট ভেদ জন্মাইলেন, রায় মহাশয়! তোমার জামাতা গোপীনাথ বাগ্‌ছী নওরঙ্গখানী থাকিয়া গৌরীকান্ত সান্যালের উপকার করে, তোমার অপেক্ষা রাখে না। দোষে দোষে হইল করণ। উপকার না দেখে পরে ব্যবস্থা যায় জগদানন্দ রায়ে। জগদানন্দ রায় ও গৌরীকান্ত সান্যালে করণ—নওরঙ্গখানী নিকৃতি।



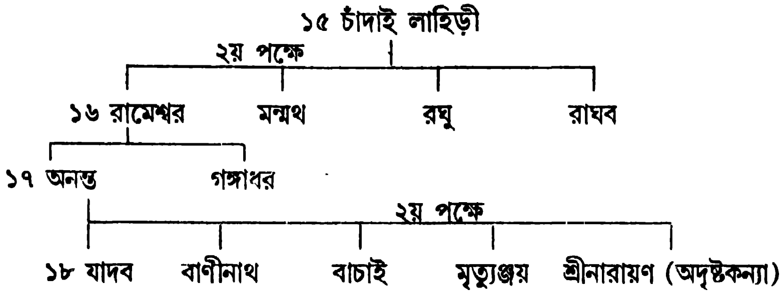


নওরঙ্গখানী সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে এরূপও লিখিত আছে—এক মুসলমান নিগ্রহ করিয়াছিল সুন্দর সমাদ্দারকে। সুন্দর সমাদ্দারের কন্যা লন রঘুনাথ সান্যাল। রঘুনাথ ও লখাই বাগ্‌ছীতে করণ। লখাই বাগ্‌ছীর ঘরে ভোজন করেন নয়ান বাগ্‌ছী। নয়ান বাগ্‌ছী ও কৃষ্ণানন্দ মৈত্রে করণ। তাহাতে কৃষ্ণানন্দ মৈত্র নওরঙ্গখানীর ছিটা। পরে লখাই বাগ্‌ছী ও গোবিন্দ মৈত্রে করণ—নওরঙ্গখানী নিষ্কৃতি।

৪৪। অদৃষ্টকন্যা—মৃত্যুঞ্জয় লাহিড়ীতে

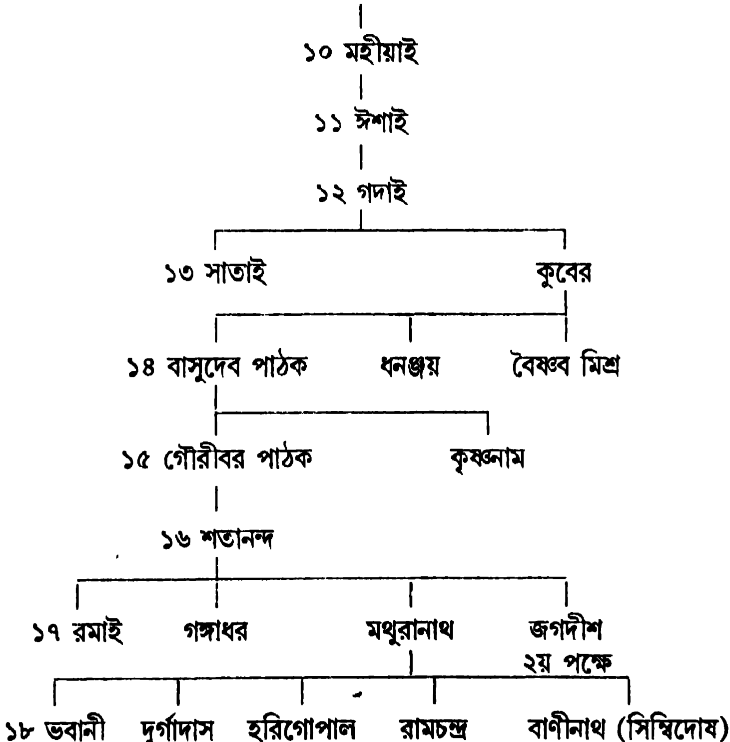
মৃত্যুঞ্জয় লাহিড়ী বর্তমানে তাহার পুত্র হরিদেব লাহিড়ী অদৃষ্ট-ভগিনী দেন অনন্ত লাহিড়ীর পুত্র হরিদেব লাহিড়ীকে, হরিদেবের ঘরে ভোজন করেন হরিনারায়ণ ভাদুড়ী. এই কারণে হরিনারায়ণ ভাদুড়ী অদৃষ্টকন্যার ছিটা। তৎপরে যদুনাথ ভাদুড়ী ও মৃত্যুঞ্জয় লাহিড়ী উপকর্তা।

(কামিনী আঘাতে পূর্ববংশ দ্রষ্টব্য)



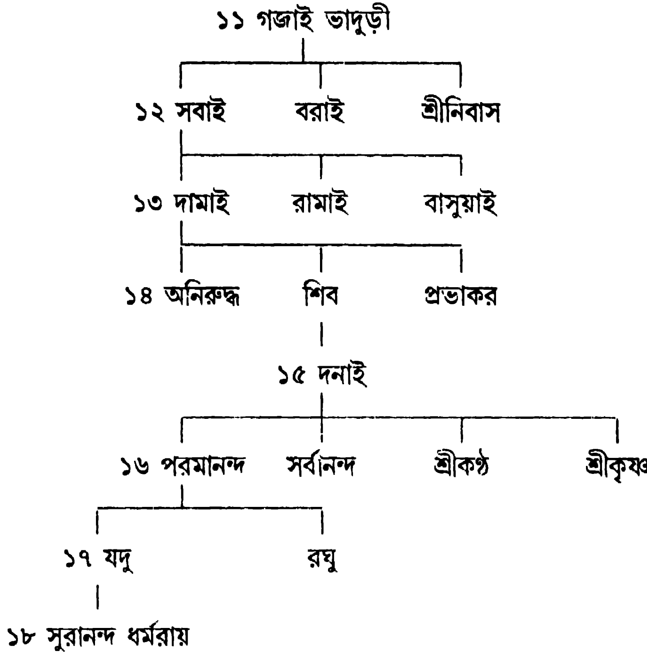
৪৫। সিম্বিদোষ—পুখুরিয়ার বাণীনাথ রায়চৌধুরী সান্যালে

চণ্ডীদাস সিম্বির কন্যা লন বাণীনাথ চৌধুরী সান্যাল, অকরণে বাণীনাথের গঙ্গালাভ, বাণীনাথের পুত্র রতিনাথ, রতিনাথের প্রথম পক্ষের পুত্র জয়নারায়ণ, ২য় পক্ষে রামকৃষ্ণ তলাপাত্র। রামকৃষ্ণ তলাপাত্রের ঘরে ভোজন করেন জগাই সান্যাল। জগাই সান্যালের ঘরে ভোজন করেন নারায়ণ সান্যাল। এই কারণে নারায়ণ সান্যাল সিম্বির ছিটা। পরে রামকৃষ্ণ তলাপাত্র সান্যাল (পুখুরিয়া) ও রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ —সিম্বিদোষ নিষ্কৃতি।



৪৬। চাঁদি অবসাদ—সুরানন্দ ধর্মরায় ভাদুড়ীতে

বারখাদার চাঁদাইর ঘরে নারায়ণ উপাধ্যায় ভোজন করেন। নারায়ণ উপাধ্যায়ের কন্যা লন ত্রিপুরারি তলাপাত্র, ত্রিপুরারির কন্যা লন সুরানন্দ ধর্মরায় ভাদুড়ী। তাঁহার ঘরে ভোজন করেন পরমানন্দ ভাদুড়ী। এরূপে পরমানন্দ ভাদুড়ী চাঁদির ছিটা। পরে সুরানন্দ ধর্মরায় ও কমল লাহিড়ীতে করণ—চাঁদি নিষ্কৃতি।



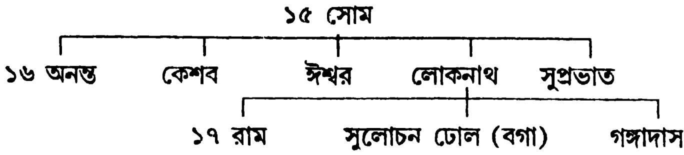
৪৭। বগা অবসাদ—সুলোচন ঢোলে

মাঙ্গুলি ধর্ম খাঁর পিতা ধোপ কাপড় পরিয়া বহির্দেশে গিয়াছিলেন। মাঙ্গুলি ধর্ম খাঁ বক তাবিয়া তীর মারিলেন, তাহাতে তাঁহার পিতার প্রাণ বাহির হইল।

"মাঙ্গুলী ধর্ম খাঁ বড় পুণ্যবান্।
পিতা মেরে গাইল তার বগা হইল নাম ॥"

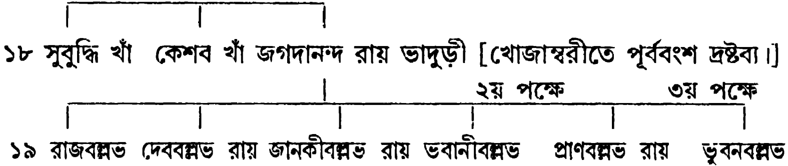
মাঙ্গুলি ধর্ম খাঁর এক কন্যা লন সুলোচন ঢোল, আর কন্যা লন পুরুষোত্তম সান্যাল। সুলোচন ঢোল ও বল্লভ চৌধুরীতে করণ। পরে বল্লভ চৌধুরীর গঙ্গালাভ। বল্লভ ভাতিঝি বৈদ্যনাথ তলাপাত্রে উৎসর্গ করেন, তলাপাত্রের ঘরে ভোজন করেন হরিবল্লভ চৌধুরী। হরিবল্লভের ঘরে ভোজন করেন গোপীবল্লভ মৈত্র। এই কারণে গোপীবল্লভ মৈত্র বগার ছিটা। পরে বিশ্বনাথ মৈত্র ও কৃষ্ণদাস লাহিড়ীতে করণ, কৃষ্ণদাস লাহিড়ী ও জনার্দন খাঁয়ে করণ—বগা-নিষ্কৃতি।

(সাদেখানীর কামাইর বংশ দ্রষ্টব্য)



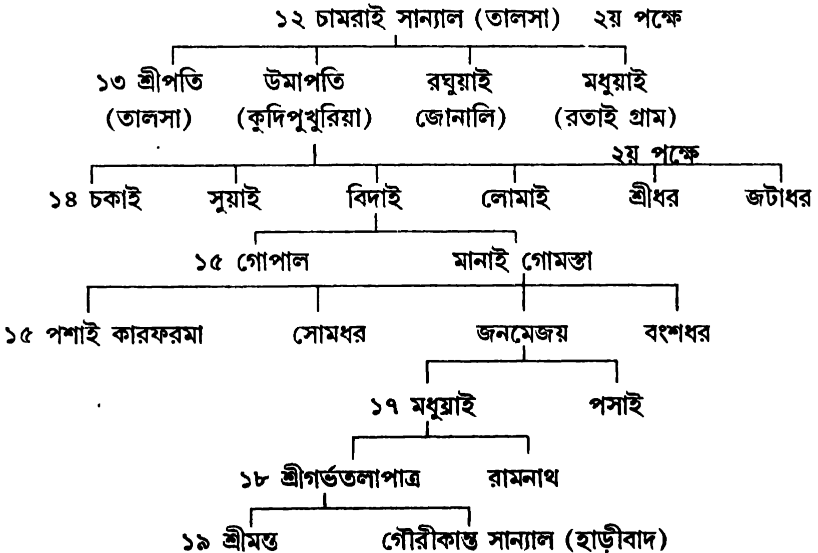
৪৮। রোহেলা অবসাদ—প্রচণ্ড খাঁতে

প্রচণ্ড খাঁ বিবাহ করেন রোহেলার বিশ্বনাথ পাঠকের কন্যা। প্রচণ্ড খাঁর পুত্র চাঁদ রায়, হরিরাম রায় ও রাম রায়। চাঁদ রায়ের কন্যা লন প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়ী, প্রাণবল্লভ ও দুর্গাদাস সান্যালে করণ, দুর্গাদাসের ঘরে ভোজন করেন রাজবল্লভ রায়, রাজবল্লভের ঘরে ভোজন করেন কেশব খাঁ, এই কারণে কেশব খাঁ রোহেলার ছিটা। পরে কৃষ্ণদাস লাহিড়ী ও জনার্দন খাঁয়ে করণ—রোহেলা নিষ্কৃতি।[৬]



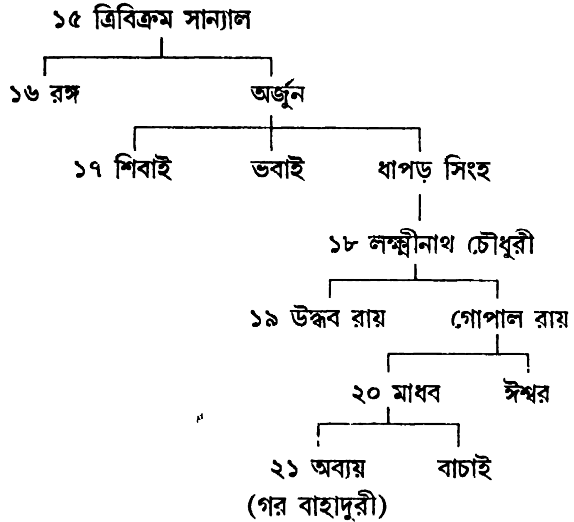
৪৯। হাড়ীবাদ—কুদিপুখুরিয়ার গৌরাকান্ত সান্যালে

মিশ্রসিংহ সাধু বাগছীর পুত্র যাদব বিদ্যাভূষণ চক্রবর্তী তাহাতে হাড়ীবাদ। সেই বিদ্যাভূষণ চক্রবর্তীর কন্যা লন সুরানন্দ ধর্মরায় কালিহাই। সুরানন্দ ধর্মরায় ও কমল লাহিড়ীতে করণ, কমলের ঘরে ভোজন করেন রাঘব লাহিড়ী, এই রাঘব রঘুপতির বংশ। রাঘব লাহিড়ী ও গৌরীকান্ত সান্যালে করণ, এই কারণে গৌরীকান্ত সান্যাল হাড়ীবাদের ছিটা। পরে কমল লাহিড়ী ও শিবানন্দ সান্যালের করণ—হাড়ীবাদ নিষ্কৃতি।



৫০। গরবাহাদুরী অবসাদ—চাম্‌টার অব্যয় সান্যালে

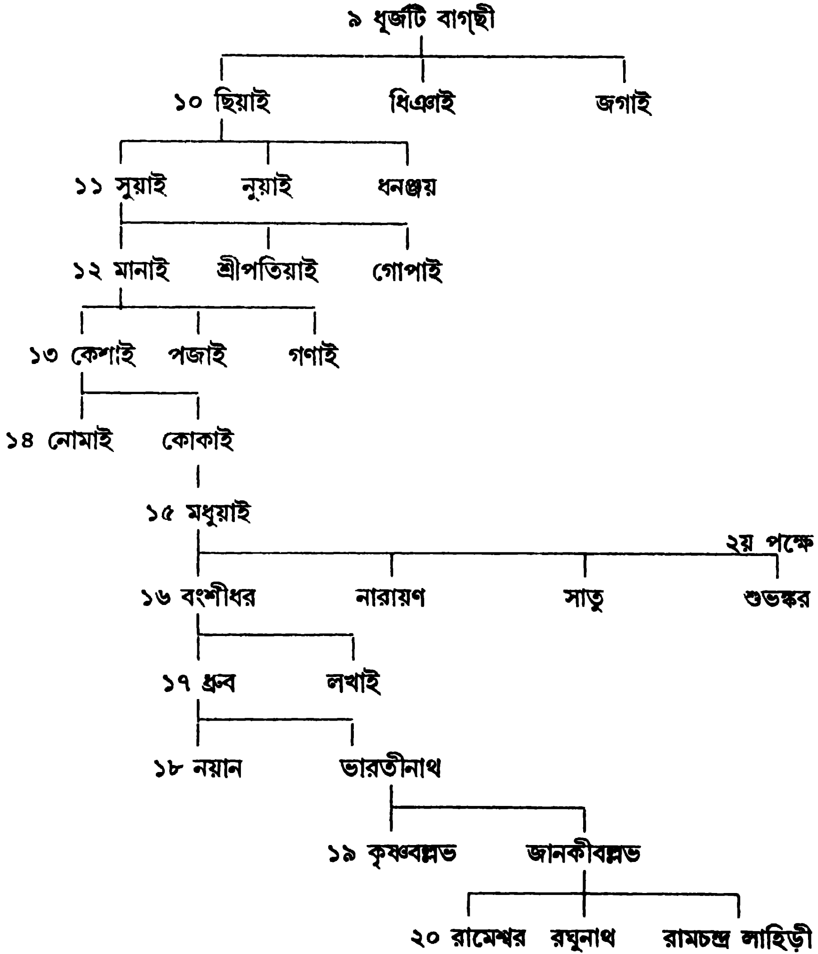
গরবাহাদুর খাঁর পুত্র জোর করিয়া অব্যয় সান্যালকে দিয়া খানা বহিয়া আনাইয়াছিল। অব্যয় সান্যালের ঘরে ভোজন করেন শ্রীবর সান্যাল, শ্রীবরের ঘরে ভোজন করেন প্রদ্যুম্ন সান্যাল, এই কারণে প্রদ্যুম্ন সান্যাল গরবাহাদুরের ছিটা। তৎপরে মুকুন্দ ভাদুড়ী অব্যয় সান্যালের উপকর্তা,—গর বাহাদুরী নিষ্কৃতি।



৫১। সাধকনামা দোষ (ভবানীপুর)—রামচন্দ্র বাগ্‌ছীতে

মথুরেশ চক্রবর্তী ভবানীপুরের কালীমাতার পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে পূজারীর কাজ অতি নিন্দিত। মথুরেশ চক্রবর্তী রামচন্দ্র বাগ্‌ছীর পুত্রকে কন্যা দান করেন। কুলজ্ঞেরা চক্রবর্তীকে কহিলেন, চক্রবর্তী! তুমি কুলকার্য করিলে আমাদিগকে বিদায় কর। চক্রবর্তী কহিলেন, আমি দেবদ্বারে থাকি, তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিব। ইহা কহিয়া ঠাকুরানীর নির্মাল্য দিলেন। কুলজ্ঞেরা বিদায় হইয়া গেলেন। মথুরেশ চক্রবর্তী কষ্ট শ্রোত্রিয়, রামচন্দ্র বাগ্‌ছী কুলীনদিগের মত না লইয়া তাঁহার কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। সদানন্দ চৌধুরী লাহিড়ী কুলীনদিগের মধ্যে প্রধান, তিনি পুত্রকে পাঠাইয়া কুলজ্ঞদিগকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি বিদায় পাইলেন। তাঁহারা কহিলেন, আমরা ঠাকুরানীর নির্মাল্য পাইয়া বিদায় হইয়াছি। চৌধুরী কহিলেন, আমি বিদায় করিব, আপনারা কুলীন সহিত আস্তাড়িত করুন। চৌধুরী বিদায় করিলেন, কুলজ্ঞেরা রামচন্দ্র বাগ্‌ছী ও মথুরেশকে সাধকনামা দোষ ও ভবানীপুর গ্রামনামা অবসাদ দিয়া আস্তাড়িলেন। রামচন্দ্র বাগ্‌ছী ভবানীপুরীতে চৌদ্দ বৎসর আবদ্ধ থাকেন। তাঁহার বাটীতে পক্ষী সঞ্চরণ করে না, ফকির, বৈষ্ণব ভিক্ষার্থ গমন করে না। চৌদ্দ বৎসর পরে একদিন দ্বারকা মৈত্র ভিক্ষায় গমন করিলেন। রামচন্দ্র দ্বারকা মৈত্রকে ধরিয়া রাখিয়া করণ করেন। দ্বারকায় রামচন্দ্রে করণ, তাহাতেও গাইল নিষ্কৃতি হইল না। পরে কামদেব ভাদুড়ী

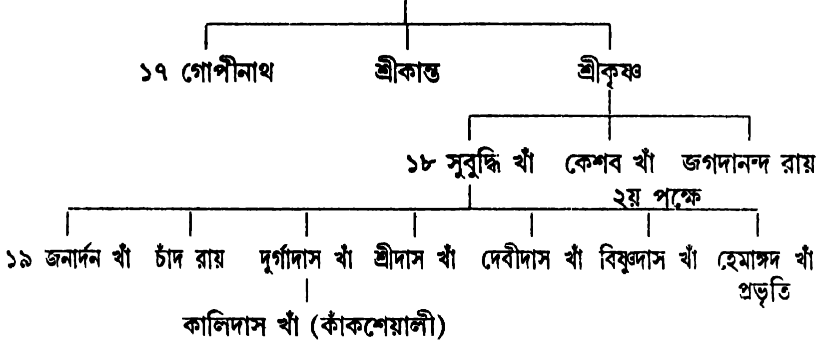
ভবানীপুরী নিষ্কৃতির জন্য রামচন্দ্র ঠাকুরের নিকট গিয়া কহিলেন যে, মহাশয় আমরা দর্পনারায়ণীর বাহির। আপনি আমাদিগের অবলম্বন থাকিয়া করণ কারণ করাইয়া ভবানীপুরী নিষ্কৃতি করুন। রামচন্দ্র ঠাকুর আশ্রয় থাকিয়া করণ করাইয়া ভবানীপুরী নিষ্কৃতি করেন। গাইলেন নাম ভবানীপুরী, একারণে পরে পটী হইল ভবানীপুরী।[৭]



৫২। কাঁকশেয়ালি অবসাদ—কালিদাস খাঁ ভাদুড়ীতে

কাঁকশেয়ালির জগন্নাথ তালুকদার প্রথমে এক-পৌত্রী দেন কালিদাস খাঁকে, তৎপশ্চাৎ কন্যা দেন বিষ্ণু বাগ্‌ছীর পুত্রে, অপর পৌত্রী দেন কৃষ্ণদাস লাহিড়ীর পুত্রে। বিষ্ণু বাগ্‌ছীর ঘরে ভোজন করেন শুভরাম খাঁ, এই কারণে শুভরাম খাঁ কাঁকশেয়ালির ছিটা। পরে কালিদাস খাঁ ও বশিষ্ঠ সান্যালে করণ; বিষ্ণু বাগ্‌ছী ও অভিরাম খাঁয়ে করণ—কাঁকশেয়ালি

কালিদাস খাঁর পূর্ব্ববংশ



৫৩। ওরাখানী অবসাদ—চাম্‌টা সমাজের রামানন্দ সান্যালে

ওরা খাঁর সোয়ারে বিরূপ করিয়াছিল গাদু সিংহ খাঁকে। গাদুর পৌত্রী লন ভোলানাথ রায়, ভোলানাথের কন্যা লন জয়নারায়ণ চৌধুরী, জয়নারায়ণের কন্যা লন রামানন্দ সান্যাল, এই কারণে রামানন্দ সান্যাল ওরা খানীর ছিটা। রামানন্দ সান্যাল ও রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ—ওরা খানী নিষ্কৃতি।

৬৮টি অবসাদ বা দোষের মধ্যে উপরে ৫৩টির বিবরণ লিখিত হইল। পরবর্তী অধ্যায়ে পটীর বিবরণী মধ্যে সুজাখানী, সাহসখানী, দেশাবাদ ও কিংবদন্তী এই চারিটি অবসাদ প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত হইয়াছে, এ কারণে এ স্থলে আর তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না। অপর অবসাদগুলির মধ্যে কয়েকটিতে নিতান্ত কুৎসা ও গ্লানিজনক কথা স্থান পাইয়াছে ও অপর কয়টির বিবরণ নিতান্ত অস্পষ্ট ও পূর্বাপর সামঞ্জস্য রহিত, এ কারণে তদ্বিবরণও পরিত্যক্ত হইল।

১. বারেন্দ্রকুলগ্রন্থ 'নিগূঢ়কল্পে' যেরূপ ভাষায় অবসাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, অবসাদের পরিচয় প্রসঙ্গে অনেকটা সেই ভাষাই রক্ষিত হইল।
২. ৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৩. ৭৯ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ দ্রষ্টব্য।
৪. "শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর ঘরে ভোজন করেন পাঁচু ভাদুড়ী, এই হেতু পাঁচু ভাদুড়ীতে দর্পনারায়ণীর ছিটা।" কুলগ্রন্থান্তরে এইরূপ আছে।
৫. আধুনিক কুলগ্রন্থে ও কুলশাস্ত্র দীপিকায় রাজা উদনারায়ণের পুত্র হৃদয়নারায়ণ, তৎপুত্র দর্পনারায়ণ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মাঝগাঁ ও ভারেঙ্গার কুলজ্ঞদিগের হস্তলিখিত শতাধিকবর্ষের প্রাচীন কুলগ্রন্থ সমূহে রাজা উদয়নারায়ণের ৫ পুত্র—হৃদয়নারায়ণ, সুবুদ্ধিনারায়ণ, দর্পনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ ও রাজা হরিনারায়ণ এইরূপ লিখিত ইহাই প্রকৃত পাঠ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।
৬. নবম অধ্যায়ে রোহেলাপটীর ইতিহাস দ্রষ্টব্য।
৭. পটীর প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

নবম অধ্যায়

পটীর বিবরণ

পূর্বে দর্পনারায়ণী অবসাদ-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, দর্পনারায়ণী হইতেই কুলীনদিগের মধ্যে 'পটীর' সূত্রপাত। পটীর বৃত্তান্ত সবিস্তারে লিখিতে গেলে, বারেন্দ্র কুলীনদিগের এবং শ্রোত্রিয়গণের অনেক কুৎসা আসিয়া পড়ে, কিন্তু গৌড়ের মুসলমান রাজকর্মচারী ও সৈন্যগণ হিন্দুদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন, বিশেষত আধুনিক শিক্ষিত সমাজে পূর্বোক্ত দোষগুলি গণ্য নহে বিবেচনা করিয়া পটীর বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল।

উদয়নাচার্য ভাদুড়ী পরিবর্ত ও তিলক দান ব্যতীত আরও বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া যান যে, কুলীনে কুলীনে সম্বন্ধ না হইয়া কুলীনেরা অপরের সহিত আদান-প্রদান করিলে কুলপাত হইবে। সে সময়ে কুলীন নামই ছিল, কিন্তু পটীর উৎপত্তি হয় নাই। পূর্বেই লিখিয়াছি, মুসলমান রাজত্বকালে নানা কারণে নানা প্রকার দোষস্পর্শে, সেই সকল দোষ অন্য ব্যক্তির দ্বারা সংসৃষ্ট হওয়াতে দোষহীন কুলীনেরা দোষীদিগের সহিত আহার ও আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া দেন। পূর্বোক্ত দোষী কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণ যে যে দোষে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সে সকল দোষ হইতেই পটী বা ভিন্ন ভিন্ন থাকের উৎপত্তি হইয়াছিল। নির্দোষ ব্যক্তিগণও দলবদ্ধ হইয়া নির্দোষ বা নিরাবিল নামে পটী করিয়াছিলেন। তৎকালে দোষী ও নির্দোষ বারেন্দ্র বিপ্রগণের মধ্যে এইরূপ পরস্পর অনৈক্য ও ঈর্ষায় সমাজ ভঙ্গের সূত্রপাত হইয়াছিল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে ভিন্ন ভিন্ন নির্দোষ ও দোষী কুলীনগণ দলবদ্ধ হইয়া যেমন এক একটি মেলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আঘাতের কুলীন যাঁহারা আর নিষ্কৃতি পান নাই, তাঁহাদিগকে লইয়া কাপ এবং ভিন্ন ভিন্ন অবসাদের কুলীনগণ বিভিন্ন দলবদ্ধ হইয়া আটটি পটীর সৃষ্টি করিলেন। এই আট পটীর নাম —

১ আদি নিরাবিল পটী (আদি নিরাবিলের অন্তর্গত ভবানীপুর), ২ ভূষণা, ৩ রোহেলা, ৪ নিরাবিল ৫ বেণী ৬ আলেখানী ৭ জোনালী ৮ কুতবখানী।

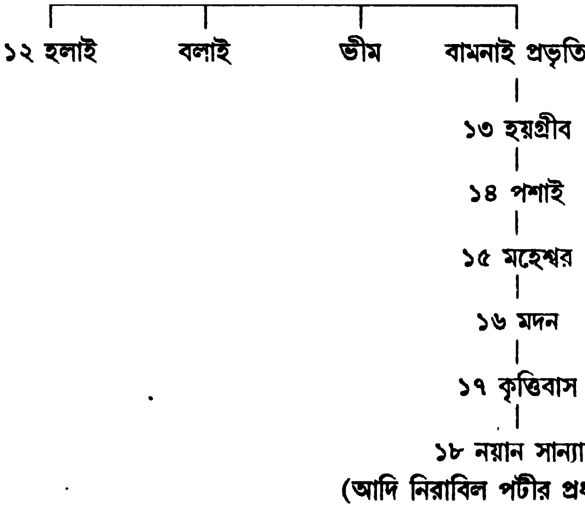
আদি নিরাবিল

পূর্বকালে কোন ব্যক্তির সাংসারিক বা কুল সম্বন্ধে কোন দোষস্পর্শ হইলেই সে সমাজে পতিত হইত। দর্পনারায়ণী-অবসাদ-মধ্যে যে যে কুলীন থাকিলেন, তাঁহারা দোষগ্রস্ত। এই জন্য বাণীবল্লভ ভাদুড়ী প্রভৃতি কুলীনগণ এবং হিরণ্যগর্ভ চক্রবর্তী, লক্ষ্মণ তলাপাত্র ও শঙ্কর আচার্য এই তিন জন শ্রোত্রিয় লইয়া করণ-কারণ করিয়া আদি নিরাবিল পটী সৃষ্টি করিলেন। ইহাদিগের মধ্যে কোন দোষ ছিল না। হিরণ্যগর্ভ চক্রবর্তী কন্যা দেন বাণীবল্লভ চক্রবর্তীকে, লক্ষ্মণ তলাপাত্র কন্যা দেন নয়ান সান্যালে এবং শঙ্করাচার্য গোবিন্দ

মৈত্রে কন্যা দান করিয়াছিলেন। তারপর করণ-কারণ। নয়ানে নয়ানে করণ, নয়ানে লোকনাথে করণ, লোকনাথে রমানাথে করণ, নয়ানে বিষ্ণুদাসে করণ, নয়ানে বাণীবল্লভ ভাদুড়ীতে করণ। এ সম্বন্ধে কুলজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন—

"অষ্ট অষ্ট কুলে রমানাথ গণি।
ভাদুড়ীতে লোকনাথ সান্যালে বাণী ॥
নয়ানে বিষ্ণুদাস বিষ্ণুদাস নয়ান ॥"

ভাদুড়ীকুলে বাণীবল্লভ ও সান্যালকুলে বাণীনাথ, ভাদুড়ীকুলে নয়ান ও মৈত্র নয়ান, মৈত্রকুলে রমানাথ, লাহিড়ীকুলে বিষ্ণুদাস, ভাদুড়ীকুলে লোকনাথ ও লাহিড়ীকুলে দ্বিজরাজ এই ৮জন মিলিয়া 'আদি নিরাবিল' পত্তন করেন।



রোহিলা পটী

তারাগুণ নামক গ্রামে বাৎস্য গোত্রীয় সান্যাল হরিহর আচার্যের পুত্র গৌরী রায় ও প্রচণ্ড খাঁ। প্রচণ্ড খাঁ নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। নবাব তাঁহাকে রোহিলখণ্ডে প্রেরণ করেন, তিনি রোহিলখণ্ডে গিয়া প্রাচীন বয়সে বিশ্বনাথ পাঠকের কন্যা বিবাহ করিয়া পত্নীসহ দেশে আসিয়া ঐ বিবাহিত পত্নীর পাকস্পর্শ উপলক্ষে জ্ঞাতিকুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান। পাকস্পর্শের সময় ঐ কন্যা বলিয়া ফেলে, 'কো মানি কো গরমানি কো পাতৃমে দেগা বড়া পরমানি।' এই কথা শুনিয়া কন্যার রোহিলখণ্ডে জন্মের বিষয় অবগত হইয়া উপস্থিত সকলেই আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন ও প্রচণ্ড রায়কে রোহিলাদোষী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই বিষয়ে কুলজ্ঞেরা ভুবননন্দের ঢাকুর হইতেও কবিতা উল্লেখ করিয়া থাকেন,—

'তারাগুণ নাম নগরবাসী।
গৌরীচরণ রায় কুলাভিলাষী ॥
উলট উত্তম পুরুষ নামে।
তনয়া সনয়া দিলা সুধামে ॥
ভাদুড়ী কুলীন কুলীন সারে।
কুলজ্ঞ ভুবন ভণে ঢাকুরে ॥
তাহার অনুজ মনুজরাজ।
প্রচণ্ড রায়ের প্রচণ্ড কাজ ॥
হরি রাম চাঁদ তাঁহার সুত।
প্রথম বনিতা বিনাশ জাত ॥
দ্বিতীয়া মহিলা রোহিলা দেশে।
প্রচণ্ড করিলা বয়স শেষে ॥
পরে ঘরে আসি দেখিলা রায়।
চাঁদ কান্দ কান্দ দুহিতা তায় ॥
বল্লভ ভাদুড়ী ভাদুড়ী সারে।
সুতসুতা রায়ে প্রদান করে।
করণ কারণ করিয়া হেলা।
বার্বকাবাদে বল্লভ গেলা ॥
শুনগো শুনগো কুলজ্ঞ মিলা।
আস্তাড়িল তারে রোহিলা বোল্যা ॥
পুন তারাগুণ ভাদুড়ী রায়।
আসি কান্দ চাঁদ সভায় ॥
ছলে বলে তার পিতার দোষে।
রোহিলা বলিয়া কুলজ্ঞ ঘোষে ॥
করণ করিব কুলজ্ঞ আন।
বিহিত বিবিধ বিতর ধন ॥
প্রচণ্ড কহিলা শ্রীদুর্গাদাসে।
শুনি সঞ্জামিনী কাঁপে তরাসে ॥
শুনিয়া বলিলা কুলজ্ঞ বিনা।
করণ কারণ, হয় তা জানি না ॥
শুভ ফল নহে জানিয়া রায়।
ধরিয়া করণ করান তায় ॥
সাহসে হইলে হইত ভাল।
ধরিয়া করণে গালি জাগিল ॥
সাহস নহিল রহিল গালি।
শীতাংশুকে যেন লাগিল কালি ॥
শুনিয়া করণ কুলজ্ঞ রোষে।
'রোহিলা' 'রোহিলা' বলিয়া ঘোষে ॥

শ্রীবাণী বাগ্‌ছী শ্রীদুর্গাদাসে।
করণ হইল ভয় সাহসে ॥
অবসাদে রায় দুর্গাদাসে।
লীলা সম্বরিলা বালির কুশে ॥
সঞ্জামিনীসুত শ্রীনারায়ণ।
শ্রীরামভদ্র দ্বিতীয়া পুনঃ ॥
নারায়ণ সান্যাল কেশব খাঁরে।
বিনয়ে বলিলা কুলীন সারে ॥
মাদা নামধাম শঙ্কর সম।
বিরাজিত তুমি শ্বশুর মম ॥
অবসাদ অম্বরি বিশেষ বজালে।
কুলীন যে ছিলাম গণ্য মান্য কুলে ॥
সম নিধি দশ করণ করি।
সম্বরি অম্বরি বিশাল হরি ॥
ভুবন কুলজ্ঞ ঢাকুরে কয়।
আর কি সম্বরি বিষের ঘায় ॥
সভাস্থিত কুলীন দেহ।
রোহিলা নিষ্কৃতি করণ কহ ॥
এসব কুলীন কেশব খাঁয়ের বশ।
গোপীনাথ শিব রাম রমেশ ॥
এসব কুলীনে কেশব বলে।
আসিয়া হাসিয়া রোহিলায় মিলে ॥
সঞ্জামিনী গাঞি শ্রীনারায়ণে।
গোপীনাথ আসি মিলে করণে ॥
পুনঃ গোপীনাথ বাগ্‌ছী সনে।
শিবরাম সান্যাল সম করণে ॥
পুনঃ শিবরাম সান্যাল কুলে।
রমেশ মৈত্র করণে মিলে ॥
ধনেতে বিহীন বাগ্‌ছী গোপী।
দারিদ্র্য দোষেতে হইলা লোভী ॥
যে ধন পাইল সব গ্রাসিল।
কুলজ্ঞে প্রদান কিছু না করিল ॥
কহিল কুলজ্ঞ কেশব খাঁরে।
অম্বরি সম্বরি তারা সম্বরে ॥
রোহিলা পাঠানী না করে যারা।
যাবৎ না আসে সুবুদ্ধি খাঁরা ॥
তাবৎ রহিল রোহিলা গালি।
বৃথা যে ধরেছ করণ স্থালী ॥'

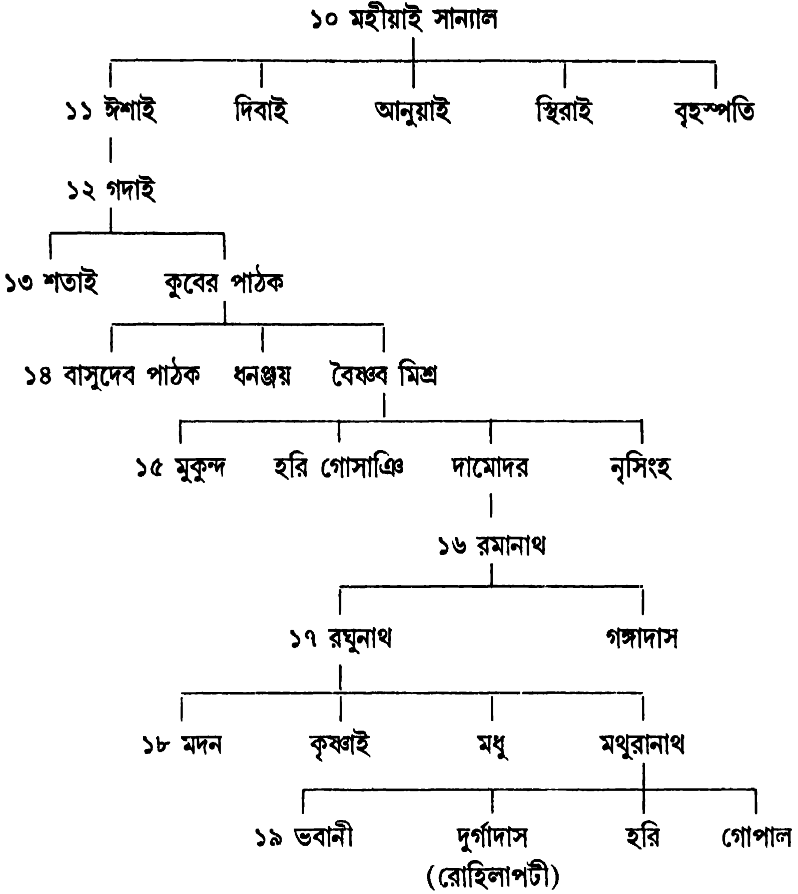
প্রচণ্ড রায়ের প্রথম পক্ষের পুত্র চাঁদ রায়, হরিরাম রায় ও রামরাম রায়। চাঁদ রায়ের কন্যা অরক্ষণীয়া হইল। কুলীনেরা রোহিলা-দোষের কন্যা বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়ী চাঁদ রায়ের কন্যা গ্রহণ করেন, তজ্জন্য কুলীনেরা প্রাণবল্লভ রায়কে রোহিলা দোষে স্থগিত রাখিলেন। সকলেই তাঁহার সহিত আদান-প্রদান ও আহারাদি সংস্রব ত্যাগ করিলেন। প্রাণবল্লভ রায় চাঁদ রায়ের নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, আপনার কন্যা আমি বিবাহ করিয়াছি বলিয়া আমি সমাজে আবদ্ধ আছি, আমার কন্যাগ্রহণে কুলীন সমাজ অস্বীকৃত, অতএব আপনার সভায় যদি কোন কুলীন থাকেন, তাঁহার সহিত আমার কন্যার করণ করাইয়া দেন। চাঁদ রায়ের সভায় ছিলেন দুর্গাদাস সান্যাল, তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল, কিন্তু তিনি অস্বীকৃত হইয়া কহিলেন যে, আমি সামান্য স্থানে করণ করিব, তথাপি চাঁদ রায়ের সহিত করণ করিব না। তবে যদি একান্তই করণ করিতে হয়, তবে বার্বকাবাদে গিয়া কুলজ্ঞের নিকট ব্যবস্থা লইতে হইবে। প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়ী কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া চাঁদ রায়ের নিকট গিয়া কহিলেন যে, মহাশয় হাতের কুলীন ছাড়িয়া দিলে আর করণ করিবার জন্য কুলীন জুটিবে না, আপনার অধিকারস্থ কুলীনকে ধরিয়া বাঁধিয়া করণ করান। তখনই দুর্গাদাস সান্যালের সহিত প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়ীর কন্যার সম্বন্ধ স্থির করা হইল। দুর্গাদাস সান্যালে ও প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়ীতে করণ। কুলজ্ঞেরা কহিলেন, দুর্গাদাস যদি সাহস করিয়া করিত, তবে দুর্গাদাসের করণে দোষ নিষ্কৃতি হইত। দুর্গাদাস সাহস করিলেন না, কাজেই দুর্গাদাসের করণেও দোষ নিষ্কৃতি হইল না। প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়ীর কুশে দুর্গাদাস সান্যালের গঙ্গালাভ। দুর্গাদাসের পুত্র ১ম পক্ষে শ্রীনারায়ণ, ২ পক্ষে রামভদ্র। এই সময়ে মাদা মোকামে কেশব খাঁ খোজাম্বরি দোষে সংসৃষ্ট থাকায় সাতাইশ পালট্ করণ করিয়া খোজাম্বরি নিষ্কৃতি করেন।

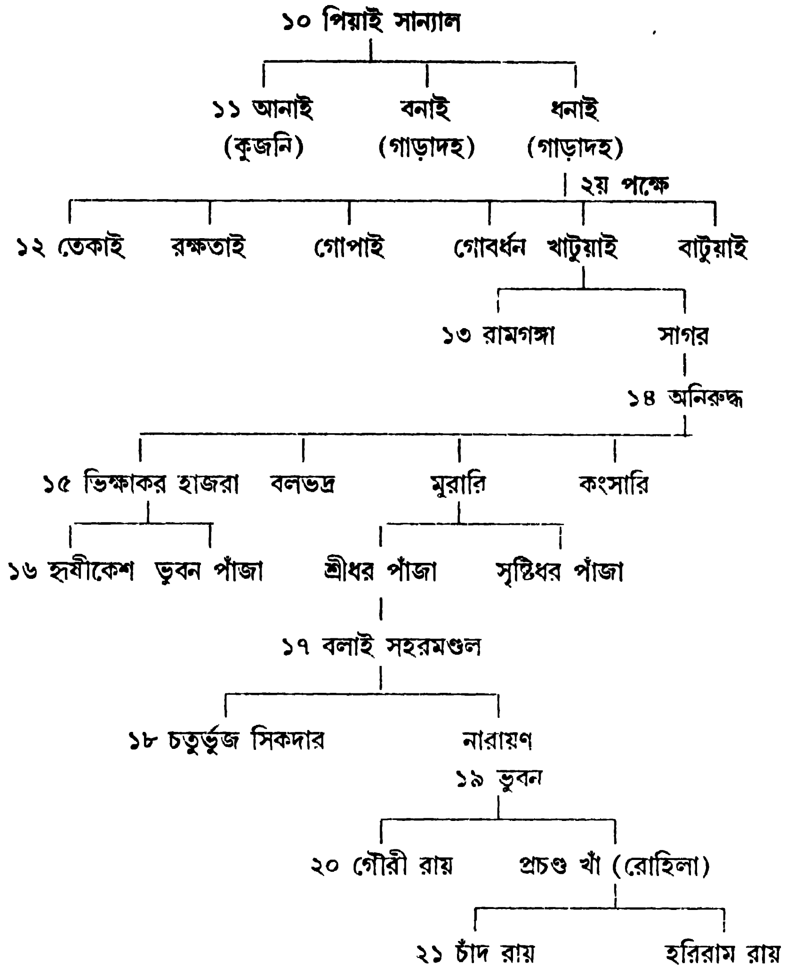
জামাতা শ্রীনারায়ণ সান্যাল তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আপনি সাতাইশ পাল্‌ট করিয়া 'অম্বরি' নিষ্কৃতি করিতেছেন, আমরা চৌদ্দবৎসর রোহিলাতে আবদ্ধ আছি, আমাদিগকে কুলীন দিয়া করণ কারণ করাইয়া রোহিলা নিষ্কৃতি করুন।' কেশব খাঁ কুলজ্ঞের নিকট ব্যবস্থা লইয়া আপনি বাহির থাকিয়া করণ কারণ করাইয়া রোহিলা নিষ্কৃতি করেন।' শ্রীনারায়ণে ও গোপীনাথে করণ, গোপীনাথে শিবরামে করণ এবং শিবরামে ও রমেশ মৈত্রে করণ। গোপীনাথ বাগ্‌ছী ছিলেন দরিদ্রকুলীন, তিনি যাহা কিছু ধন-পণ পাইলেন, আপনারা বাঁটিয়া খাইলেন, কুলজ্ঞদিগকে কিছুই দিলেন না। কুলজ্ঞেরা কহিলেন, কেশব খাঁ সাতাইশ পালট্ করিয়া অম্বরি নিষ্কৃতি করিয়াছেন।' রোহিলার পাছ করেন নাই, রোহেলা নিষ্কৃতি হয় নাই। সুবুদ্ধি খাঁর সন্তানে যখন করণ করিবে, তখন রোহিলা নিষ্কৃতি হইবে। বিমাতা চক্রান্ত করিয়া রমেশ মৈত্রে করণ করাইলেন। রোহিলার শিবরাম, হরিরাম, গোপীনাথ ও রমেশচন্দ্র চারি কুলীনের চারি উপকার ব্যবস্থা থাকিল। সুবুদ্ধি খাঁর পুত্র ১ম পক্ষে জনার্দন খাঁ, চাঁদ রায় ও দুর্গাদাস খাঁ এবং ২য় পক্ষে শ্রীদাস খাঁ, ৩য় পক্ষে দেবীদাস খাঁ, বিষ্ণুদাস, হেমাঙ্গদ খাঁ, অন্যান্য পক্ষে জয়ন্তী দাস খাঁ, বিশ্বনাথ খাঁ ও রামনাথ খাঁ। এই কালে কৃষ্ণদাস লাহিড়ী জনার্দন খাঁকে বলিলেন যে, রোহিলার চারি কুলীনের উপকার ব্যবস্থা আছে, সেই চারি কুলীনের উপকার করিয়া আমরাও রোহিলা নিষ্কৃতি করি। এই কালে জনার্দন খাঁ শম্ভু চৌধুরীকে অবলম্বন করিয়া ব্যবস্থাপূর্বক করণ কারণ করিয়া রোহিলা নিষ্কৃতি করিলেন। জনার্দন খাঁ ও হরিরাম সান্যালে করণ, শিবরাম ও পদ্মনাভে করণ, কৃষ্ণদাসে ও রমেশে করণ, শ্রীদাস খাঁ ও রূপনারায়ণ বাগ্‌ছীতে করণ, হরিদেব ও

হরিনারায়ণে করণ। রোহিলা নিষ্কৃতি করিয়া জনার্দন, শ্রীদাস খাঁ, কৃষ্ণদাস লাহিড়ী, হরিদেব লাহিড়ী, রমেশ মৈত্র, রূপনারায়ণ বাগ্‌ছী প্রভৃতি কুলীনেরা কুলে বড় হইলেন। কিন্তু রাজা উদয়নারায়ণ বিপক্ষ ছিলেন, তিনি কহিলেন, তবে জানি যে, রোহিলা নিষ্কৃতি যদি বাহির কুলীনে আদর করে। সুসঙ্গ হইতে রামভদ্র লাহিড়ী ছয় টাকা পণ দিয়া রমেশ মৈত্রে পরিবর্ত করিলেন, বাংরোল হইতে ছয় টাকা পণ দিয়া কৃষ্ণদাস লাহিড়ীও পরিবর্ত করেন। পরে রাজা আপত্তি করিলেন যে, কুলীনের আদর বুঝিলাম, শ্রোত্রিয়ের আদর বুঝি। তখন শিবরাম মজুমদার ষাইট টাকা পণ দিয়া রমেশ মৈত্রের পুত্রে কন্যা দেন। তথাচ রাজা পুনরায় আপত্তি করিলেন, তবে জানি যে রোহিলা নিষ্কৃতি, যদি অন্য দোষীরা আদর করে। মাঙ্গুলি ধর্ম খাঁর জন্মেছিল বগা। এই কালে ভূষণা নিষ্কৃতি হওয়ায় জনার্দন খাঁ ও রহিদেব লাহিড়ী পরিবর্ত করিয়া কহিলেন, আমি যে কুলীনের কুশ-পাতিল বাউড়ে দিলাম, সেই কুলীনে জোনাল্লি নিষ্কৃতি করিয়া পরে ভূষণা নিষ্কৃতি করিল, এখন রোহিলা নিষ্কৃতি করিব। এই কালে নিষ্কৃতির ব্যবস্থা যায় জনার্দন খাঁতে। হরিরাম সান্যাল ও জনার্দন খাঁতে করণ, রমেশ মৈত্র ও কৃষ্ণদাস লাহিড়ীতে করণ, শিবরাম সান্যাল ও পদ্মনাভ লাহিড়ীতে করণ, হরিদেব লাহিড়ী ও হরিনারায়ণ ভাদুড়ীতে করণ, রূপনারায়ণ বাগ্‌ছী ও শ্রীদাস খাঁ ভাদুড়ীতে করণ রোহিলা নিষ্কৃতি। পরে রোহিলার তিন কুলীন ও ভূষণার তিন কুলীন ছয় কুলীনে করণ করায় কুলজ্ঞেরা দোচামা দোষ দিয়া আস্তাড়িলেন। পরে ব্যবস্থা হইল, ভূষণারা রোহিলার পাছ করে রোহিলা সতেজ, রোহিলারা ভূষণার পাছ করে ভূষণা সতেজ। শেষে রোহিলা ভূষণার পাছ করায় ভূষণা সতেজ হয় এবং উভয়ের পাছ গ্রহণ করে।

ভাবের কথা ও মতের কথা

রোহিলা পটী হইতে তিনটি ভাব জন্মে, যথা—ভাব মেঘনা, ভাবমমিনপুর ও ভাব রূপাই (ভট্টাচার্য)। কুলীনদিগের পরস্পর অনৈক্যই ভাবোৎপত্তির কারণ। মেঘনা গ্রামের রাধাবল্লভ রায়ের শ্রোত্রিয়ান্ত পীরালী অপবাদ ছিল, সেই রাধাকান্ত রায়ের কন্যা লন কৃষ্ণদাস লাহিড়ী। কৃষ্ণদাস লাহিড়ী যে সকল কুলীনের সঙ্গে করণ করেন, তাঁহারাই মেঘনা ভাবের কুলীন। এই সময় ছোট মেঘনার নির্দোষ শ্রোত্রিয় কন্দর্প রায় রাধাবল্লভ রায়ের সংসৃষ্ট কুলীনে কন্যা দিতে অসম্মত হওয়ায় পুনরায় বড় মেঘনা ও ছোট মেঘনায় দুইটি ভাব জন্মে, পরে কৃষ্ণদাস লাহিড়ী প্রভৃতি কুলীনকে কন্যা-সম্প্রদান করিয়া উভয় মেঘনার কুলীন ও শ্রোত্রিয়েরা একত্র হন। আবার মেঘনার কুলীনেরা পরস্পর অনৈক্য হওয়ায় চামু বাগ্‌ছীর মত, বিনোদ বাগ্‌ছীর মত, হরেকৃষ্ণ বাগ্‌ছীর মত, শঙ্কর মৈত্রের মত, যদু লাহিড়ীর মত প্রভৃতি মত চলিল। পীরগাছানিবাসী কোন দোষাশ্রিত কুলীন রোহিলা পটীতে কন্যাদান করায় শ্রোত্রিয় দোষে 'পীরগাছার ভাব' বলিয়া আর একটি থাক হইয়াছে। মমিনপুরের ভাবের শ্রোত্রিয় (দেওয়ান কার্তিকেয় রায়ের পূর্বপুরুষ) রামগোপাল চক্রবর্তী ও মদনগোপাল চক্রবর্তী উভয়ে লাহিড়ী প্রভৃতি কতকগুলি কুলীন লইয়া মমিনপুর সমাজ স্থাপন করেন। মমিনপুরের কুলীনের মধ্যে মেঘনার ন্যায় পরস্পর অনৈক্য হওয়ায় ছয়ঘরিয়া মত, রামনাথ লাহিড়ীর মত, কৃষ্ণরাম সান্যালের মত প্রভৃতি কয়েকটি মতের সৃষ্টি হইল। এক্ষণে রামনাথ লাহিড়ী ও কৃষ্ণনাথ সান্যালের মতের কুলীনেরা 'টুট' অর্থাৎ ভঙ্গ হওয়ায় যে কয়েকজন কুলীন আছেন, তাঁহারা চামু বাগ্‌ছীর মতে প্রবেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। [পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]


১০ মহীয়াই সান্যাল
১১ ঈশাই
দিবাই
আনুয়াই
স্থিরাই
বৃহস্পতি
১২ গদাই
১৩ শতাই
কুবের পাঠক
১৪ বাসুদেব পাঠক
ধনঞ্জয়
বৈষ্ণব মিশ্র
১৫ মুকুন্দ
হরি গোসাঞি
দামোদর
নৃসিংহ
১৬ রমানাথ
১৭ রঘুনাথ
গঙ্গাদাস
১৮ মদন
কৃষ্ণাই
মধু
মথুরানাথ
১৯ ভবানী
দুর্গাদাস
(রোহিলাপটী)
হরি
গোপাল



আলেখানী

আদি নিরাবিল হইতে দুইটী পটী হইয়াছিল—আলেখানী ও ভবানীপুরী

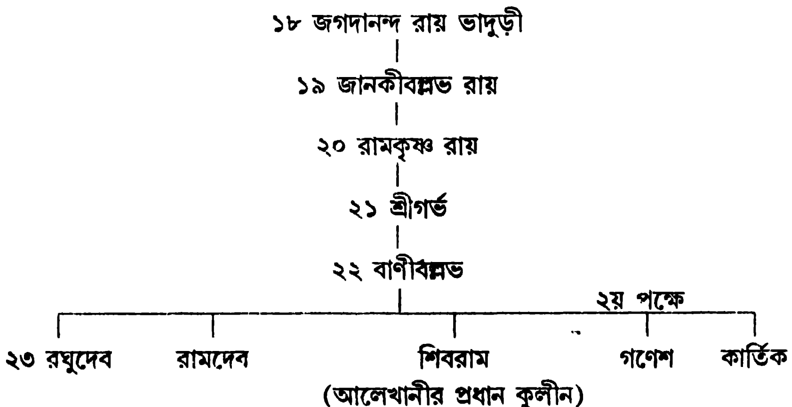
আলেখানী প্রথমে অবসাদ, পরে পটী হইল। আলে খাঁর সোয়ারে বিরূপ করিয়াছিল কমল সুবুদ্ধি রায় লাহিড়ীকে। কমল সুবুদ্ধি রায়ের ঘরে ভোজন করেন সূরানন্দধর্ম খাঁ লাহিড়ী। কমল সুবুদ্ধি রায়ের পুত্র মথুরা বসন্ত রায় ও রামচন্দ্র রায়। মথুরা বসন্ত রায়ের কুলজ মথুরা মৈত্র। মথুরা মৈত্র ও কেশব সান্যাল দুই কর্তা পরিবর্ত করিয়া মথুরা বসন্ত রায়ের গঙ্গালাভ। বসন্ত রায়ের পুত্র ১ম পক্ষে সদানন্দ চৌধুরী, ভবানী রায়, ২য় পক্ষে গণেশ রায়। সদানন্দ চৌধুরী ও লুঘভট্টে করণ, কুলজে কুলজে করণ। সদানন্দ চৌধুরীর পিতামহ কমল সুবুদ্ধি রায় আলেখানীতে আবদ্ধ ছিলেন। এই কারণে লঘু ভট্টের সহিত সদানন্দ চৌধুরীর কুলজের পর আর কোন কুলীন করণ করিতে স্বীকার না হওয়ায় পরে

কুলজ্ঞেরা শিবরাম ভাদুড়ীকে কহিলেন, তুমি আলেখানী নিষ্কৃতি কর। শিবরাম ভাদুড়ী কুলজ্ঞদিগের কথায় সম্মত হইয়া শিবরাম ভাদুড়ী ও সদানন্দ চৌধুরীতে করণ, সদানন্দ ও জয়রাম সান্যালে করণ, জয়রাম ও মাধব ভট্ট মৈত্রে করণ, মাধব ও রামকৃষ্ণ বাগ্ছীতে করণ, রামকৃষ্ণ ও লঘু ভট্টে করণ। লঘু ভট্ট ও রামকৃষ্ণ সান্যালে করণ, রামকৃষ্ণ ও বলরাম ভাদুড়ীতে করণ। এই সকল করণ কারণ তথাচ আলেখানী নিষ্কৃতি হইল না। ব্যবস্থা হইল যে যদি অন্য অবসাদ আদর করে। অন্য অবসাদ কি? পূর্বে মল্লিক সুজার কন্যা লন শক্তিধর মৈত্র, শক্তি ও অনন্ত চামটায় করণ, অনন্তপুত্র রঘু ও রাঘব। রঘুর কন্যা লন সনাতন আরিন্দা, সনাতনের কন্যা লন কৃষ্ণানন্দ লাহিড়ী, কৃষ্ণানন্দ ও বাণীবল্লভ ভাদুড়ীতে করণ, বাণীবল্লভ ও পূর্ণানন্দ সান্যালে করণ। পূর্ণানন্দের কুশে বাণীবল্লভের গঙ্গালাভ। বাণীবল্লভের পুত্র ১ম পক্ষে রঘুদেব, রামদেব, ২য় পক্ষে শিবরাম, গণেশ ও কার্তিক। রঘুদেব ও নয়নানন্দে করণ। রঘুদেবে সুজাখানী, নয়নানন্দে পরাণমৌলিকী। দোষে দোষে হইল করণ, উপকার না দেখে। জনার্দন মৈত্র ভাঙ্গেন দ্বারকা মৈত্র কুলজ, দ্বারকা এই কালে মথুরানাথ সান্যাল ভাঙ্গেন জনার্দন বাগ্ছী কুলজ; জনার্দন ও শ্রীকৃষ্ণ সান্যালে করণ। পরে জনার্দন ভাঙ্গেন দ্বারকা মৈত্র কুলজ! শ্রীকৃষ্ণ সান্যাল ও দ্বারকা মৈত্রে করণ, শ্রীকৃষ্ণ ও জনার্দন বাগ্ছীতে করণ, পরে উপকারের ব্যবস্থা যায়, পক্ষান্তরে তুল্য বস্তু শিবরাম ভাদুড়ী। কুলজ্ঞেরা শিবরাম ভাদুড়ীকে কহিলেন, তুমি সুজাখানী নিষ্কৃতি কর।

শিবরাম ভাদুড়ী ও রামকৃষ্ণ বাগ্ছীতে করণ, শিবরাম ভাদুড়ী ও জনার্দন বাগ্ছীতে করণ. জনার্দন ও দ্বারকায় করণ, দ্বারকা ও রামনারায়ণে করণ। তথাচ গাইল নিষ্কৃতি হয় না। কুলজ্ঞেরা কহিলেন, —

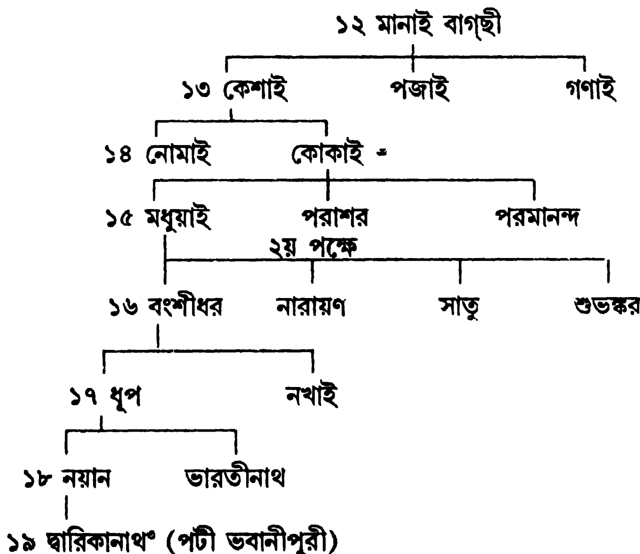
'ভুলে গেল কুলের কথা শিবরামের যোগ্যতা,
বৃথা জাগে সুজাখানীর কথা।'

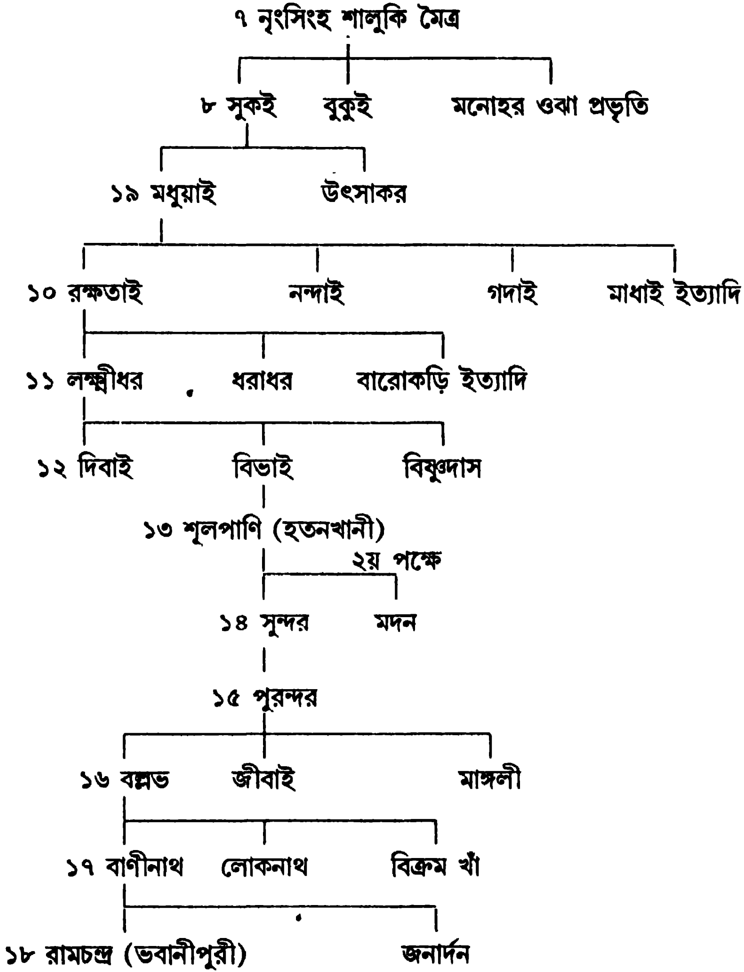
ব্যবস্থা যায় হরিরাম আছেন বাহির, যদি করেন তবে গাইল নিষ্কৃতি হয়। অকরণে হরিরামের গঙ্গালাভ। হরিরামের দুই পুত্র রামচন্দ্র ও রঘুনাথ। রামচন্দ্র ও দ্বারকায় করণ, সুজাখানী নিষ্কৃতি। কিন্তু তখনও পরাণ-মৌলিকী জাগে। রঘুদেব ভাদুড়ীর কুশে নয়নানন্দের গঙ্গালাভ। নয়নানন্দপুত্র লক্ষ্মীকান্ত সান্যাল চক্রবর্তী। সদানন্দ চৌধুরী ও লক্ষ্মীকান্ত সান্যালে করণ, পরাণ মৌলিকী নিষ্কৃতি। গাইল হইল নিষ্কৃতি, পটী হইল আলেখানী।



ভবানীপুরী পটী

ভবানীপুরের রাজীব চক্রবর্তীর পৌত্রী (মথুরেশ চক্রবর্তীর কন্যা) দ্বারকানাথ বাগ্‌ছীর পুত্র গ্রহণ করেন। দ্বারকানাথ মৈত্র ভিক্ষার্থে তথায় গিয়াছিলেন। সাতকড়ি চক্রবর্তী হুড়া ঘটক, কুশবিচার না করিয়া পূর্বে দ্বারকায় ও রামচন্দ্রে করণ করেন, পরেও দ্বারকায় ও রামচন্দ্রে করণ, কুশে কুশে করণ হইল, কুলজ্ঞেরা ছিদ্র পাইলেন। ভবানীপুরী দিয়া আস্তাড়িলেন, প্রথমে দোষ পাইলেন সাধকনামা। পরে দ্বারকা মৈত্র ও রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ, রামচন্দ্র লাহিড়ী ও রাজীব সান্যালে করণ, তথাচ দোষ নিষ্কৃতি হয় না। মুদ্দই লাহিড়ী, নান্ন্যাসী ও বাগ্‌ছী। লাহিড়ীতে সদানন্দ চৌধুরী, নান্ন্যাসীতে রাজা ইন্দ্রজিৎ ও বাগ্‌ছীতে পুটীয়ার রামচন্দ্র ঠাকুর। এই কালে দ্বারকা মৈত্র রামচন্দ্র লাহিড়ী প্রভৃতি কুলীনগণ ঐক্য হইয়া রামচন্দ্র ঠাকুরের নিকট যাইলেন। তাঁহাকে কহিলেন যে, মহাশয়! আমরা ভবানীপুরীগ্রস্ত হইয়া করণ কারণ করিলাম, তথাপি দোষ নিষ্কৃতি হয় না। অতএব আপনি করণ কারণ করিয়া ভবানীপুরী নিষ্কৃতি করুন, তাহা হইলে রক্ষা পাই, নতুবা আমাদিগের কুলকুশ হয় না। পরে রামচন্দ্র ঠাকুর অধিষ্ঠাতা থাকিয়া করণ কারণ করান। শ্রীকৃষ্ণ বাগ্‌ছী ভাঙ্গেন রঘুনাথ বাগ্‌ছীর কুলজ, রঘুনাথ ভাঙ্গেন কামদেব ভাদুড়ীর কুলজ, কামদেব ও রামনারায়ণ লাহিড়ীতে করণ, রাজীব সান্যাল ও বেণীনাথ মৈত্রে করণ, দ্বারকানাথ মৈত্র ও রঘুনাথ বাগ্‌ছীতে করণ। এই কালে কুলজ্ঞেরা আপত্তি করিলেন, তবে জানি ভবানীপুরী নিষ্কৃতি, যদি সদানন্দ চৌধুরীর সন্তানে করণ করে। সদানন্দ চৌধুরীর পুত্র ১ম পক্ষে রঘুনাথ রায়, গোবিন্দ রায়, শিবরাম রায় ও ২য় পক্ষে দুর্গারাম রায়। দ্বারকা মৈত্রের পুত্র গঙ্গারাম, কৃষ্ণরাম ও গোপাল। গঙ্গারাম মৈত্র ও গোবিন্দ রায়ে করণ, গোবিন্দ ও রামচন্দ্র চক্রবর্তীতে করণ, কৃষ্ণরাম মৈত্র ও গোবিন্দ রায়ে করণ, ভবানীপুরী নিষ্কৃতি। দোষ গেল পটী হইল ভবানীপুরী।





ভূষণা পটী

জিতামিত্র রত্নাবলীর পুত্র রামকৃষ্ণ বড় ঠাকুর, রূপনারায়ণ তলাপাত্র, শ্রীনারায়ণ তলাপাত্র ও হরিনারায়ণ তলাপাত্র। শ্রীনারায়ণ তলাপাত্রের কন্যা লন রামচন্দ্র লাহিড়ী। হরিনারায়ণ তলাপাত্রের কন্যা লন গঙ্গারাম সান্যাল, পরে কন্যা দেন রঘুনাথ রায়ের পুত্রে। কুলজ্ঞেরা দেশাবাদ দিয়া আস্ভাড়ন করিয়া করিলেন যে—

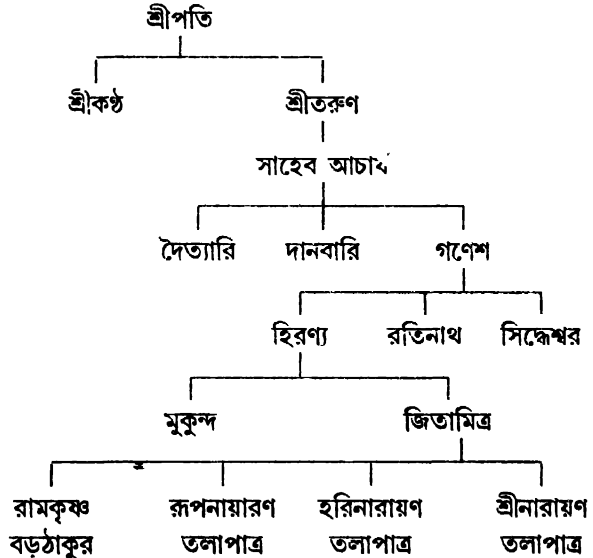
"রামচন্দ্র গঙ্গারাম কেন করিলে কুকাম
কেন খাইলে ভূষণার পাণি।
খাইয়ে রূপদলের ভাত, হিন্দুতে না ছোঁয় পাত
গাইল বদ্ধ মৈশালা আলামি ॥"

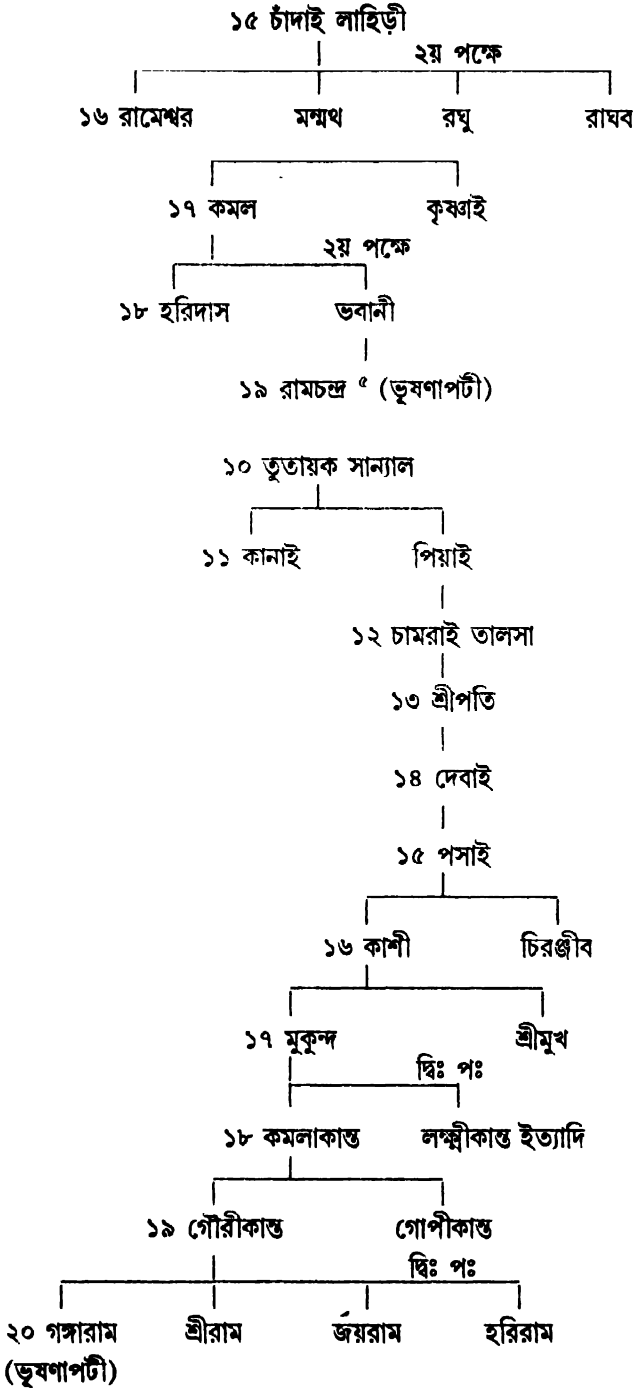
ইহার ইতিহাস এইরূপ। ফরিদপুর জেলাস্থিত ভূষণা পরগনার মধ্যে মৈশালা ও

আলামি নামে দুইখানি গ্রাম ছিল। তথায় রূপদলনাম্নী মুসলমানজাতীয়া কোন এক স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে তথাকার শ্রোত্রিয়গণ লিপ্ত হন। রত্নাবলী গ্রামনিবাসী জিতামিত্রও তাহাতে লিপ্ত ছিলেন। এই কারণে রামচন্দ্র লাহিড়ী ও গঙ্গারাম সান্যাল মৈশালা ও আলামি দোষসংস্রবে আক্রান্ত হন। পরে কুলজ্ঞ, কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণ একত্র হইয়া করণ কারণ করিয়া উক্ত অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। রামচন্দ্র লাহিড়ী ও দেবনারায়ণ মৈত্রে পরিবর্ত, গঙ্গারাম সান্যাল ও কৃষ্ণবল্লভে পরিবর্ত, রঘুনাথ রায় ও দেবীদাস সান্যালে পরিবর্ত. তথাপি নিষ্কৃতি হয় না। ব্যবস্থা যায়, দেশস্থ কুলীন মথুরা রায় ভাদুড়ী অন্তরঙ্গ ব্যক্তি, যদি তিনি সাহস করিয়া করণ করেন, তাহা হইলে ভূষণা নিষ্কৃতি হয়। পরে মথুরা রায় ভাদুড়ী ও গঙ্গারাম সান্যালে পরিবর্ত, ভূষণা নিষ্কৃতি। স্থানের নামানুসারে পটীর নাম হইল —ভূষণা।

জিতামিত্র রত্নাবলীর বংশাবলী

আনর পুত্র যজ্ঞপতি, তৎপুত্র, কুলপতি, তৎপুত্র, ভূপতি, তৎপুত্র শ্রীপতি।



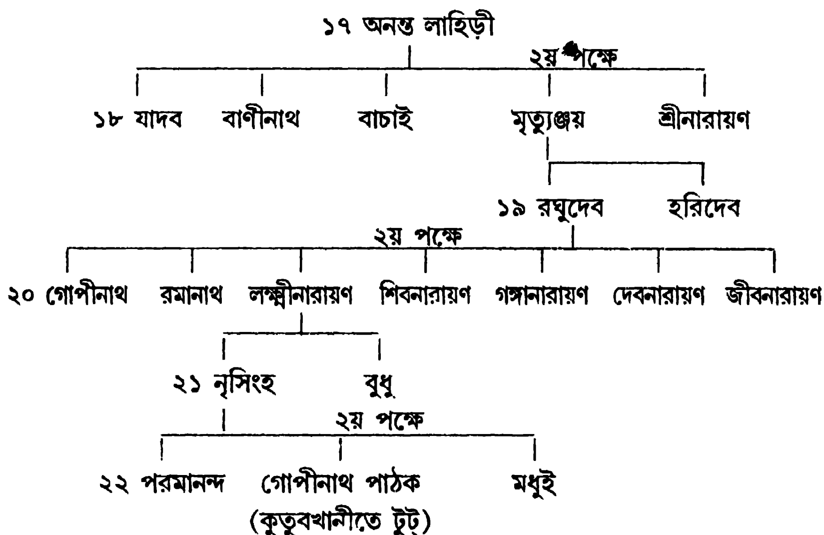

১৫ চাঁদাই লাহিড়ী
২য় পক্ষে
১৬ রামেশ্বর
মন্মথ
রঘু
রাঘব
১৭ কমল
কৃষ্ণাই
২য় পক্ষে
১৮ হরিদাস
ভবানী
১৯ রামচন্দ্র ৫ (ভূষণাপটী)
১০ তুতায়ক সান্যাল
১১ কানাই
পিয়াই
১২ চামরাই তালসা
১৩ শ্রীপতি
১৪ দেবাই
১৫ পসাই
১৬ কাশী
চিরঞ্জীব
১৭ মুকুন্দ
শ্রীমুখ
দ্বিঃ পঃ
১৮ কমলাকান্ত
লক্ষ্মীকান্ত ইত্যাদি
১৯ গৌরীকান্ত
গোপীকান্ত
দ্বিঃ পঃ
২০ গঙ্গারাম (ভূষণাপটী)
শ্রীরাম
জয়রাম
হরিরাম

কুতুবখানী

কয়ড়ার মথুরা চৌধুরীর কন্যাকে কুতুব খাঁর সোয়ারে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। মথুরা চৌধুরীর ঘরে বিবাহ করেন মৃত্যুঞ্জয় লাহিড়ী। কুলগ্রন্থে লিখিত আছে,—

'যে ঘায় টুটিল পাঠক গোপীনাথ মিতাই টুটিল সেই ঘায়।
পুখুরিয়ার পুরন্দর ছিটায় বদ্ধ দুমনা দাড়িকা পায় ॥'

কিছুকাল পরে গঙ্গারাম সান্যাল, হেমাঙ্গন্দ খাঁ, কৃষ্ণবল্লভ লাহিড়ী, রঘুনাথ সান্যাল, রামকৃষ্ণ মজুমদার, বলরাম সান্যাল, রঘুরাম বাগ্‌ছী, রামগোবিন্দ সান্যাল ও রূপচাঁদ লাহিড়ী প্রভৃতি কুলীনেরা একত্র হইয়া আদান-প্রদান ও করণ কারণ করিয়া কুতুবখানী নিষ্কৃতি করেন। কুতুবখানী প্রথমে আঘাতমধ্যে গণ্য ছিল, পরে কুতুবখানী পটী হয়। এক্ষণে ঐ পটীতে কুলীন নাই, সকলেই ভঙ্গ হইয়া কাপ হইয়াছেন।



১০ পিয়াই সান্যাল

১১ আনাই বনাই ধনাই

১২ ডিঙ্গরাই চামরাই শাতাই নাভাই দ্বিঃ পঃ আপাই

১৩ শ্রীপতি উমাপতি দ্বিঃ পঃ রঘুয়াই মধুয়াই

১৪ দেবাই কামাই সত্যবান্

১৫ বাসুয়াই পশাই শম্ভু গৌরীবর ভগবান্ গোবিন্দ

১৬ কাশী চিরঞ্জীব নমাই ভুবন

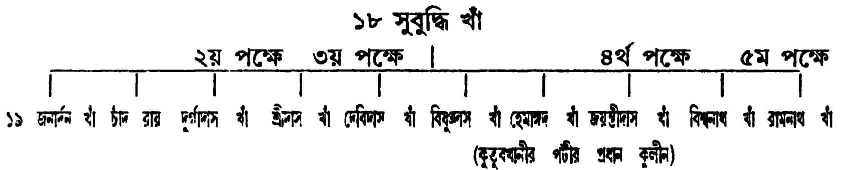
১৭ মুকুন্দ শ্রীমুখ

১৮ কমলাকান্ত দ্বিঃ পঃ লক্ষ্মীকান্ত তৃঃ পঃ নন্দন চতুঃ পঃ পাঁচু

১৯ গৌরীকান্ত গোপীকান্ত

২০ শিবরাম গঙ্গারাম শ্রীরাম জয়রাম দ্বিঃ পঃ হরিরাম

(কুতুবখানী পটীর শ্রেষ্ঠ কুলীন।)



১৯ কৃষ্ণদাস লাহিড়ী

২০ বলরাম শিবরাম হরিরাম বিষ্ণুরাম গোবিন্দ গোপাল বনমালী গোপীনাথ জগন্নাথ রামনাথ মথুরানাথ

২য় পক্ষে

রামজীবন যদু রঘু

২য় পক্ষে

২১ রামদেব কামদেব কাশীরাম জয়রাম সন্তোষ হরিবল্লভ রামবল্লভ কৃষ্ণবল্লভ

(কুতুবখানীর প্রধান কুলীন)

২২ রামেশ্বর দুর্গারাম ইন্দ্রনারায়ণ

২৩ নরু যদু রূপচাঁদ দীপচাঁদ মৃত্যুঞ্জয়

(কুতুবখানীর কুলীন)

১০ মহীয়াই

১১ ঈশাই দিবাই ইত্যাদি

১২ সাতাই কুবের

১৩ বাসুদেব পাঠক ধনঞ্জয় বৈষ্ণব মিশ্র

১৪ মুকুন্দ হরিগোসাঞি দামোদর নৃসিংহ

১২ রামচন্দ্র পুরুষোত্তম

১৬ শ্রীপতি গোবিন্দ নারায়ণ কাশীনাথ

১৭ গোপাল মথুরানাথ রতিনাথ

১৮ রঘুরাম প্রভুরাম

(কুতুবখানীর প্রধান কুলীন)

জোনালী পটী

বর্ণি নামক গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণের অপঘাতে মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার শব জোনালী গ্রামে আনিয়া পুরন্দর মৈত্র এবং হিরণ্য ভাদুড়ী প্রভৃতি মিলিয়া দাহ করেন। পুরন্দর মৈত্র কুলজ্ঞদিগকে অবজ্ঞা করিতেন। ঐ শবদাহকারীদিগের অন্যতম ভগবান সান্যালের বিধবা ভগিনীও তাহাতে লিপ্ত ছিলেন। পুরন্দর ঐ বিধবার হস্তে ভোজন করেন। কুলজ্ঞেরা পুরন্দর মৈত্র ও হিরণ্য ভাদুড়ীকে জোনালী দিয়া আস্তাড়ন করেন।

এই পটীর কুলীনগণ উক্ত প্রকার দোষ ভিন্ন আরও তিনটি দোষাশ্রিত বলিয়া কুলগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। যথা—দর্পনারায়ণী, চাঁড়ালী ও অদৃষ্ট-কন্যা।

দর্পনারায়ণী

দর্পনারায়ণী অবসাদ শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী এবং তৎপুত্রদিগকে স্পর্শ করায় শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর সংস্রবে দর্পনারায়ণী ভাব রহিয়া গেল।

অদৃষ্ট কন্যা

কুলীনকন্যার পিতা কিংবা ভ্রাতা না থাকিলে অর্থাৎ করণ করিবার কোন ব্যক্তি না থাকিলে এবং কোন শ্রোত্রিয়ের পিতা ও ভ্রাতৃবিহীন কন্যা অদৃষ্টকন্যা বলিয়া অভিহিত। সেই কন্যা কোন কুলীনে বিবাহ করিলে সেই কুলীনের কুলপাত হয়। উক্ত কন্যাকে বন্ধুহীনা কন্যাও বলিয়া থাকে।

চাঁড়ালী

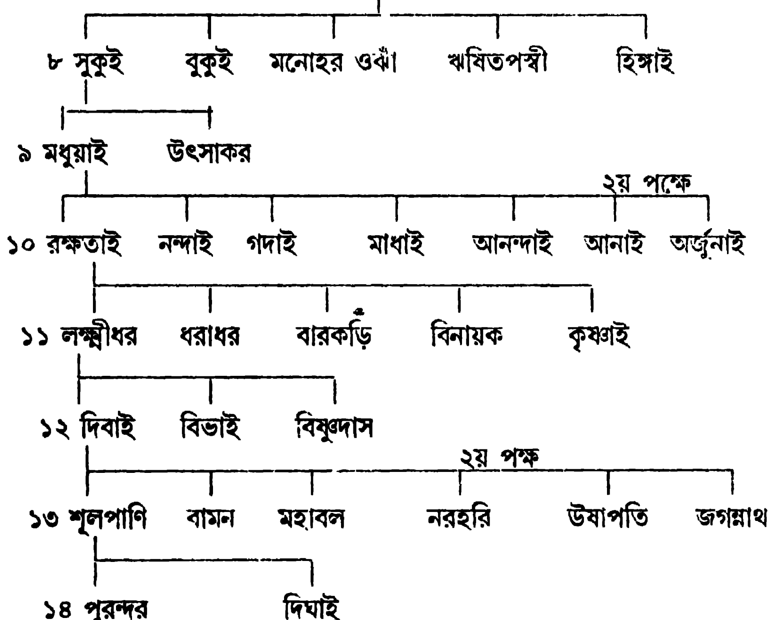
বিষ্ণুভাণ্ডারনবিশের চণ্ডালিনী-গমন অপবাদ ছিল। বিষ্ণুভাণ্ডারনবিশের কন্যা লন বিজয়লাটী। বিজয়লাটীর কন্যা লন রামচন্দ্র লাহিড়ী। এই কারণে রামচন্দ্র লাহিড়ীতে চাঁড়ালীদোষ। বিজয়লাটীর পুত্র রামচন্দ্র লাটী। রামচন্দ্র লাহিড়ী রামভদ্র লাটীকে কহিলেন যে, মাতুল মহাশয়, আপনি কুলীনে কন্যা দেন। রামভদ্র লাটী কহিলেন, আমি কোন কুলীনে কন্যা দিব। রামচন্দ্র লাহিড়ী কহিলেন, আপনি শ্রীরাম সান্যালের পুত্রে কন্যা দেন। রামভদ্র লাটী শ্রীরাম সান্যালের পুত্রে কন্যা দিলেন। এই কালে কুলজ্ঞেরা কহিলেন, শ্রীরাম সান্যাল আর রামচন্দ্র লাহিড়ীতে যদি করণ হয়, তবে তোমার কুলীনে কন্যাদানের সার্থকতা বটে। এই কথা মাত্রেই শ্রীরাম সান্যাল ও রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ। কুলজ্ঞেরা তাঁহাদিগকে জোনালী, চাঁড়ালী ও অদৃষ্টকন্যা এ তিন দোষ দিয়া আস্তাড়িলেন। এই কালে রামচন্দ্র লাহিড়ী বিবেচনা করিলেন, রাজা উদয়নারায়ণ হিন্দুর শ্রেষ্ঠ, বারেন্দ্র 'যূপ', সতেজকে আস্তাড়িলে নিস্তেজ হয়, নিস্তেজ কুলীনকে ভোজন দিলে সতেজ হয়। এই রাজা উদয়নারায়ণের কন্যার কার্য যদি রঘুনাথ রায়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায়ে করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে কুলজ্ঞের কথায় কি আসে যায়। রাজা উদয়নারায়ণ ছিলেন ডাকমণ্ডু মোকামে। রামচন্দ্র লাহিড়ী তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার কন্যার কার্য রঘুনাথ রায়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় করুন। তিনি নামেও শ্রীকৃষ্ণ, কর্তব্যেও শ্রীকৃষ্ণ। রাজা কহিলেন, আমি কুলজ্ঞের বিনা অভিপ্রায়ে কন্যার বিবাহ দিতে পারি না। এই কালে কুলজ্ঞ গোপী বিশারদ ও দ্বারকানাথ মৈত্র বিপক্ষ ছিলেন। তাঁহাদিগকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রামচন্দ্র লাহিড়ী রঘুনাথ রায়ের পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন। আপনাদিগের কি অভিপ্রায়? কুলজ্ঞেরা কহিলেন, শ্রীনারায়ণ মৈত্রে

অদৃষ্ট-কন্যা। সেই শ্রীনারায়ণ মৈত্র ও শ্রীরাম সান্যালে করণ, শ্রীরাম ও রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ, রামচন্দ্র ও রঘুনাথ রায়ে করণ। যদি রামচন্দ্র লাহিড়ী আর জনার্দন খাঁনে করণ হয় তবে তোমার এ কার্য কর্তব্য বটে। ডাকমণ্ডু, মোকামে রাজা উদয়নারায়ণ কুশ পাতিল আনাইয়া প্রস্তুত করিলেন। কুলজ্ঞেরা জনার্দন খাঁকে করণ করিতে নিষেধ করিয়া পত্র লিখিলেন। কুলজ্ঞের পত্র পাইয়া জনার্দন খাঁ কুশ পাতিল বাউড়ে দিলেন। পরে ব্যবস্থা যায় শ্রীদাস খাঁ। শ্রীদাস খাঁ কহিলেন, আমি বধূকে পুছিয়া আসি। কুলজ্ঞেরা তরজা করিলেন—

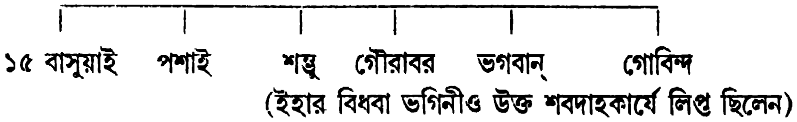
'কুল না বুঝে শ্রীদাস নাচে, ঘরে নাচে ঘরী।
প্রাণের অধিক রতি নাচে, ভাগ্নে নাচে গৌরী ॥'

ফিরে ব্যবস্থা যায় গঙ্গারাম সান্যালে। পূর্বে বলিয়াছি শিব পাতে হরিরাম, হরিরাম পাতে গঙ্গারাম। অকরণে গঙ্গারাম সান্যাল কুলে বড়। গঙ্গারাম সান্যাল ও রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ। তাহাতে জোনালী, চাঁড়ালী ও অদৃষ্ট-কন্যা তিন দোষ নিষ্কৃতি হয়। পটী হইল জোনালী।

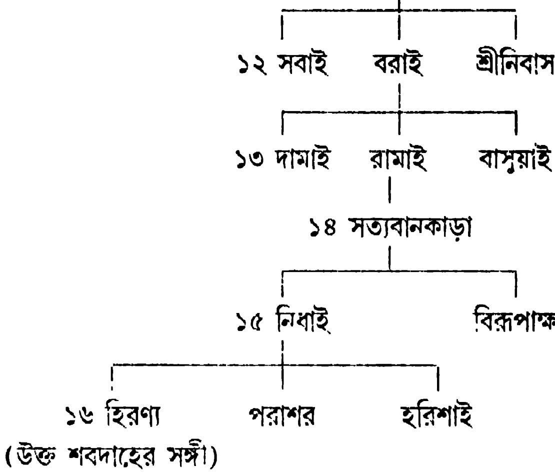
উক্ত চারি দোষে সংসৃষ্ট যে সকল কুলীন, তাঁহারাই জোনালী পটী। পরে কতকগুলি কুলীন একতায় করণ করিয়া আদান-প্রদান করেন। তাঁহারাও জোনালী পটীতে থাকিলেন। রাজশাহী জেলার শ্যামনগর ও মাঝগ্রামের কুলজ্ঞেরা এই পটীর কুলীন। তাঁহাদিগের বংশধরেরা অদ্যাবধি শূদ্রে দান গ্রহণ কিংবা শূদ্রগৃহে ভোজন করেন না।



১৪ দেবাই সান্যাল

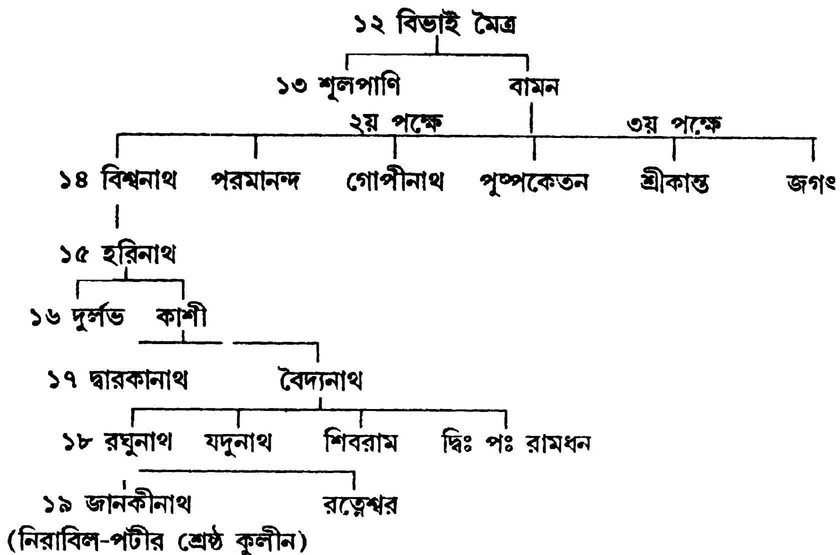


১১ গজাই ভাদুড়ী



নিরাবিলপটী

যাহা আবিলতা-রহিত অর্থাৎ নির্মল, দোষরহিত, তাহারই নাম নিরাবিল। রোহিলাতে রোহিলা দোষ, ভূষণাতে ও আলেখানীতে যবনদোষ এবং ভবানীপুরে সাধকনামা কষ্টশ্রোত্রিয়গত দোষ। এই দোষে যে সকল কুলীন লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া জানকীবল্লভ রায় ভাদুড়ী, দেবীদাস সান্যাল, রঘুদেব লাহিড়ী, জানকীনাথ মৈত্র, কমলাকান্ত বাগছী, শিবরাম সান্যাল প্রভৃতি কুলীন একতায় করণ-কারণ করিয়া নিরাবিলপটী স্থাপন করিলেন। পরে দর্পনারায়ণী-অবসাদগ্রস্ত কুলীনগণকে নিরাবিল পটীতে আনেন। এই নিরাবিল পটীর কুলীন রঘুরাম মজুমদার মথুরা-কোপার কন্যা গ্রহণ করায় পাঁচুড়িয়া-দোষে লিপ্ত হন। পাঁচুড়িয়া ডাকুয়াই কালিহাইর বংশে বদন পাঁজা। বদন পাঁজার কন্যা লন মথুরাকোপা। তাঁহাদের জন্য নিরাবিল পটীতে পাচুড়িয়া দোষ স্পর্শ করে। তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ নিরাবিলপটী হইতে মথুরাকোপা-ঘটিত কুলীনদিগকে বাহির করিয়া দেন। ইহাতে নিরাবিল পটীমধ্যে 'বাহির ভাব' নামে এক থাক হয়। নিরাবিলপটীর প্রথম কুলীনদিগের ও বাহির ভাবের প্রথম কুলীনদিগের বংশলতা প্রদত্ত হইল—



১১ আনন্দাই সান্যাল

১২ পজাই — পদ্মনাভাই

১৩ মিতাই — শাকাই

১৪ দিগম্বর — শুক্লাম্বর — শ্রীধর — দুর্গাবর — চণ্ডীবর

আধুয়াই — পাচুয়াই

লোক্যনাথ

১৭ হিরণ্য

১৮ লক্ষ্মণ — জীবাচার্য — গদাধর

১৯ পীতাম্বর — বনমালী — ছকড়ি

২য় পক্ষে

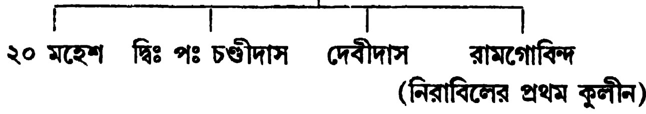
২০ শ্রীনারায়ণ — গোবিন্দ — কৃষ্ণরাম

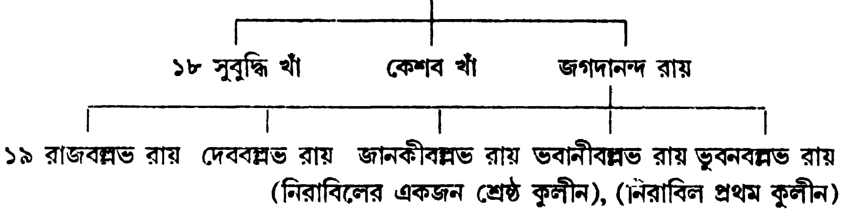
২য় পক্ষে

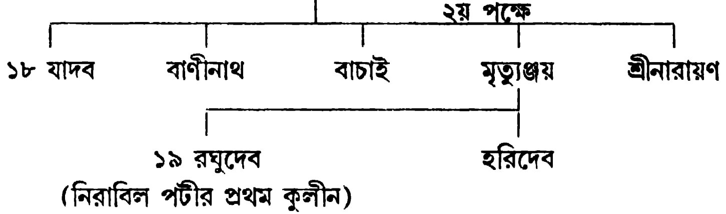
২১ রাধাবল্লভ — গোপীকান্ত — কৃষ্ণবল্লভ — রাজবল্লভ

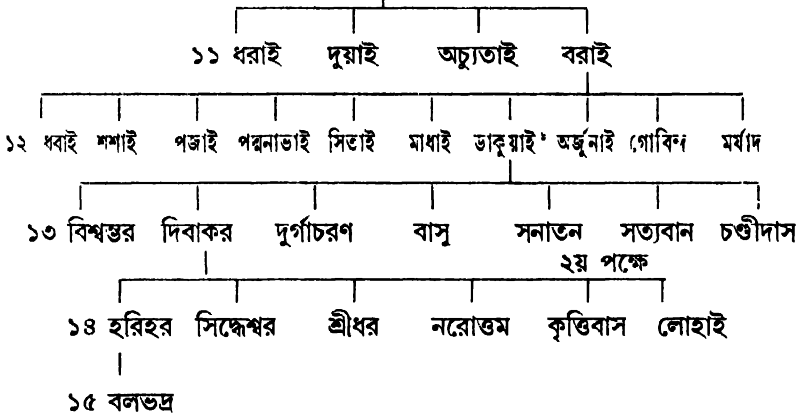
২২ গোপালবল্লভ — রামচন্দ্র — শিবরাম — রামজীবন

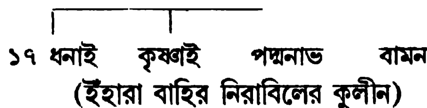
(নিরাবিল পটীর প্রধান কুলীন)

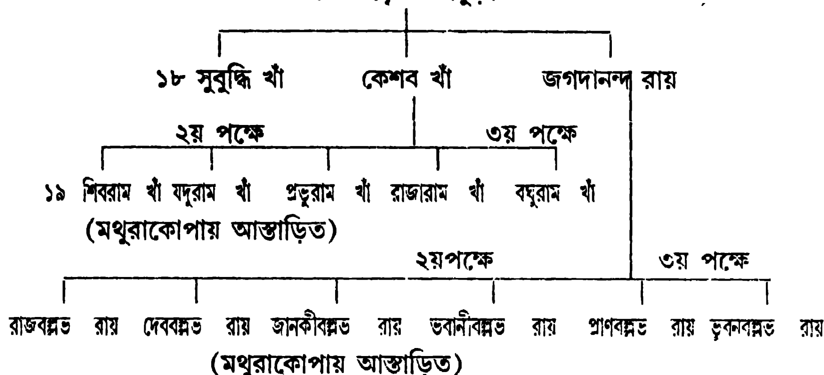

১৯ বনমালী সান্যাল
২০ মহেশ
দ্বিঃ পঃ চণ্ডীদাস
দেবীদাস
রামগোবিন্দ
(নিরাবিলের প্রথম কুলীন)

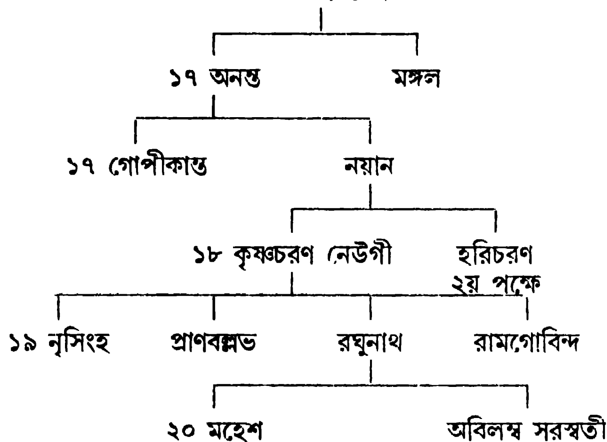

১৭ শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী
১৮ সুবুদ্ধি খাঁ
কেশব খাঁ
জগদানন্দ রায়
১৯ রাজবল্লভ রায়
দেববল্লভ রায়
জানকীবল্লভ রায়
ভবানীবল্লভ রায়
ভুবনবল্লভ রায়
(নিরাবিলের একজন শ্রেষ্ঠ কুলীন), (নিরাবিল প্রথম কুলীন)

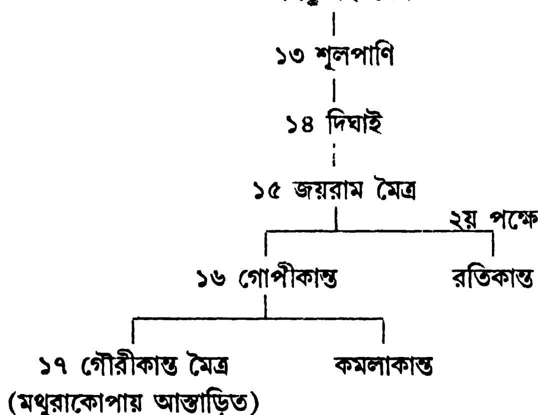

১৭ অনন্ত লাহিড়ী
২য় পক্ষে
১৮ যাদব
বাণীনাথ
বাচাই
মৃত্যুঞ্জয়
শ্রীনারায়ণ
১৯ রঘুদেব
হরিদেব
(নিরাবিল পটীর প্রথম কুলীন)


১০ অনন্ত বাঙ্গাল ওঝা কালিহাই
১১ ধরাই
দুয়াই
অচ্যুতাই
বরাই
১২ ধবাই
শশাই
পজ্ঞাই
পদ্মনাভাই
সিতাই
মাধাই
ভাকুয়াই
অর্জুনাই
গোবিন্দ
মর্যাদ
১৩ বিশ্বম্ভর
দিবাকর
দুর্গাচরণ
বাসু
সনাতন
সত্যবান
চণ্ডীদাস
২য় পক্ষে
১৪ হরিহর
সিদ্ধেশ্বর
শ্রীধর
নরোত্তম
কৃত্তিবাস
লোহাই
১৫ বলভদ্র


১৬ জনার্দন
পুষ্পকেতন
মীনকেতন
বদনপাঁজা
১৭ ধনাই
কৃষ্ণাই
পদ্মনাভ
বামন
(ইঁহারা বাহির নিরাবিলের কুলীন)


১৭ শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী
১৮ সুবুদ্ধি খাঁ
কেশব খাঁ
জগদানন্দ রায়
২য় পক্ষে
৩য় পক্ষে
১৯ শিবরাম খাঁ যদুরাম খাঁ প্রভুরাম খাঁ রাজারাম খাঁ রঘুরাম খাঁ
(মথুরাকোপায় আস্তাড়িত)
২য়পক্ষে
৩য় পক্ষে
রাজবল্লভ রায় দেববল্লভ রায় জানকীবল্লভ রায় ভবানীবল্লভ রায় প্রাণবল্লভ রায় ভুবনবল্লভ রায়
(মথুরাকোপায় আস্তাড়িত)


১৫ দনাই মৈত্র[৭]
১৭ অনন্ত
মঙ্গল
১৭ গোপীকান্ত
নয়ান
১৮ কৃষ্ণচরণ নেউগী
হরিচরণ
২য় পক্ষে
১৯ নৃসিংহ
প্রাণবল্লভ
রঘুনাথ
রামগোবিন্দ
২০ মহেশ
অবিলম্ব সরস্বতী


১২ বুভাই মৈত্র
১৩ শূলপাণি
১৪ দিঘাই
১৫ জয়রাম মৈত্র
২য় পক্ষে
১৬ গোপীকান্ত
রতিকান্ত
১৭ গৌরীকান্ত মৈত্র
কমলাকান্ত
(মথুরাকোপায় আস্তাড়িত)

বেণী পটী

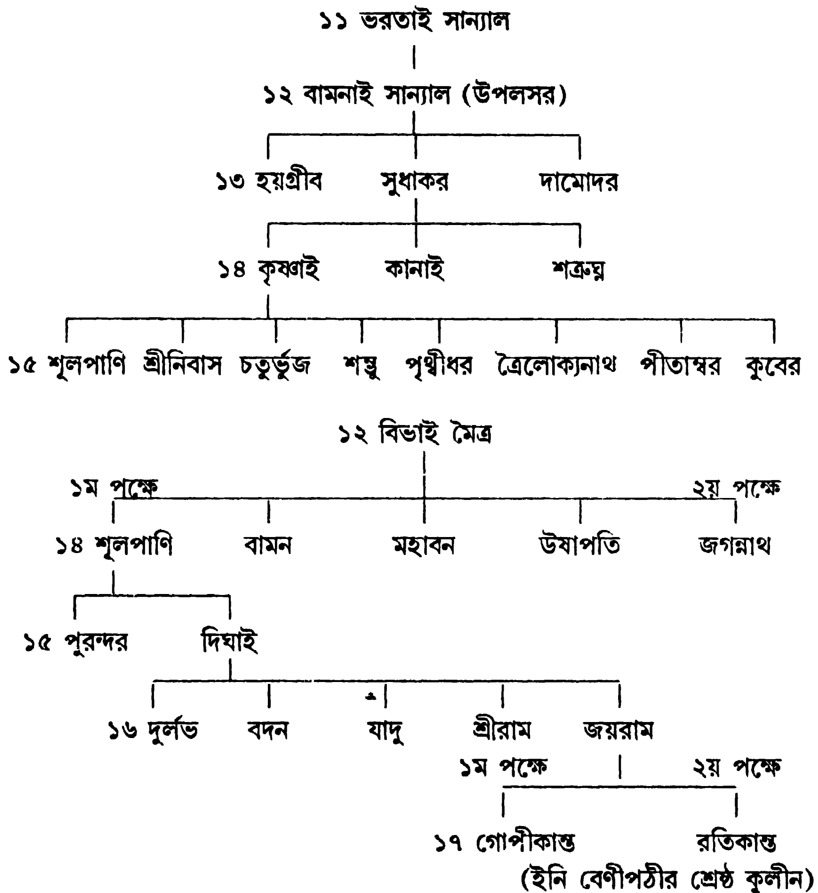
কুলগ্রন্থে লিখিত আছে :—

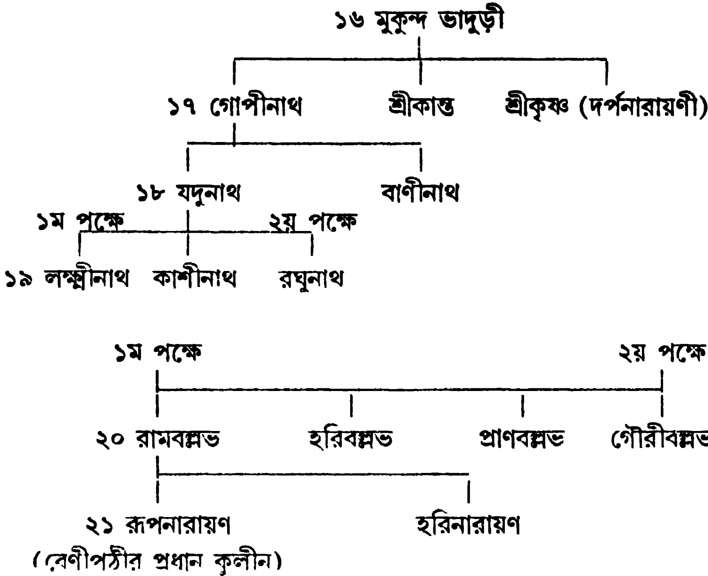
'কি কব অদৃষ্টের মার।
একেবারে জন্মিল চৌধুরী চার ॥
গঙ্গাপথের গঙ্গাধর কৈতের বেণী।
ছাতকের বসন্ত রায় পাউলির ভবানী ॥
হুজুরাপুরের মোহর চৌধুরী পাইক-পহরের রূপা।
বাহির-বন্দরের আদিত্য রায় সাফুল্লার শিবা ॥'

জেলা রাজশাহীর মধ্যে চলনবিল নামে এক অতি বৃহৎ বিল আছে। উহা রাজশাহীর মধ্যে বড়ল ও অন্যান্য নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মায় মিলিত হইয়াছে। রাজশাহী হইতে যাঁহারা নৌকাযোগে ঢাকা ও ময়মনসিংহ গমন করেন, তাঁহারা ঐ বিল বাহিয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মনদীতে পড়েন। ঐ বিল পূর্বে বহুদূর পর্যন্ত জলমগ্ন ছিল। কালক্রমে স্থানে স্থানে ভরাট হওয়ায় সেই সকল স্থানে লোকবসতি হইয়া গ্রামপত্তন হইয়াছে। ঐ বিলের মধ্যে 'কৈত' নামে একটি গ্রাম আছে। বেণী রায় নামক জনৈক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। মুসলমান-রাজত্ব-কালে দেশে ঘোর অরাজকতা বিদ্যমান ছিল, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। বেণী রায় যে স্থানে বাস করিতেন, সে স্থানের অধিকাংশ লোক দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। বেণী রায়ও তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া তাঁহার অপবাদ ছিল। তাঁহার গাঞি গোত্রের নিশ্চয়তা ছিল না। তিনি দস্যুদলে বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি অতিশয় জঘন্য শ্রেণীর লোক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তৎকালে বারেন্দ্র সমাজে কৌলীন্য মর্যাদা প্রবল থাকায় বেণী রায় সমাজে পরিচিত হইবার আশায় ও কুলীনে কন্যাদান করিবার ইচ্ছায় কুলজ্ঞদিগের নিকট গমন করিয়া মনের কথা প্রকাশ করেন। কুলজ্ঞেরা কহিলেন, তোমার কন্যা প্রথমে কুলীনে গ্রহণ করিবে না। তুমি প্রথমে শ্রোত্রিয়ে কন্যা সম্প্রদান করিয়া পরে কুলীনে কন্যা দান কর। সেই কথা শুনিয়া বেণী রায় কন্যা দেন মহেশ মল্লিকে, তৎপরে কন্যা দেন ভবানী আচার্যে, পরে কন্যা দেন সুসঙ্গের গোপীনাথ কোঙারে, পরে কন্যা দেন শ্রীপতি কোঙারে, পরে কন্যা দেন ভাটানের গঙ্গারাম চক্রবর্তীকে। পরে আপন পৌত্রী (কৃষ্ণমঙ্গল রায়ের কন্যা) দেন পীতাম্বর সান্যালের পুত্রে। পীতাম্বর সান্যাল ও রতিকান্ত মৈত্রে করণ, পীতাম্বর সান্যাল ও রামবল্লভ ভাদুড়ীতে করণ। এই দিবস যদি ব্যবহারপূর্বক করণ হইত, তবে রামবল্লভের করণেই গাইল নিষ্কৃতি হইত। গোপীনাথ কোঙার জবরদস্তী করিয়া করণ করাইলেন, তাই নিষ্কৃতি হইল না। পীতাম্বর কুশে রামবল্লভ ভাদুড়ীর গঙ্গালাভ। রামবল্লভের পুত্র রূপ নারায়ণ ও হরিনারায়ণ। এই কালে বেণী রায়ের পৌত্রী (কৃষ্ণমঙ্গল রায়ের কন্যা) লন যদুরাম সান্যাল, আর পৌত্রী শিবরাম রায়ের কন্যা রামচন্দ্র লাহিড়ী পুত্রে লওয়ান। এই দিবস ব্যবস্থাপূর্বক করণ কারণ হয়। রূপনারায়ণ বাগছী ও রূপনারায়ণ ভাদুড়ীতে করণ। রামচন্দ্র লাহিড়ী ও রঘুরাম সান্যালে করণ। ভবানীচরণ লাহিড়ী ও যদুরাম সান্যালে করণ। যদুরাম সান্যাল আর রতিকান্ত মৈত্রে করণ। রূপনারায়ণ ভাদুড়ী কুলে বড়, রূপনারায়ণ বাগছী কুলে বড়, রঘুরাম ও যদুরাম সান্যাল কুলে বড়, আর ভবানীচরণ লাহিড়ী মহামিশ্রের ছয় পুত্রের মধ্যে গরিষ্ঠ। এই সব করণ কারণ করেন, তত্রাচ বেণী নিষ্কৃতি হয় না। ব্যবস্থা

যায়— রমেশ মৈত্র যদি করণ করেন তবে, বেণী নিষ্কৃতি হয়। রূপাইর (সহিত কুলক্রিয়ার) পর রমেশের গঙ্গালাভ। রমেশের পুত্র রমানাথ, এক পক্ষে শ্রীরাম, অন্য পক্ষে বাণেশ্বর। রমানাথ কুলজে ডাউয়ার রাঘব মজুমদারের ও জয়কৃষ্ণ মজুমদারের দুই শ্রোত্রিয়ের কন্যাগ্রহণ। সেই রমানাথ মৈত্রে আর রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ। এই সকল করণ কারণ করিয়া রামচন্দ্র লাহিড়ী কুলে বড়। ওদিকে রমানাথ ও রতিকান্ত করে যায় গণনা। বেণী-নিষ্কৃতি।

"বেণী ত্রিবেণী। যারে পরশে তারে মুক্তিপদ গণি।'





পটীর সম্বন্ধে বক্তব্য

পূর্বে লিখিত হইয়াছে,[১] রোহিলা পটী হইতে তিনটি ভাব জন্মে—মমিনপুরী, মেঘনা ও রূপাই। মমিনপুরীর কুলীনেরা মেঘনার ন্যায় পরস্পর অনৈক্য হওয়ায় ছয়ঘরিয়া মত, রামনাথ লাহিড়ীর মত, কৃষ্ণরাম সান্যালের মত, চলিল। এক্ষণে রামনাথ লাহিড়ীর ও কৃষ্ণরাম সান্যালের মতের কুলীনেরা টুটা অর্থাৎ ভঙ্গ এবং শ্রোত্রিয়ান্তদোষ প্রাপ্ত হওয়ায় নির্দোষ রামনাথ লাহিড়ীর ও কৃষ্ণরাম সান্যালের মতের কুলীনের সংখ্যা কম বলিয়া ঐ দুই মতের কুলীনেরা চামু বাগ্ছীর মতে প্রবেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। দোষী কুলীনেরা কেহ কেহ অন্য পটীর কুলীনের সহিত আদান প্রদানে করণ করিতেছেন। এখন পর্যন্ত চামু বাগ্ছীর কুলীনদিগের মধ্যে কোন দোষ প্রবেশ করিতে পারে নাই। এই মতের কুলীন শান্তিপুর-নিবাসী পরলোকগত প্রসিদ্ধ ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্র ও তাঁহার আত্মীয় জ্ঞাতিগণ। টুঙ্গিমাজিদা-নিবাসী পরলোকগত লাহিড়ী কোম্পানির জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী এবং তাঁহার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণ ও ঐ গ্রাম-নিবাসী উদয়নাচার্যের অধস্তন পুরুষ পরলোকগত বলরাম খাঁর পুত্রগণ এবং কৃষ্ণদাস লাহিড়ীর অধস্তন পরলোকগত কালা চাঁদ লাহিড়ীর বংশধরেরা, চক পঞ্চানন-নিবাসী কৃষ্ণদাস লাহিড়ীর বংশধর 'অনুসন্ধান' সংবাদপত্রের সম্পাদক বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ী ও ভ্রাতা এবং শ্যামাচরণ লাহিড়ী, হরিচরণ লাহিড়ী ও পরলোকগত অঘোরনাথ ও বাবু কেদারনাথ লাহিড়ী; ভুবনেশ্বর লাহিড়ীর পুত্রগণ এবং বিল্ব-পুষ্করিণীর মৈত্র বংশীয়গণ; ইহা ভিন্ন কুমারখালিস্থ সান্যাল এবং বেলেকান্দী, ভাউডাঙ্গা, মেঘনা প্রভৃতি নানাস্থানে বহুসংখ্যক কুলীন আছেন। এই মত এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে, পৃথক হয় নাই। বিনোদ বাগ্ছীর মতের কুলীনমধ্যেও আবার দুই মত হইয়াছে।

রামনাথ লাহিড়ী ও কৃষ্ণরাম সান্যালের মতের কতকগুলি কুলীন সাঁতরাগাছির

খোষাল লাহিড়ী শ্রোত্রিয়-দোষসংসৃষ্ট হওয়ায় সেই দোষসংসৃষ্ট কুলীনেরা 'খোষালি মত' বলিয়া খ্যাত। ঐ খোষালি মতের কুলীনেরা ভবানীপুরীতে প্রবেশ করিয়া ভবানীপুরী পুষ্ট করিতেছেন। ভবানীপুরী পটীর কুলীন কুলগাছি, চণ্ডীপুর, ঝাউডাঙ্গ, বালি, সমুদ্রগড়, উসৎপুর, দামপাল এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ফুলবেড়িয়া প্রভৃতি গ্রামে এবং রাজশাহী জেলায় হালসা প্রভৃতি স্থানে আছেন। পুটিয়ার জমিদারেরা ও খাঁ, সান্যাল এবং মৈত্র প্রভৃতি কতকগুলি কুলীন পাচুড়িয়া দোষাশ্রিত। তাঁহারা ভবানীপুরী পটীর কুলীন।

মুক্তাগাছার গৌরীকান্ত আচার্যের বৈমাত্র ভগিনীর ফোটা হয় খাজুর রাজচন্দ্র সান্যালে। পরে এই কন্যা গৌরীকান্ত আচার্যের বিমাতা উৎসর্গ করেন কলিকাতার শিবু সান্যালের পুত্র মধু সান্যালে। তাহাতে মধুসূদন সান্যালের দোষ ঘটে, এই মধু সান্যাল জোড়াসাঁকো শ্যাম মল্লিকের বাড়ির সম্মুখের বাড়িতে বাস করিতেন। এইখানে সর্বপ্রথম ন্যাশনাল থিয়েটার হয়।

১। খোজাম্বরি, পরাণ মৌলিকী ও মুদাখানী এই তিন দোষে নয়নানন্দ আচার্য সান্যাল, মহেশ লাহিড়ী ও গোপীনাথ বাগ্‌ছী এই তিন কুলীন আবদ্ধ থাকেন। এই তিন কুলীনের দোষ পীতাম্বর, কৃষ্ণানন্দ পাত্‌সা এবং দামোদর সান্যাল প্রভৃতি ২৪ জন কুলীনের সঙ্গে পাল্টাপাল্‌টি পরিবর্ত করিয়া কেশব খাঁ ভাদুড়ীর উদ্যোগে সমতা হইয়াছিল, ঐ আদানকে সাতাইশ পাল্‌ট্ বলে। সাতাইশ পালটের বিবরণ নিয়ে লিখিত হইল—

১. পূর্ব গোপীনাথে পীতাম্বর সান্যালের করণ, ২. পীঁতাম্বরে কৃষ্ণানন্দ পাত্‌সায় করণ, ৩. গোপীনাথে দামোদরে করণ, ৪. গোপীনাথে রাজবল্লভ রায়ে করণ, ৫. গোপীনাথে কেশব খাঁয়ে করণ, খোজাম্বরি নিষ্কৃতি। পরে পাছপাছ ৬. গোপীনাথে শিবরাম সান্যালে করণ ৭. গোপীনাথে চতুর্ভুজ ভাদুড়ীতে করণ, নিরাবিল, ৮. মুদাখানীর পর মহেশ লাহিড়ী ও দামোদর মৈত্রে করণ, ৯. মহেশে রাজবল্লভ রায়ে করণ, ১০. মহেশে চাঁদ রায়ে করণ মুদাখানী নিষ্কৃতি। ১১. চাঁদ রায় ও গোপাল সান্যালে করণ (সর্বদ্বারিক), ১২. রামচন্দ্র লাহিড়ী ও রতিকান্ত মৈত্রে করণ (অমাবস্যার শ্রাদ্ধ প্রতিপদে হইল), তৎপরে ১৩. কৃষ্ণানন্দ পাতসা ও পীতাম্বর সান্যালে করণ ১৪. পীতাম্বর সান্যাল ও কেশব খাঁয়ে করণ ১৫. পীতাম্বর সান্যাল ও (গুড়নইর) রঘুনাথ মৈত্রে করণ ১৬. পীতাম্বর সান্যাল ও রতিকান্ত মৈত্রে করণ. ১৭. কৃষ্ণানন্দ পাতসা ও (পুখুরিয়ার) গোবিন্দ সান্যালে করণ, ১৮. কৃষ্ণানন্দ পাতসা ও কৃষ্ণদাস লাহিড়ীতে করণ, ১৯. কৃষ্ণদাস লাহিড়ী ও জগন্নাথ ভাদুড়ীতে করণ. করণ (রাম ভাদুড়ী বংশ), ২০. কৃষ্ণদাস লাহিড়ী ও গঙ্গারাম সান্যালে করণ, ২১. কৃষ্ণদাস লাহিড়ী ও রামবল্লভ ভাদুড়ীতে করণ, ২২. গঙ্গারাম সান্যাল ও জানকীনাথ লাহিড়ীতে করণ. ২৩. কৃষ্ণদাস লাহিড়ী ও গোবিন্দ পাত্‌সায় করণ, ২৪. কৃষ্ণদাস লাহিড়ী ও (পুখুরিয়ার) রামদাস সান্যালে করণ. ২৫. রমেশ মৈত্র ও দেবীদাস সান্যালে করণ. ২৬. রমেশ মৈত্র ও রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ. ২৭. গোবিন্দ সান্যাল ও গঙ্গানন্দ বাগ্‌ছীতে করণ এই সাতাইশ পালট। এইরূপে কেশব খাঁ সাতাইশ পালট করিয়া খোজাম্বরি ও মুদাখানী-দোষ নিষ্কৃতি করেন।

২। আলেখানী পটীর কুলীন মাত্র ৩/৪ ঘর তাঁহারা এক্ষণে ভবানীপুরী পটীর কুলীনের সহিত আদান-প্রদান করিতেছেন।

৩। ইনি ভবানীপুরের মথুরেশ চক্রবর্তীর কন্যা বিবাহ করিয়া ভবানীপুরগ্রস্ত হন।

৪। গৌড়ে ব্রাহ্মণকার মহিমাচন্দ্র মজুমদার মহাশয় জিতমিত্র রত্নাবলীর বংশাবলী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত রাজশাহী জেলার শ্যামনগরনিবাসী আটপটীর শ্রেষ্ঠ কুলাচার্য প্রাণনাথ মুকুটমণি ও রামনাথ সিদ্ধান্ত মহাশয়দ্বয়ের কুলগ্রন্থের মিল নাই, উক্ত স্থানে প্রাপ্ত বংশাবলী উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

৫। ইনি সুসঙ্গে বিবাহ করিয়া মল্লিক-যদুনাথী দলে মিলিত হন, ইঁহার পিতামহ কমল লাহিড়ী ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া ভূষণায় পলায়ন করেন, শেষে তথায় মৈশালা আলামী দোষে লিপ্ত হন। পরে করণ কারণ করিয়া মুক্তি পান এবং ভূষণাপটীর কুলীন হইয়াছিলেন।

৬। ডাকুয়াই প্রভৃতি ৪ জন পাচুড়িয়াদোষগ্রস্ত।

৭। কামিনী-আদাতে পূর্ব বংশ দ্রষ্টব্য।

৮। এ ছাড়া কুলাচার্যগণের পটী-ব্যাখ্যা গ্রন্থে বাহির-নিরাবিলের উল্লেখ আছে, তাহার পরিচয় মথুর-কোপা-অবসাদ প্রসঙ্গে ৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। (বেণী রায়ের পৌত্রীব সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়া বেণীদোষগ্রস্ত হন।)

৯। ১২০ পৃষ্ঠা দেখ।

১০। 'মোটা ঘটক কানা কুলীন কানা তার ভাই।
টুটী কাটায় করণ ক'রে হইলা রূপাই।"

দশম অধ্যায়

বারেন্দ্রকুলের সমালোচনা

যৎকালে মহারাজ বল্লাল সেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে কৌলীন্য মর্যাদা সংস্থাপন করেন, তৎকালে কুলীনগণ শ্রেষ্ঠ পদে এবং শ্রোত্রিয়গণ নিম্নপদে অধিষ্ঠিত হইলেও কাহার পুত্রে কে কন্যাদান করিবেন, তাহার কোন ব্যবস্থা না করায় মহারাজ বল্লাল সেনের রাজোচিত কার্যই হইয়াছিল। তৎপরে মহারাজ বল্লাল সেন হইতে উদয়নাচার্য ভাদুড়ী পর্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসর কাল কুলীনের পুত্রকন্যা শ্রোত্রিয়ে এবং শ্রোত্রিয়ের পুত্রকন্যা কুলীনে আদান প্রদান হইয়া আসিতেছিল। উদয়নাচার্য নিজে কুলীন এবং বারেন্দ্র সমাজের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পদমর্যাদায় শ্রোত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অথচ তাঁহার অপেক্ষা সমমর্যাদায় নিম্নপদস্থ শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিতে হইবে, ইহা অপমানজনক বোধ করিয়া কুলীনদিগের মধ্যে পরিবর্ত-প্রথা সৃষ্টি করেন এবং পরিবর্ত বিবাহের পূর্বে করণপ্রথা প্রচলিত করেন। শ্রোত্রিয় আশ্রয়স্বরূপ থাকিলেন অর্থাৎ করণ ও পরিবর্ত বিবাহ সময়ে শ্রোত্রিয় উপস্থিত থাকিবেন। শ্রোত্রিয়েরা কুলীনে কন্যাদান করিবেন, কিন্তু কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। যেরূপ ভাবে করণ করিতে হইবে, তাহা স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে।

কুলীনের পিতা বর্তমান থাকিলে পুত্রগণকে 'পিতার কুশে থাকা' বলে।

পিতা বর্তমানে কুলীন ভ্রাতৃগণের যদি কেহ কাপের সহিত করণ করেন, তাহা হইলে উক্ত কুলীন 'কাপ' এবং তাঁহার ভ্রাতা ও পিতা দোষগ্রস্ত হইয়া 'পোক্‌রা' শব্দে অভিহিত হন। তাঁহারা সচরাচর কুলীনের মধ্যে ব্যবহৃত হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা কাপ সমাজে কুলীনের তুল্য বলিয়া সমাদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পিতার মৃত্যুর পর কুশ পৃথক না হইলে অর্থাৎ সকল ভ্রাতায় আলাহিদা করণ না করিয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে যদি কোন ভ্রাতা কাপের সঙ্গে করণ করেন, তবে অপর কুলীন ভ্রাতৃগণ দোষগ্রস্ত হইয়া 'ভাইকরা' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

কুলীনের পুত্রগণ তাঁহাদিগের পিতার মৃত্যুর পর আপনাপন কুশ বিভাগ করার জন্য সকলেই পৃথক পৃথক করণ করিতে বাধ্য। এইরূপ করণ অধিকাংশ স্থলেই কুশময় করণ হইয়া থাকে। এই করণের নাম 'কুলজ করণ'। কুলীন মধ্যে পিতা বর্তমানে এইরূপ করণ করার অধিকার পুত্রগণের নাই।

কুলীনের পিতা বর্তমানে তিনি স্বয়ং অথবা পুত্রগণকে যদি কাপের সহিত করণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি এবং তাঁহার পুত্রগণ কোন অবস্থাতেই কুলীনের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারেন না। যদি তাঁহার অনভিমতে তাঁহার কোন পুত্র কর্তৃক ঐরূপ কার্য হয়, এবং যদি তিনি তৎক্ষণাৎ উক্ত পুত্রকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি কুলমর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু এই ব্যবস্থানুযায়ী ঐরূপ স্থলে দোষগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে সচরাচর কুলীনের মধ্যে পরিগণিত হইতে দেখা যায় না।

যদি শ্রোত্রিয়ের কন্যা কুলীনে বিবাহ করেন, তবে সেই কুলীন শ্রোত্রিয়-ভাবাপন্ন হইবেন, এই কারণে বিবাহের পরে সেই কুলীন অথবা তাঁহার পিতা কুলীন সহিত পাছাপাছ করিয়া শ্রোত্রিয়-ভাবাপন্ন হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, সেই করণকে 'উপকার করণ' বলে।

কুলীন অথবা কাপের অজ্ঞাতে এবং অনভিমতে তাঁহাদের পুত্র অথবা অন্য কোন বন্ধু কর্তৃক কুলীনের কন্যা কাপে অথবা শ্রোত্রিয়ে এবং কাপের কন্যা শ্রোত্রিয়ে বিবাহ দেওয়া হইলে উক্ত কুলীন প্রথমোক্ত কারণে কাপ এবং শেষোক্ত কারণে 'শ্রোত্রিয়ান্ত' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহার নিষ্কৃতির ব্যবস্থা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

কাপ সমাজের নিয়মাবলী অনেক স্থলে কুলীনের সহিত বিভিন্ন। কাপ ইচ্ছা করিলে আপন জীবদ্দশায় সন্তানগণকে কুশ পৃথক করিয়া দিয়া অর্থাৎ সন্তানগণকে আপনাপন কন্যা পুত্রের বিবাহে করণ করার আদেশ দিয়া করণ পরিত্যাগ করিতে পারেন।' কিন্তু উক্তরূপ করণ ত্যাগ করার পর পিতার করণ করায় অধিকার সম্পূর্ণ লোপ হয়। করণ ত্যাগ করার পর তাঁহার কোন পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে উক্ত সন্তানগণের 'গর্ভসুড়া' অপবাদ হয় এবং তাহাদিগের করণ করায় অধিকার থাকে না। কিন্তু যে সকল পুত্রগণকে করণ করার আদেশ করিয়াছেন, তাহাদিগের কোন অপবাদ হয় না।

করণ ভিন্ন কুলীন ও কাপে স্বজাতির কন্যাগ্রহণ ও স্বজাতিতে কন্যাদান উভয়ই নিষিদ্ধ। কুলগ্রন্থে লিখিত আছে —

"কুলীনত্বং পরিবর্তং কথিতং কুলপঞ্জিকাং।
কন্যায়া প্রতিদানেন শ্রোত্রিয়ত্বং বিধীয়তে ॥"

কাপ অপেক্ষা কুলীন শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য উচ্চশ্রেণীর বন্ধুহীন কন্যা, করণ ব্যতীত গ্রহণ কাপের পক্ষে অনুমোদিত হইয়াছে। শ্রোত্রিয়ের সম্বন্ধে করণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং যে কুলীন অথবা কাপ, করণ ব্যতীত কন্যাদান করেন, তিনি শ্রোত্রিয়ের ধর্ম অবলম্বন করিলেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন। কুলজ্ঞ-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, পরশুরাম পঞ্চানন নামক একজন প্রসিদ্ধ আঢ্যকাপ তাঁহার কন্যার বিবাহ নিরাবিল পটীর কুলীন কৃষ্ণদাস লাহিড়ীর পুত্রের সহিত সম্পাদন করেন। (পরশুরাম পঞ্চাননের বংশাবলী যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।)

কৌলীন্য-মর্যাদার প্রতিষ্ঠা হইতে সমাজে কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে কুলজ্ঞগণের অপরিসীম ক্ষমতা ও প্রভুত্ব পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। মন্বাদি মহর্ষিগণ প্রণীত ধর্মশাস্ত্র যেরূপ আর্যগণ বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিতে বাধ্য, কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে কুলজ্ঞগণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বারেন্দ্র সমাজ ও তদ্রূপ বাধ্য ছিলেন। কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে ব্যবস্থা ও বিচারের ভার কুলজ্ঞগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। বর্তমান সময়ে কুলজ্ঞগণের যেরূপ হতাদর হইয়াছে, পূর্বে তদ্রূপ ছিল না। সমাজ মধ্যে অতিশয় ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারিগণও অতি দরিদ্র কুলজ্ঞের নিকট অবনত মস্তকে থাকিতেন। কুলজ্ঞগণ, করণ ব্যতীত বিবাহ দর্শনে অতিশয় কুপিত হইয়া কৃষ্ণদাস লাহিড়ীকে 'কিংবদন্তি' নামক অবসাদ দিয়া আস্তাড়ন করেন। কিংবদন্তি অর্থাৎ এরূপ একটি ভয়ঙ্কর অসদানুষ্ঠান হইল যে, তাহার কি অভিধান প্রদত্ত হইবে, তাহার কিছুই স্থির নিশ্চয় হইল না। এতদুপলক্ষে নানারূপ বিচার আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ বিচারের পর কুলজ্ঞগণ স্থির করিলেন যে, পরশুরাম পঞ্চানন কন্যার বিবাহকালীন করণ না করা হেতু শ্রোত্রিয় হইলেন তাঁহার কন্যা গ্রহণ করায় কুলীনের, শ্রোত্রিয়-কন্যা গ্রহণের ফল হওয়ায় কুলীনের কোন দোষ হইবে না। পরশুরাম একজন প্রধান কুলজ্ঞ

ছিলেন। কুলীনের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়ায় কুলজ্ঞগণ তাঁহাকে সিদ্ধ শ্রোত্রিয় পদ প্রদান করিলেন। এই ঘটনা হইতেই সমাজে উক্তরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। কুলীন যদি অন্য কোন কুলীনের সহিত করণ ব্যতীত কন্যা সম্প্রদান করেন, তাহা হইলে কন্যাদাতা কুলীন শ্রোত্রিয় হইবেন কিন্তু গৃহীতা স্বপদে থাকিবেন।

কুলীন মহাশয়দিগের কন্যা প্রদান সম্বন্ধে দুই তিন পুরুষ হইতে একটি রহস্যজনক ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। বারেন্দ্র শ্রেণী ১০০ ঘরে ১০০ গাঞি, তাহার ৭ ঘর এবং পংক্তি পূরণ জন্য ভাদড় ১ ঘর, এই ৮ ঘর কুলীন। সিদ্ধশ্রোত্রিয় ৮ ঘর ও সাধ্য-শ্রোত্রিয় ৮ ঘর এই ১৬ ঘর শ্রোত্রিয় কুলীনে সম্প্রদান করিবেন। অবশিষ্ট শ্রোত্রিয়ের অধিকাংশ আদান প্রদান ক্রয় বিক্রয়ের ন্যায় সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। কুলীন মহাশয়েরা তাঁহাদের কন্যার বিবাহের জন্য একটি কুলীন পাত্র ঠিক করিয়া সে পাত্রের বয়স বেশি বা কম হইলেও ক্ষতি নাই সিদ্ধান্ত করিয়া সেই পাত্রের সহিত করণের প্রণালী অনুসারে করণ করিয়া ঐ কন্যার যে কুলীনের সহিত করণ হইল, তাহার সহিত বিবাহ না দিয়া যাহারা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করে, তাহাদের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন। কুলীনের সহিত করণের পূর্বে ঐরূপ পাত্রও তাহার নিকট যত টাকা লইবেন, সমুদয় স্থির করিয়া পরে কুলীনের সঙ্গে করণ করেন, এই করণকে 'পাত্রান্তরে করণ' বলে। যে কুলীনের সহিত করণ করিবেন, সে কুলীন যদি ঐরূপ হইবে জানিতে পারিলে প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করেন, পরে সামান্য অর্থ পাইলেই করণ করিয়া দেন, তাহাতে করণ করিয়া নিকৃষ্ট শ্রোত্রিয়ে ঐ করণীয়া কন্যার বিবাহ দিলে সেই কুলীনের কুল নষ্ট হয় না। এইরূপ দুইটি কন্যা পর পর পাত্রান্তর করিলেও সে কুলীনের কুল নষ্ট হয় না। কিন্তু তৎপরবর্তী কন্যা অর্থাৎ তৃতীয়া কন্যা কুলীনে বিবাহ না দিলে সে কুলীনের কুলপাত হইবে। যে কুলীন, কুলীনের সহিত করণ করিয়া ঐ করণীয়া কন্যা শ্রোত্রিয়ে বিবাহ দেন, তাঁহার সহিত সেই সমাজের কুলীনেরা পরস্পর করণ করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। এইরূপ ব্যবহার পদ্মানদীর দক্ষিণ পারের রোহেলাপটীর ও ভবানীপুর পটীর মধ্যেই অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মানদীর উত্তর পারে নিরাবিল, ভূষণা, বেণী ও জোনালি পটীর কুলীনদিগের মধ্যে কেহ ইচ্ছাপূর্বক ঐরূপ কার্য করিলে সেই সমাজের অপরাপর কুলীনেরা তাহার সহিত আদান-প্রদান রহিত করেন। যদি কোন কুলীনের কন্যার করণ করার পর, যে কুলীনের সঙ্গে করণ করিয়া কন্যার বিবাহ দিবার অঙ্গীকার করেন, সেই অঙ্গীকৃত পাত্র মৃত্যু কি অন্য কোন রকমে অন্যথা হইলে সেই কন্যার বিবাহ দিতে কন্যার পিতা বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়েন। সেই কন্যাকে 'ঢেমনা' কন্যা বলে। ঐ কন্যা সৎসিদ্ধ-শ্রোত্রিয়ে বিবাহ করেন না। কন্যার পিতা কোন আত্মীয়ের দ্বারা অতি গোপনে গ্রামান্তরে লইয়া গিয়া কোন কষ্ট শ্রোত্রিয়ের বয়োধিক পাত্রের সহিত কন্যাকে কোন এক অবীরা আত্মীয়ার দ্বারা সম্প্রদান করিয়া দিয়া বিবাহান্তে ঐ কন্যা জামাতার সহিত সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করেন। ঐরূপ কন্যাকে শাস্ত্রে 'অন্যপূর্বা কন্যা', চলিত কথায় 'করণীয়া কন্যা' বলে। এরূপ কন্যা পূর্বে সৎশ্রোত্রিয়ে বিবাহ করিতেন না এবং কন্যার পিতা, ভ্রাতা বা আত্মীয়েরা জামাতা কন্যার কোন সংস্রবে থাকিতেন না। শান্তিপুরের গোস্বামী মহাশয়দিগের পুরুষানুক্রমে রোহেলা ও ভবানীপুর পটীর কুলীনে এবং সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে কন্যা দান করা তাঁহাদের একটি ব্রত ছিল। সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে কন্যা দানের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পূর্বোক্ত পরশুরাম পঞ্চানন কুলজ্ঞের অধস্তন

সন্তানদিগকে ১০টির অধিক কন্যাদান করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, কালের কুটিল গতিতে এবং সমাজের বিশৃঙ্খলায় অতি উচ্চ বংশীয় গোস্বামী মহাশয়েরাও এইরূপ অতি ঘৃণিত শ্রোত্রিয়ে কন্যা সম্প্রদান করিয়া পূর্ব পুরুষের সম্মান রক্ষা ও অন্যপূর্বা করণীয়া কুলীন কন্যা বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করিতেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"অনাপূর্বা বয়োজ্যেষ্ঠা মাতৃনামা স্বগোত্রজা।
অন্নপুষ্টা পয়ঃমুত্রসঙ্গমে মাতৃসঙ্গমঃ।"

ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা ঐ সমস্ত বিবাহ অসৎ কার্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

কুলীনদিগের আর একটি কার্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পূর্বে কুলীনেরা ঐরূপ কন্যার বিবাহ দিয়া কন্যা জামাতার সহিত কোন সংস্রব রাখিতেন না এবং সেই কন্যার পাকস্পর্শ অর্থাৎ 'বৌভাত' হইত না। কোন সামাজিক কি সামান্য কার্যেও তাঁহার রন্ধন-শালায় প্রবেশ কিংবা রন্ধনের উপকরণ কোন দ্রব্যাদি পর্যন্ত স্পর্শ করা নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহার গর্ভজাত সন্তানদিগের সামাজিক ভোজনে কুলীন ও সিদ্ধশ্রোত্রিয়দিগের মধ্যস্থলে বসিয়া ভোজন করার অধিকার ছিল না। সমাজের এক পার্শ্বে অবনত মস্তকে সাধারণ বারেন্দ্রের মধ্যে বসিয়া আহার করিতে হইত। ভোজনের সম্মান মাছের মুড়া তাহাদের পাতে পড়িত না। এমন কি কোন সামান্য ভোজন ব্যাপারে সমাজে তাহাদের পরিবেশন করিবার অধিকার ছিল না। আর এক্ষণে কুলীন মহাশয়েরা বিবাহান্তেই অষ্ট মঙ্গলায় কন্যা জামাতা গৃহে আনিয়া আমোদ প্রমোদ এবং কুটুম্বিতা পর্যন্ত করিতেছেন, সেই কন্যা কুলীন পিতার গৃহে রন্ধনাদি করিয়া ভোজন পর্যন্ত করাইতেছেন। যে সকল কুলীনেরা কন্যার করণ করিয়া সেই কন্যা বিক্রয় ও সেই কন্যার শ্বশুরকুলের সহিত আহার ব্যবহার ও কুটুম্বিতা এবং উপরোক্ত কন্যার হস্তের রন্ধনাদি ভোজন করেন, তাঁহাদিগকে সচরাচর 'পাঁটিবেচা' বলে। কন্যা সমাজে কন্যার ঐরূপ অপব্যবহার হয় না। তাঁহারা স্বজাতির কন্যাগ্রহণ ও দান কারণ কন্যার বিবাহের দিন প্রাতঃকালে করণ করেন। কুলীনদিগের করণের ন্যায় কাপেরও করণ হয়। কাপে ঐরূপ ঘৃণিত কার্য করেন না। এ কারণে পদ্মানদীর দক্ষিণ পারের কুলীন অপেক্ষা কাপদিগের সম্মান অধিক।

মুসলমান অধিকার বঙ্গদেশে সর্বত্র বিস্তৃত হইলে মুসলমান রাজপুরুষগণ এক এক স্থানের প্রধান কর্মচারী হইয়া সৈন্য-সামন্ত লইয়া থাকিতেন। সেই সকল কর্মচারীরা বলপূর্বক হিন্দুদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া তাহাদের যুবতী স্ত্রী কন্যা কাড়িয়া লইত, তাহাতে বহু হিন্দু জাতিচ্যুত হইয়া মুসলমান হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সম্ভ্রান্তবংশীয় অনেকে তাহাদের উক্তরূপ অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য স্ব স্ব বাসস্থান, ভূমি সম্পত্তি প্রভৃতির মমতা ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন।

অন্যদিকে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সকল মুসলমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়া তাঁহাদের অধীন কর্মচারী হইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নবাবের দেওয়ানী পদ হইতে বড় বড় রাজকীয় পদে নিযুক্ত হইতেন এবং খাঁ, রায়, চৌধুরী, রায়চৌধুরী প্রভৃতি নানাপ্রকার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চাকুরি উপলক্ষে মুসলমানের সহিত ঐ সকল কর্মচারীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় মুসলমানেরা সুবিধা পাইলেই তাঁহাদের পত্নী ও পরিবারের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিত। যাঁহাদের পত্নী ও কন্যা মুসলমানেরা লইয়া গিয়া জাতিনাশ

করিবার উদ্যোগ করিত, তাঁহারা পত্নী ও কন্যার উদ্ধার করিয়া আনিয়া ঐ কন্যা কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের সহিত বিবাহ দিয়া জ্ঞাতি ও কুটুম্বদিগের সহিত ভোজন করিয়া দোষ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতেন। দোষ-সংসৃষ্ট কন্যার বিবাহ দিয়াই যে কন্যার পিতা এবং ভ্রাতা দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন, তাহা নহে। কুটুম্ব, আত্মীয় ও জ্ঞাতি প্রভৃতিকে একত্র ভোজন না করাইলে যাঁহারা ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন, তাঁহারাও ঐ দোষে আক্রান্ত হইতেন। বর্তমান কালের বিবাহের সহিত সে কালের বিবাহ তুলনা করিলে সম্পূর্ণ পার্থক্য লক্ষিত হইবে। সে সময়ের বিবাহ যদি বর্তমান কালের বিবাহের ন্যায় হইত, তাহা হইলে অধুনা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হইত। কুলীনেরা পরস্পর আদান প্রদানের পূর্বে পরস্পর করণ করিয়া সমীকরণ করিতেন। শ্রোত্রিয়েরা কুলীনে কন্যাদান করিয়া বিবাহের পর দিবস বরের পিতা ও অন্যান্য কুলীনের সঙ্গে করণ করিয়া সমীকরণ করার পর এই করণকে 'উপকার করণ' বলে। শ্রোত্রিয়-কন্যা কুলীনে গ্রহণ করিলেই সেই কুলীন শ্রোত্রিয় ভাবাপন্ন হন, এই কারণে অন্যান্য কুলীনের সহিত করণ করিয়া সমীকরণ করিলেই কুলীনের ভাবপ্রাপ্ত হইতেন। কন্যাকর্তার বাটিতে বরের পক্ষে আত্মীয় কুটুম্ব এবং কন্যাকর্তার আত্মীয় কুটুম্ব একযোগে ভোজন করাইয়া কন্যাকর্তা মর্যাদাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বস্ত্র ও অর্থ দিয়া বিদায় করিতেন, ঐ ভোজনের নাম 'স্বকৃত ভোজন'। বরের বাটীতেও বরের পিতাকে ঐরূপ ভোজন করানোর নাম পাকস্পর্শ। নববধূ অন্নের পাত্র হস্তে করিয়া ভোজনের স্থানে প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের পাতে এক এক মুষ্ঠি অন্ন পরিবেশন করার নাম 'পাকস্পর্শ ভোজন'। নববধূর হস্তে পাকস্পর্শ না হইলে সে বধূ কোন ভোজ্যে রন্ধন করিয়া কুলীন ও শ্রোত্রিয়কে পরিবেশন করিতে পারিত না। তাহার প্রবাদ থাকিত—ইঁহার বিবাহের পর পাকস্পর্শ অর্থাৎ 'বৌভাত' হয় নাই। সুতরাং উনি রন্ধন করিতে পারিবেন না। স্বকৃত ও পাকস্পর্শ ভোজনে কুলীনের ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের স্ত্রীলোকেরাই রন্ধন করিবার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনুসন্ধানে কাহার কোন দোষ বাহির হইলে তাঁহাকে রন্ধনশালা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত। কষ্ট-শ্রোত্রিয়দিগের স্ত্রীলোকেরা শূদ্রকন্যার ন্যায় রন্ধন-শালার ত্রিসীমায় যাইবার অধিকারিণী ছিলেন না। পরিবেশনের সময় উক্ত প্রকারের পাচিকা দ্বারাই পরিবেশন করিবার নিয়ম পদ্মানদীর উত্তর পারে এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে। পদ্মানদীর দক্ষিণ পারের নিয়ম—সিদ্ধশ্রোত্রিয়ের বাটীতে তিনি ও তাঁহার পুত্র, ভ্রাতষ্পুত্র, জামাতা, দৌহিত্র, ভাগিনেয় ও জ্ঞাতি ইঁহারাই পরিবেশন করিবার অধিকারী। বারেন্দ্রদিগের কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের বাটীতেও বিবাহ ও অন্যান্য ভোজের সময়ও ঐরূপ নিয়ম চল্লিশ বৎসর পূর্বেও প্রচলিত ছিল। ভোজনই জাতিরক্ষার একটি মুখ্য কারণ। এক্ষণে পদ্মানদীর দক্ষিণ পারে বারেন্দ্র মহাশয়েরা 'স্বকৃত ভোজন' বিস্মৃত হইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাকস্পর্শের ভোজনের কথায় শরীর শিহরিয়া লেখনী অচল হইয়া যায়।

কুলীনগণ ও শ্রোত্রিয়েরা স্বাধীনভাবে আদান-প্রদান করিলে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা হইবে বিবেচনায় রাজা বল্লাল সেন তাঁহার প্রদত্ত কুলমর্যাদার সময়ে কুলীন ও শ্রোত্রিয়দিগের নেতৃ-স্বরূপ ঘটক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বারেন্দ্র সমাজে ঘটক ও কুলজ্ঞ পৃথক। যাঁহারা বর কন্যার যোগাযোগ করিয়া দেন, তাঁহারাই ঘটক। যাঁহারা কুলীন ও শ্রোত্রিয়দিগের বংশ, অংশ ও কোনরূপ দোষ থাকিলে তাহা সমাজে প্রকাশ করেন এবং করণের সময় উপস্থিত থাকিয়া করণের মন্ত্র পড়াইয়া করণ করাইয়া থাকেন, তাঁহারাই

কুলজ্ঞ। করণের সময় কুলীনদিগের আপনাপন পটীর কুলজ্ঞগণ সেই, পটীর কুলীন এবং শ্রোত্রিয়েরা উপস্থিত থাকিয়া ঘাটে করণ হইত। করণের পর সেই ঘাটে সভা হইত, সেই সভাতে কুলীনেরা ও শ্রোত্রিয়েরা কন্যার পাত্র স্থির করিবার জন্য কুলজ্ঞদিগের নিকট স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। কুলজ্ঞেরা কুল-বিচার করিয়া সেই সভাতেই কুলীন ও শ্রোত্রিয়-কন্যার উপযুক্ত বরের সন্ধান করিয়া দিতেন, কুলীন ও শ্রোত্রিয়েরা সেই ব্যবস্থা শিরোধার্য করিয়া লইতেন। অন্যথা করিবার কাহারও সাধ্য ছিল না। কুলজ্ঞদিগের কথা অন্যথা করিলে কুলীন ও শ্রোত্রিয় স্ব স্ব পটীর কুলীনদিগের সহিত আদান প্রদান করিতে পারিতেন না। দান ও পণের বিষয় কুলজ্ঞেরা যাহা বলিয়া দিতেন, উভয় পাত্র তাহাতেই সম্মত হইতেন। কুলজ্ঞদিগের অনুপস্থিতিতে করণ ও বিবাহ হইত না। কুলজ্ঞেরা উপস্থিত বর ও কন্যা পক্ষের বংশাবলী ও আদান-প্রদান বর্ণনা করিতেন। কুলীন ও শ্রোত্রিয় যদি কোনরূপ দোষগ্রস্ত হইতেন, কুলজ্ঞেরা তাহা সমাজে প্রকাশ করিয়া দোষাশ্রিত ব্যক্তিকে স্থগিত করিতেন, সমাজস্থ ব্যক্তিরাও কুলজ্ঞের মতাবলম্বী হইতেন। তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের পূর্বপুরুষ বারেন্দ্রকুলের সমাজপতি ছিলেন। তিনি সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, তিনি ভোজনের মজলিসে কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের সঙ্গে যাঁহাকে লইয়া একত্রে ভোজন করাইতেন, তিনি দোষাশ্রিত হইলেও দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। তবে রাজা স্ব ইচ্ছায় ভোজন দিতে পারিতেন না। তাঁহাকে কুলজ্ঞদিগের অনুমতি লইতে হইত।

উদয়নাচার্যের পরিবর্ত-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই কুলজ্ঞ নিযুক্ত হন। কালের পরিবর্তনে কুলীন ও শ্রোত্রিয়দিগের কৌলীন্য-মর্যাদার প্রতি ক্রমশ আস্থা হ্রাস হওয়ায় কুলজ্ঞদিগের পরিবার প্রতিপালন ও নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়াতে তাঁহারা ঘটকের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লজ্জাবশত ঘটকেরা কুলজ্ঞ আখ্যা গ্রহণ করেন নাই।

কুলীনদিগের করণের সময় সে স্থলে কাপের যাওয়ার অধিকার ছিল না, এবং কাপের করণ কুলীনে দেখিতে নাই, কুলীনগণের এরূপ নিয়ম ছিল। তাহার প্রমাণ—কুলজ্ঞ পরশুরাম পঞ্চানন আপন কুলপাত হওয়ায় কাপ হইয়াছিলেন। তিনি কুলীনের করণ ও বিবাহে উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রোত্রিয়ের পদ গ্রহণ করেন। পূর্বে কুলজ্ঞ ভিন্ন কাহারও করণের মন্ত্র পড়াইবার অধিকার ছিল না। এখন কুলীনের কুলজ্ঞ পুরোহিত উপস্থিত থাকিলেও ভিন্ন শ্রেণী কুশাদি লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে কাপদিগের সংস্রবে অর্থাৎ তাহাদিগের সহিত ভোজন, স্নান ও শয়ন ইত্যাদিতে কুলীনের কুলপাত হইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে কুলজ্ঞরা তৎকালীন বারেন্দ্র সমাজের যূপ সদৃশ তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণের নিকট গিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! কাপ সৃষ্টি হইয়া তাহাদের সহবাসে এবং স্নান ভোজনাদিতে কুলীনের কুলপাত হইতেছে। অতএব আপনি তাহার প্রতিকার করুন।' তচ্ছ্রবণে রাজা কহিলেন, 'কি উপায় অবলম্বন করিলে কুলীনের কুলরক্ষা হয়, আপনারা তাহার ব্যবস্থা করুন।' কুলজ্ঞেরা কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি হিন্দু শ্রেষ্ঠ, বারেন্দ্র কুলের যূপ, আপনি যাহা করিবেন, তাহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না। অতএব আমরা ব্যবস্থা করিলাম, আপনি কাপে কন্যা দান করিয়া, কাপে কুলীনে এক পংক্তিতে ভোজন দিয়া কুলীনের কুলরক্ষা করুন। যেহেতু আপনি সতেজকে আস্তাড়িলে নিস্তেজ হয় আর নিস্তেজকে ভোজন দিলে সতেজ হয়।' রাজা কংসনারায়ণ কুলজ্ঞদিগের ব্যবস্থা মত কাপে কন্যাদান দিতে স্বীকৃত হইয়া কাপ জীবাইধাবড় সিংহের পুত্রে এবং ডাউর মাঝির পুত্র সদানন্দ মাঝিকে কন্যা দেন। রাজা

দুই কন্যা দুই কাপে দান করিয়া কাপে কুলীনে এবং পংক্তিতে ভোজন দিয়া কহিলেন, কাপে ও কুলীনে কুশবারি সংযুক্ত অর্থাৎ কাপে কুলীনে করণ হইলে কুলীনের কুলপাত হইবে। স্নান, ভোজন ও শয়নে কুলীনের কুলপাত হইবে না। যে ১২ ঘর কুলীন বন্ধ ছিলেন, তাঁহাদিগের কুল রক্ষা হইল। রাজা কংসনারায়ণের সভায় সেই সময় বহু সংখ্যক কুলজ্ঞ, কুলীন, শ্রোত্রিয় ও কাপ সমুপস্থিত ছিলেন। রাজা সকলের সাক্ষাতে ঐরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন। কুলজ্ঞেরা কহিলেন, কাল সহকারে কাপের আদর হইবে।

অন্যান্য কুলীনের সম্মতি অনুসারে রাজা কংসনারায়ণ মুকুন্দ ভাদুড়ী ও তদীয় পুত্র চতুষ্টয়কে উপরোক্ত দোষ হইতে অব্যাহতি দিয়া বারেন্দ্র সমাজ ও হিন্দু ধর্মরক্ষার্থ নিম্নলিখিত নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যথা—

১ম : কুলীনের সহিত কাপের কুশবারিযুক্ত করণ হইয়া কুলীন কাপের কন্যা গ্রহণ করিলে কি কাপে কন্যা দান করিলে কুলীনের কুল নষ্ট হইবে।

২য় : যখন কোন শ্রোত্রিয় নিচ পটী হইতে উচ্চ পটীতে যাইবেন অর্থাৎ কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তিনি তৎপূর্বে একটি কন্যা কাপে দান করিবেন। কারণ অধম পটীতে যে দোষ থাকে, তাহা কাপের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া উচ্চ পটীতে যাইতে পারিবেন, অন্যথা পারিবেন না।

(বার্বাকাবাদ সমাজের মধ্যে হরিপুর কাপের মধ্যে গণনীয়। হরিপুর ভাবাপন্ন দনাই ব্রহ্মচারী গঙ্গীতীরবর্তী নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরের মধ্যে সীতানাথ ভট্টাচার্য মহাশয় হরিপুরের ন্যায় তাঁহার কাপত্ব মর্যাদা আদান-প্রদানে ঠিক বজায় রাখিয়াছেন। জটিয়া যাদুর বংশধর তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি এবং পাঁচু চৌধুরীর বংশধরেরাও ঐরূপ ভাবাপন্ন আছেন। ভাদুড়ী বংশের বংশধরগণ ও তেঘরি নিবাসী গঙ্গাধর মৈত্রের পুত্র ও বেণীমাধব মৈত্র ইহারাও নবদ্বীপ মধ্যে কাপ শ্রেণীর গণনীয়। ইহা ব্যতীত মুর্শিদাবাদ জেলায় সৈদাবাদ, বেলডাঙ্গা, জগন্নাথপুর, চুমুরিগাছা, মৌহমা, বালুচর, মীরপুর, বাহাদুরপুর, কাশিমবাজার, সন্ন্যাসীডাঙ্গা প্রভৃতি এবং বাগড়ি ও দক্ষিণ দেশ মধ্যে ঝাউডাঙ্গা, নারায়ণপুর, পাটুলি প্রভৃতি স্থানে স্থানে উচ্চ শ্রেণীর কাপ আছেন। এই সকল স্থানের মধ্যে চিনাখালির ভাদুড়ী বংশ উল্লেখযোগ্য। এই বংশের কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী (রসসাগর) মহাশয়ের বংশাবলীও যথাস্থানে প্রদত্ত হইল।)

৩য় : উদয়নাচার্য ভাদুড়ী কৃত পরিবর্ত-মর্যাদা অনুসারে কন্যা কি ভগিনীর অভাবে পরিবর্ত হইতে পারিত না, সেই কাঠিন্য নিবারণ করণ জন্য রাজা কংসনারায়ণ কুশময় বর ও কন্যার ব্যবস্থা করিলেন।

৪র্থ : শ্রোত্রিয় বরে কন্যা দান করিলে কাপও শ্রোত্রিয় হইবে।

৫ম : শ্রোত্রিয়গণ মধ্যে ৪ ভাগ করিলেন। যথা—সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ এবং কষ্ট। যাঁহারা শুদ্ধ বংশজ ও ক্রমাগত কুলকার্য করিবেন, তাঁহারা সিদ্ধ, যাঁহারা কুলার্চনায় সমাজে পরিচিত তাঁহাবা সাধ্য, কাপেরা শ্রোত্রিয়ে কন্যা দান করিয়া শ্রোত্রিয় হইয়া যদি কুলকার্য করিতে থাকেন, তবে তাঁহারা সুসিদ্ধ এবং যে শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণে কুলীন কষ্ট পান, তাঁহারা কষ্ট নামে অভিহিত হইবে।

৬ষ্ঠ : কাপেরা উত্তম কাপের সহিত করণ করিয়া কন্যা দিলে তাহাদের কুলগৌরব বৃদ্ধি হইবে। কুলীনের কন্যা গ্রহণ এবং করণ করিয়া কুলীনে কন্যা দান করা কাপের পক্ষে সমধিক গৌরবের বিষয় হইবে।

৭ম : কুলীনে কন্যা দানে, কুলক্রিয়া করিয়া এবং সৎশ্রোত্রিয় কন্যা গ্রহণ করিলে শ্রোত্রিয়ের গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

৮ম : কুলীন এবং কাপ ভঙ্গ হইলে আর কখন পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে না। কাপের সহিত করণ দ্বারা কুলীন কাপ হইয়া যাইবে এবং শ্রোত্রিয়ে কন্যা দান করিলে কুলীন শ্রোত্রিয় হইবে।

৯ম : কুলক্রিয়া দ্বারা কষ্টশ্রোত্রিয় সিদ্ধ এবং সাধ্যভাব প্রাপ্ত হইবেন এবং উপযুক্ত কুলক্রিয়া না করিলে সিদ্ধ, সাধ্য ও সুসাধ্য শ্রোত্রিয়ও কষ্ট ভাবাপন্ন হইবেন।

পূর্বোক্ত উদয়নাচার্যের উপেক্ষিত ছয় পুত্র, মধু মৈত্রের দুই পুত্র এবং তের আঘাতে সমুৎপন্ন অষ্টাদশ সমাজস্থ ব্যক্তিগণ একত্র হইয়া, কাপ শ্রেণীতে করণ কারণ করিয়া দ্বিতীয় পরিবত্ত-মর্যাদা সৃষ্টি করিলেন, তাঁহারা কাপের ছ'ঘরিয়া হইলেন।

এই সকল কাপের মধ্যে মুড়াইতকাপ চৌদ্দ ঘর গণনা করা যায়। যথা—আগমবাগীশ, সহস্রাক্ষ, গাঙ্গনের বিপ্রদাস, হরিণার জনার্দন সরকার, দেবীদাস, নৈসামুড়ার শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্তী, হাড়োর রতিনাথ চক্রবর্তী, কাশী পণ্ডিত, গোবিন্দ চক্রবর্তী, লোকনাথ চক্রবর্তী, রঘুবীর গঙ্গী, রঘুরাম মজুমদার, বৃহস্পতি বিশ্বাস ও শিবরাম চক্রবর্তী।

এই সকল কাপেরা কুলীনে কন্যা দান পূর্বক কুলীনের সঙ্গে করণ করিয়া কুলভঙ্গ করিতে লাগিলেন। তাহার নাম 'কুলীন টুটান'। কাপেরা কুলীনদিগকে টুটাইতে পারিলে শ্লাঘা বিবেচনা করিতেন। কুলীন করণ করিয়া কাপের কন্যা গ্রহণ অথবা কাপে কন্যাদান করিলে তাহাকে 'টুটে যাওয়া' বলে। এবং পিতা বর্তমানে কাপের সহিত করণ করিলে সকল ভ্রাতাদিগের কুল নষ্ট হইয়া, তাহারা 'পোকরা' নামে অভিহিত হইয়া কাপ শ্রেণীভুক্ত হইবে। কিন্তু তাঁহারা কাপের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত থাকিবেন। পিতা অবর্তমানে কোন ভ্রাতা কাপের সহিত করণ করিলে সেই ভ্রাতা কাপ হইবেন। অন্যান্য ভ্রাতাগণের 'ভাই করা দোষ' হইবে। তাঁহারা কুলীনের সহিত করণ করিলে তাঁহাদের কুল নষ্ট হইবে না। কাপেরা কুলীনে কন্যাদান করিয়া কুলীনদিগের কুলভঙ্গে এবং 'পোকরা' কুলীন হইয়া ক্রমশ কাপের দল পুষ্ট হইতে থাকায় কাপেরা আপনাপন সুবিধা মত স্থানে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কুলজ্ঞরা কাপের তিনটি সমাজ নির্দেশ করিলেন। যথা—বার্বকাবাদ সুলতানপ্রতাপ ও গঙ্গাতীর। বার্বকাবাদে—লালৈর, কাশিমপুর, হরিপুর, সুলতান প্রতাপে—বার্কা, বারিকোনা, নওয়াবাড়ি, খেতুপাড়া। গঙ্গাতীরে—খাগড়া, অমরকুণ্ড ও ব্যাসপুর। তৎপরে মুড়াইত কাপের মধ্যে আগমবাগীশ ভট্টাচার্য নবদ্বীপে, ও দেবীদাস ভট্টাচার্য লামুরিয়া বর্তমানে হরিনাথপুর প্রভৃতি গঙ্গাতীরস্থ স্থানে আসিয়া আদান প্রদান করিতে থাকেন। পরে ঘূর্ণী, মেড়তলা, কৃষ্ণনগর, অম্বিকা, ভাতুড়িয়া, শান্তিপুর, কলিকাতা, মহৎপুর ও বুঁহচা প্রভৃতি স্থানে মুড়াইত বংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। খাগড়াদি স্থানের কাপের সংস্রবে বাগড়ি দেশে ধোড়াদহ ও জংলাপুর এবং দক্ষিণ দেশে চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, চাতরা, বরাহনগর এবং রাঢ়দেশে নিশিড়াগৌর, বীরশীঘন, কুলীন খাঁত রাঢ়দেশে বনবিষ্ণুপুর, চাঙ্গতলা প্রভৃতি নানা স্থানে কাপদিগের বসতি হইয়াছে। বাগড়ির মধ্যে আরপপুর, খাজুরতলা, জুগীন্দে, নতিডাঙ্গা, গোড়ডাঙ্গা, পেয়ারপুর প্রভৃতি স্থান, নবদ্বীপে জটিয়া যাদুর সন্তান তারা প্রসন্ন চূড়ামণি ভট্টাচার্য ও রাধাবল্লভ ভট্টাচার্য-বংশীয় কবিভূষণ মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য মহাশয় এবং পাঁচু চৌধুরীর বংশজ বাদক ও গায়ক শ্রেষ্ঠ বিনু ভট্টাচার্য, ঘূর্ণীর চৌধুরী,

সরকার ও মৈত্র বংশ এবং কৃষ্ণনগরের ও ভাজাঙ্গানার রায় ও মেড়তলার রাজারাম তর্কবাগীশের বংশ এবং নবদ্বীপ, শ্রীপুর, পালপাড়া, বরাহনগর ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের ঢোলবংশ ও বুঁইচার জটিয়া যাদুর বংশ এবং বাগড়ির বাঘবংশ কাপ মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্বে বলা হইয়াছে, বার্বকাবাদে—লালৈর কাশিমপুর ও হরিপুর। কাশিমপুর ভাবের বাণীনাথের পুত্র শতানন্দ, শিবানন্দ ও গঙ্গানন্দ। শতানন্দের পৌত্র প্রভুরাম বিদ্যাবাগীশ বনবিষ্ণুপুরের রাজার সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত হইয়া রাজদত্ত নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। প্রভুরামের বংশধরগণের মধ্যে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয় সংস্কৃত শাস্ত্রে এবং সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া, বাঙ্গালা দেশের মধ্যে বনবিষ্ণুপুরের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রামশঙ্করের পুত্র মাধবচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়দ্বয়ও সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বৈদিক কুলোদ্ভব বিখ্যাত সঙ্গীতবিশারদ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীও কেশবচন্দ্রের অন্যতম ছাত্র। উক্ত গোস্বামী মহাশয় কলিকাতাস্থ স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মহারাজ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়দ্বয়ের সঙ্গীতাধ্যাপক ছিলেন। রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের বংশাবলী এই গ্রন্থের যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে। ইহারা কাপ শ্রেণীর মধ্যে প্রধান বলিয়া গণনীয়। উক্ত বংশসম্ভূত নবদ্বীপের রামতনু ন্যায়পঞ্চানন কাপ শ্রেণীর মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন।

একাদশ অধ্যায়

কাশ্যপগোত্র-পরিচয়

তাহিরপুরের রাজবংশ

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে তাহিরপুরের রাজবংশ জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি ও দেশহিতৈষণা গুণে বিশেষ সম্মানিত। বরাহী নদীর পূর্বতীরে রামরামা গ্রামে তাহিরপুরের বিখ্যাত ভৌমিকবংশের রাজধানী ছিল। তাহিরপুরের বর্তমান রাজবাটী বরাহীর অপর পার্শ্বে রামরামার পশ্চিমে অবস্থিত।

বিজয় লস্কর

দিল্লির বাদশাহ সুসঙ্গের বুদ্ধিমন্ত হাজরাকে সাম্রাজ্যের পূর্বদ্বার ও বিজয় লস্করকে পশ্চিম দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত করেন ও বহু সম্পত্তি দান করেন। এই জন্য সুসঙ্গ রাজা উদয়াচল ও তাহিরপুর রাজ্য অস্তাচল নামে অভিহিত হইত। বিজয় সিংহের রাজধানী রামরামায় ছিল। তাঁহার নিজের গড় ও বহু সৈন্য সামন্ত ছিল। তাঁহার পুত্রের নাম উদয়নারায়ণ।

উদয়নারায়ণ

বাদশাহ উদয়নারায়ণের নিকট হইতে তাহিরপুর ব্যতীত অন্যান্য পরগনা কাড়িয়া নেন। এই উদয়নারায়ণই বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নিরাবিল পটীর সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। তাঁহার পৌত্র নন্দনবাসী সিদ্ধশ্রোত্রিয় রাজা কংসনারায়ণ কুলীনগণের আশ্রয়দাতা বলিয়া বারেন্দ্র-সমাজে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। কুলজ্ঞ উদয়নাচার্যের নিয়ম অনুসারে কুলীন-কন্যার শ্রোত্রিয়ের সঙ্গে বিবাহ হইতে পারিত না এবং কুলীনদিগের বিবাহে কুশবারি সংযুক্ত প্রতিজ্ঞা করিতে হইত, কেবল বাগদানে কার্য হইত না। এই নিয়মের জন্য বহু কুলীন কুল নষ্ট হইল এবং তাঁহারা কাপ হইতে লাগিলেন।

কংসনারায়ণ

রাজা কংসনারায়ণ দেখিলেন যে এরূপ প্রথা চলিলে কুলীনের বংশ একেবারে লুপ্ত হইবে। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কাপ ও কুলীনদিগকে একত্র করিয়া দিলেন। তিনি কাপ ও কুলীনের মধ্যে কন্যা আদান প্রদান ও কুলীনে শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ বিধিবদ্ধ করিলেন। কংসনারায়ণ স্বীয় বংশের কন্যা কাপে প্রদান করিলেন। নাটোরের মহারাজ রামজীবনের পুত্র কালিকাপ্রসাদ কংসনারায়ণের প্রপৌত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করেন।

তাহিরপুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিনোদরাম

রাজা কংসনারায়ণের পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ রায় সম্পত্তির দশ আনার উত্তরাধিকারী হয়েন। নরেন্দ্রনারায়ণের কন্যা উমাদেবীর সহিত আনন্দীরাম রায়ের বিবাহ হয়। নরেন্দ্রের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় আনন্দীরাম ঐ দশ আনা সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তিনি

নিঃসন্তান থাকায় তাঁহার ভ্রাতা বিনোদরাম রায় তাঁহার মৃত্যুর পর সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন। বিনোদরাম বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। বর্তমান তাহিরপুর-রাজবংশের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা।

চন্দ্রশেখর

বিনোদরামের পুত্র বীরেশ্বর রায়। বীরেশ্বরের দুই পুত্র চন্দ্রশেখরেশ্বর ও মহেশ্বর। বীরেশ্বর অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন বলিয়া অনেক টাকা ধার রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রশেখর বিশেষ চেষ্টা করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যে পিতৃঋণ পরিশোধ করেন। ইনি নৈষ্ঠিক সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন. ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইনি রামপুর-বোয়ালালিয়াতে 'সদাব্রত' স্থাপন করেন। এই সদাব্রত হইতে বহু লোকের দৈনিক আহার. মাসিকবৃত্তি ও পৌষ সংক্রান্তির অনেক টাকা দান করা হয়। চন্দ্রশেখর প্রজারঞ্জক ছিলেন। চন্দ্রশেখর ও মহেশ্বরের মধ্যে সৌভ্রাত্র ছিল। তাঁহাদের রাজা উপাধি না থাকিলেও প্রজারা তাঁহাদিগকে রাজা বলিয়া ডাকিত।

মহেশ্বরের পুত্রগণ

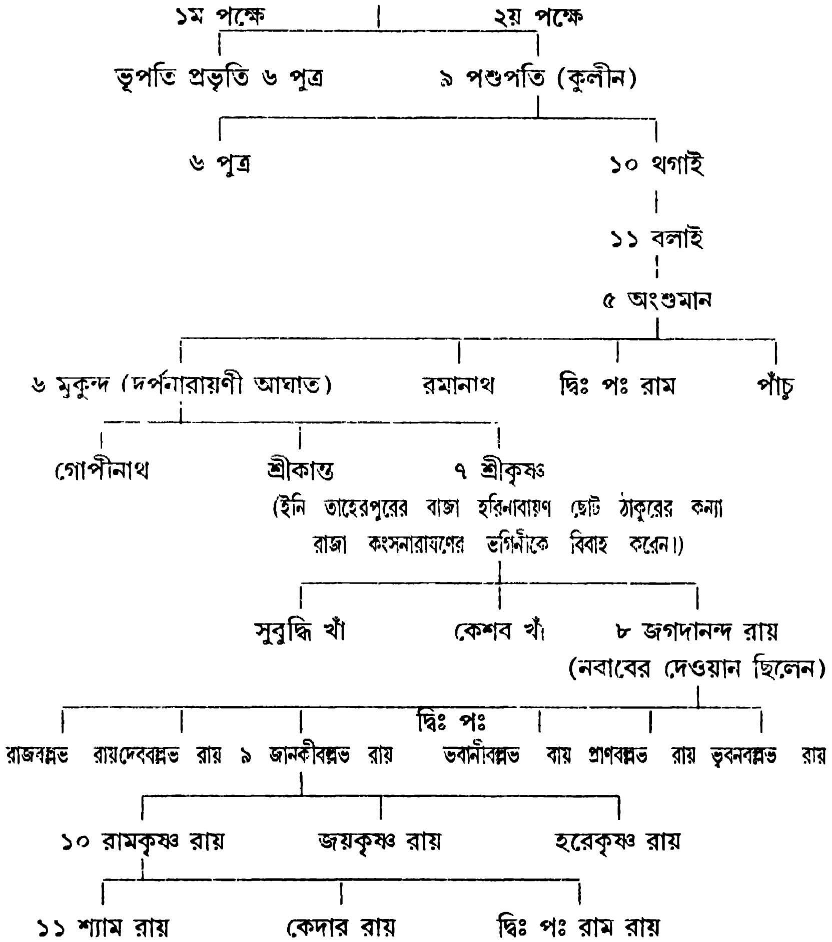
চন্দ্রশেখরের পুত্রের নাম শশীশেখরেশ্বর। মহেশ্বরের চারিপুত্র—জগদীশেশ্বর. তারকেশ্বর, বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর। তারকেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর এখনও জীবিত আছেন। চন্দ্রশেখর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সন্তান সংখ্যা অধিক দেখিয়া সম্পত্তির অর্ধেকাংশ ব্যতীত আরও পাঁচ হাজার টাকার সম্পত্তি মহেশ্বরের পুত্রদিগকে প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া বহু সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন।

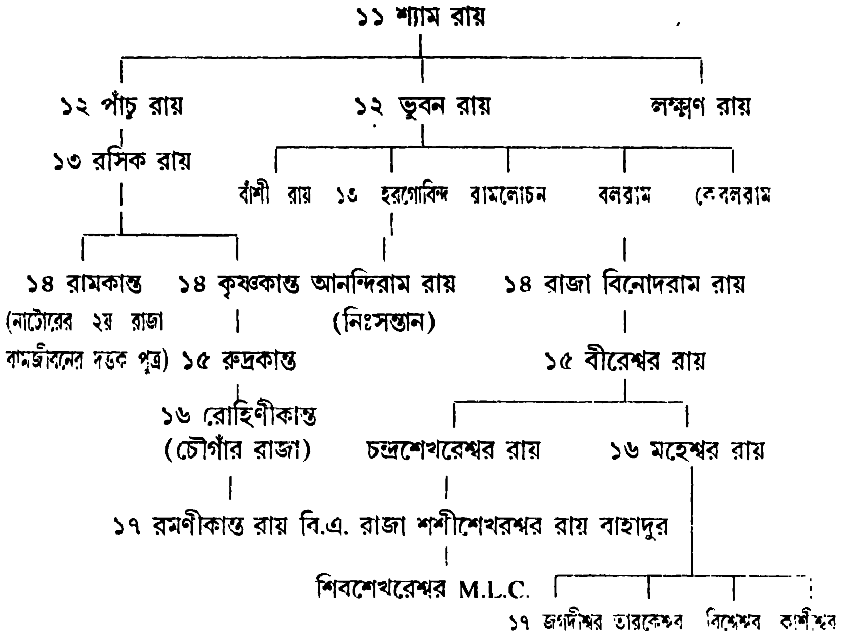
শশীশেখরেশ্বর

শশীশেখরেশ্বর বিশেষ বুদ্ধিমান ও হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগী। তিনি অনেক সৎকার্য করিয়াছেন। গভর্নমেন্ট তাঁহাকে রাজাবাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। তিনি বহুকাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বর্তমানে তিনি কাশীধামে বাস করিতেছেন।

তাঁহার যোগ্যপুত্র কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়ও অনেক দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য আছেন। তিনি দ্বিতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি রূপে কার্য করিয়া গভর্নমেন্ট ও দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

তাহেরপুরের রাজ বংশাবলী



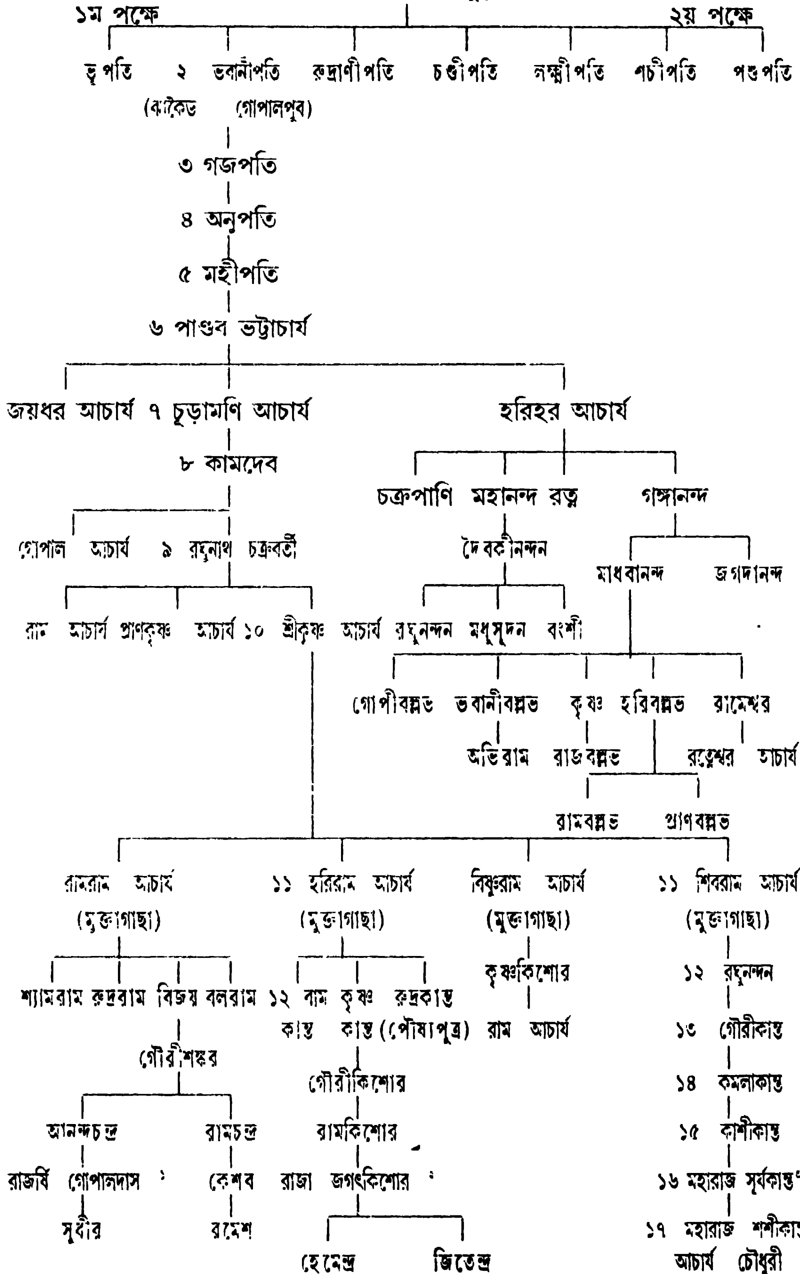


মুক্তাগাছার আচার্য বংশ

মুক্তাগাছার আচার্য পরিবারের বর্তমান বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মুক্তাগাছা। ইহাদিগের আদিবাস বগুড়া জেলার অন্তঃপাতী চম্পাপুর গ্রামে ছিল। ইঁহারা উদয়নাচার্যের অধস্তন শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের বংশধর। শ্রীকৃষ্ণ আচার্য মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে কোন এক সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন। নবাব তাঁহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া ময়মনসিংহ জেলার আলাপসিংহ পরগনা তাঁহাকে পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করেন। তাঁহার পরলোকান্তে তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় পূর্ব-বাসস্থান চম্পাপুর পরিত্যাগ করিয়া আলাপসিংহ পরগনায় আপন জমিদারির অন্তর্গত মুক্তাগাছায় আসিয়া বাস করেন। তদবধি ইঁহারা আলাপসিংহ পরগনার জমিদার বলিয়া পরিচিত। উক্ত চারিপুত্র হইতে মুক্তাগাছারা আচার্য বংশের চারি শরিকের উৎপত্তি।

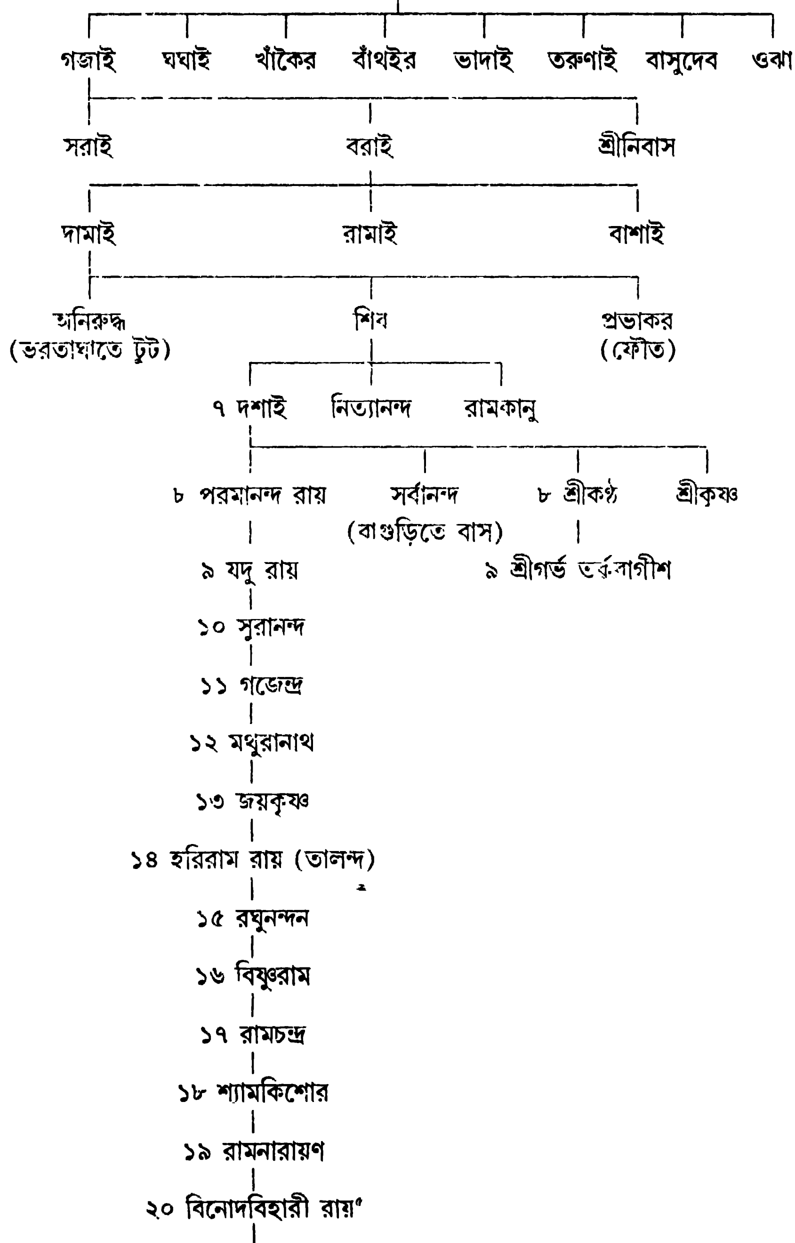
গৌরীকান্ত আচার্যের পত্নী বিমলা দেবী ৺কাশীধামে বহু দেবালয় নির্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবাদির সংস্থান করেন এবং অতিথি সৎকারের জন্য সত্রাদি স্থাপন করিয়া অবশিষ্ট জীবন কাশীতে অতিবাহিত করিয়া কাশীধামেই প্রাণত্যাগ করেন। এই বংশের অন্যতম শরিক জগৎকিশোর আচার্যের ঊর্ধ্বতন পুরুষের পত্নী ছোট বিমলা দেবীও কাশীধামে নানা দানধর্মাদি এবং অবশিষ্ট জীবন বারাণসীতে অতিবাহিত হইয়া কাশীধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাশীকান্ত আচার্যের পত্নী লক্ষ্মী দেবী নদীয়া জেলার বিল্বপুষ্করিণীর রোহেলাপটীর কুলীন বৈষ্ণব মিশ্র সান্যালের সন্তান রাজকিশোর সান্যালের কন্যা। ইনিও ৺কাশীধামে দানাদি করিয়া তথায় প্রাণত্যাগ করেন।

মুক্তাগাছার আচার্য-চৌধুরী বংশ



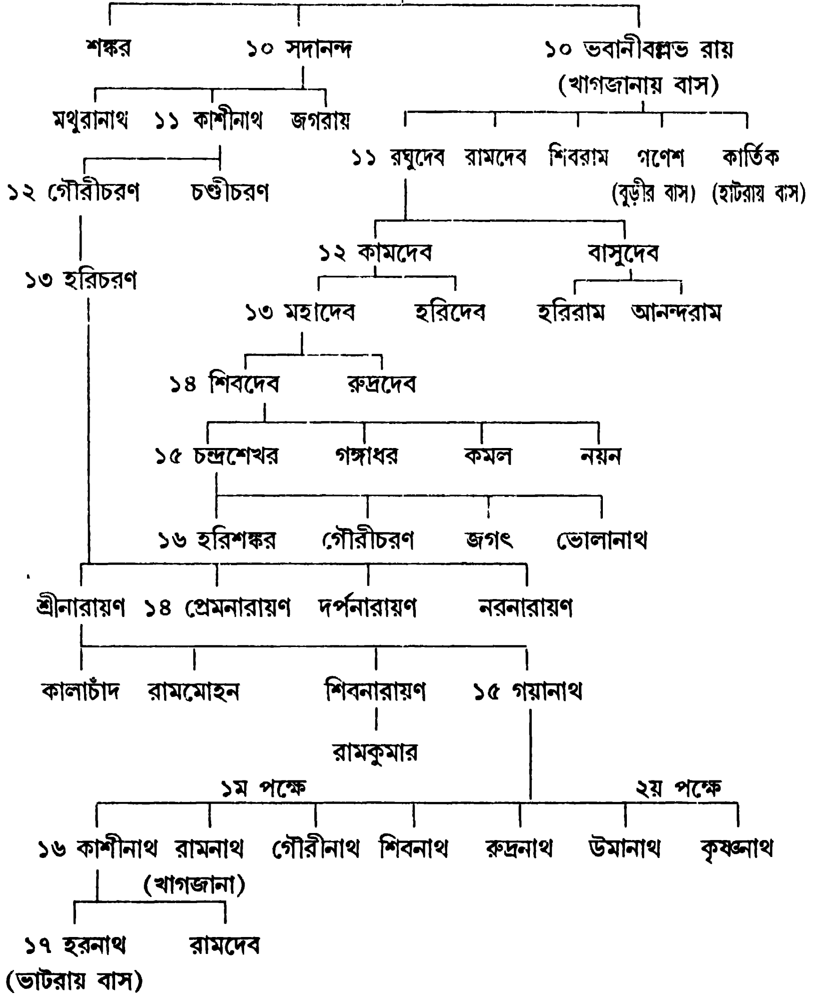
পরমানন্দ রায় ভাদুড়ীর বংশ

পশুপতি[৪] (বালিয়াটি)



২১ গোপালচন্দ্র হরিধন

শ্রীগর্ভ তর্কবাগীশের বংশক্রম



শিবরাম বাচস্পতি ও কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশের উর্ধ্বতন বংশ

১ উদয়নাচার্য ভাদুড়ী
|
২ পশুপতি
|
৩ ঘঘাই

৪ কামাই (কালিকাপুরে বাস) — কুমাই (তালকুটিয়া) — তিকাই (ভাঙ্গাবাড়ি) — চামাই (বড়োল) — সুরেশ (গড়াল) — বর্ধমান

৪ কামাই
|
৫ রনাই
|
৬ পিতাই

১ম পক্ষে — ২য় পক্ষে — ৩য় পক্ষে

৭ পুষ্পকেতন — মীনকেতন — অংশুমান — কুসুমশেখর

৭ পুষ্পকেতন → ৮ ভুয়াই — নাঘাই — জগাই — পরমাই

৮ ভুয়াই → ৯ সোমধর — রতাই — মাতাই

৯ সোমধর → শ্রীকান্ত (জামিরতা) — ১০ গোপীকান্ত — লক্ষ্মীকান্ত (চরশি বাস) — রামকান্ত — যদুনন্দন — মধুসূদন (চরশি বাস)

১০ গোপীকান্ত → যদুনাথ — বাণীনাথ — ১১ মাধব — চিরঞ্জীব

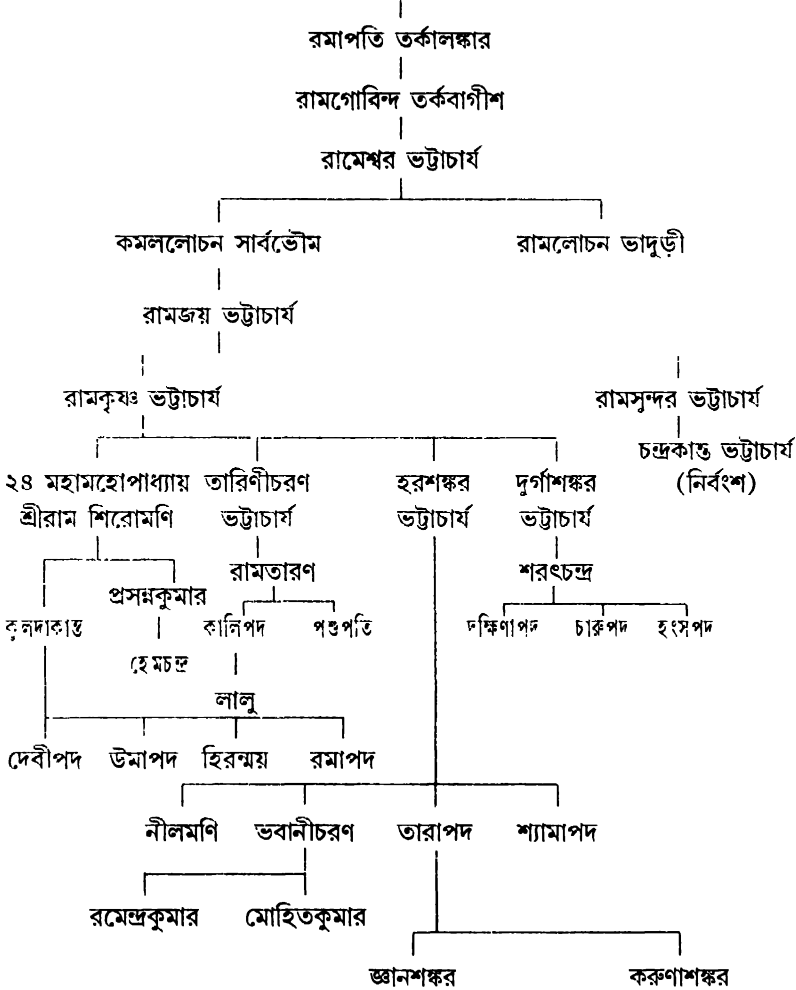
১১ মাধব → ১২ রঘুনাথ — ১২ রামনারায়ণ — ১২ রাঘব (বৈকুণ্ঠপুর)

১২ রঘুনাথ → ১৩ রামভদ্র — রামদেব ভট্টাচার্য — রামচন্দ্র তর্কবাগীশ (বৈকুণ্ঠপুর) — কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশ

১৩ রামভদ্র
|
১৪ শিবরাম বাচস্পতি

মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম শিরোমণির বংশ

কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশ (১৫৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব বংশ)



সুসঙ্গের দু'আনী রাজবংশ

১৫ মুকুন্দ ভাদুড়ী
|
১৬ গোপীনাথ প্রভৃতি (১০৪ ও ১০৫ পৃষ্ঠায় পূর্ব বংশ)
|
১৭ যদুনাথ
|
১৮ লক্ষ্মীনাথ

১৯ রামবল্লভ (বেণী অবসাদ) | হরিবল্লভ (রোহিলা পটী) | প্রাণবল্লভ | গৌরবল্লভ (ভূষণাপটী)

গৌরবল্লভ (ভূষণাপটী)
|
২০ রামগোবিন্দ ভাদুড়ী
(সাঁতৈলপতি রামকৃষ্ণের ভয়ে খৃস্টিয় ১৮শ শতকের শেষে সুসঙ্গে পাপিয়াখালি গ্রামে বাস ও রাজকন্যাবিবাহে সুসঙ্গের দু'আনা অংশ লাভ)
|
২১ হরিরাম সিংহ
|
২২ রুদ্রচন্দ্র সিংহ
|
২৩ গোপীনাথ সিংহ (দত্তক)

হিমাইতপুরের [ভাদুড়ী] চৌধুরী বংশ

হিমাইতপুর চৌধুরী বংশের খ্যাতি পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ-সমাজে বর্তমান আছে। ইহারা বারেন্দ্র কাপ ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের বংশে বহু লোক শিক্ষিত ও বহু স্থানে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত আছেন ও ছিলেন। শ্রেষ্ঠ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজেই ইঁহাদের পুত্র কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হয়। পূর্বে এই বংশের কুল মর্যাদা ৫১ টাকা ছিল। এক্ষণে তিন হাজারে উঠিয়াছে। বহু শরিক হওয়ায় পূর্ব সম্পত্তি বিভাগ হইয়া অবস্থা নিঃস্ব হইয়াছে। কিন্তু হিমাইতপুরের চৌধুরী বংশের খ্যাতি বারেন্দ্র সমাজে এখনও পূর্বের ন্যায় সমান আছে।

ঐ বংশে মোহনবল্লভ ভাদুড়ীর ঢাকা জেলায় বালিয়াটী গ্রামে বাস ছিল। তীর্থ যাত্রা কালে পাবনা জেলায় হরিপুর গ্রামে উমানন্দ নিয়োগীর বাড়িতে অতিথি হইলে কাপ উমানন্দের কন্যার সহিত বিবাহ হওয়ায় কুলীন টুটিয়া কাপ হন। পরে তিনি সাঁতৈলের রাজা রামকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত হন এবং উক্ত রাজা হইতে হিমাইতপুর গ্রামে ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া তথায় বসতি স্থাপন করেন।

হিমাইতপুরের [ভাদুড়ী] চৌধুরী বংশ

২২ শ্রীধর   শ্রীকর

অনিরুদ্ধ   শিব   ২৩ প্রভাকর

৪ গোকুল   মথুরানাথ

২৫ বিষ্ণুদাস

২৬ কুমুদানন্দ

২৭ মোহনবল্লভ ভাদুড়ী   কুমুদবল্লভ ভাদুড়ী

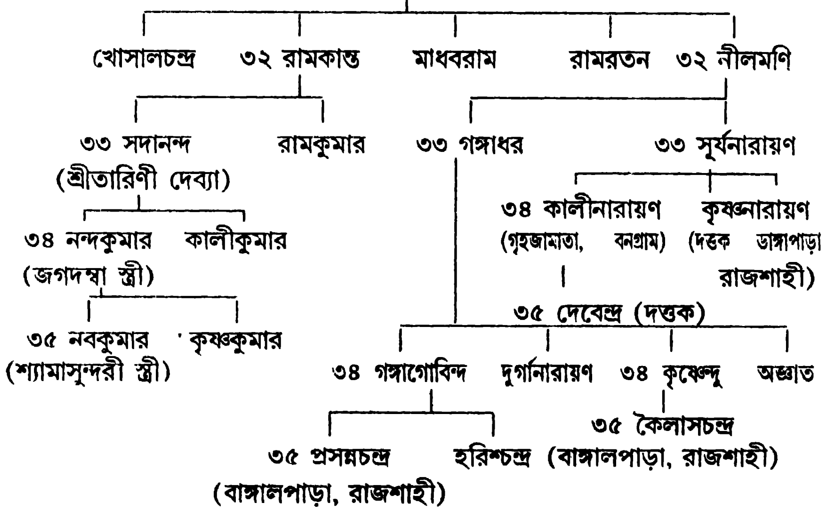
২৮ পীতাম্বর   নরসিংহ (নিঃসন্তান)   রঘুরাম (নিঃসন্তান)   ২৮ রামচরণ (প্রতাপপুর)

২৯ চন্দ্রশেখর   ২৯ রামজীবন

২৯ রামগোপাল   ২৯ রামনারায়ণ   ২৯ জয়নারায়ণ   হরেকৃষ্ণ (নিঃসন্তান)

৩০ রামপ্রসাদ   ৩০ দর্পনারায়ণ (দত্তক)

৩১ মনোহর চৌধুরী



মৈত্রকুল-পরিচয়

নাটোর-রাজবংশ

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে নাটোরের রাজবংশ ধনে মানে ও জ্ঞানে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বংশ বলিয়া পরিগণিত। বাঙ্গালার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এই বংশের প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। 'আঙ্গোরার মৈত্র' বলিয়া এই বংশ সমাজে পরিচিত।

নাটোর রাজবংশের উৎপত্তি

আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ব্রাহ্মণ সুষেণের অধস্তন সপ্তদশ পুরুষ দিবাকর। দিবাকর হইতে পঞ্চম অধস্তন পুরুষ কামদেব সরকার নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার পিতা। তিনি পুঁটিয়ার রাজা নরনারায়ণের জমিদারি লস্করপুর পরগনার কোন এক গ্রামে বাস করিতেন এবং উক্ত রাজবাটিতে সামান্য বেতনে তহশীলদারের কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম। তাঁহারা পুঁটিয়ার রাজবাটিতে থাকিয়া পারস্য ভাষাদি শিক্ষা করিতেন। তিনটি পুত্রই প্রতিভাশালী ছিলেন। রঘুনন্দনের অঙ্গে রাজশ্রী দেখিয়া রাজা দর্পনারায়ণ বলিয়াছিলেন, 'এই বালক কালে বিখ্যাত রাজা হইবে।' তিনি রঘুনন্দনকে বলিতেন, 'তুমি রাজা হইয়া পুঁটিয়ার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিও না।' মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কোন বিশেষ কার্যোপলক্ষে একবার দর্পনারায়ণকে আহ্বান করেন। দর্পনারায়ণ রঘুনন্দনের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া রঘুনন্দনকে সঙ্গে করিয়া মুর্শিদাবাদে যান। নিজ কার্য সমাধা করিয়া দর্পনারায়ণ যখন নবাবের নিকট বিদায় নেন, তখন নবাব রঘুনন্দনকে তাঁহার নিকট রাখিয়া যাইতে বলেন। রঘুনন্দনের রাজোচিত অবয়ব ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া নবাব পূর্বেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রাজ দর্পনারায়ণ রঘুনন্দনকে নবাবের নিকট রাখিয়া পুঁটিয়া প্রত্যাগমন করেন। রঘুনন্দন নিজের বুদ্ধিবলে ক্রমে নবাবের দেওয়ান হইলেন।

রামজীবন

ইতিমধ্যে রঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন সাঁতৈলের রাজার বিদ্রোহের পর সাঁতৈলের সমস্ত রাজ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া নাটোরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার ভ্রাতা রঘুনন্দন মুর্শিদকুলি খাঁর প্রবর্তিত রাজস্ব আদায় প্রথা অবলম্বন করিয়া নিপুণ ভাবে নবাবের কর আদায় করিতেন। যদি কেহ রাজস্ব দিতে অক্ষম হইত, তখন তাহার সম্পত্তি নিলামে উঠান হইত। পূর্ববঙ্গের অনেক জমিদারই বাকি খাজনা দিতে অপারগ বা অনিচ্ছুক হন। রঘুনন্দন তাঁহাদের সম্পত্তি নবাব সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া একে একে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনের নামের লিখিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে রামজীবন পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ জমিদার হইলেন। কথিত আছে যে তিনি ৫২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা রাজস্ব দিতেন। এই জন্য নাটোররাজকে লোকে বায়ান্ন লাখ তেপান্ন হাজারী বলিত।

রামকান্ত

রঘুনন্দন নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার জ্যেষ্ঠ রাজা রামজীবনের পুত্র কুমার কালীপ্রসাদের মৃত্যুর পর রামকান্তকে দত্তক গ্রহণ করিলেন। রাজা রামকান্ত নিরাবিল পটীর কুলীন রসিক রায়ের ঔরস পুত্র। রসিক রায় ভাদুড়ি বংশীয় শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ির তৃতীয় পুত্র। জগদানন্দ রায় হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। তৎকালে দত্তক পুত্র দান বা গ্রহণ করিলে কুলীনের কুলপাত হইত। রাজা রামকান্তকে নাটোরের রাজার দত্তক পুত্র দেওয়ায়

কুলীনেরা রসিক রায়কে কুলীন সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। রাজা রামজীবন কুলজ্ঞ ও কুলীনদিগকে নাটোরে আনাইয়া অধ্যাপকদিগের নিকট ব্যবস্থা লইয়া ও কুলজ্ঞ মধ্যস্থ রাখিয়া রসিক রায়ের সহিত নিরাবিলের পটীর কুলীনগণের পাল্টাপাল্টি করণ করাইয়া রসিক রায়ের কুলরক্ষা করেন। এই সময় হইতে নিরাবিল পটীর দুই থাক হয়। এক্ষণে দত্তক পুত্র গ্রহণে আর কুলপাত হয় না এবং কুলীনদিগেরও দুই থাকে কোন বাঁধাবাঁধি নাই। রাজা রামকান্তের পত্নীই সুপ্রসিদ্ধা প্রাতঃস্মরণীয়া রানি ভবানী।

রানি ভবানী

বর্তমান বগুড়াজেলার অন্তর্গত ছাতানী গ্রাম নিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর ঔরসে ও জয়দুর্গার গর্ভে রানি ভবানীর জন্ম হয়। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার সহিত রাজা রামকান্তের বিবাহ হয়। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমতি ছিলেন। বিষয় বুদ্ধি তাঁহার অত্যন্ত প্রখর ছিল। রাজা রামকান্ত স্বীয় বুদ্ধিদোষে বৃদ্ধমন্ত্রী দয়ারামের সঙ্গে বিবাদ করিয়া বিষয় হারান ও অবশেষে জগৎ শেঠের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দয়ারাম রামকান্তের অনুতাপ দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া নবাব সরকার হইতে নানা কৌশলে রামকান্তের নষ্ট সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করেন।

রাজনৈতিক জীবন

রানি ভবানীর দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। কিন্তু পুত্র দুইটি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাঙ্গলা ১১৫৩ সালে (ইংরাজি ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে) রামকান্ত রানি ভবানীকে দত্তক পুত্র লইবার অনুমতি দিয়া পরলোক গমন করেন। ইহার পর রানি ভবানীই রাজশাহী জেলার একমাত্র অধীশ্বরী হইলেন। রাজশাহী জেলার খাজুরা গ্রাম নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত রানি ভবানীর কন্যা তারার বিবাহ হয়। বিবাহের পর রানি ভবানী জামাতার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন, কিন্তু বাঙ্গলা ১১৫৮ সালে রঘুনাথের মৃত্যু হয়। তখন রানি ভবানী আবার স্বয়ং রাজ্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি অর্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া রাজ্য পরিচালনা করিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। রানি ভবানীর রাজ্য এত বিশাল ছিল যে তাহা হইতে দেড় কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হইত। ইহার মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকা সরকারে কর স্বরূপ প্রদত্ত হইত। এত বড় বিশাল রাজত্ব পরিচালনা করিতেন বলিয়াই তিনি 'অর্ধ বঙ্গেশ্বরী' নামে খ্যাত হন। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে তিনি সমগ্র বঙ্গের রাজনৈতিক গগনের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক ছিলেন।

জীবন যাপন প্রণালী

অল্প বয়সে বিধবা হইয়া রানি ভবানী কঠোর ব্রহ্মচর্যে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি প্রত্যহ রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে গাত্রোত্থান করিতেন। জপ সাঙ্গ করিয়া অর্ধ দণ্ড রাত্রি থাকিতে তিনি স্বহস্তে পূজার ফুল তুলিবার জন্য পুষ্পোদ্যানে যাইতেন। ভৃত্যেরা মশাল ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইত। ফুল তুলিয়া তিনি গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। গঙ্গার ঘাটে বসিয়া বেলা দুই দণ্ড পর্যন্ত তিনি জপ, গঙ্গা পূজা ও শিবপূজা করিতেন। তারপর অনেকগুলি দেবালয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গৃহে আসিতেন। গৃহে আসিয়া পুরাণপাঠ শ্রবণ ও ইষ্ট পূজা করিতে বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া যাইত। আহ্নিকাদি করার পর তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া দশজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন। পরে পরিবারস্থ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া বেলা আড়াই প্রহরের সময় নিজে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। আহারের পর দেওয়ান দপ্তরে আসিয়া কুশাসনে বসিয়া তিনি কর্মচারিদিগকে

বিষয় কর্মের আজ্ঞা দিতেন। তখন তাঁহারা রানির আদেশ লিখিয়া লইতেন। অপরাহ্নে রানি আবার পুরাণ শ্রবণ করিতেন। তাঁহার পাঠশ্রবণ শেষ হইলে কর্মচারিগণ তাঁহার নিকট আসিয়া আজ্ঞাপত্রে তাঁহার সহি লইয়া যাইত। সন্ধ্যাকালে তিনি গঙ্গায় যাইয়া ঘৃতপ্রদীপ ভাসাইতেন। সন্ধ্যার পর চারিদণ্ড মালা জপ করিতেন। তৎপরে কিছু জলযোগ করিয়া আবার দেওয়ান দপ্তরে আসিয়া বসিতেন। রাত্রি এক প্রহরের সময়, তিনি প্রজাদের আবেদন নিবেদন শ্রবণ করিতেন। অবশেষে পরিবারস্থ সকলের খোঁজ খবর লইয়া তিনি রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বিশ্রাম করিতে যাইতেন। এইরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া রানি ভবানী তাঁহার বিশাল রাজ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন।

রানি ভবানীর দান

রানি ভবানীর দানের কথা বাঙ্গলাদেশে প্রবাদের ন্যায় প্রচলিত। তিনি অসংখ্য দেবমন্দির নির্মাণ করাইয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করাইয়া ও সহস্র সহস্র দরিদ্রকে অন্ন দান করিয়া বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া হইয়া আছেন। তাঁহার মাতা জয়দুর্গার স্মৃতিরক্ষার্থে ছাতানী গ্রামে তিনি এক স্বর্ণময়ী জয়দুর্গা মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। 'মাতৃভক্তির সঙ্গে দেবভক্তির এইরূপ অনন্য সাধারণ সুমধুর সমাবেশ যে দেবমন্দিরকে জগদ্ব্যাপী বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল, তাহা এখন ধুলিবিলুণ্ঠিত। কিন্তু জয়দুর্গা এখনও রানি ভবানীর প্রশংসনীয় ব্যবস্থায় সেবাপূজা লাভ করিয়া আসিতেছেন।' কাশীতে তাঁহার কীর্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় ১৩০৪ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকায় লিখিয়াছেন— 'নিজ কাশীতে নিত্য প্রাতঃকালে এক প্রস্তরের চৌবাচ্চাতে আট মণ ছোলা ভিজানো যাইত, তাহা অনাহূত যে সকল লোক আগত হইত তাহাদিগকে দেওয়া যাইত এবং অন্নপূর্ণার মন্দিরে নিত্য নিত্য ২৫ মন তণ্ডুল বিতরণ হইত। কাশীধামে তিনি প্রায় শত দেবমন্দির, অতিথিশালা ও ধর্মশালা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। রানি ভবানী এই সকল সেবাপূজার জন্য যে অর্থ ও ভূমিদান করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন অদ্যাপি নাটোরে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যাম রায়ের সেবা এখনও মুর্শিদাবাদ প্রদেশে সর্বজনপরিচিত।'

বিদ্যাশিক্ষায়ও তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন। রাজশাহীর অনেক চতুষ্পাটী মহারানির সাহায্যে স্থাপিত হয়।

রানি ভবানী তাঁহার বাল-বিধবা কন্যা তারাসুন্দরীকে পুনরায় বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ষড়যন্ত্রে বিফলমনোরথ হয়েন বলিয়া কথিত আছে। সাতাত্তরের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া প্রজাদের দুঃখ নিবারণ করিয়াছিলেন।

রাজশাহী জেলার অন্তর্গত আটগ্রামের রায়বংশসম্ভূত রামকৃষ্ণকে রানি ভবানী দত্তক গ্রহণ করেন। তিনি ৭৯ বৎসর বয়সে অমরধামে প্রস্থান করেন।

রামকৃষ্ণ

তাঁহার দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণের সাধনার কথা ইতিহাস বিখ্যাত। দশশালা বন্দোবস্তের কবুলিয়তে মহারাজ রামকৃষ্ণ 'মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুর' নামে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তিনি যে এইরূপ উপাধির অধিকারী ছিলেন ইংরাজ দপ্তরে এইরূপে তাহার প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে।

ছোট তরফ ও বড় তরফ

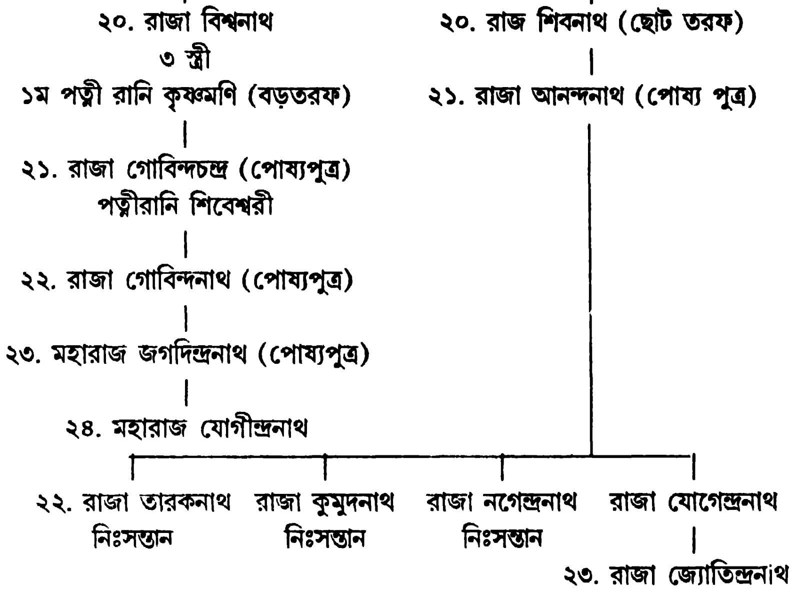
রামকৃষ্ণ বিরাট ঐশ্বর্যের মধ্যেও মাতৃসাধনা করিয়া অমরকীর্তি লাভ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণের দুই পুত্র বিশ্বনাথ ও শিবনাথ। ইহাদের সময় হইতে রাজবংশ ছোট তরফ ও বড় তরফে বিভক্ত হইয়া পড়ে। মহারাজ বিশ্বনাথ পূর্বে শাক্ত ছিলেন, পরে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী মহারানি জয়মণি নতুন ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। নিজের ধর্ম বিসর্জন অপেক্ষা স্বামীত্যাগ বরণীয়া মনে করিয়া তিনি শ্বশুরদত্ত সম্পত্তি মাত্র লইয়া সমস্ত রাজসম্পদ তুচ্ছ করিয়া মুর্শিদাবাদ জিলায় বড়নগরে গঙ্গাবাসে চলিয়া যান। তখন বিশ্বনাথ কৃষ্ণমণিকে বিবাহ করেন। বিশ্বনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে কৃষ্ণমণিকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়া যান। মহারানি কৃষ্ণমণি গোবিন্দচন্দ্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। গোবিন্দচন্দ্রেরও কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। তাঁহার পত্নী রানি শিবেশ্বরীর পোষ্যপুত্র গ্রহণ লইয়া নাটোর ছোট তরফ ও বড় তরফের মধ্যে মহাবিরোধ বাধে। ক্রমে এমন হয় যে পোষ্য পুত্র অসিদ্ধ হইবার আশঙ্কা ঘটে। কিন্তু অবশেষে পোষ্য পুত্র গোবিন্দনাথের দাবি ইংরাজ আদালতে গ্রাহ্য হয়। গোবিন্দনাথের দুইটি কন্যা হয়, সুতরাং তিনি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের অকালে ইহলোক-পরিত্যাগে বাঙ্গলার আপামর সাধারণ সকলেই মর্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছেন। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ অমায়িক, পরোপকারী, বিদ্বান ও সুলেখক ছিলেন। ক্রিকেট খেলায় ও সঙ্গীতেও তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঔরসপুত্র যোগীন্দ্রনাথ বর্তমানে বড় তরফের মহারাজ। ছোট তরফের রাজা শিবনাথ রাজা আনন্দনাথকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। রাজা আনন্দনাথের চারি পুত্র—রাজা তারকনাথ, রাজা কুমুদনাথ, রাজা নগেন্দ্রনাথ ও রাজা যোগেন্দ্রনাথ। রাজা যোগেন্দ্রনাথ পরোপকারী সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র জ্যোতীন্দ্রনাথ এখন ছোট তরফের রাজা।

আঙ্গোরার মৈত্রকুল

নাটোর-রাজবংশাবলী

- ৬. শূলপাণি মৈত্র (সাতটা)*
  - ৭. কেশব (আঙ্গোরা)
    - ৮.উদ্ধব বা উধাই
      - ৯.শঙ্কর পাইল
        - ১০. বাসুদেব
        - জীবধর বা জীবড় ওঝা
          - ১১. শ্রীনিবাস
            - ১ম পক্ষে:
              - ১২. রামশরণ
              - ধুর্জটী
              - শিব
              - দিবাকর
                - ১৩. ভবানন্দ
                  - ১৪. কৃষ্ণানন্দ
                    - ১৫. মধুসূদন মিশ্র
                    - নয়নানন্দ আচার্য
                      - ১৬. মথুরানাথ ভৌমিক
                      - রতিনাথ
                      - কামদেব সরকার
                        - ১৭. রাজা রামজীবন
                          - ১৮. কালিকাপ্রসাদ (কালু কোঙর)
                          - রাজা রামকান্ত (পোষ্যপুত্র) (পত্নী রানি ভবানী কন্যা তারাদেবী)
                            - ১৯. রাজা রামকৃষ্ণ (পোষ্যপুত্র)
                        - রাজা রঘুনন্দন
                          - ভবানীপ্রসাদ
                        - বিধুরাম রায়
                      - ভোলানাথ
                      - অভিরাম
                        - ১ম পক্ষে: রামনারায়ণ রায় চৌধুরী
                        - ২য় পক্ষে: মহাদেব
                          - শিবদেব
                          - হরিদেব
                            - ভবানীপ্রসাদ
                            - রামপ্রসাদ
                            - রামকৃষ্ণ (মহারানি ভবানী কর্তৃক দত্তক গ্রহণ)
                  - গোপাল
            - ২য় পক্ষে:
              - শ্রীক্ষেত্র
              - পুরন্দর

রাজা রামকৃষ্ণ



আগমবাগীশ ভট্টাচার্যের বংশ-বিবরণ

এই বংশ ব্রাহ্মণ সমাজে কাশ্যপ গোত্রীয় মণ্ডলজানীর মৈত্র নামে খ্যাত। ইঁহাদের পূর্ব বাসস্থান শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমেশ্বরীতলাতে ছিল। পরে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের নানা স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছেন। এক বংশ অদ্যাপি শ্রীধামে বাস করিয়া আগমেশ্বরী দেবীকে যথারীতি অর্চনাদি করিয়া আসিতেছেন। উক্ত বংশের ধর্মদাস মৈত্র মহাশয় অদ্যাপি তথায় বর্তমান আছেন।

পাঠান রাজত্বকালে ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রপীড়নে যখন বিশুদ্ধ শাক্ত ধর্ম লোপ হইবার উপক্রম, তখন এই মহাপুরুষ তান্ত্রিক দীক্ষা প্রদানে আব্রাহ্মণচণ্ডালকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া হিন্দুধর্ম রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এখনও যে গ্রামে গ্রামে বারোয়ারী কালী পূজা দেখা যায়, তাহা কৃষ্ণানন্দের বর্ণাশ্রম-সম্মেলনের ফল।

কৃষ্ণানন্দ, শ্রীচৈতন্য ও রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে একই গুরুর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতেন। কৃষ্ণানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যের প্রথমে হরিহর আত্মা ছিল। যৎকালে শ্রীচৈতন্য সখীভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনে আকৃষ্ট হন, তদবধি দুই জনের মনোমালিন্য আরম্ভ হয়। কৃষ্ণানন্দ গৌরকে সখীভাবে ভজনা করিতে নিষেধ করিয়া অপমানিত হন এবং সেই সময় হইতে দুইজনে পৃথকভাবে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে বদ্ধপরিকর হন। কৃষ্ণানন্দ শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়া কালীমূর্তির স্বরূপ প্রকাশ করেন। তৎপূর্বে ঘটে কালিকা দেবীর আরাধনা হইত। এখনও আগমেশ্বরী মন্দিরে (নবদ্বীপে) কৃষ্ণানন্দ স্থাপিত ঘট বর্তমান আছে এবং বহু শাক্ত তথায় মহামায়ার অর্চনা করিয়া ধন্য হইতেছেন।

কৃষ্ণানন্দ ও সহস্রাক্ষ দুই ভাই ; কৃষ্ণানন্দ শাক্ত ও সহস্রাক্ষ বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। উভয়ের পৃথক ধর্ম্মমত জন্য বোধ হয় প্রথমে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল না। এরূপ প্রবাদ আছে—

কৃষ্ণানন্দ আগমেশ্বরী দেবীর ভোগের জন্য স্বীয় উদ্যানে উৎকৃষ্ট রম্ভা উৎপন্ন করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিকালে উহা সহস্রাক্ষ তাঁহার ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করেন। ইহাতে কৃষ্ণানন্দ মনে মনে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হন, কিন্তু প্রকাশ্যে ভ্রাতাকে কিছু বলেন না।

কৃষ্ণানন্দ প্রতি রাত্রে স্বহস্তে মাতৃমূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা সমাপনান্তে বিসর্জন দিতেন। একদিন এইরূপ পূজায় বসিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই আর পূজা শেষ হয় না। ভোগ নিবেদন করেন, বোধ হয় 'মা' যেন বিমুখ হইয়া আর ভোগ গ্রহণ করেন না। কোনরূপ ত্রুটি হইয়াছে ধারণায় পুনরায় ধ্যানযোগে মাকে আবাহন করেন। এদিকে ভ্রাতার পূজার বিলম্ব দেখিয়া সহস্রাক্ষ কারণানুসন্ধানে আসিয়া দেখেন আদ্যাশক্তিস্বরূপিনী মা তাঁহার (সহস্রাক্ষের) ইষ্টদেব গোপালকে কোলে লইয়া সেই কদলী ভক্ষণ করাইতেছেন। কৃষ্ণানন্দও এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত ; তৎক্ষণাৎ ভ্রাতাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তদবধি উভয়ের ভ্রাতৃসৌহার্দ্য পুনঃস্থাপিত হয়।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ "তন্ত্রসার" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁহার সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের বহুল আলোচনা হইত, কিন্তু তন্ত্রের সকল ক্রিয়া এক সঙ্গে পাওয়া যায় এমন কোন গ্রন্থ ছিল না। আগমবাগীশ নানা তন্ত্র আলোচনা করিয়া তন্ত্রসার প্রণয়ন করেন। ইহাতে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সকল ক্রিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিংবদন্তী আছে, তৎকালে আদ্যাশক্তির কোনরূপ মূর্তি না থাকায় তিনি আগমবাগীশকে স্বপ্নে আদেশ করেন 'তুমি আমার মূর্তি প্রকাশিত কর।' কৃষ্ণানন্দ "কিরূপ মূর্তি প্রকাশ করিব?" জিজ্ঞাসা করায় আদ্যাশক্তি প্রত্যুত্তরে বলেন "তুমি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রথমে যে মূর্তি দেখিবে, তাহাই আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে।" কৃষ্ণানন্দ প্রভাতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সম্মুখে এক নবযৌবনদীপ্তা ঘনমেঘবরণা গোপরমণী, বাম হস্তে গোময়পিণ্ড, দক্ষিণ হস্ত উক্ত পিণ্ড প্রাচীরে লেপন করিবার জন্য উর্ধ্বে উত্তোলিত, দক্ষিণ পদ সম্মুখে ন্যস্ত, বামপদ পশ্চাতে। গোপরমণী অকস্মাৎ কৃষ্ণানন্দকে দেখিয়া লজ্জায় জিহ্বা বাহির করিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণানন্দ ইহাই আদ্যাশক্তির রূপ বলিয়া জানিলেন। প্রতিদিন গঙ্গাস্নানান্তে গঙ্গাজলের পাত্রে করিয়া কিছু গঙ্গামৃত্তিকা আনিয়া প্রতিদিন দক্ষিণাকালীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া গোপনে রাত্রি সার্ধদ্বিপ্রহরের সময় পূজা করিতেন এবং অতি প্রত্যুষে সর্বলোকচক্ষুর অন্তরালে বিসর্জন দিয়া আসিতেন। একদিন কার্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে কৃষ্ণানন্দ মায়ের ঐরূপ মৃণ্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করিয়া ভক্তিভাবে পূজা করিতেছিলেন এবং সিদ্ধ পুরুষ জটিয়া যাদু অতি গোপনে পূজাস্থলে আসিয়া কৃষ্ণানন্দের অজ্ঞাতে তাঁহার পূজা অবলোকন করিতেছিলেন। কৃষ্ণানন্দ প্রথমে ভোগ নিবেদন করিলেন, তাহার পর পায়সান্ন নিবেদনের অব্যবহিত পরেই পানীয় প্রদান করিলেন। ইহাতে জটিয়া যাদু আর গুপ্তভাবে থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মায়ের পায়সান্ন আহার হয় নাই, উহা নির্মাল্যের ভিতর পড়িয়াছে, আপনি পায়স নিবেদনের পরেই পানীয় নিবেদন করিয়াছেন।" কৃষ্ণানন্দ দেখিলেন সত্য সত্যই নির্মাল্যের ভিতরে পায়সান্ন রহিয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণানন্দ জটিয়া যাদুকে আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধক বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং দুই জন একত্রে দেবীর পূজানুষ্ঠানাদি করিতে লাগিলেন। প্রবাদ আছে, জটিয়া যাদুর কন্যার সহিত কৃষ্ণানন্দের

পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। অদ্যাবধি দীপান্বিতা পূজার দিন জটিয়া যাদুর বংশধরেরা দেবীর পূজা করিয়া ভোগাদি দিয়া থাকেন। কৃষ্ণানন্দ গোপনে দক্ষিণাকালী পূজা করিয়া প্রত্যুষে যখন তিনি উহা বিসর্জন দিতে যান তখন একদিন কাজি উহা দেখিতে পায়। ঐ ব্যক্তি নবদ্বীপে ভূম্যধিকারীর নিকট গিয়া উহা জ্ঞাপন করে। তিনি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় উক্ত সংবাদদাতা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে এবং পূজাস্থানে গোপনে অবস্থান করে। কৃষ্ণানন্দ প্রত্যুষে যখন মূর্তি হস্তে গঙ্গাস্নানে যাইতে ছিলেন, তখন ভূম্যধিকারী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণানন্দ এক হস্ত দ্বারা আশীর্বাদ করায় ভূস্বামী বলিলেন, 'দুই হস্তে আশীর্বাদ করিবার নিয়ম আছে, আপনি দুই হস্তে আশীর্বাদ করুন।' কৃষ্ণানন্দ তাহাই করিলেন এবং এই সুযোগে ভূস্বামী আদ্যাশক্তির মূর্তি দেখিয়া উহা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণানন্দ সংক্ষেপে তাঁহার স্বপ্নবিবরণ এবং তন্ত্রের সারসঙ্কলনের কথা বলিলেন। রাজা এবং পণ্ডিতমণ্ডলী সভা করিয়া তাঁহাকে আগমবাগীশ উপাধি দিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থের নাম রাখিলেন 'তন্ত্রসার'। রাজা বলিলেন "আপনি যে মূর্তি ক্ষুদ্রাকারে পূজা করিয়াছেন আমি তাহাই বৃহদাকারে পূজা করিব।" সেই সময় হইতে কার্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে শ্যামাপূজা হইয়া থাকে। কৃষ্ণানন্দ যে স্থানে পূজা করিতেন, সে স্থানের নাম রাখা হইল আগমেশ্বরীতলা এবং প্রতিমার নাম হইল আগমেশ্বরী। দেবীর মন্দির ইষ্টকনির্মিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অদ্যাবধি সকলেই আগমেশ্বরীতলা সিদ্ধস্থান বলিয়া জানে। মেদিনীপুর জেলার দোরপরগনার ভূম্যধিকারী আগমেশ্বরীর সেবা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ১০০ বিঘা লাখরাজ দান করেন।

সহস্রাক্ষের বংশধরগণ এখনও নবদ্বীপে বাস করিতেছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহারই বংশধর ছিলেন। এই বংশের অন্য এক শাখা (শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী) বর্তমানে পাবনা জেলায় তাড়াশ গ্রামে বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণানন্দের পৌত্র মধুসূদন আচার্যকে সাঁতৈলের (রাজশাহী) রাজা শিখাই সান্যাল তাঁহার রাজ্যে ব্রহ্মোত্তর দিয়া বাস করান। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ এই স্থানে (হরিপুর) বাস করিয়া আসিতেছেন।

কৃষ্ণানন্দের উত্তর পুরুষের মধ্যে কৃষ্ণমঙ্গল বিদ্যাবাগীশ, রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার, রামলোভন বিদ্যাভূষণ ও রাধারমণ বিদ্যারত্ন প্রসিদ্ধ। ইঁহারা কয়েক জনই তান্ত্রিক সাধক এবং শাস্ত্রদর্শী সুপণ্ডিত অধ্যাপক ছিলেন। প্রত্যেকেই স্বগৃহে বহু বিদ্যার্থী ছাত্রকে আহার ও বাসস্থান প্রদান করিয়া বিদ্যা শিক্ষা দিতেন।

কৃষ্ণমঙ্গল বড়ল নদীর তীরবর্তী দশপাকিয়া নামক স্থানে সাধনা করিতেন। ঐ স্থান তাঁহার গৃহ হইতে প্রায় ১ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখনও সেই সাধনক্ষেত্র বর্তমান আছে। কালের করাল স্রোতে তাহা ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। বর্তমানে কোন সাধু পুরুষের ঐকান্তিক চেষ্টায় পুনরায় তাহা অরণ্যবিমুক্ত হইয়া মনোরম আশ্রমে পরিণত হইয়াছে। কৃষ্ণমঙ্গলের পুত্র রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তৎরচিত "প্রাণতোষিণী" তন্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও তন্ত্রের গভীর গবেষণার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কলিকাতায় হাতীবাগানে চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্বক অধ্যাপনা করিতেন। খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস নামক বিশিষ্ট ধনীর অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ায় এই বিশ্বাস-বংশকে তৎপ্রণীত গ্রন্থে চিরকালের জন্য অমর করিয়া রাখিয়াছেন।

ঐ গ্রন্থের গুরুশিষ্য লক্ষণে তিনি লিখিয়াছেন "আমার অত্যতিবৃদ্ধপিতামহের তন্ত্রসারে এই লক্ষ্মণ উক্ত হইয়াছে।" এবং আত্মপরিচয় প্রদানকালে তিনি বলিয়াছেন "আমি সাতু আচার্যের পৌত্র এবং কৃষ্ণমঙ্গলের পুত্র।"

রামতোষণের ভ্রাতা রামলোভনও তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। কথিত আছে, বলিহারের (রাজশাহী) কোন রাজপুত্রের সৌন্দর্যহীনতার জন্য বিবাহে বিঘ্ন ঘটায় রামলোভন কোন তান্ত্রিক ক্রিয়ার জন্য রাজধানীতে আহূত হন। রামলোভন তান্ত্রিক যজ্ঞান্তে যজ্ঞাবশিষ্ট ভস্ম দ্বারা রাজপুত্রের ললাটে একটি তিলক প্রদান করেন। তিলক যতদিন স্থায়ী থাকিবে ততদিন রাজপুত্রকে অসীম কান্তিমান পুরুষ দেখাইবে। এই ক্রিয়ার অত্যাশ্চর্য ফলে সন্তুষ্ট হইয়া বলিহার-রাজ রামলোভনকে রংপুর জিলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর নামক মৌজাখানি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দান করেন। এখনও সেই ব্রহ্মোত্তর তাঁহার ওয়ারিশগণ ভোগ করিতেছেন।

রামলোভনের পুত্র গুরুপ্রসাদ একজন জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্মিক, অতিথিপরায়ণ অধ্যাপক ছিলেন। তিনিও পিতাপিতামহের ন্যায় বহু বিদ্যার্থী ছাত্রকে অন্ন ও বিদ্যা দান করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র পণ্ডিত রামরমণ বিদ্যারত্নের অনেক সাহায্য পাইতেন। রামরমণ বলিহার-রাজের সভা-পণ্ডিত ছিলেন এবং তথা হইতে ভ্রাতাকে অর্থানুকূল্য করিতেন। বলিহার রাজধানী হইতে লিখিত পত্রে এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

গুরুপ্রসাদের পুত্র সারদাপ্রসাদও পিতৃনাম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনিও নিজ গৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নিজব্যয়ে বিদ্যার্থীকে সাহিত্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ও স্মৃতি শিক্ষা দিতেন। সারদাপ্রসাদের একটি মহৎ গুণ ছিল যাহা এখনকার দিনে ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। তাঁহার গৃহে যে সংখ্যক অতিথি যে সময়েই আসুক না কেন তিনি কখনও তাহাদিগকে বিমুখ করিতেন না। অনেক সময় এমন হইত যে বাড়ির পুরুষদিগের আহার শেষ হইয়াছে, ৩/৪টি অতিথি আসিয়া উপস্থিত। গৃহিণীরা তাঁহাদের ভোজ্য অন্ন অতিথিকে দিয়া নিজেরা চিড়ামুড়ি খাইয়া দিন কাটাইলেন।

মণ্ডলজানী মৈত্র আগমবাগীশের বংশ

- ১২ মানাই
  - শ্রীপতি
  - ১৩শ্রীরাম (শ্রীকণ্ঠ)
    - ১৪ নীলাম্বর
      - কল্যাণ আচার্য
        - মাধব আং
          - দুর্গাদাস আং
          - জিতামিশ্র আং
            - রঘুনন্দন আং
        - অনন্ত আং
        - মহেশ আং
          - কৃষ্ণানন্দ আং
            - কাশীনাথ
              - রূপাই
              - গৌরী
              - চণ্ডীদাস
              - ত্রিপুরাদাস
            - মথুরানাথ
              - রামচন্দ্র
            - হরিনাথ
              - গোপাল পঞ্চানন
                - নারায়ণ
              - প্রাণবল্লভ
                - যদু
                - ভবদেব
              - শ্যামসুন্দর
                - বা[illegible]দেব
              - মধুসূদন
                - আনন্দরাম
                  - সাতু আং
                    - কৃষ্ণমঙ্গল বিদ্যাবাগীশ
                      - রামলোচন ভঃ
                        - রাজীবলোচন ভঃ
                          - ভবানীদাস ভঃ
                      - রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার
                        - রামরমণ বিদ্যারত্ন
                      - রামলোভন বিদ্যাভূষণ
                        - গুরুপ্রসাদ ভঃ
                          - শারদাপ্রসাদ ভঃ
                            - গঙ্গাপ্রসাদ বাচস্পতি
                              - দেবীপ্রসাদ
                              - রমাপ্রসাদ
                            - শিবপ্রসাদ ভঃ
                      - রামশোভন ভঃ
                    - রুদ্ররাম হরি
                    - হরি
                    - কৃষ্ণশরণ
                    - কৃষ্ণচন্দ্র
                      - রতিকান্ত
                        - রামকৃষ্ণ
                      - রামনিধি
                        - রূপচন্দ্র
                  - সনাতন
                - পরশুরাম
                - জয়নারায়ণ (বসত বিশা)
            - বিশ্বনাথ
          - ১৫ [illegible]াক্ষ (লখাই)
        - কেশব আং
  - লক্ষ্মীধর

তালন্দ গ্রামের মৈত্র জমিদার বংশ

রাজশাহী জেলার অন্তর্গত হাপানিয়া গ্রামে প্রীতিকৃষ্ণের বাস ছিল। ইঁহার পুত্র ব্রজকিশোর মৈত্র তালন্দ গ্রামে বিবাহ করিয়া তালন্দবাসী হইয়াছিলেন।

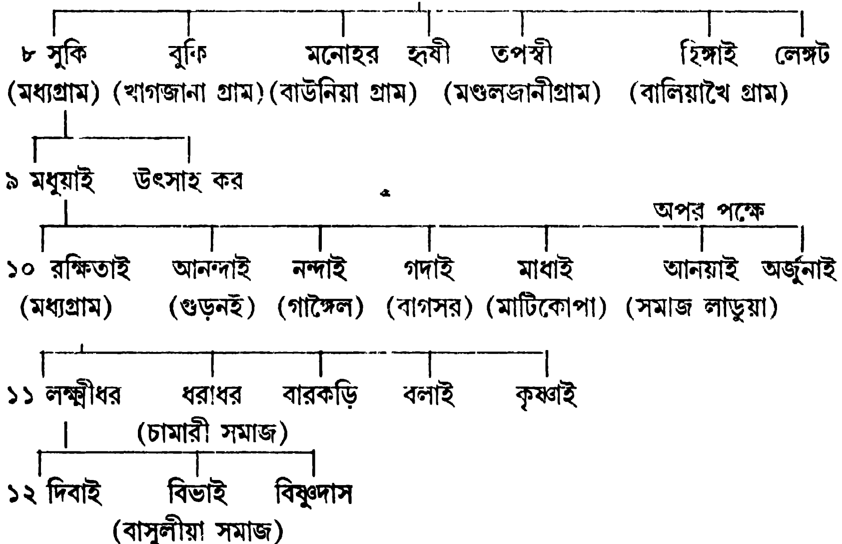
ব্রজকিশোর মৈত্রের পুত্র গৌরকিশোর, তৎপুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ মৈত্র। তৎপুত্র প্রসিদ্ধ আনন্দমোহন মৈত্র মহাশয় স্বীয় বুদ্ধিবলে প্রায় ৮০ হাজার টাকা আয়ের স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া ৯০ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ঁবৃন্দাবনধামে পৈত্রিক বিগ্রহ ঁরাধামাধব জিউ ঠাকুরকে স্থাপন করিয়াছেন। এই শ্রীমন্দির "মৈত্রের কুঞ্জ" নামে খ্যাত। এখানে বার্ষিক ছয় হাজার টাকার উপর ব্যয় হইয়া থাকে। বাড়িতে ঁমদনমোহন দেব বিগ্রহ ঠাকুরের সেবা আছে।

আনন্দমোহন অত্যন্ত অতিথিপ্রিয় ছিলেন। যত অতিথিই আসুক না কেন, তিনি অকাতরে অন্নদান করিতেন। পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি ললিতমোহনকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সম্পত্তির সদ্ব্যবহারই করিয়াছেন। অতিথিসেবা, দেবসেবা ইত্যাদি রীতিমত ঠিক রাখিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গোস্বামী মহাশয়গণ ইঁহার ধর্মজীবনের পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে "মোহান্ত মহারাজ" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ললিতমোহন অত্যন্ত প্রজারঞ্জক ছিলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ব্রজেন্দ্রমোহন এম এ ও বি-এল পাশ। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান গোপীকুলমোহন স্কুলে পড়িতেছেন।

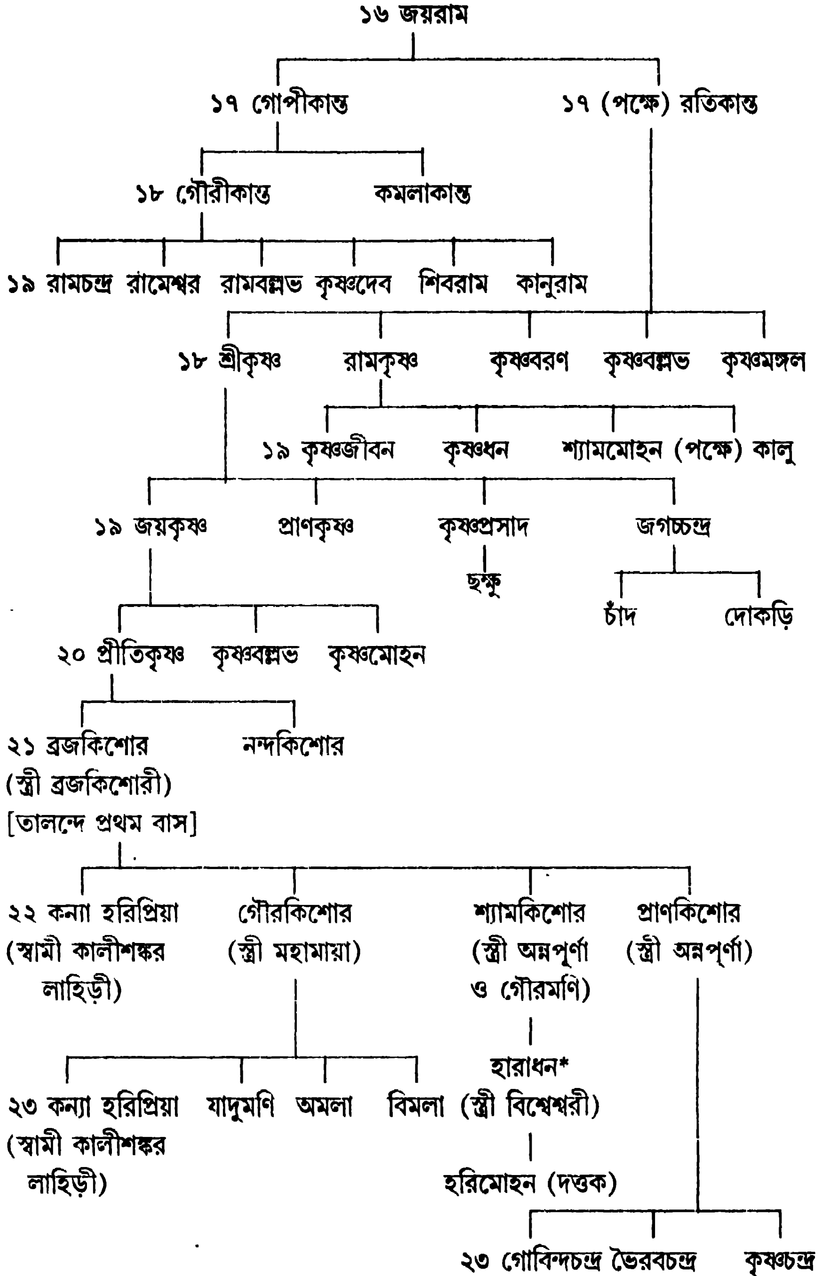
তালন্দার মৈত্র বংশ

আদিপুরুষ সুষেণ

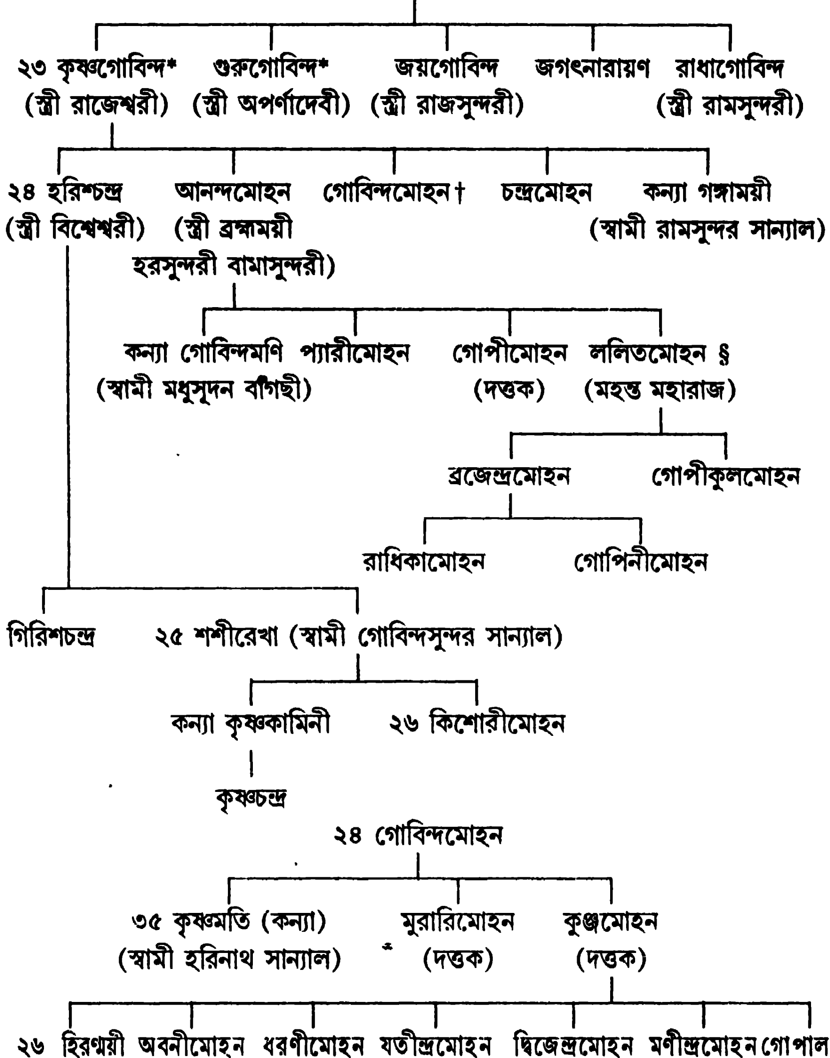
৭ নরসিংহ (উর্দ্ধতন পুরুষ ৩৭ পৃষ্ঠায়)



১২ বিভাই পুত্র ১৩ শূলপাণি, তৎপুত্র ১৪ সুন্দর, তৎপুত্র ১৫ দিঘাই, তৎপুত্র জয়রাম,



* হারাধন তালন্দে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন ও বৃন্দাবনে শ্রীশ্রী লালজিউ বিগ্রহ ঠাকুর সেবার জন্য সম্পত্তি অর্পণ করেন।



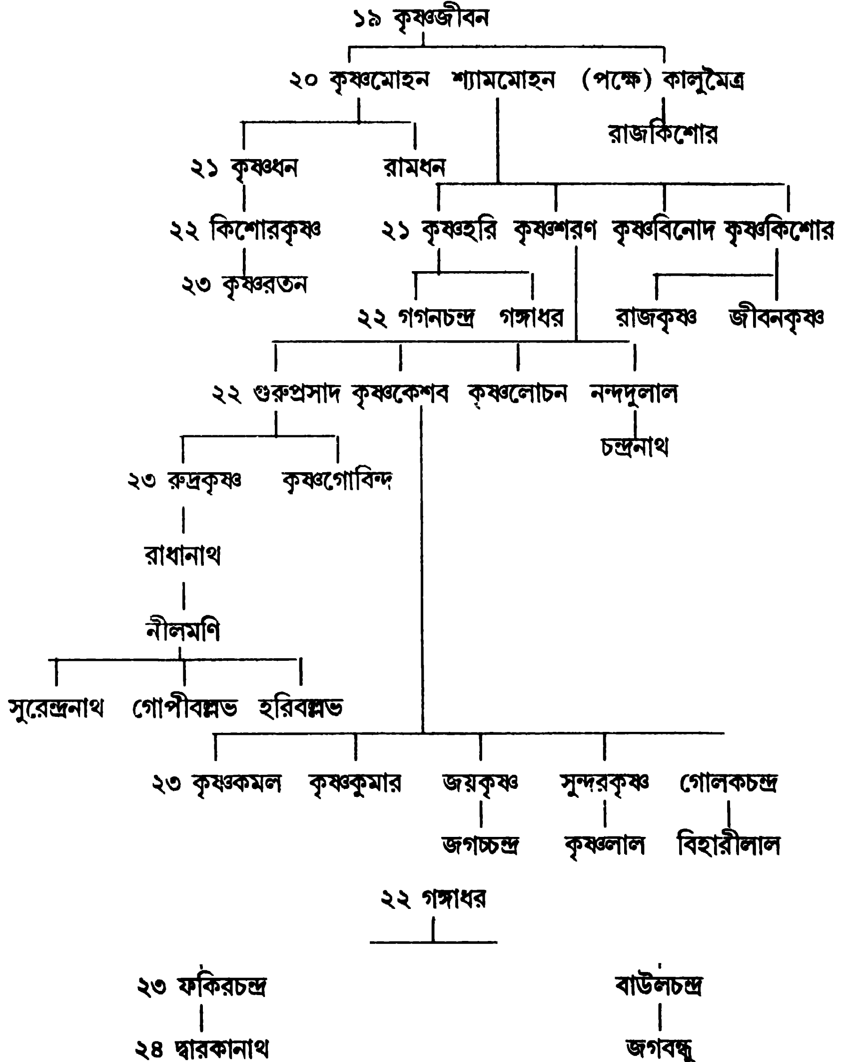
* কৃষ্ণগোবিন্দ সম্পত্তি খরিদ, কারবার ও অতিথি সৎকার দ্বারা সাধারণে পরিচিত হন। গুরুগোবিন্দের স্ত্রী অপর্ণা দেবী তালন্দে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন ও শ্রীশ্রীঅপর্ণেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন।

† আনন্দমোহন ও গোবিন্দমোহন বৃন্দাবন রাধাবাগে শ্রীশ্রীরাধামাধব জীউ বিগ্রহ স্থাপন করেন। অতিথিসেবা, দেবসেবা ও সম্পত্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। আনন্দমোহন তালন্দ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন ও শ্রীশ্রীরাধামাধব জীউ বিগ্রহ ঠাকুরকে বিপুল সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছেন।

§ ললিতমোহন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, 'মহন্ত মহারাজ' বলিয়া সকলে সম্মান করিতেন। তালন্দায় তাঁহার বহু কীর্তি বিদ্যমান। ললিতমোহন ব্রজেন্দ্রমোহন চেরিটেবল ডিস্পেন্সারি, ললিতমোহন লাইব্রেরী, ব্রহ্মময়ী বোর্ডিং ও শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

২৫ ললিতমোহন
(স্ত্রী বল্লভপুরের মুরলীমোহন গোস্বামীর কন্যা ী)

ব্রজেন্দ্রমোহন (স্ত্রী বীণাপাণি দেবী পিঃ প্যারীমোহন রায় পান্‌সীপাড়া) | গোপীকুল-মোহন (স্ত্রী রেণুকণা দেবী) | কন্যা কৃষ্ণমোহিনী (স্বামী সুরেন্দ্রনাথ সান্যাল বি. এল. সাং তালন্দ) | কৃষ্ণরঙ্গিণী | কৃষ্ণঅঙ্গিণী | কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী | কৃষ্ণউন্মাদিনী



(বল্লালী কুলীন) সতু মৈত্রের বংশীয় কৃষ্ণানন্দ পাতশার বংশ

- ৭ নরসিংহ
  - ৮ মনোহর (বাউনে)
    - ৯ আকাই
      - ১০ গোবিন্দাই
        - ১১ নিতাই
          - ১২ ছকড়ি
            - ১৩ শ্রীনিবাস
            - কোকাই
              - ১৪ যদু
                - ১৫ ভবানন্দ
                  - ১৬ গৌরীকান্ত
                  - কমলাকান্ত
                  - রমাকান্ত
                    - ১৭ কৃষ্ণানন্দ পাতশা
                    - শিবানন্দ লস্কর
              - মাধব বিশ্বাস
              - কমল
              - নয়ান
            - জগাই
            - সিধাই
          - ধিকাই
            - শিবধর
              - গদাই
              - মঙ্গল
          - তেকাই
          - পাঁচুয়াই
            - নিধাই (তরতাঘাত)
        - গতাই
        - কেশাই
        - রামনাই
    - বাকাই
    - সানাই
    - সব্বাই
    - নাড়াই
    - নাথাই
    - জগাই
    - মুগাই
    - পুরাই

- ১০ আনন্দাই (গুড়নৈ)
  - ১১ রাম
  - পদ্মনাভ
  - গঙ্গাধর
  - চক্রপাণি
  - ভীম
    - ১২ বসুন্ধর মিশ্র আচার্য
      - ১৩ সুরেশ
      - সুবুদ্ধি
      - রামভদ্র
      - কাশী
      - দণ্ডপাণি
        - ১৪ জানু
          - ১৫ সদু (সন্ধ্যাঘাত)
  - শ্রীপতি
  - নিধাই
  - প্রিয়ঙ্কর
  - দৈত্যারি

মেড়তলার ভট্টাচার্য বংশ

মেড়তলার ভট্টাচার্যবংশ পাণ্ডিত্য ও সাধনা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পদ্মার দক্ষিণ পারের বারেন্দ্রসমাজে ইঁহাদের বিশেষ সম্মান আছে। ইঁহারা গুড়নৈর মৈত্র। ইঁহাদিগের পূর্বপুরুষ রাজারাম তর্কবাগীশ ও কালীশঙ্কর তর্কচূড়ামণি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।

রাজারাম

রাজারাম তর্কবাগীশ মহাশয় খৃস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। যৌবনকালে তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। তাঁহার পাঠসমাপ্তির কিছুদিন পূর্বে নবদ্বীপে একজন সন্ন্যাসী আসেন। তাঁহার সহিত সওয়াহস্ত পরিমিত একখানি কালীমূর্তি ছিল। এই মূর্তি লইয়া তিনি পোড়ামাতার মন্দিরে ভজন সাধন করিতেন। তিনি যোগবলে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য করিতে পারিতেন বলিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ শীঘ্রই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের শাস্ত্রসম্বন্ধীয় প্রশ্নেরও সদুত্তর দিতেন। রাজারাম তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। সন্ন্যাসীও তাঁহার প্রতি স্নেহপরায়ণ হইয়া নির্জনে রাজারামকে আগম ও নিগম শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

তাঁহার শিক্ষা যখন সম্পূর্ণ হইল তখন সন্ন্যাসীর আদেশে তিনি এক কাপের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ইহার পর সন্ন্যাসী নবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করেন এবং রাজারামও নবদ্বীপের উত্তরপশ্চিম দিকে অবস্থিত মেড়তলা গ্রামে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী যাইবার সময় তাঁহার আরাধ্যামূর্তি রাজারামকে দিয়ে যান। রাজারাম প্রথমে দেবমন্দির নির্মাণ করিয়া দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, পরে বাড়ির অপরাংশ নির্মাণ করেন। তাঁহার নির্মিত দেবমন্দির এখনও বর্তমান আছে। রাজারামের সাধনক্ষমতা দর্শন করিয়া অনেক ধনাঢ্য ও পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে চুপিগ্রাম নিবাসী দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের পূর্বপুরুষগণ ও বলিহারের রাজবংশের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হইয়াও অনেক বৈদিককে দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

কালীশঙ্কর

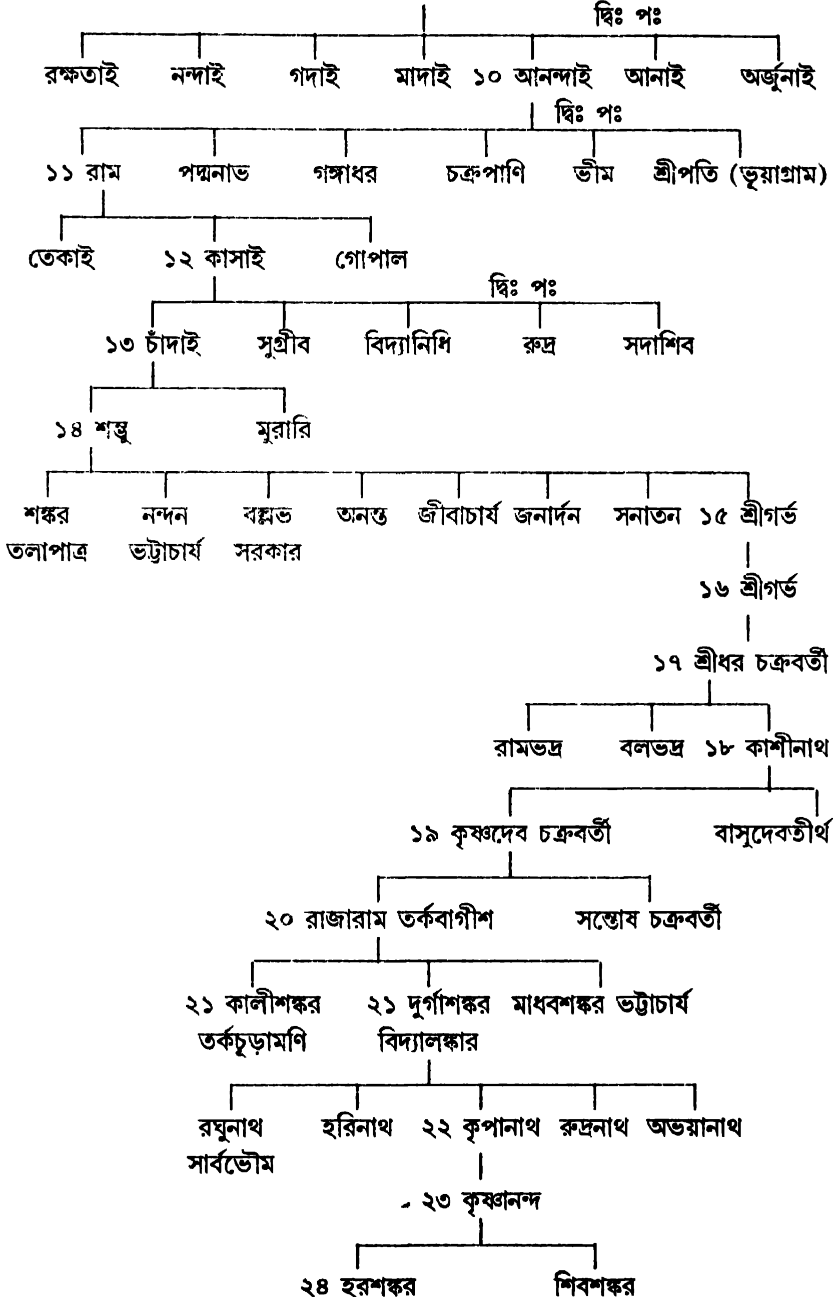
রাজারামের তিন পুত্র, তন্মধ্যে কালীশঙ্কর তর্কচূড়ামণি সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রবাদ যে একবার কালীশঙ্কর কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে এক মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করেন। মহারাজের পুত্র শিবচন্দ্র মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে গমন করিলে নবাবনন্দিনী তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। নবাব তখন কন্যার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া শিবচন্দ্রের সহিত কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন। শিবচন্দ্র জাতিপাতের আশঙ্কায় অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি পিতার অনুমতি লইবার ছলে কৃষ্ণনগরে আসিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সমস্ত ব্যাপার বলিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তখন জাতিনাশের বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় কালীশঙ্করের শরণাপন্ন হন। কালীশঙ্করকে তিনি মারণযজ্ঞ করিয়া নবাবনন্দিনীর প্রাণনাশ করিতে অনুরোধ করেন। কালীশঙ্কর প্রথমে এই দারুণ কর্ম করিতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু অবশেষে মহারাজের জাতিরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া মারণ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ইহার অতি অল্প দিনের মধ্যেই নবাবের নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে তাঁহার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কালীশঙ্করের অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে তাঁহাকে উপযুক্ত ভাবে সম্মানিত করেন।

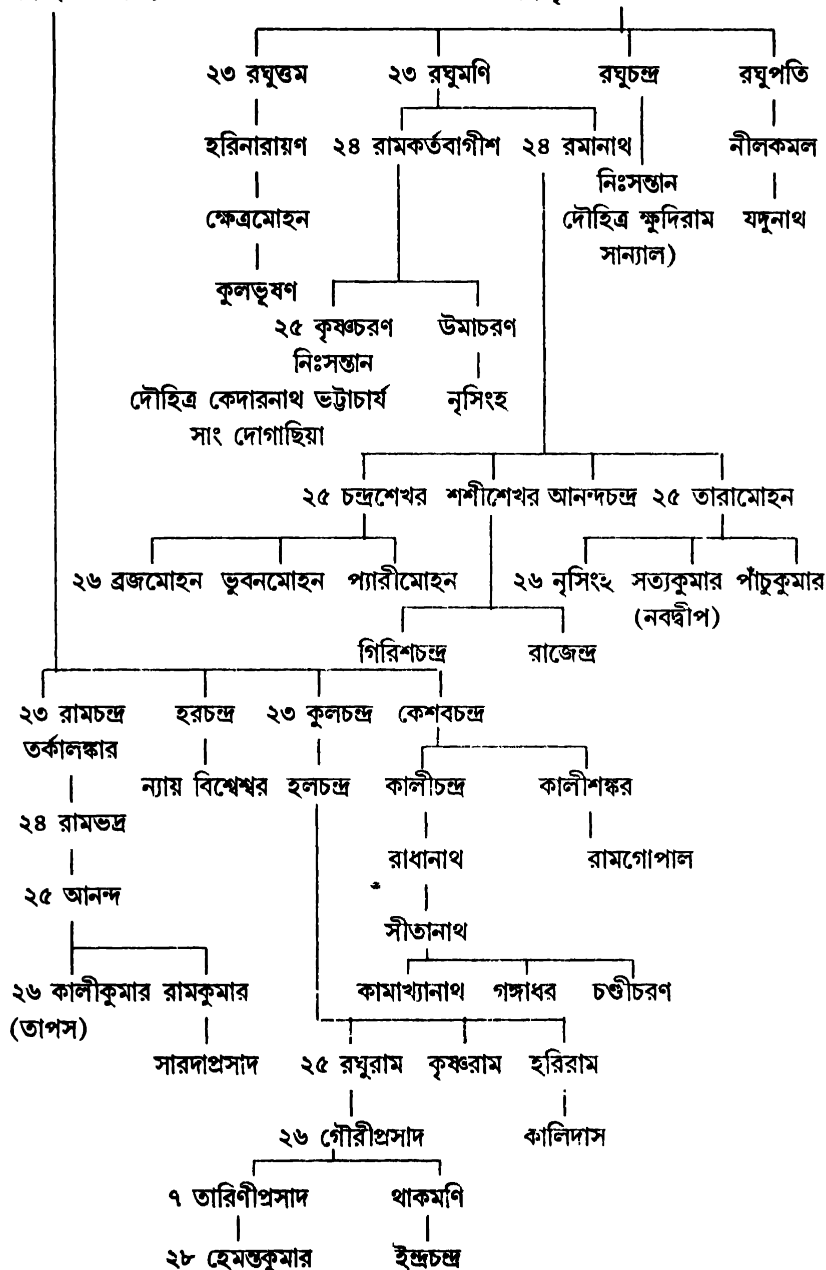
কালক্রমে নবাবের নিকট কালীশঙ্করের মারণযজ্ঞের কথা পৌঁছিল। নবাব কালীশঙ্করকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিবার জন্য ফৌজদারের উপর আদেশ দিলেন। কালীশঙ্কর কিছুকাল পলাতকভাবে এখানে সেখানে ঘুরিয়া শেষে নবাব সরকারে আত্মসমর্পণ করিলেন। নবাব তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া নিষিদ্ধ মাংস খাওয়াইবার চেষ্টা করেন। নবাবের সম্মুখে খানা খাওয়াইবার জন্য তাঁহাকে আনা হইল, কিন্তু খানার উপরকার কাপড় সরাইয়া দেখা গেল যে, নিষিদ্ধ মাংসের পরিবর্তে কেবলমাত্র কয়েকটি শুভ্র পুষ্প রহিয়াছে। ইহার পর তাঁহাকে বিষপান করাইয়া কারাগারে রাখা হইল। যখন কারাগাররক্ষীরা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া সৎকার করিতে যাইবে, তখন দেখিল যে কালীশঙ্কর সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। নবাব এই খবর পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহার অমানুষিক শক্তি দেখিয়া নবাব তাঁহাকে মুক্তি দেন ও কিছু ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি নবাবের দান গ্রহণ করিতে প্রথমে অস্বীকৃত হন। পরে নবাবের নির্বন্ধাতিশয়ে পাটুলী হইতে কাষ্ঠশালী পর্যন্ত গঙ্গার জলকর দান গ্রহণ করেন। আজও মেড়তলার ভট্টাচার্যগণ এই অধিকার ভোগ করিতেছেন।

বর্তমান অবস্থা

কালীশঙ্করের অধস্তনেরা ন্যায়, স্মৃতি ও তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। এই বংশের কালীকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় সাধকপুরুষ ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। রামকুমারের পুত্র সারদাপ্রসাদ স্মৃতি ও তন্ত্রের অধ্যাপনা করেন। যদুনাথ ও সীতানাথও তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপক।

রাজারাম তর্কবাগীশের বংশ




২১ কালীশঙ্কর তর্কচূড়ামণি
২২ হরিশচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন
২২ কৃষ্ণচন্দ্র তর্কপঞ্চানন
২৩ রঘুত্তম
২৩ রঘুমণি
রঘুচন্দ্র
রঘুপতি
হরিনারায়ণ
২৪ রামকর্তবাগীশ
২৪ রমানাথ
নিঃসন্তান
দৌহিত্র ক্ষুদিরাম সান্যাল)
নীলকমল
যদুনাথ
ক্ষেত্রমোহন
কুলভূষণ
২৫ কৃষ্ণচরণ
নিঃসন্তান
দৌহিত্র কেদারনাথ ভট্টাচার্য
সাং দোগাছিয়া
উমাচরণ
নৃসিংহ
২৫ চন্দ্রশেখর
শশীশেখর
আনন্দচন্দ্র
২৫ তারামোহন
২৬ ব্রজমোহন
ভুবনমোহন
প্যারীমোহন
২৬ নৃসিংহ
সত্যকুমার
(নবদ্বীপ)
পাঁচুকুমার
গিরিশচন্দ্র
রাজেন্দ্র
২৩ রামচন্দ্র
তর্কালঙ্কার
হরচন্দ্র
২৩ কুলচন্দ্র
কেশবচন্দ্র
ন্যায় বিশ্বেশ্বর
হলচন্দ্র
কালীচন্দ্র
কালীশঙ্কর
২৪ রামভদ্র
রাধানাথ
রামগোপাল
২৫ আনন্দ
সীতানাথ
২৬ কালীকুমার
(তাপস)
রামকুমার
কামাখ্যানাথ
গঙ্গাধর
চণ্ডীচরণ
সারদাপ্রসাদ
২৫ রঘুরাম
কৃষ্ণরাম
হরিরাম
২৬ গৌরীপ্রসাদ
কালিদাস
৭ তারিণীপ্রসাদ
থাকমণি
২৮ হেমন্তকুমার
ইন্দ্রচন্দ্র

হরিপুরের (পাবনা) চৌধুরী-বংশ

পাবনা জেলার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামের চৌধুরীবংশের সর্ আশুতোষ, যোগেশচন্দ্র, প্রমথনাথ ও কুমুদনাথের প্রতিভার গৌরবে আজ সমগ্র বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত। সাহিত্য, রাজনীতি, ব্যবহারশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিদ্যায় ইঁহাদের কয়েক ভ্রাতা যেন দিকপালস্বরূপ। ইঁহাদের বংশের খ্যাতিপ্রতিপত্তি ইঁহারা বর্ধিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ বংশের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি নতুন নহে।

ইঁহাদের বংশের আদিপুরুষ সুষেণ আদিশূর কর্তৃক কনোজ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম। ইঁহারা পূর্বে মৈত্র গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া ইহাদের উপাধি ছিল মৈত্রেয়। সুষেণের দশম অধস্তন পুরুষ স্বর্ণরেখের নাম নেপালের দরবার লাইব্রেরীতে রক্ষিত চতুর্ভূজ নামক স্বর্ণরেখের বংশধর কর্তৃক লিখিত হরিচরিত নামক সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। স্বর্ণরেখের পৌত্র মতিয়াই মৈত্রগ্রাম দান স্বরূপ পাইয়াছিলেন। মতিয়াইয়ের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ শূল সাতটা গ্রামে গিয়া বাস করেন। ইনিই সাতটা সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। শূলের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশব মৈত্র হইতে নাটোরের সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশের, আর দ্বিতীয় পুত্র অম্বর ওঝা হইতে হরিপুরের চৌধুরী বংশের উদ্ভব। ওঝা শব্দ সংস্কৃত উপাধ্যায়ের অপভ্রংশ মাত্র। হরিপুরের চৌধুরীরা কাশ্যপ গোত্র ও মৈত্রগাঞি।

অম্বর ওঝার সপ্তম অধস্তন পুরুষ হৃষীকেশ মজুমদারের সময় হইতে চৌধুরী বংশ আপনাদের বংশবিবরণ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। হৃষীকেশ মুসলমান সরকারে মজুমদারের কর্ম করিয়া মজুমদার উপাধি পাইয়াছিলেন। হৃষীকেশের পুত্র হরি মৈত্র—তাঁহার নামেই বর্তমান গ্রাম হরিপুরের নামকরণ হইয়াছে। হরিপুরে পূর্বে নিয়োগীরা বাস করিতেন—তাঁহাদের বংশের এক কন্যাকে হরি মৈত্রের পুত্র যাদবানন্দ বিবাহ করেন।

হরি মৈত্র বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি ভাল কীর্তন করিতে পারিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে হরি কীর্তনীয়া বলিত। হরিপুর গ্রামে ও তাহার আশেপাশে কিন্তু তান্ত্রিকাচারের খুব প্রাবল্য ছিল। হরি মৈত্রের পিতা হৃষীকেশ মজুমদার আঘাত হেতু কৌলীন্য মর্যাদা হারাইয়া কাপ আখ্যা প্রাপ্ত হন। সাধারণত যাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিম্নবংশে বিবাহ করিতেন তাঁহারাই কৌলীন্য হারাইয়া কাপ নামে অভিহিত হইতেন, কিন্তু হৃষীকেশের সহিত তদানীন্তন সমাজের মতবিরোধ ঘটায় তিনি কাপ হইয়াছিলেন। কিন্তু কৌলীন্য হারাইলেও ইঁহাদের সামাজিক সম্মানের কোন হানি হয় নাই; ইঁহারা কাপদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া "কাপকুলচূড়ামণি" আখ্যা পাইয়াছিলেন। সামাজিক মর্যাদায় লালোর ও কাশিমপুরের চৌধুরী ব্যতীত আর সকল কাপই ইঁহাদের নিম্নে। আধুনিক কালের পূর্বে ইঁহারা কখনও নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহিত আদান প্রদান করেন নাই।

হরি মৈত্রের পুত্র যাদবানন্দ এই বংশে প্রথম চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। কেন না, ইনি সাঁতৈলের বা ভাতুরিয়ার রাজার অধীনে চৌধুরী (চতুর্ধূরিন্) বা আদায়কারীর কাজ করিতেন। সাঁতৈলের রাজা ছিলেন বারভূঁইয়ার একজন। ইনি বাঙ্গলার সুবেদারকে কর ও সৈন্য, রসদ ও নৌকা প্রদান করিতেন। তাঁহার অবস্থান অনেকটা সামন্ত রাজাদের ন্যায় ছিল। যাদবানন্দ সোনাবাজু পরগনার অন্তর্গত খারিজা মহলের জোতদারও ছিলেন। খারিজা মহলের কিয়দংশ এখনও হরিপুরের চৌধুরীরা ভোগ করিতেছেন। যাদবানন্দের সময় হইতে হরিপুরের চৌধুরীরা চৌধুরী উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

যাদবানন্দের পৌত্র রামদেব সাঁতৈলের রাজার দেওয়ান হইয়াছিলেন। সাঁতৈল হরিপুর

হইতে মাত্র দেড় ক্রোশ দূরে। রামদেবকে লোকে দেওয়ান চৌধুরী বলিত। তাঁহার বংশধরেরা দেওয়ান চৌধুরীর বংশ বলিয়া পরিচিত হইত। রামদেব খাট্যা পরগনার কয়েকটি মহল দান প্রাপ্ত হয়েন। এই সকল মহলের আয় ছিল ষাট হাজার টাকা।

রামদেব

রামদেবের সময়ে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বারভূঁঞারা পূর্বে নিয়মিতভাবে রাজস্ব দিতেন না। নবাব যদি দুর্বল প্রকৃতির হইতেন তবে তো এক রকম রাজস্ব বন্ধই করিতেন। সাঁতৈলের রাজারাও অনেকদিন রাজস্ব দেন নাই। এখন মুর্শিদকুলি খাঁ নবাব হইয়া এক যোগে সমস্ত বকেয়া খাজনা দাবি করিলেন। সাঁতৈলের রাজা তাহা দিতে রাজী হইলেন না। তখন নবাব সৈন্যদল প্রেরণ করিয়া। সাঁতৈলের রাজাকে পরাজিত ও সপরিবারে নিহত করিলেন। নবাব তখন সাঁতৈলের দেওয়ান রামদেবকে সাঁতৈলের গদি দিতে চাহিলেন। কিন্তু রামদেব প্রভুভক্তি বশত তাহা লইতে রাজী হইলেন না। মুর্শিদকুলি খাঁ তখন রামদেবকেই তাঁহার আত্মীয়দের মধ্যে কোন উপযুক্ত পাত্রের নাম করিতে বলিলেন। রামদেব প্রথমে সাঁতৈলের রাজারই একজন দরিদ্র জ্ঞাতির নাম করেন। কিন্তু পরে শুনিতে পান যে উক্ত জ্ঞাতি রাজা হইয়া প্রথমে তাঁহারই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া নবাবকে টাকা নজর দিবেন। তখন রামদেব তাঁহার নিজের আত্মীয় নাটোর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামজীবনের নাম করেন। নবাব ও দিল্লীর সম্রাট রামজীবনকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া নেন। নাটোর-রাজবংশের সহিত হরিপুরের চৌধুরী বংশের এই জন্যই এত সৌহার্দ্য। যখন মুর্শিদাবাদের সৈন্যেরা আসিয়া সাঁতৈল লুট করিতেছিল, তখন রামদেব রাজার গৃহদেবতা শ্যামরায় ও মঙ্গলচণ্ডীকে আনিয়া স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্যাবধি শ্যামরায় ও মঙ্গলচণ্ডী চৌধুরী বংশে পূজিত হইতেছেন।

রামচন্দ্র

রামদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র মুর্শিদাবাদে রাজস্ব বিভাগে অতি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ও নবাব দরবারের সভ্য বা রায়ঝাঁয়া পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র ছাড়া রামদেবের আরও চারি পুত্র ছিলেন। এই পাঁচ ভাই হইতেই হরিপুরের চৌধুরীদের পাঁচ ঘরের উৎপত্তি হইয়াছে।

নয়নকৃষ্ণ

রামচন্দ্রের পৌত্র নয়নকৃষ্ণ চৌধুরী নাটোররাজের দেওয়ান হন। রামজীবনের ভ্রাতা রঘুনন্দনের বুদ্ধিবলে তখন নাটোর বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জমিদার। নয়নকৃষ্ণ নাটোর রাজের নিকট হইতে কতকগুলি ডিহি পাইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জ্ঞাতিবিবাদ বশতঃ ও নাটোররাজের সম্পত্তি নিলাম হওয়ার জন্য এই ডিহিগুলি ইহাদের হস্তচ্যুত হয়। নয়নকৃষ্ণের পুত্রেরা নয়াবাড়ি নামে একটি নতুন বাড়ি নির্মাণ করেন। নয়াবাড়ির পুকুর কয়েদিদের দ্বারা খনন করান হইয়াছিল। তখন হরিপুরে একটি কয়েদখানা ও ভাটি ছিল। নয়নকৃষ্ণের বংশ এখন লোপ পাইয়াছে।

কালীনাথ

নয়নকৃষ্ণের ভ্রাতা কালীনাথ চৌধুরী নিলামে সোনাবাজু পরগনা খরিদ করেন। কিন্তু পাছে নাটোররাজ জোর করিয়া উহা কাড়িয়া নেন এই ভয়ে তিনি উক্ত পরগনা জয়ারির বলরামবিশি, নাটোরের মুন্সী দুলাইনিবাসী রহিমুদ্দিন চৌধুরী ও সেরেস্তাদার তাঁতিবন্দ

নিবাসী উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সহিত সমভাগে ভাগ করিয়া নেন। কালীনাথ অতিশয় ধর্মপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি নিজের অংশের সোনাবাজু পরগনা তাঁহার সমস্ত জ্ঞাতিদের মধ্যে ভাগ করিয়া দানপত্র লিখিয়া দেন। তাঁহার সময়েই হরিপুরের বিশেষ সমৃদ্ধি সাধিত হয়। চৌধুরীরা অনেক কুলীন আনিয়া হরিপুরে বাস করান এবং তাঁহাদিগকে কন্যা সম্প্রদান করেন। এইরূপে প্রায় পাঁচশত ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ হরিপুরে বাস স্থাপন করেন। তাঁহারা সকলেই চৌধুরীদের নিকট হইতে কিছু ভূসম্পত্তি লাভ করেন।

কালীকান্ত

কালীনাথের পুত্র কালীকান্ত নাটোররাজের দেওয়ান হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অল্প বয়সে রামকৃষ্ণ ও দুর্গাদাস নামে দুই পুত্র রাখিয়া ইহলীলা সংবরণ করেন। এই দুই পুত্রই তখন শিশু বলিয়া তাঁহাদের পিতৃব্য কমলাকান্ত সংসারের কর্তা হয়েন। কমলাকান্তের ভগিনীপতি সম্পত্তির আমীন নিযুক্ত হয়েন। তিনি পরে মোক্তার হইয়া কৌশলে সোনাবাজু পরগনার অধিকাংশ নিলামে নিজ নামে ক্রয় করিয়া নেন। কালীকান্ত ভগিনীপতির এই ব্যবহারে এতই মর্মাহত হয়েন, যে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কালীকান্তের ভগিনীর মৃত্যুর পর উক্ত ভগিনীপতি দুর্গাদাসের তৃতীয় ভগিনী মৃণ্ময়ীদেবীকে বিবাহ করেন। উহার প্রদত্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া দুর্গাদাস ও রামকৃষ্ণ জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন।

দুর্গাদাস

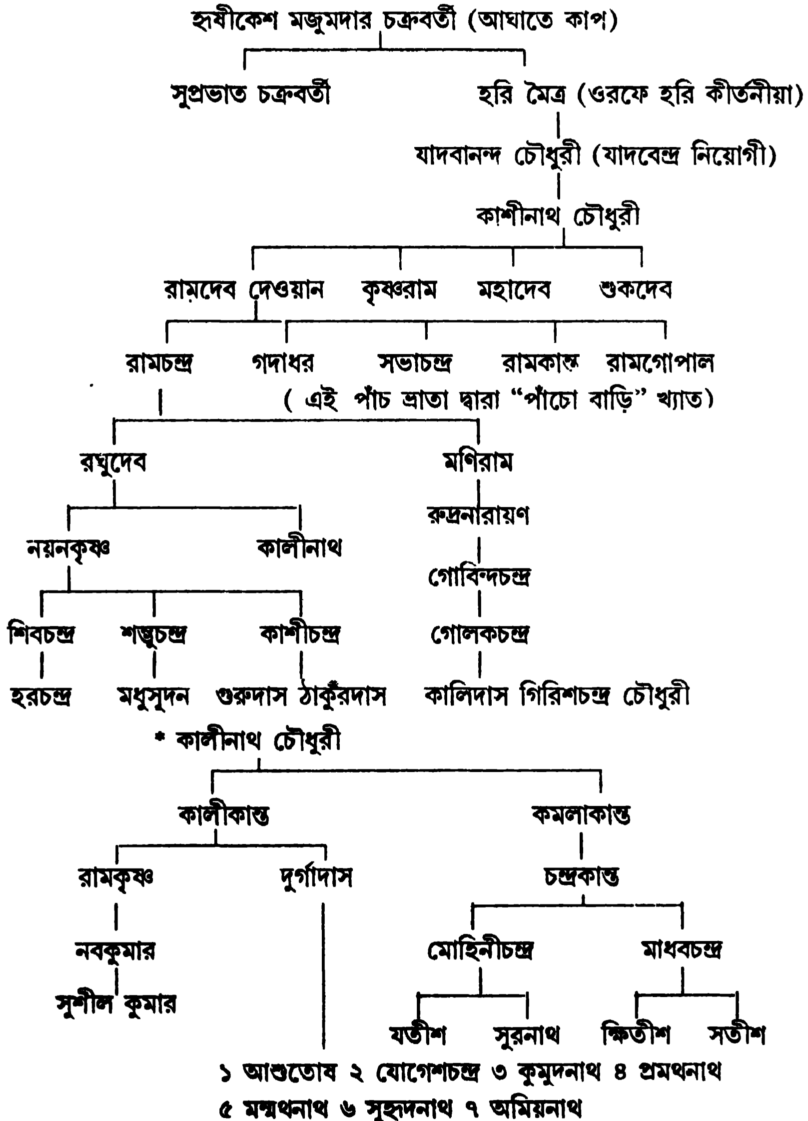
দুর্গাদাস তখনও বালক। কিন্তু তাঁহার অধ্যবসায় ও চরিত্রবল ছিল অসাধারণ। তিনি ভগিনীর নিকট থাকিয়া রাজশাহী হইতে কিছু লেখাপড়া শিখিয়া কলিকাতায় হিন্দু-কলেজে পড়িতে যান। কলিকাতা হইতে পাশ করিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার বংশের নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার ভগিনীপতি রোগশয্যায় শায়িত—তাঁহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া কোন প্রকারে সম্পত্তির কিয়দংশ উদ্ধার করেন। দুর্গাদাসের ভগিনীপতি মৃণ্ময়ীদেবীকে সম্পত্তি দান করিবার ও পোষ্যপুত্র রাখিবার ক্ষমতা দিয়া যান। মৃণ্ময়ী একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন এবং হেবানামা দ্বারা তাঁহার দুই ভ্রাতৃজায়া এবং দুই বিধবা ভগিনীকে সম্পত্তি দান করিয়া যান। মৃন্ময়ীর পোষ্যপুত্র ইহা লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া মোকদ্দমা করিয়া ভারতীয় সকল আদালতে পরাজিত হন। কিন্তু আদালতে পরাজিত হইলেও তিনি সহজে সম্পত্তির অধিকার দেন নাই। জলেশ্বরে উভয় পক্ষের মধ্যে যে দাঙ্গা হয় তাহাতে ১২ জন লোক হত ও ৭২ জন আহত হয়। প্রিভিকাউন্সিলের আপিলে মৃণ্ময়ীর পোষ্যপুত্রেরই অবশেষে জয় হয়।

ভগিনীপতির সহিত মোকদ্দমা করিবার সময় দুর্গদাস Mr. G. Money নামক ব্যারিস্টারকে স্বপক্ষে নিযুক্ত করেন। G. Money স্বেচ্ছায় ছোট লাট স্যার সিসিল বীডন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুর্গাদাসের জন্য একটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ যোগাড় করিয়া দেন। দুর্গাদাসের ধৈর্য এত অসাধারণ ছিল যে একদিন যখন তিনি যশোহর আদালতে একটি মোকদ্দমার বিচার করিতেছিলেন, তখন তারের খবরে তাঁহার প্রিভিকাউন্সিলের মোকদ্দমা হারার সংবাদ আসিলেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিচার চালাইতে থাকেন। তিনি সমগ্র জীবন পরহিতব্রতে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার পত্নী মগ্নময়ী দেবীকে দিয়া যান।

দুর্গাদাসের পুত্রগণ

দুর্গাদাসের সাত পুত্র। প্রথম পুত্র আশুতোষ হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র যোগেশচন্দ্র, তৃতীয় পুত্র কুমুদনাথ, চতুর্থ পুত্র প্রমথনাথ, ও সপ্তম পুত্র অমিয়নাথ ব্যারিস্টারী করেন। পঞ্চম পুত্র মন্মথনাথ ও ষষ্ঠপুত্র সুহৃদনাথ স্বনামধন্য ডাক্তার।

অম্বর ওঝা (সাতটা) তৎপুত্র কুয়াই, তৎপুত্র শাকাই, তৎপুত্র বারকড়ি, তৎপুত্র বলাই, তৎপুত্র বেদান্ত, তৎপুত্র রঘুনন্দন, তৎপুত্র হৃষীকেশ।



প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠের বংশ

সাং ভাতশালা ও নবদ্বীপ। (পৈতৃক নিবাস পুঁটিয়ার নিকট পীরগাছা)

৬ শূলপাণি (সাতোটা)
|
৭ অম্বু বা অম্বর ওঝা
|
৮ কুয়াগ্রিও
|
৯ শাকাই
|
১০ বারকড়ি — বশিষ্ঠ — অষ্টাঙ্গ
|
১১ হয়গ্রীব মৈত্র
|
সুধাকর — ১২ রামভদ্র
|
১৩ বলভদ্র
|
১৪ জটাধর
|
১৫ ঈশান
|
রামানন্দ সরখেল — বিনোদ — ১৬ মধুবসন্ত রায়
|
রঘুনাথ রায় — যাদু রায় — তিতু রায় (১৭ দ্বিঃ পক্ষে)
|
১৮ চাঁদ রায় — নয়ান রায় — গঙ্গারাম রায়
|
রামনাথ রায় — ১৯ সুন্দররাম রায়
|
২০ কাশীনাথ রায় — মাণিক রায়
|
২১ মনোহর — গণেশচন্দ্র নিঃসন্তান — ভোলানাথ
|
২২ মতিলাল (যাত্রাওয়ালা) — হীরালাল (অবিবাহিত অবস্থায় পরলোক গমন) — ব্রজলাল (ইনিও যাত্রার দল করিয়াছিলেন)
| দ্বিঃ পক্ষে
২৩ ধর্মদাস রায় — ভূপেন্দ্র প্রভৃতি

পরশুরাম পঞ্চানন্দের বংশ-বিবরণ

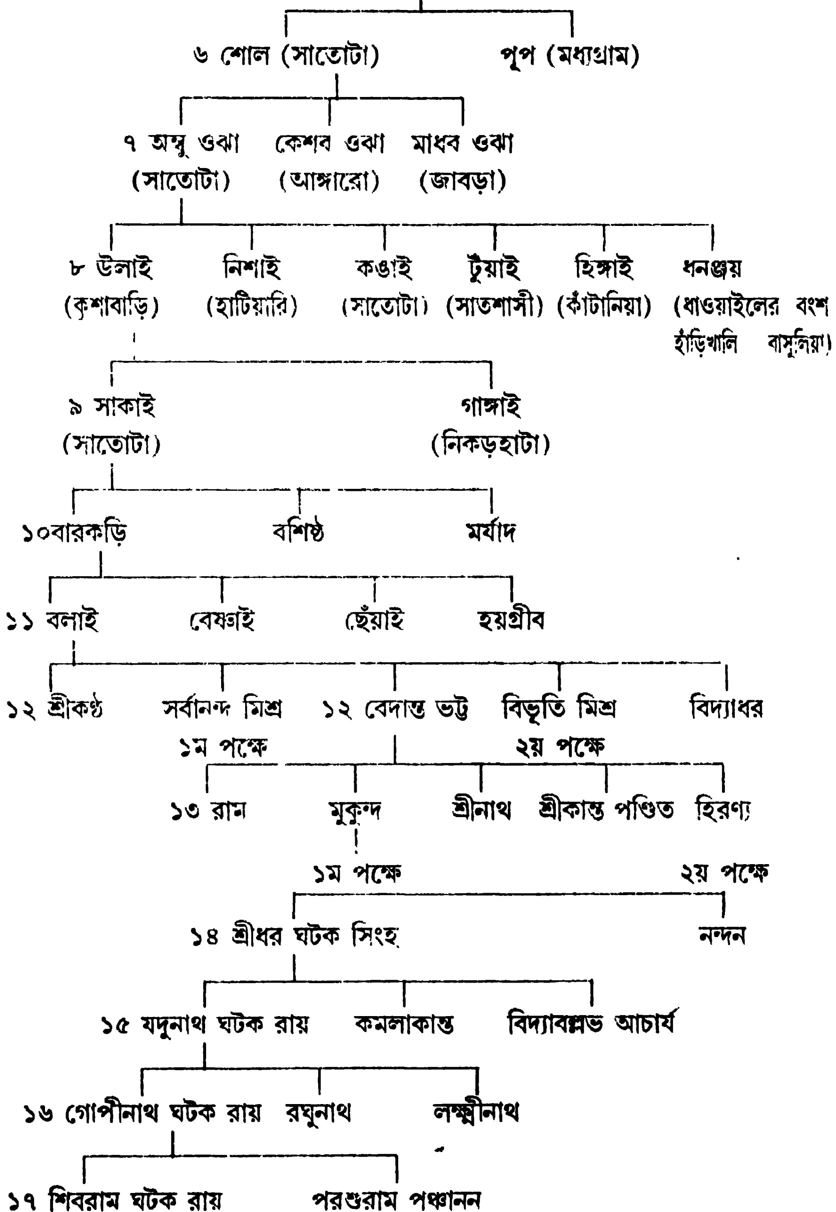
পরশুরাম পঞ্চানন সুষেণের ষড়বিংশ অধস্তন পুরুষ। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলজ্ঞ ছিলেন। ইঁহাদের পূর্বনিবাস ছিল রাজশাহীর অন্তর্গত সাতটা গ্রামে। ইঁহারা কুলীন ছিলেন। কিন্তু পরশুরাম পঞ্চানন, শিবরাম বাচস্পতি, কৃষ্ণানন্দ ঢোল, কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও রামনাথ সান্যালের সহিত করণ করায় কাপশ্রেণীভুক্ত হয়েন। তখন বারেন্দ্রেতর ব্রাহ্মণেরা কাপকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। পরশুরাম পঞ্চানন কাপশ্রেণীভুক্ত হইলে তাঁহার কুলগুরু পর্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। তখন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে খাজুরা-নিবাসী প্রধান আদ্যকাপ শিবরাম বাচস্পতির সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহার নিকট পুনরায় মন্ত্রগ্রহণ করেন।

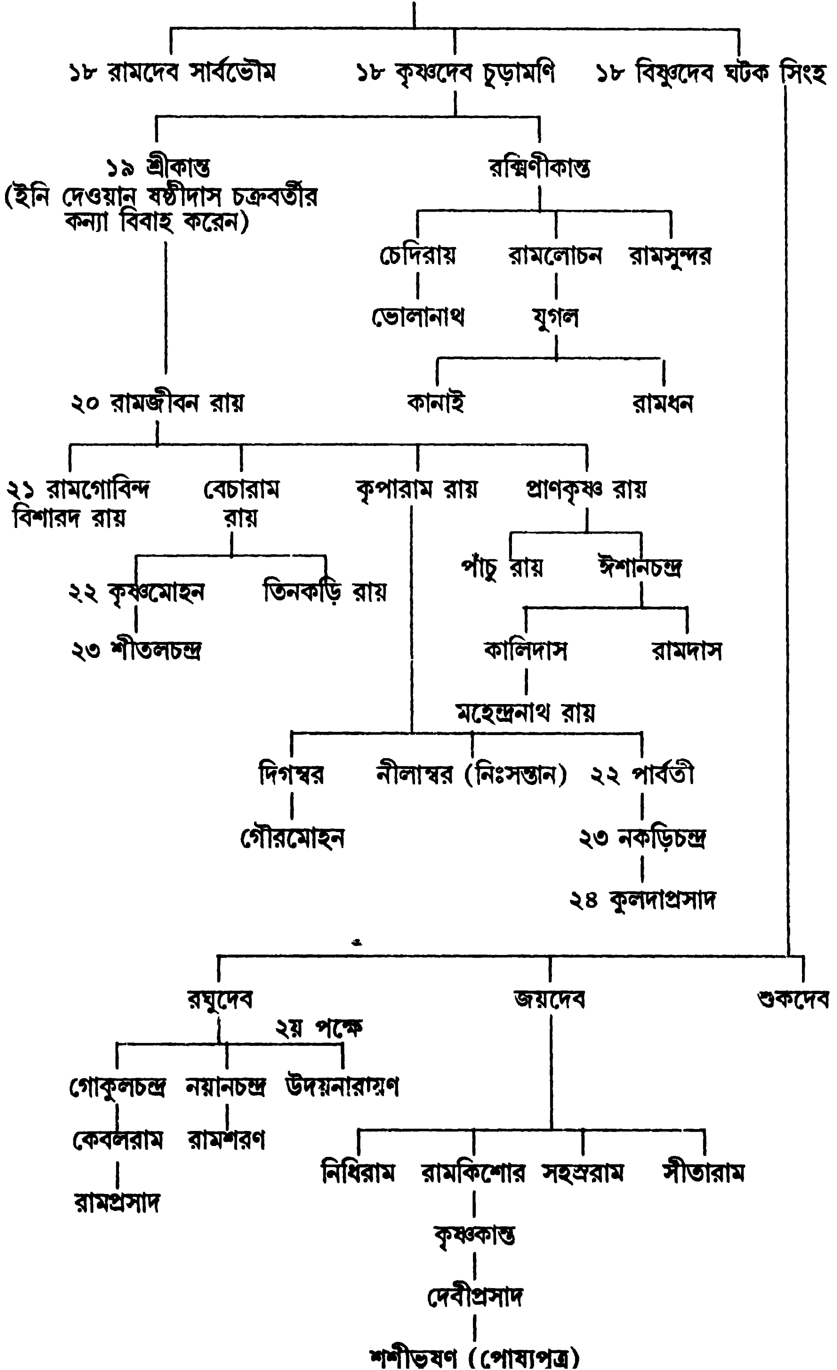
কাপ হইয়া যাওয়ায় পরশুরাম পঞ্চাননের কুলীনের করণে ও বিবাহে ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয়দিগের পুত্র কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ বন্ধ হইয়া যায়। এই জন্য তাঁহার কুলাচার্যের ব্যবসায়েরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এমন কি তাঁহার অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। অবশেষে তিনি উপায়ন্তর না দেখিয়া সিদ্ধশ্রোত্রিয় হইতে মনস্থ করিলেন। তিনি তখন দুই কন্যাকে নিরাবিলের কুলীনশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস লাহিড়ীর দুই পুত্রের সহিত, দুই কন্যা রতিনাথ সান্যালের দুই পুত্রের সহিত, অন্য দুই কন্যা রামগোবিন্দ সান্যালের দুই পুত্রের সহিত ও এক কন্যা পরশুরাম লাহিড়ীর সহিত বিবাহ দেন।

গঙ্গানন্দ নামে নবাবের একজন প্রধান কর্মচারীর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে অনেক কুলীন ও কুলজ্ঞ বরযাত্রী আসিয়াছিলেন। পরশুরাম পঞ্চাননও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। গঙ্গানন্দ দেখিলেন যে পদ্মার দক্ষিণপারে কুলীন বা কুলজ্ঞ নাই। সেই জন্য তিনি পরশুরাম পঞ্চানন ও কুলীনদিগকে তথায় বাস করিতে অনুরোধ করেন। পরশুরাম পঞ্চানন কুবাজ পরগনার বামুনগড়িয়া, রামচন্দ্রপুর, ভাটর এবং চৌপুর গ্রামের মধ্যস্থল মনোনীত করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দেওয়ান ষষ্ঠীদাস চক্রবর্তী তাঁহার কন্যাকে কুলীনে বিবাহ দিয়া সিদ্ধশ্রোত্রিয় হইতে ইচ্ছা করেন। তিনি পরশুরাম পঞ্চাননের পৌত্র শ্রীকান্ত রায়ের সহিত নিজের প্রথমা কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। পরশুরাম প্রথমে অস্বীকৃত হয়েন, কিন্তু পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে সম্মত হয়েন। শ্রীকান্ত যৌতুক স্বরূপ লাখেরাজ সম্পত্তি ও কয়েকটি পুষ্করিণী প্রাপ্ত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পরশুরাম পঞ্চাননকে তাঁহার গ্রামের পার্শ্বস্থ চারিখানা গ্রাম দান করেন। ঐ গ্রামের নাম হয় চক্-পঞ্চানন। বর্তমানে উহার নাম চকবামুনগড়িয়া।

পরশুরাম পঞ্চাননের বংশধরগণ এখন চক্পঞ্চানন গ্রামে, শান্তিপুরে ও কুমারখালির নিকটস্থ যদুবয়রা গ্রামে বাস করিতেছেন।


কাশ্যপ গোত্র
পরশুরামের পূর্ববংশ
৫ বৃহস্পতি মৈত্র
৬ শোল (সাতোটা)
পূপ (মধ্যগ্রাম)
৭ অম্বু ওঝা (সাতোটা)
কেশব ওঝা (আঙ্গারো)
মাধব ওঝা (জাবড়া)
৮ উলাই (কুশাবাড়ি)
নিশাই (হাটিয়ারি)
কণ্ডাই (সাতোটা)
টুঁয়াই (সাতশাসী)
হিঙ্গাই (কাঁটানিয়া)
ধনঞ্জয় (ধাওয়াইলের বংশ হাঁড়িখালি বাসুলিয়া)
৯ সাকাই (সাতোটা)
গাঙ্গাই (নিকড়হাটা)
১০বারকড়ি
বশিষ্ঠ
মর্যাদ
১১ বলাই
বেষ্ণাই
ছেঁয়াই
হয়গ্রীব
১২ শ্রীকণ্ঠ
সর্বানন্দ মিশ্র
১২ বেদান্ত ভট্ট
বিভূতি মিশ্র
বিদ্যাধর
১ম পক্ষে
২য় পক্ষে
১৩ রাম
মুকুন্দ
শ্রীনাথ
শ্রীকান্ত পণ্ডিত
হিরণ্য
১ম পক্ষে
২য় পক্ষে
১৪ শ্রীধর ঘটক সিংহ
নন্দন
১৫ যদুনাথ ঘটক রায়
কমলাকান্ত
বিদ্যাবল্লভ আচার্য
১৬ গোপীনাথ ঘটক রায়
রঘুনাথ
লক্ষ্মীনাথ
১৭ শিবরাম ঘটক রায়
পরশুরাম পঞ্চানন


১৭ পরশুরাম পঞ্চানন
১৮ রামদেব সার্বভৌম
১৮ কৃষ্ণদেব চূড়ামণি
১৮ বিষ্ণুদেব ঘটক সিংহ
১৯ শ্রীকান্ত
(ইনি দেওয়ান ষষ্ঠীদাস চক্রবর্তীর কন্যা বিবাহ করেন)
রুক্মিণীকান্ত
চেদিরায়
রামলোচন
রামসুন্দর
ভোলানাথ
যুগল
২০ রামজীবন রায়
কানাই
রামধন
২১ রামগোবিন্দ বিশারদ রায়
বেচারাম রায়
কৃপারাম রায়
প্রাণকৃষ্ণ রায়
পাঁচু রায়
ঈশানচন্দ্র
২২ কৃষ্ণমোহন
তিনকড়ি রায়
২৩ শীতলচন্দ্র
কালিদাস
রামদাস
মহেন্দ্রনাথ রায়
দিগম্বর
নীলাম্বর (নিঃসন্তান)
২২ পার্বতী
গৌরমোহন
২৩ নকড়িচন্দ্র
২৪ কুলদাপ্রসাদ
রঘুদেব
জয়দেব
শুকদেব
২য় পক্ষে
গোকুলচন্দ্র
নয়ানচন্দ্র
উদয়নারায়ণ
কেবলরাম
রামশরণ
রামপ্রসাদ
নিধিরাম
রামকিশোর
সহস্ররাম
সীতারাম
কৃষ্ণকান্ত
দেবীপ্রসাদ
শশীভূষণ (পোষ্যপুত্র)

১৮ রামদেব সার্বভৌম

১৯ হরিদেব রায়

গন্ধর্ব গোবিন্দ রায় সুরনারায়ণ রায় ২০ শ্যাম রায়

২১ রামশঙ্কর (বক্তার সিংহ) রঘুনাথ রায় কালীশঙ্কর রায়

রামেন্দ্র রায় রাজচন্দ্র রায় ২২ বৈদ্যনাথ বিশারদ রায় (কুলশাস্ত্রজ্ঞ)

২৩ ব্রজনাথ লটকরায় (নিবাস যদুবয়রা)

২১ রামগোবিন্দ বিশারদ রায়

২২ রামদুলাল ঘটকরায় (বিখ্যাত কুলজ্ঞ) কাশীনাথ ঘটকরায় (নিঃসন্তান) হরিশ্চন্দ্র ঘটকরায়

রামচন্দ্র রায় এককড়ি রায় (বিখ্যাত কুলজ্ঞ ও বক্তা)

সতীশচন্দ্র রায়

২৩ চন্দ্রকান্ত ঘটকশিরোমণি (কুলজ্ঞ) রামানন্দ রায় রামধন রায় কমলাকান্ত রায়

নবকৃষ্ণ কেদারনাথ পদ্মলোচন ব্রজনাথ

ভূপতিনাথ রমাপতি পরেশনাথ দেবনাথ

২৪ রামকৃষ্ণ রায় বক্তার সিংহ (কুলজ্ঞ ও বক্তা) হরেকৃষ্ণ রায়

২৫ রামযাদু রামতারণ (কুলশাস্ত্রজ্ঞ) রামগতি

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের বংশ-পরিচয়

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার নিজ বংশ-পরিচয় এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

"আমার বংশ-পরিচয় জানিত চাহিয়াছেন, যথাশ্রুত লিখিয়া পাঠাইলাম। আমি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের সুবিখ্যাত কুলীন মধুমৈত্রের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। মধু তাঁহার সমসাময়িক বারেন্দ্র ব্রাজণ-সমাজের একজন গণ্য মান্য সমাজপতি ছিলেন। তৎকালে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ কুলীন এবং শ্রোত্রিয় নামক দুই শাখায় বিভক্ত ছিল। মধু বৃদ্ধ বয়সে সত্যরক্ষার্থ গৌড়েশ্বর রাজা গণেশের মন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়ালের দুহিতার পাণিগ্রহণ করায়, তাঁহার প্রথম পক্ষের প্রথম দুই পুত্র ভিন্ন অন্য পুত্রগণ পিতৃসংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা মধুর প্রতাপে কুলচ্যুত হওয়ায় "কাপ" নামক আর একটি শাখার উৎপত্তি হয়। অনেক কুলীন কাপ হওয়ায় এবং কেহ কেহ কাপ হইয়া পরে শ্রোত্রিয় হওয়ায়, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে কুলীনের সংখ্যা ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা এখনও কৌলীন্যমর্যাদা ভোগ করিতেছি। নরসিংহ প্রভুপাদ শ্রীমাদ্বৈত গোস্বামীর পূর্বপুরুষ ছিলেন, "অদ্বৈতপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে নরসিংহের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কাপোৎপত্তির উল্লেখ আছে, যথা—

> "নরসিংহ নাড়িয়াল আরু ওঝার নাতি।
> যাঁহার কন্যার বিভায় কাপের উৎপত্তি।।
> যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
> গৌড়ীয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে ছিলা রাজা।।"

এই বিবাহসূত্রে অদ্বৈতবংশের সঙ্গে মধু মৈত্রের বংশের যে আত্মীয়তা সংস্থাপিত হয়, অদ্যাপি তাহা উভয় বংশের বংশধরগণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের মধু মৈত্রের বংশধরগণের সামাজিক আভিজাত্যের ইহাই একটি উল্লেখযোগ্য মূল। এই বংশে বর্তমান সময় পর্যন্ত বহু বংশধর প্রতিভায় এবং কৃতিত্বে সুপরিচিত। তন্মধ্যে নাটোর রাজবংশধরগণ, স্যার আশুতোষ চৌধুরী ও তদীয় ভ্রাতৃগণ, অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বংশ কাশ্যপগোত্রসম্ভূতে এবং কান্যকুব্জাগত সুষেণ মুনির বংশ বলিয়া পরিচিত। রাজদত্ত বাসগ্রামের নামানুসারে এক শাখা মৈত্র ও অপরশাখা ভাদুড়ী উপাধি বহন করিয়া আসিতেছেন। উপাধি পৃথক হইলেও, মৈত্র এবং ভাদুড়ী এক বংশের বংশধর। বর্তমানে কেহ কুলীন, কেহ কাপ, কেহ বা শ্রোত্রিয় হইলেও, সকলেই এক বংশের বংশধর এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের জনসংখ্যার অনুপাতে ইহাদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। এখন আর মৈত্রগ্রাম বা ভাদুড়ী গ্রাম ইহাদের নিবাস-স্থান নয়, ইহারা নানা স্থানে বাস করিতেছেন। মৈত্র বা ভাদুড়ী গ্রাম কোথায় ছিল, তাহার স্মৃতি পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একদা মৈত্র গ্রাম পূজনীয় পূর্বপুরুষগণের নিবাস ছিল, তখন তাঁহাদের উপাধি ছিল মৈত্র, এখন তাহা না থাকায় এখন মৈত্রেয় উপাধি দ্বারা বংশপরিচয় প্রদান করা কর্তব্য জানিয়া আমি 'মৈত্রেয়' উপাধির ব্যবহার করিয়া থাকি। যাঁহারা মুসলমান শাসন সময়ে রাজকার্যে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা কুলোপাধি ত্যাগ করিয়া চৌধুরী, মজুমদার, রায়, খাঁ প্রভৃতি বহুবিধ উপাধি ধারণ করায় আদি-কুলোপাধিধারীর সংখ্যা অল্প হইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে সকলকেই মৈত্রগ্রামী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে হয়। ধনাঢ্য কাপ বা শ্রোত্রিয়গণ কুলীনপাত্রে কন্যাদান করিয়া, কন্যাজামাতার জন্য স্বগ্রাম বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া ভরণপোষণের ব্যবস্থা

করিতেন বলিয়া, অন্যান্য কারণের মধ্যে আদি-বাসস্থান-ত্যাগের ইহাও একটি প্রধান কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। যাঁহারা বিষয়কর্মলিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তৎসূত্রেও নানা স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং অদ্যাপি হইতেছেন।

"কাপোৎপত্তির পূর্বে মধু মৈত্র রাজশাহীর অন্তর্গত অধুনা মাঝগ্রাম তৎকালে মধ্যগ্রাম পরিচিত স্থানে বাস করিতেন; কাপোৎপত্তির পরে তিনি রাজশাহীর অন্তর্গত গুড়নই নামক গ্রামে শেষজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৎসূত্রে মধুর প্রথম পুত্রদ্বয়ের বংশধরগণ "গুড়নইর মৈত্র" বলিয়া পরিচয় দান করিয়া আসিতেছেন। ঐ গ্রাম এখন সমৃদ্ধিহীন হইলেও, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে উহার খ্যাতি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। তথা হইতে মধুর বংশধরগণ নানা স্থানে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অল্পদিন পূর্বেও তাঁহাদের কাহারও কাহারও উদ্যোগে ও সহায়তায় মধু মৈত্রের ভিঁটায় বর্ষে বর্ষে শারদীয়া দুর্গোৎসব হইত। আমরা গুড়নই হইতে ফরিদপুরের অন্তর্গত মেঘনা গ্রামে এবং পরে তথা হইতে অদূরবর্তী রুক্মিণী গ্রামে বাস করিতাম; উভয় স্থানেই এখনও কোন কোন জ্ঞাতি বাস করিতেছেন।

পিতামহ উমাকান্ত তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথমা স্ত্রী রুক্মিণী গ্রামের ভদ্রাসনে বাস করিতেন, মধ্যমা পাবনার অন্তর্গত তাঁতিবন্দে বাস করিতেন, কনিষ্ঠা ফরিদপুরের অন্তর্গত সুখদেবপুরে বাস করিতেন। এখন মধ্যমার একমাত্র পৌত্র দুর্গাগতি সস্ত্রীক কাশীবাসী, তাঁহার দৌহিত্রগণ কলিকাতাবাসী। কনিষ্ঠার পৌত্রগণ সুখদেবপুরেই রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সুবিখ্যাত চক্ষুচিকিৎসক ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ তাঁহার বর্তমান সহোদরগণের সহিত বিষয়কর্মোপলক্ষে অধিকাংশ সময় কলিকাতায় বাস করেন। আমরা রুক্মিণী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া অধুনা নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালিবাসী হইয়াছিলাম। ঐ গ্রাম কোম্পানি বাহাদুরের শাসন সময়ে একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র থাকায় পুরাতন মানচিত্রে উহার উল্লেখ দেখা যায়। তথায় কোম্পানির কুঠি ছিল, বাণিজ্যরক্ষার্থ একদল পল্টন থাকিত, এবং কলিকাতা হইতে সুন্দরবন ঘুরিয়া পদ্মাপ্রবাহযোগে কোম্পানির বাষ্পপোত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাতায়াত করিত বলিয়া, কুমারখালিতে তাহাদের একটি বিশ্রামস্থান ছিল। তখনও কার্পাস ও পট্টবস্ত্র এ দেশ হইতে বিলাতে প্রেরিত হইত ; এবং কুমারখালিতে তাহার একটি প্রধান আড়ঙ্গ ছিল। তখন ইংরাজ-পরিচালিত নীল এবং রেশম কুঠি দেশের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং নীলকুঠির অত্যাচারে দেশের লোককে বিবিধ অত্যাচারে জর্জরিত করিতেছিল। কুমারখালির রেশমকুঠির অধীনে অনেকগুলি ছোটখাট কুঠি থাকায় উহা "বড়কুঠি" নামে পরিচিত ছিল ; এবং উহার দ্বিতল প্রাসাদ মর্মরমণ্ডিত থাকায়, তাহা 'শীতলকোঠা" নামে পরিচিত হইয়াছিল। তাহার চারিধারে গড়খাই ছিল। সেখানে সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ স্বনামখ্যাত নারায়ণ মজুমদার দেওয়ানী করিতেন। নির্ভীক নির্মৎসর নিরলস নারায়ণচন্দ্রের নিকট শিক্ষানবিশী করিয়া সাহেব কুঠিয়ালগণ তাঁহার প্রভুত্ব বর্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত দুহিতা শ্যামমোহিনী দেবী পিতামহদেবের প্রথম পক্ষের সহধর্মিণী। তিনি রুক্মিণীতে নীলকরের অত্যাচারে বিপর্যস্তা হইয়া, পুত্রকন্যাসহ কুমারখালিতে পিত্রালয়ে আসিয়া নারায়ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করায়, আমরা কুমারখালিবাসী হইয়াছিলাম। নারায়ণচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র কৈলাসচন্দ্র সদর-আলা হইয়া, পরে দীর্ঘকাল বিশ্রামবৃত্তি উপভোগ করিয়া অল্প দিন হইল পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই পিতৃবিয়োগ ঘটে, তৎকালে পিতৃদেব সেই বৃহৎ পরিবারের কর্তা এবং

অভিভাবক হইয়া, বিবিধ দুঃখদুর্দশার মধ্যেও পারিবারিক পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান সম্বল ছিল চরিত্রবল। তাঁহার স্মৃতি কুমারখালি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই।

পিতৃদেব মথুরানাথ অতি অল্প বয়সে কুমারখালিতে আনীত হইলে, সেখানে এক অভিন্ন হৃদয় বাল্যসখা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি স্বনামখ্যাত কাঙ্গাল হরিনাথ। হরিনাথ অত্র্যিষি মজুমদার বংশীয়, তিলি সন্তান হইলেও, সাধন বলে ব্রাহ্মণোচিত সমাদর লাভ করিতেন; এবং অদ্যাপি তাঁহার স্বর্গারোহণ দিবসে (অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে) বর্ষে বর্ষে কুমারখালি সকল সম্প্রদায়ের নরনারীর সম্মিলিত মহামহোৎসবে মুখরিত হইয়া থাকে। সেদিন কাঙ্গালের এবং কাঙ্গালসখা মথুরানাথের নামে এক সঙ্গে ভোজ্যাদি উৎসর্গীকৃত হয়।

এই দুই বাল্যসখা স্বগ্রামের বাঙ্গালা-পাঠশালায় যথাসম্ভব বাঙ্গালা শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর, কাঙ্গাল হরিনাথ স্বগ্রামে বাঙ্গালা রচনার চর্চায় নিবিষ্ট হইয়াছিলেন। পিতৃদেব পাবনার জেলাস্কুলে প্রাথমিক ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজে পুণ্যশ্লোক রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের ছাত্ররূপে ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া, কুমারখালিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, কাঙ্গাল হরিনাথের সহিত গ্রামোন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সহিত অনেকে যোগদান করেন, এবং ভট্টাচার্যবংশীয় চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ আসিয়াও যোগদান করেন। জ্ঞানের আদানপ্রদানে সকলের উন্নতি সাধিত হইবার সময় হইতে তিন জনেই অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। পিতৃদেব ইংরাজি বিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন; কাঙ্গাল হরিনাথ এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিবার পর, একটি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া তাহাতেও অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ইহারা গ্রামের লোকের জ্ঞানোন্নতির এইরূপ ব্যবস্থার সঙ্গে নৈতিক উন্নতিসাধনার্থ সংকীর্তনের, কবির, এবং পাঁচালীর দল করিয়া, রাত্রির প্রথম ভাগ তাহাতেই লিপ্ত থাকিয়া, সকল শ্রেণীর গ্রামবাসীর নেতৃত্বপদ অধিকার করেন। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি কাঙ্গাল হরিনাথের এবং পিতৃদেবের উপর এতদূর প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল যে তাঁহারা উভয়েই নিরামিষাশী হইয়া পড়েন। নির্ভীক নির্মল চরিত্রে, স্বদেশসেবায় অকৃত্রিম অনুরাগে সর্বশ্রেণীর কল্যাণসাধন জন্য আত্মত্যাগে, এবং কোনরূপ বিপৎপাতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্ষার জল আনাইয়া স্বাস্থ্যসংস্কারে, বাষ্পপোতাগত গোরাপল্টন ঠেঙ্গাইয়া তাহাদের অত্যাচার হইতে লোকরক্ষায়, আমোদ প্রমোদে সর্বশ্রেণীর আনন্দবিধানে, এবং জ্ঞানদানে ও সভ্যতা বিস্তারের আন্তরিক অনুরাগে, ইঁহাদের নব্যশিক্ষাসঙ্গত মত এবং আচরণ পুরাতনপন্থীদিগের নিকট উৎসাহলাভ না করিলেও, বাধা প্রাপ্ত হইত না। যাঁহারা নব্য শিক্ষাকে সংশয়দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন, তাঁহারাও ইঁহাদের হস্তেই পুত্রকন্যার শিক্ষাভার অর্পণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ইহাই অকৃত্রিম স্বদেশসেবার উল্লেখযোগ্য পুরস্কার; —প্রাচীনতার এবং আধুনিকতার সুসঙ্গত সমন্বয়; —স্থিতির এবং গতির অনতিক্রমণীয় পরিণাম।

এই সময়ে কুষ্টিয়া কুমারখালি অঞ্চলের প্রকৃতিপুঞ্জ অনেক দিন হইতে নীলকর বিষধর বিষজর্জরিত হইয়া যে বিদ্রোহবিকার প্রধূমিত করিয়া তুলিতেছিল, তাহা সহসা প্রবল প্রতাপে প্রজ্বলিত হইয়া, রাজা প্রজা সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবা মাত্র, ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত "সংবাদ প্রভাকর" এবং হরিশ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত "হিন্দুপেট্রিয়ট" নামক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত স্বনামখ্যাত সংবাদপত্র প্রজার পক্ষ অবলম্বন করায়, কাঙ্গাল

হরিনাথ "সংবাদ প্রভাকরের" এবং পিতৃদেব "হিন্দু-পেট্রিয়টের" সংবাদদাতা হইয়া, প্রজাপক্ষের মুখপাত্র হইতে বাধ্য হন, এই সূত্রে গুপ্ত 'কবির উৎসাহে ও উপদেশে কাঙ্গাল হরিনাথ "গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা" নামে এক পত্রিকা বাহির করিয়া উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হন। তখন তিনি ও তাঁহার সহকর্মিগণ নিঃসম্বল, তাঁহারা উৎসাহে অধ্যবসায়ে সকল বাধা দূর করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করেন। তজ্জন্যই কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত কুমারখালি হইতে প্রকাশিত কাঙ্গাল হরিনাথ সম্পাদিত "গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা" অল্পদিনের মধ্যেই শক্তিলাভ করে। ইহার শীর্ষদেশে বিদ্যারত্ন-বিরচিত একটি শ্লোক মুদ্রিত হইত। যথা—

'গুণালোক প্রদাদোষপ্রদোষধ্বান্তচন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা।।'

কাঙ্গালের এবং কাঙ্গাল-সখার এই মানসী-কন্যার সহিত আমার ক্ষুদ্র জীবনের সম্পর্ক থাকায় ইহার উল্লেখ করিতে হইল।

পূর্ব পাবনা অঞ্চল রাজশাহীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোম্পানি বাহাদুরের শাসন সময়ে পাবনার অন্তর্গত তাঁতিবন্দ গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ চৌধুরীবংশীয় ব্রাহ্মণগণ নাটোর রাজশাহী জেলার প্রধান নগর থাকিবার সময়ে তথায় রাজকার্যে লিপ্ত থাকিয়া কালক্রমে তাঁতিবন্দের জমিদাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কুলীনবরে কন্যাদান করিয়া, কন্যা-জামাতার জন্য স্বগ্রামে বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, সমাজনায়ক সিদ্ধশ্রোত্রিয় পদবীতে আরূঢ় হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁতিবন্দে আনীত লাহিড়ী ও বাগছী উপাধিধারী কুলীন ব্রাহ্মণগণ বিদ্যায় ও প্রতিভায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একতম বৈদ্যনাথ বাগছী রাজশাহীর একজন প্রধান উকিল হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম পক্ষে নদীয়া জেলার অন্তর্গত নওপাড়া থানার সিমলা গ্রামনিবাসী ভগবানচন্দ্র মজুমদারের এক সহোদরা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের এক পুত্র বৈকুণ্ঠনাথ ও এক কন্যা সৌদামিনী দেবীর শৈশবকালেই লক্ষ্মীপ্রিয়া এবং বৈদ্যনাথ অগ্রপশ্চাৎ পরলোকগমন করেন। পিতৃদেব পাবনায় বিদ্যাশিক্ষা করার সময়ে বৈকুণ্ঠনাথের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সৌন্দর্যে ও প্রতিভায় বৈকুণ্ঠনাথ প্রিয়দর্শন ছিলেন। চৌধুরী বংশের প্রসিদ্ধ জমিদার বিজয়গোবিন্দের কনিষ্ঠসহোদরা ত্রিপুরাসুন্দরীর সহিত বৈকুণ্ঠের বিবাহ হয়। বিজয়গোবিন্দ একজন শিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করায়, উত্তরকালে গভর্নর জেনারল লর্ড মেও শিকার উপলক্ষে তাঁতিবন্দে আসিয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। বিজয়গোবিন্দ পিতৃদেবকে বড় ভালবাসিতেন। তৎসূত্রে বিজয়গোবিন্দের ও বৈকুণ্ঠনাথের আগ্রহে বৈকুণ্ঠ-সহোদরা সৌদামিনী দেবীর সহিত পিতৃদেবের বিবাহ হয়। মাতামহকুলে সংস্কৃতচর্চার প্রাদুর্ভাব ছিল, মাতৃদেবীর নামকরণে তাহা সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে।

ইংরাজি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ শুক্রবার অপরাহ্নে নদীয়া জেলার নওপাড়া থানার অন্তর্গত সিমলাগ্রামে ভগবানচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাড়িতে আমার জন্ম হয়। ঐ স্থান মীরপুর রেল স্টেশনের অদূরবর্তী এবং পুরাতন গৌরীনদীর তীরবর্তী। আমি মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া মৃতজ্ঞানে পরিত্যক্ত হইতেছিলাম; মীরপুর কুঠির এক ইংরাজ-ধাত্রী আসিয়া আমাকে সঞ্জীবিত করেন। যে দিন যে সময়ে কুমারখালিতে নারায়ণ মজুমদার দেহত্যাগ করেন, সেই দিন সেই সময়ে সিমলা গ্রামে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম; আমার জন্যই

পিতৃদেবের কুমারখালি ত্যাগের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি আমার শৈশবে কুমারখালির সাবডিভিসন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট ঈশানচন্দ্র দত্তের পুত্র স্বনামখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্তের ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর যোগেশচন্দ্র দত্তের গৃহশিক্ষক ছিলেন। হাকিম বাহাদুর পিতৃদেবকে অর্থোপার্জনের প্রয়োজন বুঝাইয়া, তাঁহাকে ওকালতি পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ওকালতি পরীক্ষা দিবার জন্য রাজশাহী আসিয়া, সে বৎসর পরীক্ষা হইবে না জানিয়া পিতৃদেব প্রত্যাবর্তনপ্রয়াসী হইলে, রাজশাহীর আত্মীয় অন্তরঙ্গগণের আগ্রহে রাজশাহী দেওয়ানী আদালতে রাজকার্য স্বীকার করিয়া, রাজশাহীপ্রবাসী হইবার পর ক্রমে আমরাও রাজশাহীতে বাস করিতে আরম্ভ করিলাম। বরেন্দ্রত্যাগের কয়েক পুরুষ পরে এইরূপে আবার বারেন্দ্রবাসী হইয়াছি।

বিদ্যারম্ভকালে চিরপ্রচলিত পাঠশালা, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, অচিরপ্রতিষ্ঠাপিত বঙ্গ ও মধ্যইংরাজি বিদ্যালয়, জেলাস্কুল ও কলেজ শিক্ষাস্থান ছিল। তখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়ঃক্রম শৈশব অতিক্রম করে নাই; প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু সে পর্যন্ত শিক্ষাদানের উপযুক্ত অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত হয় নাই। কুমারখালিতে প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষাদানের অসুবিধা ছিল না। তথাপি প্রাচীন প্রথার মর্যাদারক্ষার্থ পঞ্চমবর্ষে এক শুভ দিনে শুভক্ষণে আমাদের মণ্ডপ-প্রাঙ্গণে সম্মিলিত পাঠশালায় মাটিতে দাগা বুলাইয়া আমার হাতেখড়ি হইয়াছিল। দাগা বুলাইবার পর কলাপাতায় লিখা, তাহার পর তালপাতায় লিখা, তাহার পর কাগজে লিখায়,—মুখে মুখে শতকিয়া প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া শুভঙ্করী মানসাঙ্ক পর্যন্ত শিক্ষা করায় পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত হইত। শিশুবোধক নামক এক মুদ্রিত পুস্তক প্রচলিত হইয়া থাকিলেও আমাদের পাঠশালায় তাহার পঠনপাঠন প্রচলিত হয় নাই। এই পাঠশালার গুরুমহাশয় নামে মাত্র আমার গুরুমহাশয় ছিলেন, গুরুগিরি করিতেন পিতৃসখা হরিনাথ। চতুষ্পাঠীতে মুখে মুখে সংস্কৃত স্তবস্তুতির আবৃত্তি শিক্ষায় এবং গ্রামবার্তা প্রকাশিকার প্রুফ সিটের অপর পৃষ্ঠায় হস্তাক্ষরশিক্ষায় আমার প্রাথমিক শিক্ষা পর্যবসিত হইত। অল্পদিনের মধ্যেই ইহা পরিবর্তিত হইল। জলধর সেন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব এবং আমি হরিনাথের বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া কাষ্ঠাসনে বসিয়া, মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যে বাঙ্গালা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। অল্পদিনের মধ্যে রাজশাহীতে আসিতে হইল। এখানে প্রথমে মধ্যইংরাজি বিদ্যালয়ে, পরে বঙ্গবিদ্যালয়ে, অবশেষে বোয়ালিয়া গভর্নমেন্ট স্কুল নামক জেলাস্কুলে প্রেরিত হইয়া যথারীতি শিক্ষালাভ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়া, তৎপরবর্তী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ২০ টাকা বৃত্তিলাভ করিয়া, পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করিয়া বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে রাজশাহীতে ওকালতি করিয়া আসিতেছি।"

অক্ষয়কুমার বঙ্গজননীর একটি উজ্জ্বলরত্ন, সাহিত্য জগতে তাঁহার সম্মান অতি উচ্চ, লেখনীপরিচালনে ও বাগ্মিতায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা পরিস্ফুট। বারেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বৃটিশ গভর্নমেন্ট তাঁহার কার্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে C. I. E. উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন।

মিতরার অর্ধকালীবংশ

বংশের উৎপত্তি

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মিতরা গ্রামের অর্ধকালীবংশ পণ্ডিত ও সাধকের বংশ বলিয়া বিখ্যাত। এই বংশের বীজপুরুষ রাঘবরাম বর্তমান বংশধরদের উর্ধতন একাদশ পুরুষ। পদ্মনাভের বংশে গোবিন্দরাম নামে একজন তপোনিষ্ঠ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ঔরসে ও জগজ্জ্যোতিদেবীর গর্ভে রাঘবরাম ও মহেশচন্দ্র নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রাঘবরামই অর্ধকালী বংশের প্রতিষ্ঠাতা—মহেশচন্দ্রের বংশধরগণ সম্প্রতি হালালিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

রাঘবরাম ও জয়দুর্গা

রাঘবরাম পণ্ডিতবাটি-গ্রামনিবাসী শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূত ছায়ানিধির বংশধর দ্বিজদেবের কন্যা জয়দুর্গাকে বিবাহ করেন। জয়দুর্গাকেই সাধুগণ অর্ধকালী বলিয়া সম্মান করেন। রাঘবরাম বিবাহ করিয়া প্রথমে কিছুদিন শ্বশুরালয়েই বাস করেন, পরে জয়দুর্গাদেবীর ইচ্ছাক্রমে মিতরা গ্রামে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। জয়দুর্গার পিতা দ্বিজদেব দশভুজার মূর্তি পূজা করিতেন। জয়দুর্গা আসিবার সময় ঐ মূর্তি লইয়া আসেন। উক্ত দশভূজা মূর্তি আজও মিতরাবাসীদের গৃহে নিত্য পূজিত হইতেছেন। জয়দুর্গাকে সাক্ষাৎ জগন্মাতার প্রকাশ স্বরূপ জানিয়া তাঁহার পিতা তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করেন। জয়দুর্গা দ্বিজদেবকে পুত্রবর দিয়া বলেন যে জয়দুর্গা বা অর্ধকালীর বংশধরগণ দ্বিজদেবের বংশধরদের শিষ্য হইবেন। তিনি আরও বলেন আপনার সন্ততিগণমধ্যে যিনি আমার সন্ততিগণের গুরু হইবেন, তিনি পরমসুখে কালাতিপাত করিবেন।" সেই সময় হইতে অর্ধকালীবংশের গুরুকুল পণ্ডিতবাটির দ্বিজদেবের বংশ।

বংশের বিস্তৃতি

অর্ধকালীবংশের প্রধান শাখা এখনও মিতরাগ্রামে বাস করিতেছেন। কিন্তু বংশ অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় একত্রে সকলের বাস করা অসুবিধা হয়। তজ্জন্য কেহ বা শিষ্যাদি কর্তৃক নীত হইয়া, কেহ বা অলৌকিক ক্ষমতাবলে রাজা বা জমিদার কর্তৃক তালুক বা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তরাদি প্রাপ্ত হইয়া, কেহ বা শ্বশুরসম্পত্তি ও মাতামহের সম্পত্তি পাইয়া, নানা স্থানে বাস করিতেছেন। অর্ধকালীর বংশধরগণ প্রায় ৪/৫টি ভিন্ন জেলায় ৩০/৩২টি গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের প্রধান প্রধান বাসগ্রামের মধ্যে মিতরা, কলাগাড়ি, খাবাসপুর, পুকুরিয়া, পৌলিগ্রাম, বেথুর, চারিপাড়া, আগনপুর, হরিণা, ব্রাহ্মণগ্রাম, বাড্ডাবাড়ি প্রভৃতি গ্রামের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের কুলপঞ্জিকা ও বংশাবলী সংগ্রহ করিয়া ১৩০৯ বঙ্গাব্দে উমেশানন্দ তর্কচূড়ামণি মহাশয় "অর্ধকালীকুলপঞ্জিকা" নামে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একখানি পুস্তিকা কাশীধাম হইতে প্রকাশ করেন। আমরা এই বংশবিবরণে কেবলমাত্র মূলবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

রাঘবরামের চারি পুত্র—রামদেব, রাজেন্দ্র, রামভদ্র ও রামেশ্বর। জ্যেষ্ঠপুত্র রামদেব একবার এক শিষ্যকর্তৃক শ্রাদ্ধসভায় আহুত হয়েন। শিষ্য তাঁহাকে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চাসন প্রদান করায় অন্যান্য পণ্ডিতগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তাঁহারা বলেন যে রামদেব যদি সত্যই দেবতা হন তবে তিনি অমাবস্যা তিথিতে পূর্ণচন্দ্র দেখান। রামদেব উগ্রতপ আরম্ভ করেন—তাহাতে তাঁহার মাতা অর্ধকালী ব্যগ্র হইয়া পুত্রের মর্যাদারক্ষার্থ রজনীতে

স্বীয় করস্থিত কঙ্কণ গগনমার্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাতেই শিষ্যগৃহে সমাগত পণ্ডিতগণ গগনে পূর্ণচন্দ্র দর্শন করেন। তখন পণ্ডিতগণ রামদেবের শিষ্য হইয়া তাঁহাকে "ঠাকুর ভট্টাচার্য" উপাধি দেন। রাঘবরামের কনিষ্ঠ পুত্র রামেশ্বরও প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পুত্র রাজেন্দ্র দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাসমূহের মূর্তি গঠন করিবার এক অপূর্ব যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ঐ যন্ত্রে মৃত্তিকা প্রদান করিলেই অতি মনোরম মূর্তিসমূহ প্রস্তুত হইত। আজও রাজেন্দ্রের রচিত মূর্তিসকল অর্ধকালীবংশে পূজা পাইতেছেন।

রামদেবের পাঁচ পুত্র—রামচন্দ্র, শ্যামরাম, কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম ও জয়রাম। রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ কাশীর পণ্ডিতদের সহিত বিচার করিয়া বাঙ্গালীব্রাহ্মণের মৎস্যভক্ষণ শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া প্রমাণ করেন। শ্যামরাম বিদ্যাবাগীশ পিতার সহিত রাগারাগি করিয়া পৌলীগ্রামে গিয়া বাস করেন—তাঁহার বংশধরেরা এখনও পৌলীগ্রামে বর্তমান আছেন। কৃষ্ণরাম সার্বভৌম বেথুর গ্রামে, বিষ্ণুরাম চারিপাড়া গ্রামে ও জয়রাম শিষ্যানুরোধে আগনপুর গ্রামে গমন করেন।

রামচন্দ্রের সাত পুত্রের মধ্যে ষষ্ঠপুত্র বাণেশ্বর পুকুরিয়াতে যাইয়া বাস স্থাপন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামের চারি পুত্রের মধ্যে শ্রীকণ্ঠ কলাবাড়ি গ্রামে, নীলকণ্ঠ খাবাসপুর গ্রামে ও বিজয়গোবিন্দ মস্তগ্রামে যাইয়া বসবাস আরম্ভ করেন।

রাঘবরাম হইতে সপ্তম অধস্তন পুরুষ পরমানন্দ বা মৃত্যুঞ্জয় অনেক শ্যামাবিষয়ক গান রচনা করেন। তিনি নিজের নাম অনুসারে সেই সকল গানের সুরের নাম দেন মৃত্যুঞ্জয়ী সুর। রাঘবরামের নবম অধস্তনপুরুষ বিশ্বানন্দ স্বস্ত্যয়নকার্যে অসাধারণ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া দেশে বিদেশে বহু সম্মান লাভ করেন।

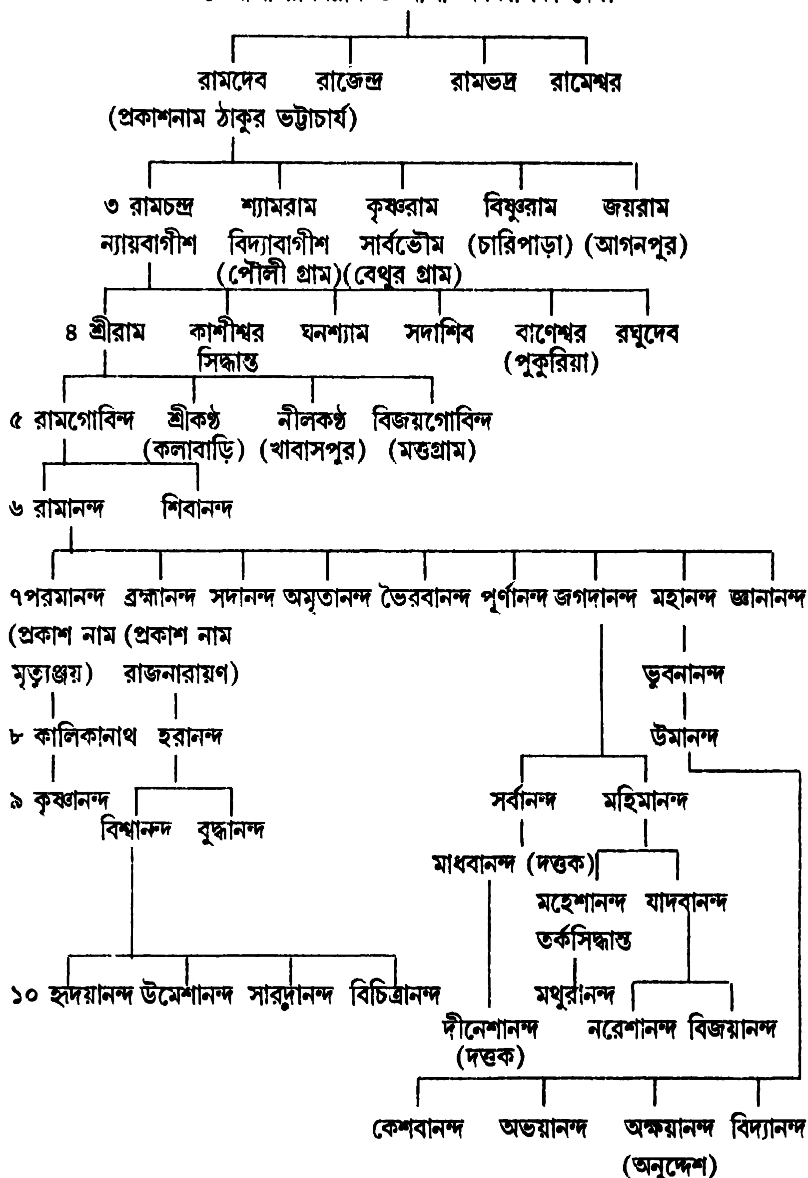
অর্ধকালীবংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহাদের অনেক শিষ্য আছে। ইঁহাদের পূজিত দেবীমূর্তি জাগ্রত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

১. প্রসিদ্ধ ধার্মিক মহাত্মা।
২. প্রসিদ্ধ দাতা।
৩. প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী ও শিকারী।
৪. উদয়নাচার্য যজুর্বেদী ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পশুপতি মাতুল কর্তৃক উপনীত হওয়ায় সামবেদী হইয়াছিলেন।
৫. পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব-প্রণেতা সুবিখ্যাত গ্রন্থকার। ইনি তালন্দ ত্যাগ করিয়া রামপুর-বোয়ালিয়া শহরে আসিয়া বাস করিতেছেন। বিনোদবিহারী প্রথমে বেণী পঠীর কুলীন ছিলেন, পিতা বর্তমানে জোনালী পঠীতে কন্যার বিবাহ দেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয়া কন্যার বিবাহে কাপ হইয়াছেন।

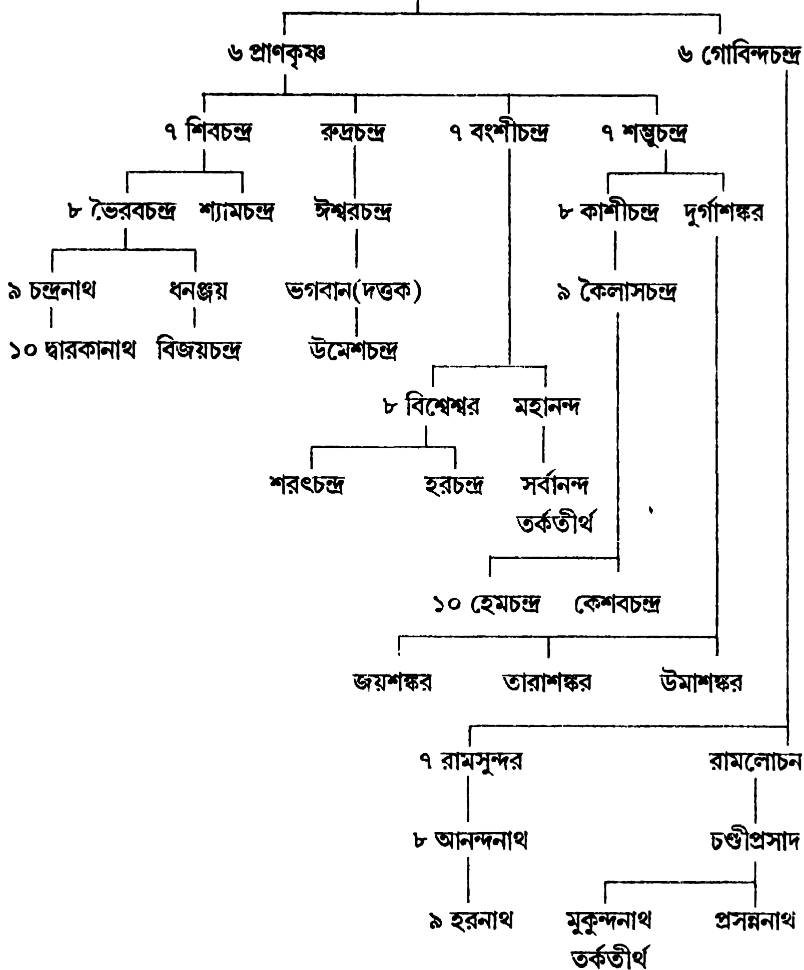
কাশ্যপ গোত্র

অর্ধকালী বংশাবলী মিতরা গ্রাম*

১ শ্রীশ্রী ৺রাঘবরাম ও শ্রীশ্রী ৺অর্ধকালিকা দেবী



* ঢাকা জেলা সবডিভিসন্ মানিকগঞ্জের অন্তর্গত মিতরা গ্রাম।


কলাবাড়ি গ্রাম
৫ শ্রীকণ্ঠ
৬ প্রাণকৃষ্ণ
৬ গোবিন্দচন্দ্র
৭ শিবচন্দ্র
রুদ্রচন্দ্র
৭ বংশীচন্দ্র
৭ শম্ভুচন্দ্র
৮ ভৈরবচন্দ্র
শ্যামচন্দ্র
ঈশ্বরচন্দ্র
৮ কাশীচন্দ্র
দুর্গাশঙ্কর
৯ চন্দ্রনাথ
ধনঞ্জয়
ভগবান(দত্তক)
৯ কৈলাসচন্দ্র
১০ দ্বারকানাথ
বিজয়চন্দ্র
উমেশচন্দ্র
৮ বিশ্বেশ্বর
মহানন্দ
শরৎচন্দ্র
হরচন্দ্র
সর্বানন্দ
তর্কতীর্থ
১০ হেমচন্দ্র
কেশবচন্দ্র
জয়শঙ্কর
তারাশঙ্কর
উমাশঙ্কর
৭ রামসুন্দর
রামলোচন
৮ আনন্দনাথ
চণ্ডীপ্রসাদ
৯ হরনাথ
মুকুন্দনাথ
তর্কতীর্থ
প্রসন্ননাথ

খাবাসপুর গ্রাম

৫ নীলকণ্ঠ

৬ কৃষ্ণকান্ত — ৬ গৌরীকান্ত — রমাকান্ত — লক্ষ্মীকান্ত

৬ গৌরীকান্ত: কমলাকান্ত — বল্লভীকান্ত — রতিকান্ত — রুদ্রকান্ত

রুদ্রকান্ত → ৮ চন্দ্রকান্ত → ৯ দুর্গাকান্ত

৯ দুর্গাকান্ত: ১০ ভবানীকান্ত — কামিনীকান্ত

রমাকান্ত → জয়কান্ত (দত্তক) → রজনীকান্ত → রমণীকান্ত

৬ কৃষ্ণকান্ত: ৭ চন্দ্রশেখর — রতনকৃষ্ণ — গোপালকৃষ্ণ পঞ্চানন — ৭ রামকৃষ্ণ

রতনকৃষ্ণ: আনন্দমোহন — জগন্মোহন

৭ রামকৃষ্ণ → ৮ হরমোহন

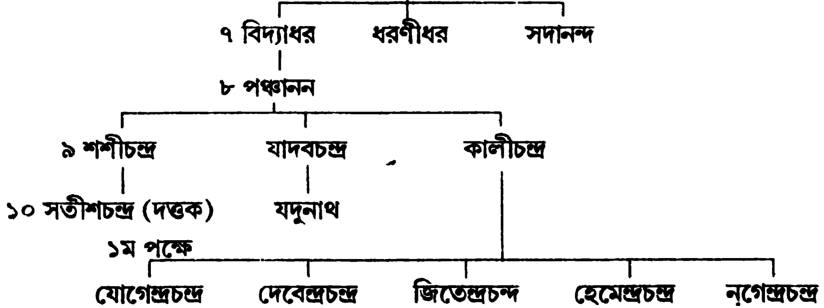
৮ হরমোহন: ১ম পক্ষে ৯ বিশ্বমোহন — ২য় পক্ষে নলিনীমোহন — অশ্বিনীমোহন — যামিনীমোহন — সুরেন্দ্রমোহন

৭ চন্দ্রশেখর: কালীকৃষ্ণ — কৃষ্ণমোহন — ৮ গোপীমোহন

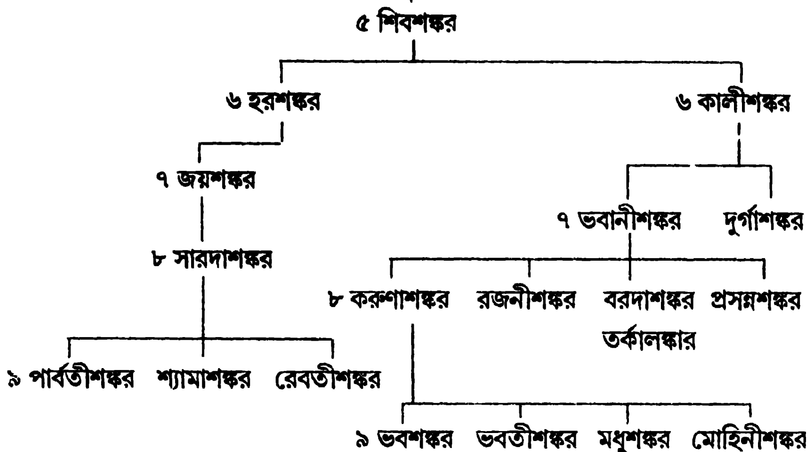
৮ গোপীমোহন: ৯ তারিণীমোহন — উমেশচন্দ্র তর্কভূষণ — শরৎচন্দ্র

৫ বিজয়গোবিন্দ (মন্ত্রগ্রাম)

৬ মুরলীধর



৪ কাশীশ্বর সিদ্ধান্ত (মিতরা গ্রাম)



৩ কৃষ্ণরাম সার্বভৌম (বেথুর গ্রাম)

৪ শিবরাম

৫ রামশঙ্কর (দত্তক)

৬ গৌরীকান্ত

৭ কমলাকান্ত উমাশঙ্কর

৮ রাজকান্ত রমণীকান্ত দুর্গাকান্ত শ্রীকান্ত আনন্দকান্ত কাশীকান্ত

সারদাকান্ত

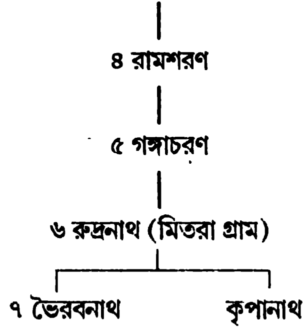
রেবতীকান্ত জয়কান্ত রজনীকান্ত নলিনীকান্ত

৯ রোহিণীকান্ত সূর্যকান্ত উদয়কান্ত হৃদয়কান্ত

১০ কুমুদকান্ত যামিনীকান্ত

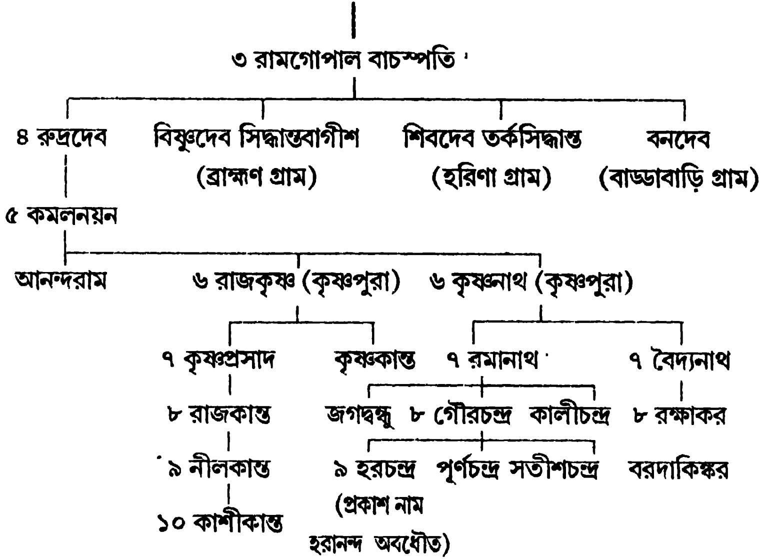
১ম পক্ষে ২য় পক্ষে

শিবকান্ত তারিণীকান্ত বিজয়কান্ত গিরিজাকান্ত



৩ জয়রাম (আগনপুর গ্রাম)

- ৪ সীতারাম
  - ৫ হরিনারায়ণ (টেপরা)
    - ৬ কৃষ্ণকান্ত
      - ভৈরবচন্দ্র
      - রামজয়
        - ৮ বিশ্বনাথ
          - ৯ মেঘনাথ
          - মহেন্দ্রনাথ
        - রাজনাথ
        - দ্বারকানাথ
      - মৃত্যুঞ্জয়
    - কমলাকান্ত
      - গোকুলচন্দ্র
      - রামসুন্দর
        - ঈশ্বরচন্দ্র (নটাখোলা)
          - হরিকিশোর
          - হরকিশোর
      - শ্যামসুন্দর
        - রজনীকান্ত
        - রমণীকান্ত
    - লক্ষ্মীকান্ত
  - দর্পনারায়ণ (শ্রীবাড়ি গ্রাম)
    - শিবনাথ
      - রামধন
        - হরনাথ
        - রূপনাথ
  - রামনারায়ণ (শ্রীবাড়ি)
    - ভোলানাথ
      - গঙ্গাগোবিন্দ
        - কৃপানাথ
  - ৫ কাশীনারায়ণ (বিক্রমহাটি)
    - ৬ নীলকণ্ঠ
      - ৭ রামলোচন
        - ৮ রামজয়
          - কালীনাথ (গোপালপুর)
        - চন্দ্রনাথ
          - ভৈরবচন্দ্র
        - রাজচন্দ্র
          - মহেশচন্দ্র
  - দুর্গানারায়ণ





* ইহার বংশধরগণ সম্প্রতি কৃষ্ণপুরা, ব্রাহ্মণগ্রাম, দুর্গানগর, হরিণা, কলম ও বাড্ডাবাড়ি বাস করিতেছেন।

৫ জয়দেব

৬ গঙ্গাপ্রসাদ   গৌরীপ্রসাদ   দেবীপ্রসাদ   চণ্ডীপ্রসাদ   কুঞ্জেশ্বর

ব্রজনাথ   শ্রীনাথ   রূপনাথ   চন্দ্রনাথ   গোলকনাথ

রাজনাথ   ভবতীনাথ   শম্ভুনাথ   মুকুন্দনাথ   প্রসন্ননাথ

ভগবানচন্দ্র   প্রিয়নাথ

হরনাথ   কৃপানাথ   প্রমথনাথ

রুদ্রনাথ   বৈকুণ্ঠনাথ   দ্বারকানাথ

অমৃতনাথ   হৃদয়নাথ

৭ রাধানাথ   কাশীনাথ

৮ আনন্দনিধি   দুর্গানাথ   কেশবনাথ

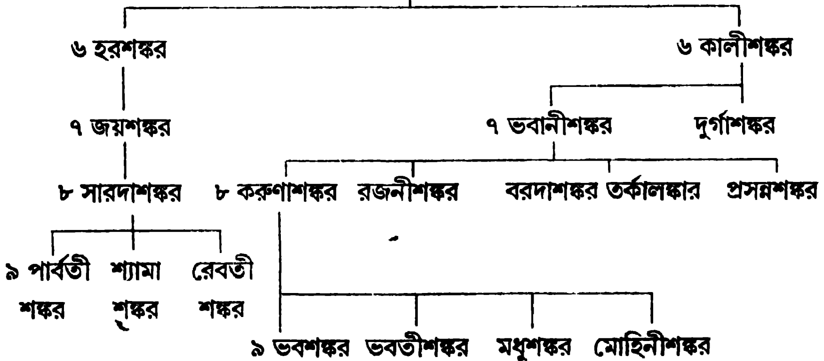
৯ কৈলাসচন্দ্র   ললনচন্দ্র   কেদারনাথ   কুবেরনাথ   রাজীবনাথ

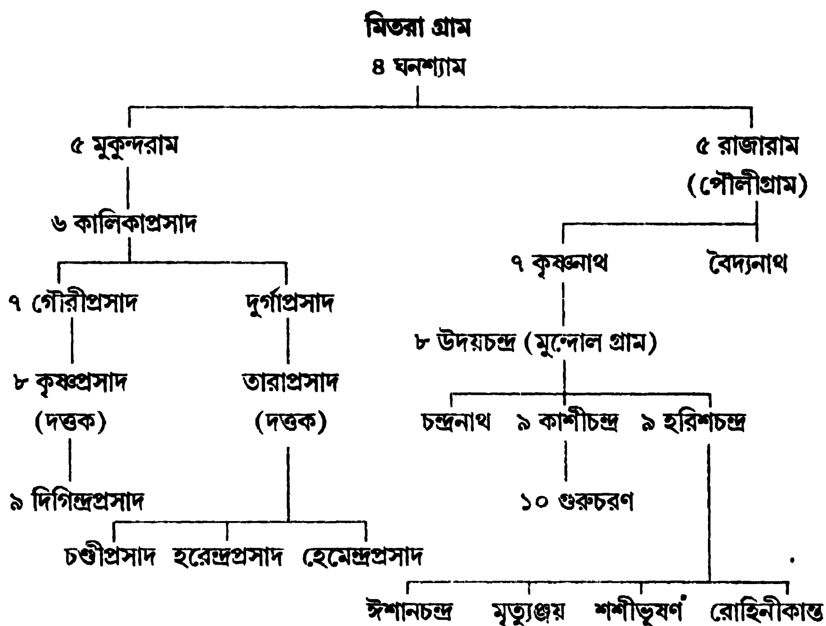
কৌশিকীনাথ

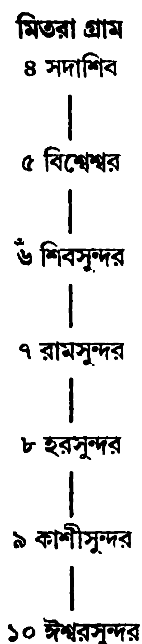
মিতরা গ্রাম

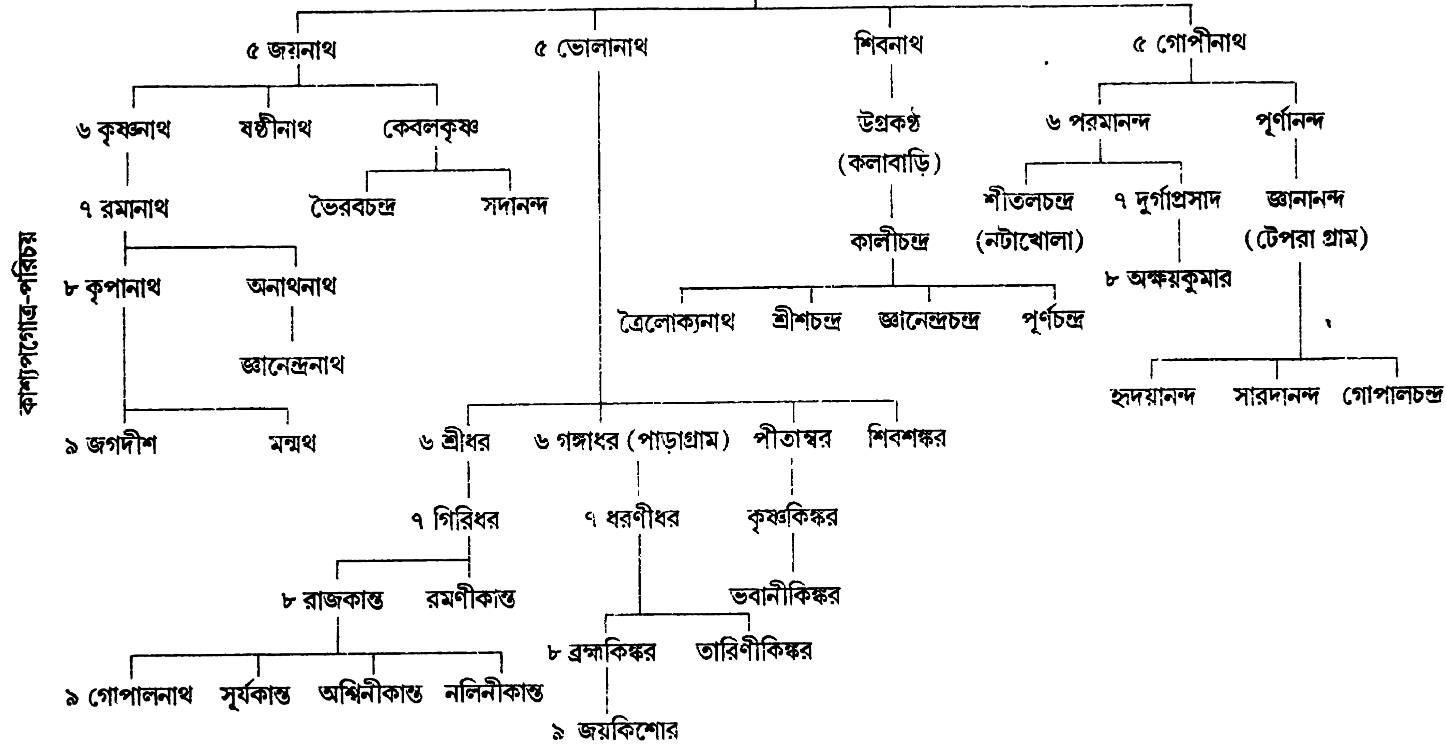
৪ কাশীশ্বর সিদ্ধান্ত

৫ শিবশঙ্কর




মিতরা গ্রাম
৪ ঘনশ্যাম
৫ মুকুন্দরাম
৫ রাজারাম
(পৌলীগ্রাম)
৬ কালিকাপ্রসাদ
৭ কৃষ্ণনাথ
বৈদ্যনাথ
৭ গৌরীপ্রসাদ
দুর্গাপ্রসাদ
৮ উদয়চন্দ্র (মুন্দোল গ্রাম)
৮ কৃষ্ণপ্রসাদ
(দত্তক)
তারাপ্রসাদ
(দত্তক)
চন্দ্রনাথ
৯ কাশীচন্দ্র
৯ হরিশচন্দ্র
৯ দিগিন্দ্রপ্রসাদ
১০ গুরুচরণ
চণ্ডীপ্রসাদ
হরেন্দ্রপ্রসাদ
হেমেন্দ্রপ্রসাদ
ঈশানচন্দ্র
মৃত্যুঞ্জয়
শশীভূষণ
রোহিনীকান্ত

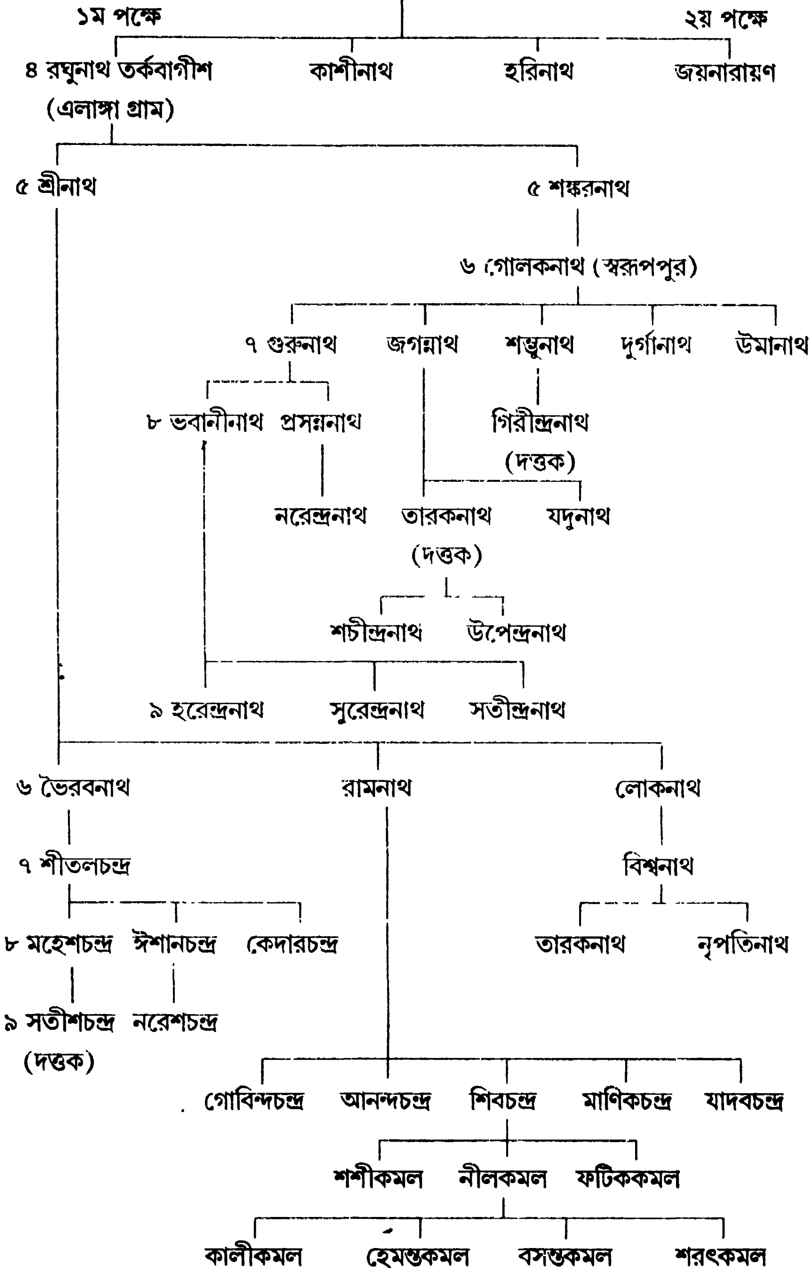

মিতরা গ্রাম
৪ সদাশিব
৫ বিশ্বেশ্বর
৬ শিবসুন্দর
৭ রামসুন্দর
৮ হরসুন্দর
৯ কাশীসুন্দর
১০ ঈশ্বরসুন্দর

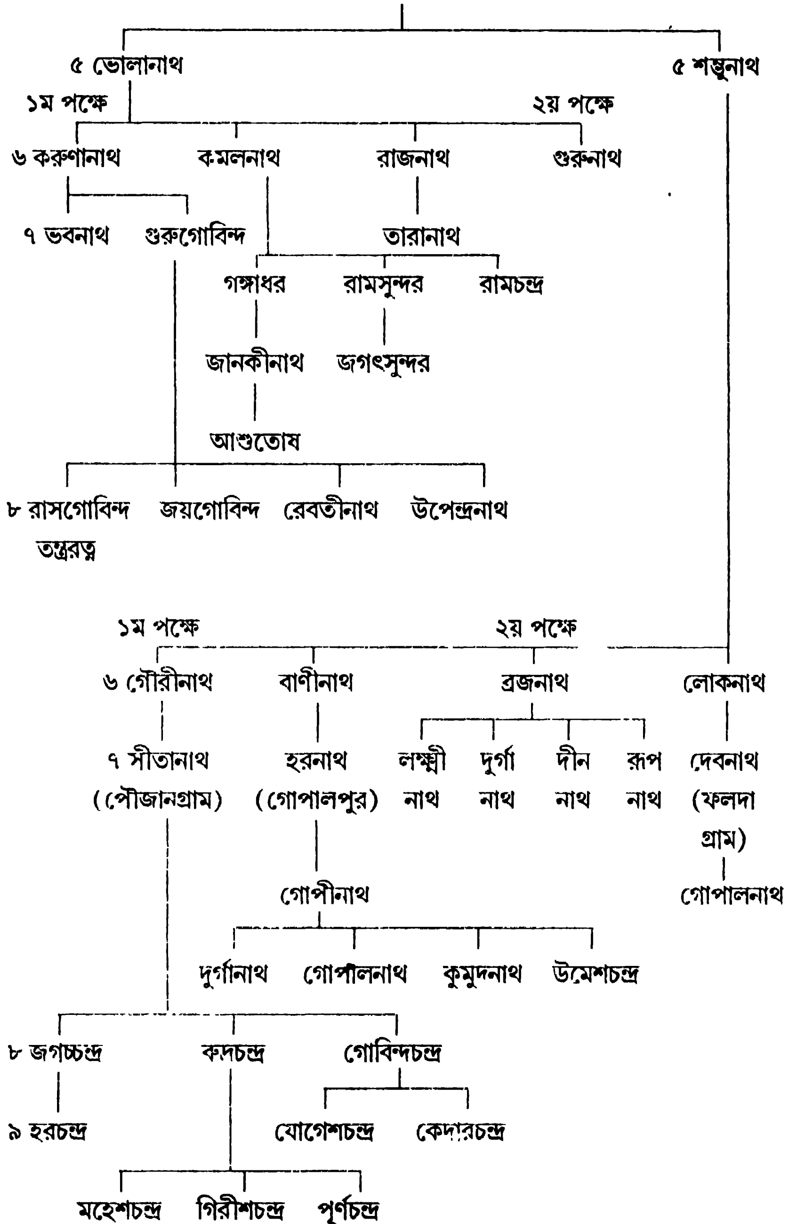


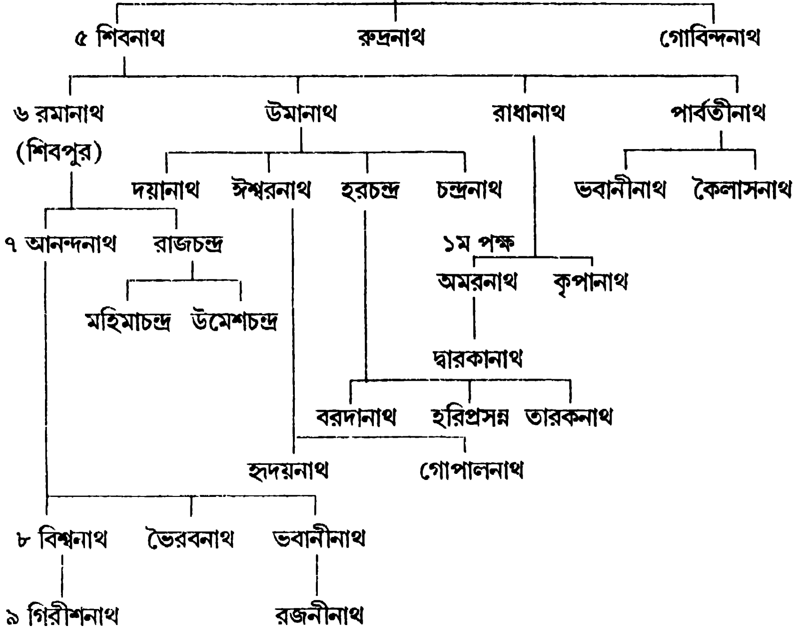
পুকুরিয়া গ্রাম
৪ বাণেশ্বর
৫ জয়নাথ
৫ ভোলানাথ
শিবনাথ
৫ গোপীনাথ
৬ কৃষ্ণনাথ
ষষ্ঠীনাথ
কেবলকৃষ্ণ
ভৈরবচন্দ্র
সদানন্দ
৭ রমানাথ
৮ কৃপানাথ
অনাথনাথ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ
৯ জগদীশ
মন্মথ
উগ্রকণ্ঠ
(কলাবাড়ি)
কালীচন্দ্র
ত্রৈলোক্যনাথ
শ্রীশচন্দ্র
জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র
পূর্ণচন্দ্র
৬ পরমানন্দ
পূর্ণানন্দ
শীতলচন্দ্র
(নটাখোলা)
৭ দুর্গাপ্রসাদ
৮ অক্ষয়কুমার
জ্ঞানানন্দ
(টেপরা গ্রাম)
হৃদয়ানন্দ
সারদানন্দ
গোপালচন্দ্র
৬ শ্রীধর
৬ গঙ্গাধর (পাড়াগ্রাম)
পীতাম্বর
শিবশঙ্কর
৭ গিরিধর
৮ রাজকান্ত
রমণীকান্ত
৯ গোপালনাথ
সূর্যকান্ত
অশ্বিনীকান্ত
নলিনীকান্ত
৭ ধরণীধর
৮ ব্রহ্মকিঙ্কর
তারিণীকিঙ্কর
৯ জয়কিশোর
কৃষ্ণকিঙ্কর
ভবানীকিঙ্কর

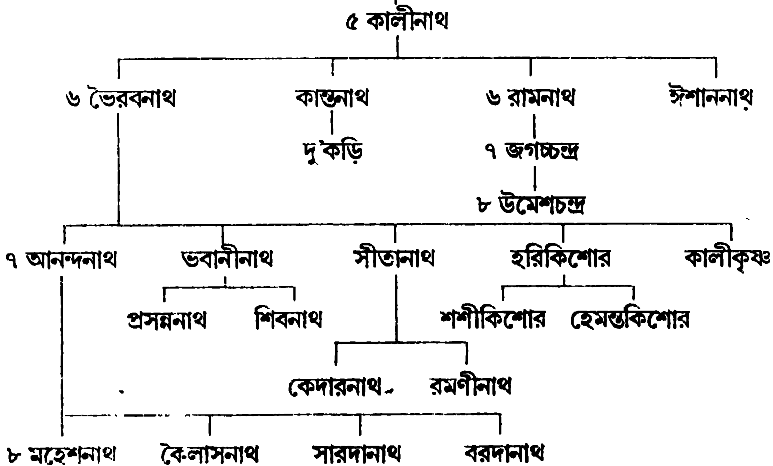
৪ রঘুদেব বংশ

- ৫ জয়দেব
  - ৬ ভবনাথ
    - ৭ কান্তনাথ
      - ৮ কাশীনাথ
    - হরনাথ
      - ৯ কামিনীনাথ
        - প্রাণনাথ
        - লোকনাথ
      - চন্দ্রনাথ
        - রমণীনাথ
          - প্রমথনাথ
      - তারিণীনাথ
        - কুলনাথ
        - যোগেন্দ্রনাথ
    - কমলনাথ
      - আনন্দনাথ
      - রাধানাথ ন্যায়ভূষণ
    - রমানাথ
    - কালীনাথ
  - শিবপ্রসাদ
    - রুক্মিণীবল্লভ (দত্তক)
- ৫ রামশঙ্কর
  - ৬ নারায়ণ (কাঁঠালিয়া)
    - ৭ ভৈরবনাথ
      - ৮ চন্দ্রনাথ
        - ৯ শিবনাথ
          - ১০ কেদারনাথ
          - বিশ্বনাথ
          - কাশীসেন
          - সুরেন্দ্রনাথ
    - কৃষ্ণশঙ্কর
    - কালীনাথ
    - হরিশচন্দ্র
- ৫ রামশরণ (বাউলজানি গ্রাম)
  - ৬ কৃষ্ণশরণ
    - ৭ রামমোহন (বাসীগ্রাম)
      - ৮ রামকমল
        - আনন্দনাথ
        - ৯ রাসগোবিন্দ
          - ১০ সুরেন্দ্রনাথ
        - ব্রজনাথ
  - হরিশরণ
    - রামরতন (বাসীগ্রাম)
      - রামসুন্দর
        - গোপালনাথ
          - ৭ রামমোহন (বাসীগ্রাম)
          - দুর্গাপ্রসাদ
          - কালীপ্রসাদ (বাসীগ্রাম)
            - চন্দ্রনাথ
              - সারদানাথ
              - শশীভূষণ
            - কৃপানাথ
              - করুণানাথ
            - উমানাথ
      - নীলকমল


৩ শ্যামরাম বিদ্যাবাগীশ (পৌলিগ্রাম)
১ম পক্ষে
২য় পক্ষে
৪ রঘুনাথ তর্কবাগীশ (এলাঙ্গা গ্রাম)
কাশীনাথ
হরিনাথ
জয়নারায়ণ
৫ শ্রীনাথ
৫ শঙ্করনাথ
৬ গোলকনাথ (স্বরূপপুর)
৭ গুরুনাথ
জগন্নাথ
শম্ভুনাথ
দুর্গানাথ
উমানাথ
৮ ভবানীনাথ
প্রসন্ননাথ
গিরীন্দ্রনাথ (দত্তক)
নরেন্দ্রনাথ
তারকনাথ (দত্তক)
যদুনাথ
শচীন্দ্রনাথ
উপেন্দ্রনাথ
৯ হরেন্দ্রনাথ
সুরেন্দ্রনাথ
সতীন্দ্রনাথ
৬ ভৈরবনাথ
রামনাথ
লোকনাথ
৭ শীতলচন্দ্র
বিশ্বনাথ
৮ মহেশচন্দ্র
ঈশানচন্দ্র
কেদারচন্দ্র
তারকনাথ
নৃপতিনাথ
৯ সতীশচন্দ্র (দত্তক)
নরেশচন্দ্র
গোবিন্দচন্দ্র
আনন্দচন্দ্র
শিবচন্দ্র
মাণিকচন্দ্র
যাদবচন্দ্র
শশীকমল
নীলকমল
ফটিককমল
কালীকমল
হেমন্তকমল
বসন্তকমল
শরৎকমল

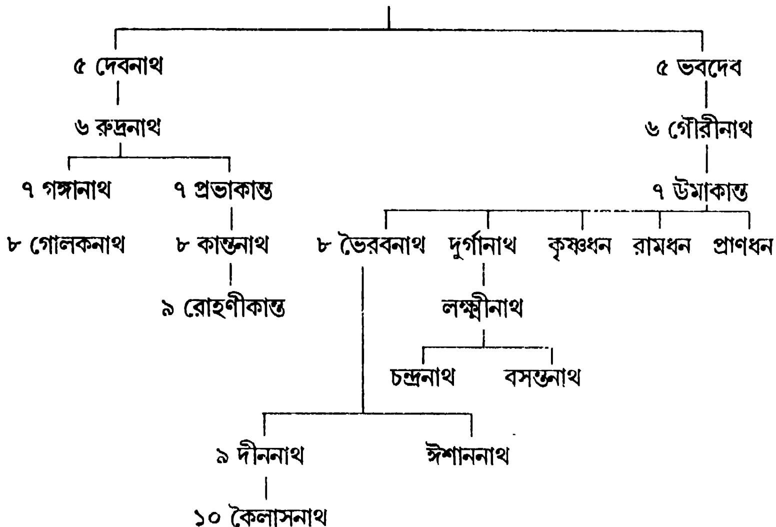

৮ কাশীনাথ (পৌলিগ্রাম)
৫ ভোলানাথ
৫ শম্ভুনাথ
১ম পক্ষে
২য় পক্ষে
৬ করুণানাথ
কমলনাথ
রাজনাথ
গুরুনাথ
৭ ভবনাথ
গুরুগোবিন্দ
তারানাথ
গঙ্গাধর
রামসুন্দর
রামচন্দ্র
জানকীনাথ
জগৎসুন্দর
আশুতোষ
৮ রাসগোবিন্দ তন্ত্ররত্ন
জয়গোবিন্দ
রেবতীনাথ
উপেন্দ্রনাথ
১ম পক্ষে
২য় পক্ষে
৬ গৌরীনাথ
বাণীনাথ
ব্রজনাথ
লোকনাথ
৭ সীতানাথ (পৌজানগ্রাম)
হরনাথ (গোপালপুর)
লক্ষ্মী নাথ
দুর্গা নাথ
দীন নাথ
রূপ নাথ
দেবনাথ (ফলদা গ্রাম)
গোপালনাথ
গোপীনাথ
দুর্গানাথ
গোপালনাথ
কুমুদনাথ
উমেশচন্দ্র
৮ জগচ্চন্দ্র
রুদ্রচন্দ্র
গোবিন্দচন্দ্র
৯ হরচন্দ্র
যোগেশচন্দ্র
কেদারচন্দ্র
মহেশচন্দ্র
গিরীশচন্দ্র
পূর্ণচন্দ্র


৪ হরিনাথ (পৌলিগ্রাম)
৫ শিবনাথ
রুদ্রনাথ
গোবিন্দনাথ
৬ রমানাথ
(শিবপুর)
উমানাথ
রাধানাথ
পার্বতীনাথ
দয়ানাথ
ঈশ্বরনাথ
হরচন্দ্র
চন্দ্রনাথ
ভবানীনাথ
কৈলাসনাথ
৭ আনন্দনাথ
রাজচন্দ্র
১ম পক্ষ
অমরনাথ
কৃপানাথ
মহিমাচন্দ্র
উমেশচন্দ্র
দ্বারকানাথ
বরদানাথ
হরিপ্রসন্ন
তারকনাথ
হৃদয়নাথ
গোপালনাথ
৮ বিশ্বনাথ
ভৈরবনাথ
ভবানীনাথ
৯ গিরীশনাথ
রজনীনাথ


৪ জয়নারায়ণ (পৌলিগ্রাম)
৫ কালীনাথ
৬ ভৈরবনাথ
কান্তনাথ
৬ রামনাথ
ঈশাননাথ
দু'কড়ি
৭ জগচ্চন্দ্র
৮ উমেশচন্দ্র
৭ আনন্দনাথ
ভবানীনাথ
সীতানাথ
হরিকিশোর
কালীকৃষ্ণ
প্রসন্ননাথ
শিবনাথ
শশীকিশোর
হেমন্তকিশোর
কেদারনাথ
রমণীনাথ
৮ মহেশনাথ
কৈলাসনাথ
সারদানাথ
বরদানাথ

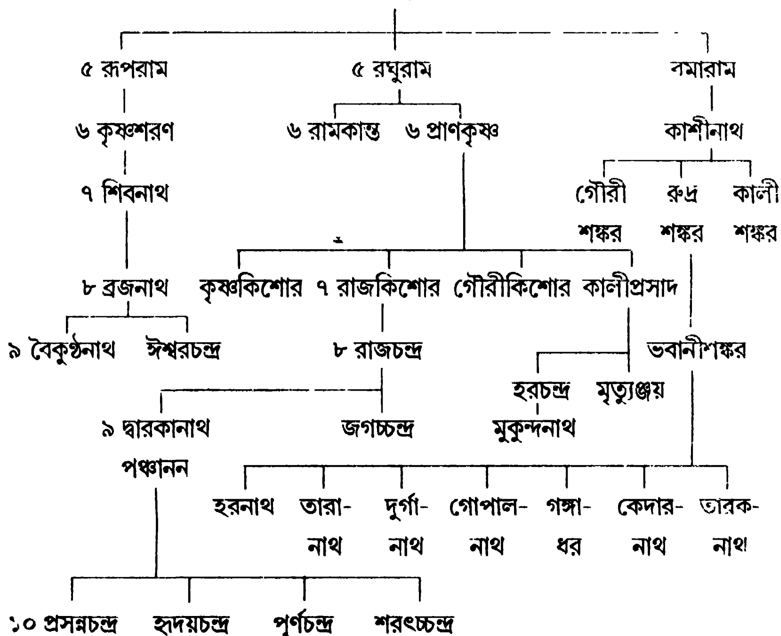
হরিণা গ্রাম

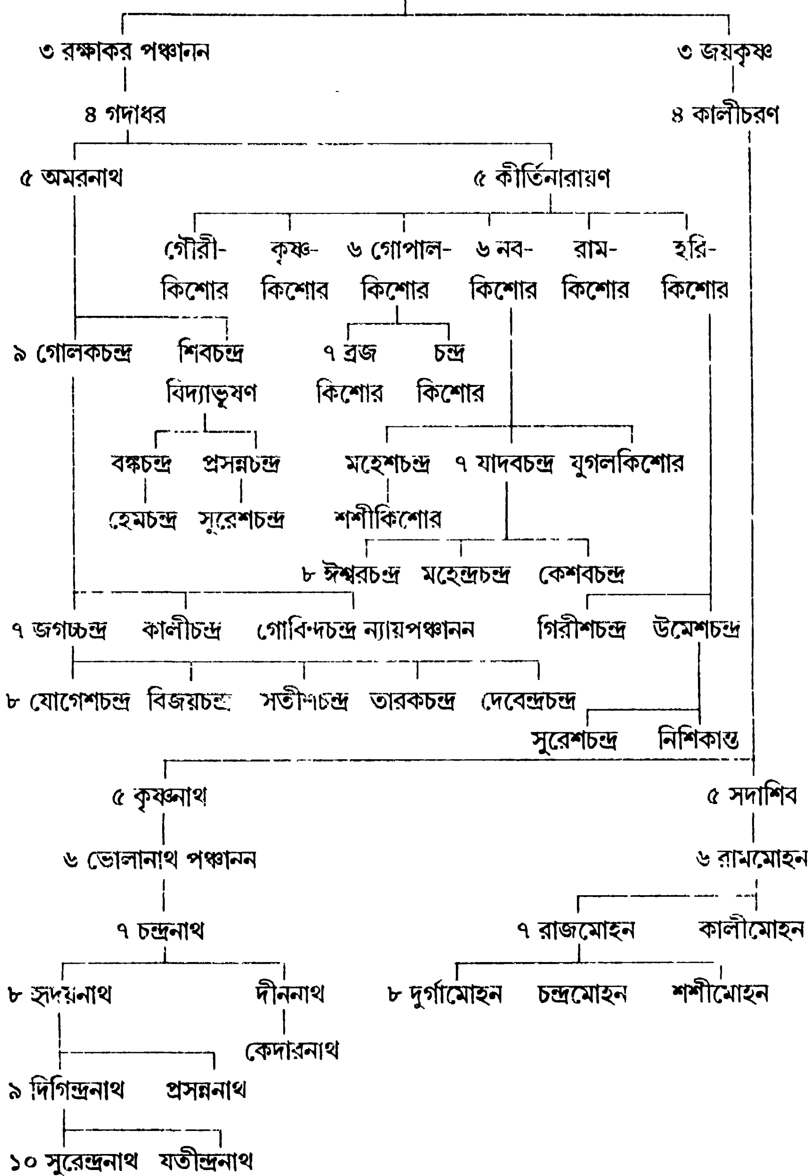
৪ শিবদেব তর্কসিদ্ধান্ত

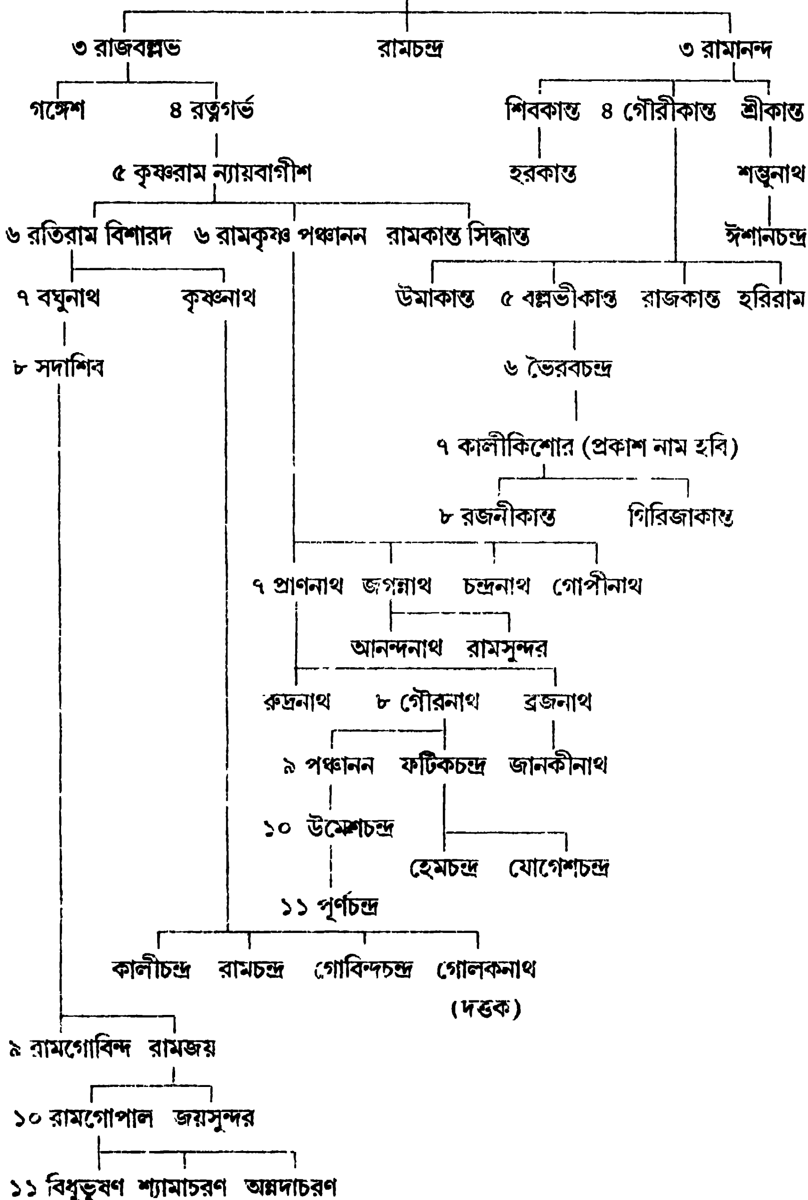


বাড্ডাবাড়ি গ্রাম

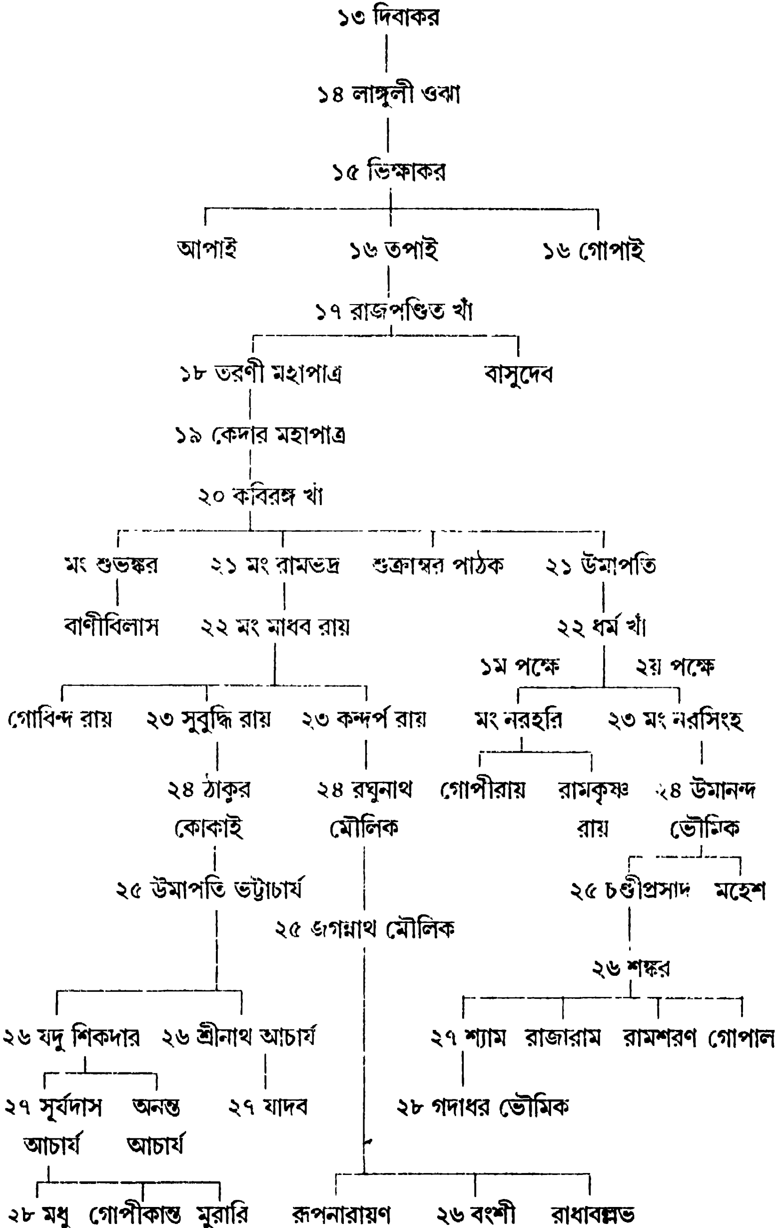
৪ বলদেব




মিতরা গ্রাম
২ রামভদ্র
৩ রক্ষাকর পঞ্চানন
৩ জয়কৃষ্ণ
৪ গদাধর
৪ কালীচরণ
৫ অমরনাথ
৫ কীর্তিনারায়ণ
গৌরী-কিশোর
কৃষ্ণ-কিশোর
৬ গোপাল-কিশোর
৬ নব-কিশোর
রাম-কিশোর
হরি-কিশোর
৯ গোলকচন্দ্র
শিবচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৭ ব্রজ কিশোর
চন্দ্র কিশোর
বঙ্কচন্দ্র
প্রসন্নচন্দ্র
মহেশচন্দ্র
৭ যাদবচন্দ্র
যুগলকিশোর
হেমচন্দ্র
সুরেশচন্দ্র
শশীকিশোর
৮ ঈশ্বরচন্দ্র
মহেন্দ্রচন্দ্র
কেশবচন্দ্র
৭ জগচ্চন্দ্র
কালীচন্দ্র
গোবিন্দচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন
গিরীশচন্দ্র
উমেশচন্দ্র
৮ যোগেশচন্দ্র
বিজয়চন্দ্র
সতীশচন্দ্র
তারকচন্দ্র
দেবেন্দ্রচন্দ্র
সুরেশচন্দ্র
নিশিকান্ত
৫ কৃষ্ণনাথ
৫ সদাশিব
৬ ভোলানাথ পঞ্চানন
৬ রামমোহন
৭ চন্দ্রনাথ
৭ রাজমোহন
কালীমোহন
৮ হৃদয়নাথ
দীননাথ
৮ দুর্গামোহন
চন্দ্রমোহন
শশীমোহন
কেদারনাথ
৯ দিগিন্দ্রনাথ
প্রসন্ননাথ
১০ সুরেন্দ্রনাথ
যতীন্দ্রনাথ

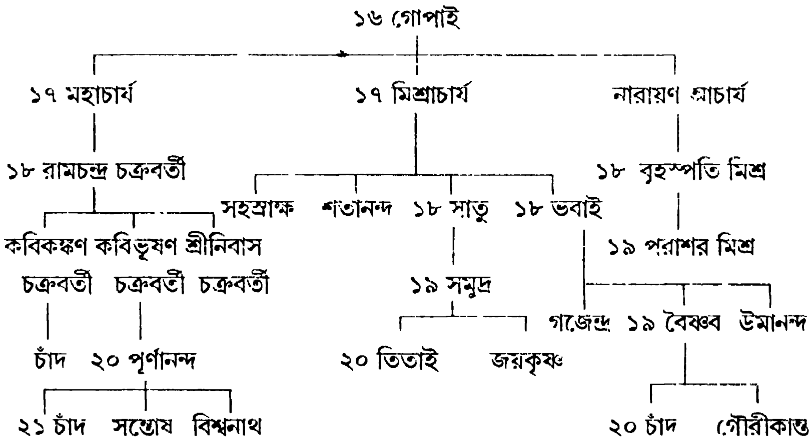

পণ্ডিতবাটি গ্রাম
দ্বিজদেব (প্রকাশ নাম ঠাকুর চক্রবর্ত্তী)
২ রূপমাধব
৩ রাজবল্লভ
রামচন্দ্র
৩ রামানন্দ
গঙ্গেশ
৪ রত্নগর্ভ
শিবকান্ত
৪ গৌরীকান্ত
শ্রীকান্ত
৫ কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ
হরকান্ত
শম্ভুনাথ
৬ রতিরাম বিশারদ
৬ রামকৃষ্ণ পঞ্চানন
রামকান্ত সিদ্ধান্ত
ঈশানচন্দ্র
৭ রঘুনাথ
কৃষ্ণনাথ
উমাকান্ত
৫ বল্লভীকান্ত
রাজকান্ত
হরিরাম
৮ সদাশিব
৬ ভৈরবচন্দ্র
৭ কালীকিশোর (প্রকাশ নাম হবি)
৮ রজনীকান্ত
গিরিজাকান্ত
৭ প্রাণনাথ
জগন্নাথ
চন্দ্রনাথ
গোপীনাথ
আনন্দনাথ
রামসুন্দর
রুদ্রনাথ
৮ গৌরনাথ
ব্রজনাথ
৯ পঞ্চানন
ফটিকচন্দ্র
জানকীনাথ
১০ উমেশচন্দ্র
হেমচন্দ্র
যোগেশচন্দ্র
১১ পূর্ণচন্দ্র
কালীচন্দ্র
রামচন্দ্র
গোবিন্দচন্দ্র
গোলকনাথ
(দত্তক)
৯ রামগোবিন্দ
রামজয়
১০ রামগোপাল
জয়সুন্দর
১১ বিধুভূষণ
শ্যামাচরণ
অন্নদাচরণ

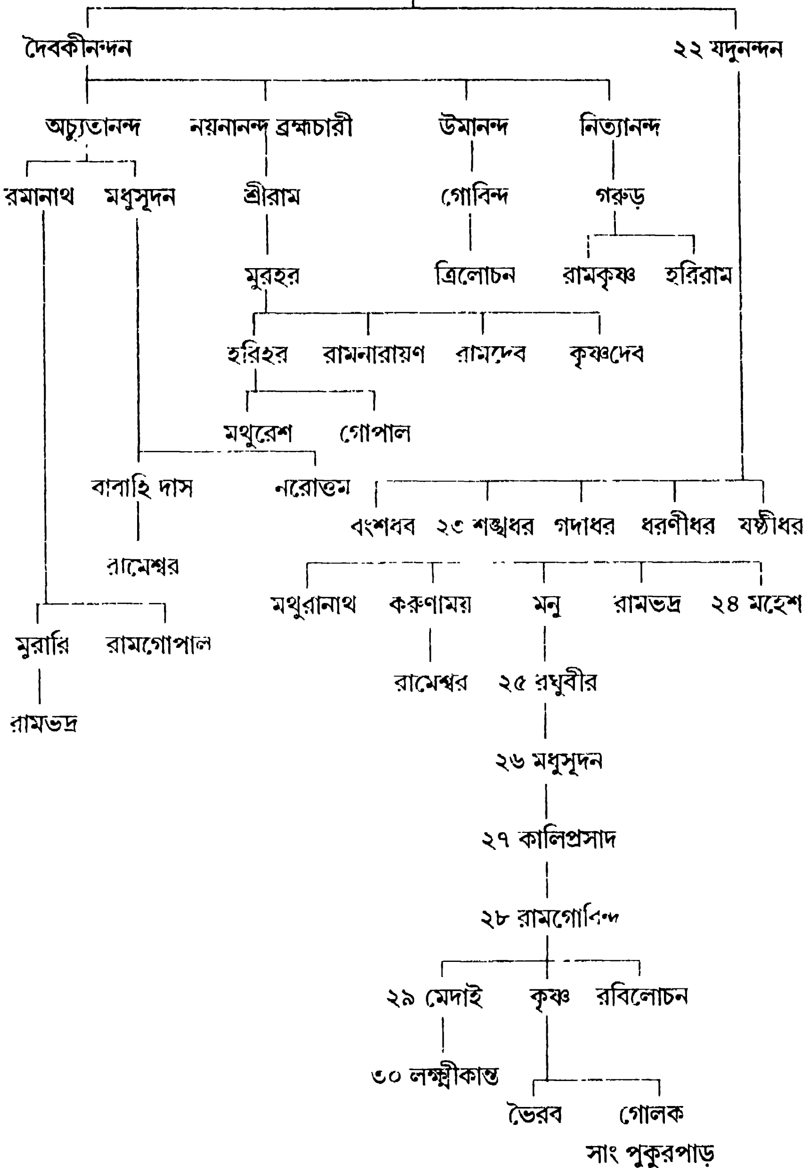
কাশ্যপগোত্র—সিদ্ধ শ্রোত্রিয়
করঞ্জ গাঞি—কাউনদিয়া সমাজ

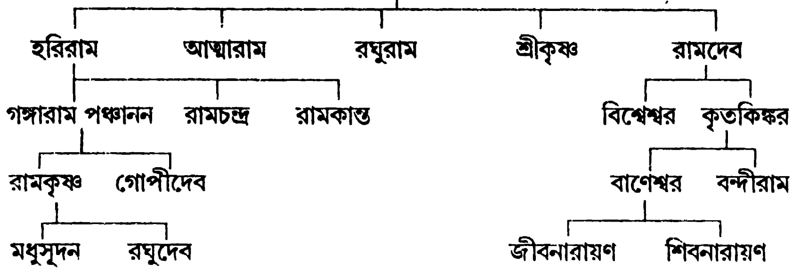


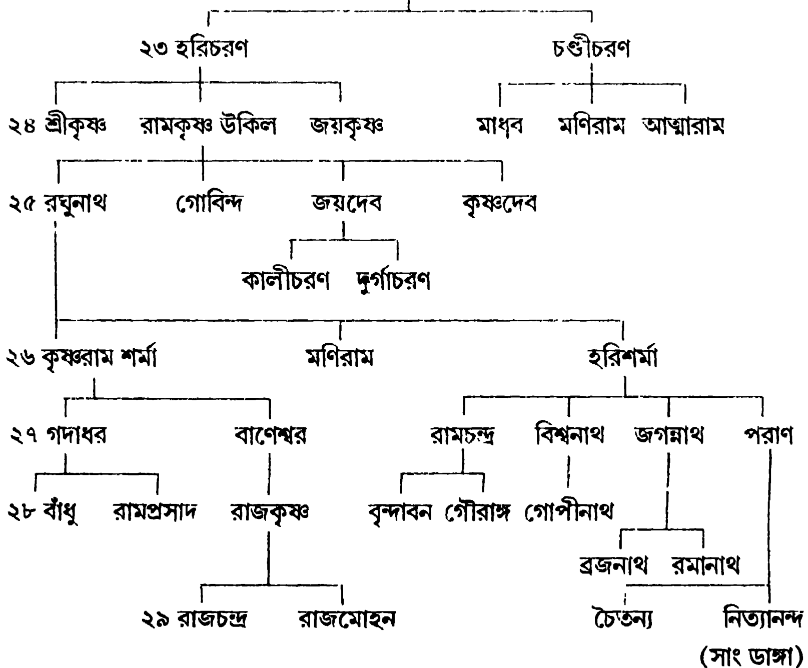
- ২৭ যাদব
  - ২৮ গঙ্গারাম
    - ২৯ গোপীনাথ
      - ৩০ জনার্দন চক্রবর্তী
        - ৩১ গোবিন্দ
      - শ্রীনাথ
      - গোপীনাথ
  - দর্পনারায়ণ
  - রাজ

- ২৬ বংশী
  - ২৭ মদনগোপাল চৌধুরী
    - ২৮ বংশীবদন
      - ২৯ হরিদেব
        - ৩০ রামকেশব
          - ৩১ রামমোহন
            - ৩২ রাধামোহন
              - ৩৩ তারিণী (সাং ফুলবাড়ি)
            - আনন্দমোহন
            - হরমোহন
        - ভবানী
  - মাধবরাম চৌধুরী
  - ২৭ রামগোবিন্দ চৌধুরী
    - রামরাম
    - ২৮ হরিদেব
      - ১ম পক্ষে
        - ২৯ ভবানী
          - ৩০ কাশীশঙ্কর
          - কালীশঙ্কর (সাং ফুলবাড়ি)
      - ২য় পক্ষে
        - রামকেশব
    - রাম




২১ বিশ্বনাথ বা বিশ্বম্ভর আচার্য
দৈবকীনন্দন
২২ যদুনন্দন
অচ্যুতানন্দ
নয়নানন্দ ব্রহ্মচারী
উমানন্দ
নিত্যানন্দ
রমানাথ
মধুসূদন
শ্রীরাম
গোবিন্দ
গরুড়
মুরহর
ত্রিলোচন
রামকৃষ্ণ
হরিরাম
হরিহর
রামনারায়ণ
রামদেব
কৃষ্ণদেব
মথুরেশ
গোপাল
বাবাহি দাস
নরোত্তম
বংশধর
২৩ শঙ্খধর
গদাধর
ধরণীধর
ষষ্ঠীধর
রামেশ্বর
মথুরানাথ
করুণাময়
মনু
রামভদ্র
২৪ মহেশ
মুরারি
রামগোপাল
রামেশ্বর
২৫ রঘুবীর
রামভদ্র
২৬ মধুসূদন
২৭ কালিপ্রসাদ
২৮ রামগোবিন্দ
২৯ মেদাই
কৃষ্ণ
রবিলোচন
৩০ লক্ষ্মীকান্ত
ভৈরব
গোলক
সাং পুকুরপাড়


২৪ মহেশ
হরিরাম
আত্মারাম
রঘুরাম
শ্রীকৃষ্ণ
রামদেব
গঙ্গারাম পঞ্চানন
রামচন্দ্র
রামকান্ত
বিশ্বেশ্বর
কৃতকিঙ্কর
রামকৃষ্ণ
গোপীদেব
বাণেশ্বর
বন্দীরাম
মধুসূদন
রঘুদেব
জীবনারায়ণ
শিবনারায়ণ


১৯ পরাশর
২০ লোকনাথ
২১ মধুমণ্ডল
২২ গঙ্গানন্দ
২৩ হরিচরণ
চণ্ডীচরণ
২৪ শ্রীকৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ উকিল
জয়কৃষ্ণ
মাধব
মণিরাম
আত্মারাম
২৫ রঘুনাথ
গোবিন্দ
জয়দেব
কৃষ্ণদেব
কালীচরণ
দুর্গাচরণ
২৬ কৃষ্ণরাম শর্মা
মণিরাম
হরিশর্মা
২৭ গদাধর
বাণেশ্বর
রামচন্দ্র
বিশ্বনাথ
জগন্নাথ
পরাণ
২৮ বাঁধু
রামপ্রসাদ
রাজকৃষ্ণ
বৃন্দাবন
গৌরাঙ্গ
গোপীনাথ
ব্রজনাথ
রমানাথ
২৯ রাজচন্দ্র
রাজমোহন
চৈতন্য
নিত্যানন্দ
(সাং ডাঙ্গা)

কাশ্যপগোত্র মৈত্রকুল—গৌরীপুর জমিদার বংশ

কাশ্যপ গোত্র যজুর্বেদী সুষেণ হইতে অধস্তন একাদশ পুরুষ সিদ্ধু ওঝার ক্রতু ও মতু নামক দুই পুত্র ছিলেন। মতুর অধস্তন বৃহস্পতির দুই পুত্র,--সোল ওঝা ও কৃপ ওঝা। সোল ওঝার মাধব, কেশব ও অম্বরনামক তিন পুত্রের মধ্যে মাধবের বংশধরগণ মিতড়ার ভট্টাচার্য বংশ ও অম্বরের বংশধরগণ হরিপুরের চৌধুরী বংশ। তৃতীয় ভ্রাতা কেশব ওঝা আঙ্গোরা নামক গ্রামে স্বীয় বাসস্থান 'আঙ্গোরা-সমাজ' নামে স্বতন্ত্র এক সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কেশবের পুত্র জীব ওঝা উদয়নাচার্যের প্রথম পক্ষের পরিত্যক্ত পুত্র চণ্ডীপতি ভাদুড়ীর 'উপকার করণে' যোগ দিয়া কৌলীন্য ভ্রষ্ট হন। পরে ইঁহার বংশধরগণ তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের প্রবর্তিত নিয়মানুসারে শ্রোত্রিয় বরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া শ্রোত্রিয় হইলেন।

জীব ওঝার প্রপৌত্র শ্রীনিবাসের দিবাকর নামক পুত্র হইতে নাটোর রাজবংশ ও রামশরণ নামক পুত্র হইতে ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরাদি বারেন্দ্র জমিদার বংশের উদ্ভব হইয়াছে।

রামশরণের অধস্তন গঙ্গানন্দ নবাব সরকারের উচ্চকর্মে নিযুক্ত হইয়া হালদার উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার জয়নারায়ণ ও যজ্ঞেশ্বর নামক পুত্রদ্বয়ও উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া বগুড়া জেলার অন্তর্গত সেলবর্ষ পরগনার তরফ কড়ই নামক জমিদারি ও তলাপাত্র উপাধি লাভ করেন। ঐ স্থানে তাঁহারা বহু দেবতা ও জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি কড়ই গ্রামে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শিবদুর্গা ও কালাচাঁদবিগ্রহ বংশধরগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর অধীনে কর্ম করিয়া ক্রমে কানুনগো পদে উন্নীত হন। এই সময়ে বঙ্গদেশীয় কোন জমিদার বিদ্রোহী হন এবং শ্রীকৃষ্ণের উপর এই বিদ্রোহ দমনের ভার অর্পিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে বিদ্রোহী জমিদারকে ধৃত করেন। এ সংবাদে দিল্লীর বাদশাহও পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দিবার জন্য নবাবের উপর আদেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে নবাব শ্রীকৃষ্ণকে 'চৌধুরী' উপাধিসহ ময়মনসিংহ পরগনার জমিদারি প্রদান করেন এবং তাঁহাকে উক্ত পরগনার দখল দেওয়ার জন্য বোকাই নগর কেল্লার কর্মচারীকে আদেশ প্রদান করেন।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী ময়মনসিংহের বিস্তৃত জমিদারি লাভ করিয়া বোকাইনগরের নিকটবর্তী একটি স্থানে বাটী নির্মাণ করিয়া কখনও তথায় কখনও কড়ই গ্রামে অবস্থিত করিতে লাগিলেন। তদবধি ঐ স্থানের নাম বাসাবাড়ি বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর দুই বিবাহ ছিল। তাঁহার প্রথমা পত্নী সর্বজয়া দেবীর গর্ভে তিন পুত্র ও এক কন্যা এবং দ্বিতীয়া পত্নী মহেশ্বরী দেবীর গর্ভে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠ চাঁদ রায় নবাব সরকারে যোগ্যতার সহিত কর্ম করিয়া এবং একটি যুদ্ধ জয় করিয়া নবাব কর্তৃক 'রায়রায়ান্' উপাধিতে ভূষিত হন।

এই সময় ময়মনসিংহ পরগনার রাজস্বের তুলনায় আয় অত্যন্ত কম ছিল। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী পুত্রের সৌভাগ্যের সূচনা দেখিয়া এই সুযোগে জমিদারির অবস্থা নবাবের নিকট উপস্থিত করিয়া পুত্রের জন্য বনজঙ্গল পরিপূর্ণ জাফরসাহী পরগনা পুরস্কার প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হয়। তদবধি অদ্যাপি জাফরসাহী পরগনার জন্য স্বতন্ত্র রাজস্ব দিতে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর জীবদ্দশাতেই প্রথমে চাঁদ রায়ের পুত্র সোনা রায়, পরে ক্রমে চাঁদ রায় ও তাঁহার বৈমাত্রেয় এক ভ্রাতা হরিনারায়ণ চৌধুরী কালগ্রাসে পতিত হন। অবশেষে দুই পক্ষে চারি পুত্র রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী কড়ইর বাটীতে দেহত্যাগ করেন।

এই স্বনামধন্য মহাপুরুষের পুত্রগণ মধ্যে কৃষ্ণকিশোর ও কৃষ্ণগোপাল হইতে যথাক্রমে রামগোপালপুর ও গৌরীপুর এবং উহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী হইতে ভবানীপুর, গোলকপুর ও বাসাবাড়ির জমিদারগণ উদ্ভূত হইয়াছেন। কালীপুরের কুলীন লাহিড়ী জমিদারগণও ইঁহাদেরই দৌহিত্র-বংশীয়। গৌরীপুর হইতেই কন্যা বিবাহের যৌতুক ও কৌলীন্য মর্যাদা স্বরূপ কৃষ্ণপুরের জমিদারি প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রথম পক্ষীয় দুই পুত্র কৃষ্ণকিশোর ও কৃষ্ণগোপাল বঃ গোপালকিশোর নবাব সরকারে কর্ম করিয়া রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় পক্ষের গঙ্গা-নারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ কড়ইর বাটীতেই থাকিতেন। তাঁহাদের চৌধুরী উপাধি থাকিয়া যায়।

চারি ভ্রাতা কিছুকাল একত্র অবস্থানের পর উভয় পক্ষের ভ্রাতৃগণ পৃথক হইলেন এবং কড়ই হইতে জমিদারি শাসন সংরক্ষণ অসুবিধাজনক মনে করিয়া প্রথম পক্ষের ভ্রাতৃদ্বয় জাফরসাহীর অন্তর্গত কৃষ্ণপুরে ও দ্বিতীয় পক্ষীয় ভ্রাতৃদ্বয় মালঞ্চা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় ভ্রাতৃবিরোধ প্রবল হইয়া উঠিলে সমস্ত সম্পত্তি তুল্য অংশে বিভাগ করিয়া লইয়া প্রথম পক্ষের ভ্রাতৃদ্বয় 'তরফ রায়' ও দ্বিতীয় পক্ষের ভ্রাতৃদ্বয় 'তরফ চৌধুরী' আখ্যায় জমিদারি ভোগ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণপুরে অবস্থিতিকালেই কনিষ্ঠ কৃষ্ণগোপাল রায় তাঁহার দুই পত্নীর মধ্যে কাহারও গর্ভে সন্তান না হওয়ায় যুগলকিশোর রায়কে দত্তক গ্রহণ করেন।

জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকিশোরের দুই বিবাহ ছিল এবং তাঁহার তখনও সন্তান হওয়ার আশা ছিল বলিয়া তিনি দত্তক গ্রহণ করিলেন না। কালক্রমে প্রথমে কৃষ্ণগোপাল এবং পরে অপুত্রকাবস্থায় কৃষ্ণকিশোরের পরলোক প্রাপ্তির পর কৃষ্ণপুর অস্বাস্থ্যকর বলিয়া যুগলকিশোর রায় জ্যেষ্ঠতাতের পত্নীদ্বয় সহ গৌরীপুরে যাইয়া বাসস্থান নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণকিশোর রায়ের দুই পত্নী রত্নমালা ও নারায়ণী দেবী দত্তক রাখিতে ইচ্ছুক হওয়ায় যুগলকিশোর রায়ের সঙ্গে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ফলে তাঁহার নিকট হইতে চার আনা সম্পত্তি পৃথক করিয়া লইয়া তাঁহারা রামগোপালপুরে আসিয়া বাস করিলেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠা রত্নামালা দেবী দত্তক গ্রহণ করেন। কিন্তু অনতিকাল মধ্যে দত্তক ও রত্নমালা দেবী উভয়েই কালগ্রাসে পতিত হইলে কনিষ্ঠা নারায়ণী দেবী রামকিশোর রায়কে দত্তক গ্রহণ করেন।

এইরূপে গৌরীপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রামগোপালপুর জমিদার বংশের সৃষ্টি হইল। যুগলকিশোর হইতেই গৌরীপুর জমিদারির উন্নতির সূচনা হয়। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান, সুচতুর ও দক্ষ জমিদার ছিলেন। ইনি বাঙ্গালার তৎকালীন সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমন এবং দিংধার দস্যু জমিদার দলন করিয়া যশস্বী হন। যুগলকিশোর বোকাই নগরে ঁরাজরাজেশ্বরী দেবী মূর্তি ও দ্বাদশ শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের প্রাত্যহিক সেবাপূজার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ভূসম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন জামালপুরে ঁরাধামোহন বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রসিদ্ধ নবাগ্নি যাগ করিয়া সমাজে সাতিশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

যুগলকিশোরের দুই পুত্র ও চারি কন্যা। পুত্র মধ্যে শিবকিশোরকে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর

দ্বিতীয় পক্ষের সুত গঙ্গানারায়ণ চৌধুরীর বিধবা পুত্রবধূ গঙ্গাময়ী দেবীকে দত্তক প্রদান করেন। কিন্তু অচির কাল মধ্যেই শিবকিশোর পরলোক গমন করেন।

যুগলকিশোর রায়ের পুত্র হরকিশোর রায় একজন আদর্শ জমিদার ছিলেন। তাঁহার সময়ে গৌরীপুর জমিদারির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি শ্রীহট্ট জেলায় প্রসিদ্ধ বংশীকুণ্ডু পরগনা ক্রয় করিয়া স্বীয় জমিদারির অন্তর্ভূক্ত করেন। অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নী ভাগীরথী দেবী একজন আদর্শ রমণী ছিলেন। ইনি পতির অনুমত্যনুসারে গোলকপুরের শম্ভুচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরীকে দত্তক গ্রহণ করিয়া আনন্দকিশোর নামে অভিহিত করেন।

ইনি স্বীয় কন্যা কৃষ্ণমণি দেবীকে থাজুবার নিরাবিল কুলীন গোবিন্দ প্রসাদ লাহিড়ীর সহিত বিবাহ দেন এবং আটিয়া পরগনায় একটি সম্পত্তি খরিদ করিয়া যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন, পরে গৌরীপুরের নিকটবর্তী একটি স্থানে কন্যা ও জামাতার জন্য বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়া স্বীয় কন্যার নাম অনুসারে উহার কৃষ্ণপুর নামকরণ করেন। এই স্বনামধন্যা মহিলা নিরাবিল কুলীনগণ মধ্যে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিয়া চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন। অদ্যাপি নিরাবিলকুলীনগণ তাঁহার প্রবর্তিত মতের সম্মান রাখিয়াছেন।

ভাগীরথী দেবী জীবিত থাকিতেই তাঁহার দত্তক পুত্র আনন্দকিশোর নাবালক পুত্র রাজেন্দ্র কিশোরকে রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। তৎপরে ভাগীরথী দেবীর দেহত্যাগের পর নাবালকের সম্পত্তি বলিয়া গৌরীপুরের সমগ্র সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন হয়।

রাজেন্দ্রকিশোর সাবালক হইলে সম্পত্তি হস্তগত হওয়ার পরই বিশ্বেশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন এবং কিছুদিন জমিদারি পরিচালনা করিয়া অল্প বয়সেই কাল কবলিত হন।

রাজেন্দ্রকিশোরের পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার পত্নী বিশ্বেশ্বরী দেবী পতির পরিত্যক্ত সমগ্র সম্পত্তির পরিচালন ভার গ্রহণ করেন এবং ১২৮৪ সনে রাজশাহীর অন্তর্গত বলিহার গ্রাম নিবাসী হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান রজনীপ্রসাদকে দত্তক গ্রহণ করেন। এই রজনীপ্রসাদই বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ দানবীর স্বনামধন্য ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

ব্রজেন্দ্রকিশোর ১৮৮১ সালে ২৯শে বৈশাখ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে গৌরীপুরের জমিদারি প্রভূত পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে।

পূর্বে গৌরীপুর ও রামগোপালপুরের সম্পত্তি অবিভক্ত (এজমালী) ছিল। ব্রজেন্দ্রকিশোর জমিদারির কার্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াই প্রজাগণের অভাব মোচনের সুবিধার্থ বিনা মামলা মোকদ্দমায় আপোসে স্বীয় সম্পত্তি পৃথক (বাটোয়ারা) করিয়া লন।

অতঃপর বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলনের সৃষ্টি হইতেই ব্রজেন্দ্রকিশোব সাধারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে আরম্ভ করেন। ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্বদেশপ্রাণতা অনন্যসাধারণ। স্বদেশহিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিতই তাঁহার নাম সংযুক্ত রহিয়াছে।

এই সময়ে কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ স্থাপিত হয়। দানবীর ব্রজেন্দ্রকিশোর এই পরিষৎ-পরিচালনের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করেন। এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় কুড়ি হাজার টাকা প্রতি বর্ষে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হস্তগত হইবার সুব্যবস্থাও তিনি করিয়া দিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রকিশোর স্বীয় বাসস্থান গৌরীপুরে পিতৃনাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য রাজেন্দ্রকিশোর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়' স্থাপন করিয়াছেন. ময়মনসিংহের চৌকী ঈশ্বরগঞ্জে মাতার নামে বিশ্বেশ্বরী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও নেত্রকোণায় একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে বিশেষ সাহায্য প্রদান করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন দেশে শিক্ষা বিস্তারার্থ বিভিন্ন জেলার বহু বিদ্যালয়েই তিনি নিয়মিত রূপে মাসিক অথবা বার্ষিক চাঁদা দিয়া আসিতেছেন।

স্বর্গীয় মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ-বাসরে ব্রজেন্দ্রকিশোর দেশে সংস্কৃত বিস্তার কল্পে পঁচাত্তর হাজার টাকা ও প্রজাগণের জলকষ্ট দূরীকরণ ও চিকিৎসার সহায়তার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়া উভয় অর্থে বিশ্বেশ্বরী স্মৃতিভাণ্ডার ও বিশ্বেশ্বরী ফাণ্ড নামক দুইটি ধনভাণ্ডার স্থাপনপূর্বক তাহার নিয়োগ ভার সুযোগ্য ট্রাস্টিগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বরী স্মৃতি ভাণ্ডারের সুদ হইতে বঙ্গদেশের স্ববৃত্তিস্থ অধ্যাপক পণ্ডিত মণ্ডলী প্রতি বর্ষে গুণানুসারে ৫০্ টাকা ও ৪০্ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইতেছেন।

বিশ্বেশ্বরী ফাণ্ডের সুদ হইতে বগুড়া হইতে শ্রীহট্ট পর্যন্ত গৌরীপুরের বিস্তৃত জমিদারির সর্বত্র প্রজাগণের জলকষ্ট দূরীকরণার্থ প্রতি বর্ষে কূপ, ইন্দারা, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করান হইতেছে এবং জমিদারির বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে।

এই উভয় ধন-ভাণ্ডারের সুদ হইতে এই মহৎ কার্য যাহাতে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে চলিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থাও ব্রজেন্দ্রকিশোর করিয়া দিয়াছেন।

দেশে যাহাতে সংস্কৃত শিক্ষার অধিক প্রচার হয়, তজ্জন্য ব্রজেন্দ্রকিশোর গৌরীপুরের নিকটবর্তী বোকাইনগরের স্থাপিত বিগ্রহ ঁরাজরাজেশ্বরী মহাদেবীর নামানুসারে রাজরাজেশ্বরীটোল এবং জামালপুর ও ময়মনসিংহ সহরে বিশ্বেশ্বরী চতুষ্পাঠী নামক দুইটি টোল স্থাপন পূর্বক বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত অধ্যাপকগণের হস্তে শিক্ষাভার ন্যস্ত করিয়াছেন।

কাশীধামে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন ও তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কলিকাতায় আসিলে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া সর্বাগ্রে ব্রজেন্দ্রকিশোরই তাঁহাকে একলক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, ব্রজেন্দ্রকিশোর তাঁহার প্রতিশ্রুত এক লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

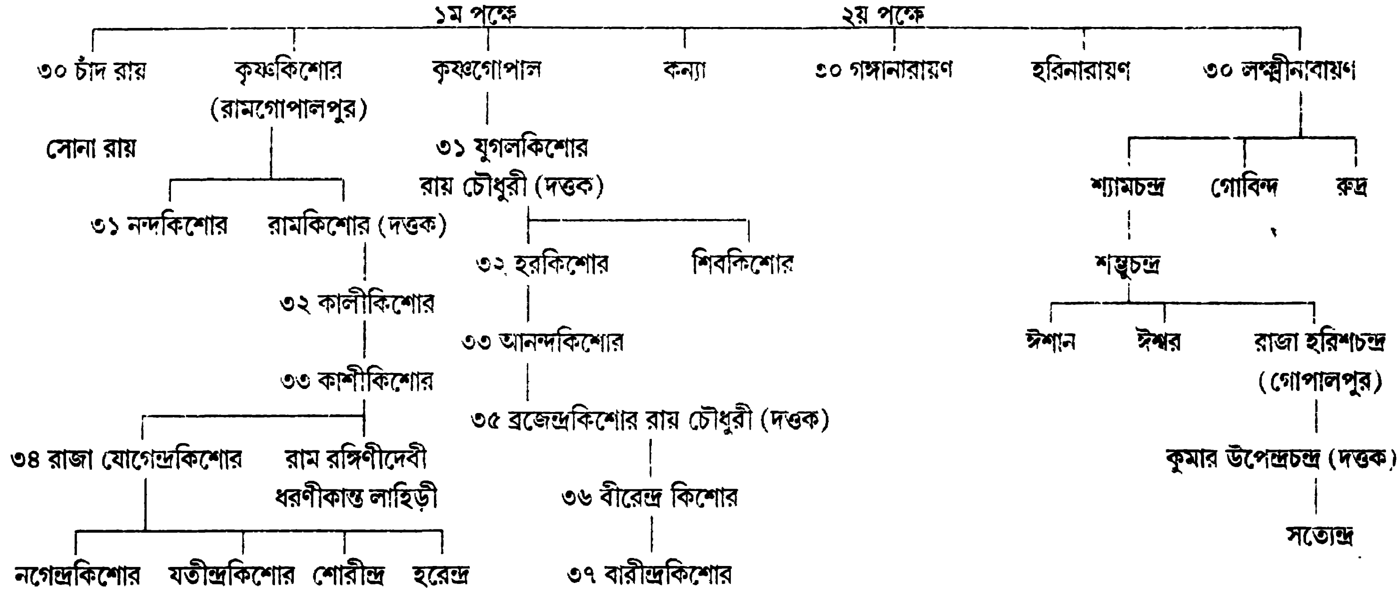
বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীনগণ মধ্যে আটপঠী বিভক্ত থাকায় তাঁহাদের কন্যাগণের বিবাহদানে অত্যন্ত অসুবিধা লক্ষ করিয়া ব্রজেন্দ্রকিশোর সুসঙ্গের মহারাজ ও তাহিরপুরের রাজা বাহাদুরের সহায়তায় বারেন্দ্র কুলীনগণের পাঠী বিভাগ জনিত আদান প্রদানের বাধা দূর করিয়া পরস্পরের মধ্যে পুত্র কন্যা বিবাহের সুব্যবস্থা করিয়া দেন। এই বিপুল ব্যয়সাধ্য 'সমীকরণ' কার্যের প্রায় সমগ্র ব্যয়ভারই ব্রজেন্দ্রকিশোর বহন করিয়াছিলেন।

তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার গৃহ নির্মাণ ও কার্য পরিচালনের জন্য এক লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

গৌরীপুর জমিদার বংশ

৩৭ পৃষ্ঠায় মৈত্রকুল বীজপুরুষ মতুর ৫ম পুরুষ অধস্তন ১৭ যোল ওঝা, তৎপুত্র ১৮ কেশব ওঝা, তৎপরে পুত্রাদিক্রমে ১৯ জীব ওঝা, ২০ সুধানিধি, ২১ শঙ্করপাণি, ২২ শ্রীনিবাস, শ্রীনিবাসের দুই পুত্র রামশরণ ও দিবাকর। রামশরণ হইতে গৌরীপুর এবং দিবাকর নাটোর হইতে রাজবংশ, রামশরণের পুত্রাদিক্রমে ২৪ শূলপাণি, ২৫ হরিপণ্ডিত, ২৬ কেশব আচার্য, ২৭ গঙ্গানগর আচার্য, ২৮ জয়নারায়ণ তলাপাত্র, তৎপুত্র



মণ্ডলজানি মৈত্র আগমবাগীশের বংশ

- নীলাম্বর আচার্য
  - ১ পক্ষে
    - অনন্ত
    - মাধব
      - রঘুনাথ চক্রবর্তী
        - বল্লভাচার্য চক্রবর্তী
          - তিকু
          - রামেশ্বর
            - যাদবেন্দ্র বিদ্যালঙ্কার
              - রাম
              - কৃষ্ণদেব
                - রামনাথ সার্বভৌম
                  - মৃত্যুঞ্জয় ওরফে হরিনাথ চূড়ামণি
                    - তিতুরাম
                      - দিনুভট্ট
                        - কাশীনাথ
                        - দ্বারকানাথ
                    - গোলক
                      - নবকৃষ্ণ
                        - গোপী
                      - রাধাকৃষ্ণ
                        - নীলমণি
                        - মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ[1]
                          - প্রমথ
                          - উপেন্দ্র
                          - শৈলানন্দ
                      - শ্রীকৃষ্ণ
  - ২ পক্ষে
    - কেশব
    - মহেশ্বর গুরু আচার্য
      - ১ পক্ষে
        - কৃষ্ণানন্দ
        - চারু
      - ২য় পক্ষে
        - মাধবানন্দ (সন্ন্যাস অবস্থায় মাধবানন্দ পুরী নামে খ্যাত)
          - বল্লভাচার্য
            - ভিখু (বিষ্ণুশরণ চক্রবর্তী)
              - কৃষ্ণশরণ চক্রবর্তী
                - শম্ভুনারায়ণ
                  - রামকান্ত
                    - দুর্গাকান্ত বিদ্যারত্ন
                      - ভগবান চন্দ্র
                        - কৈলাস
                        - গিরিশ
                        - মহেশ
                          - যোগেশ
                            - শ্রীশচন্দ্র[2]
                            - সুরেশ
                              - দেবানন্দ
                              - জগদানন্দ
                              - পূর্ণানন্দ
                            - জগদীশ
                            - জ্ঞানেশ

---

১. মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন নবদ্বীপের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। বর্তমান কালে উচ্চ সংস্কৃত কবিতায় দ্ব্যর্থ বা ত্র্যর্থ শ্লোক মুখে মুখে রচনায় তাঁহার ন্যায় সিদ্ধ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালেও তিনি নানাশাস্ত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

২. ইনি তাড়াশ জমিদার বংশের পুরোহিত, উপাধি জ্যোতিভূষণ চক্রবর্তী, অধুনা কলিকাতায় জ্যোতিষ গণনা করিতেছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

শাণ্ডিল্যগোত্র বিবরণ

পুঁঠীয়ার রাজবংশ

পুঁঠীয়ার রাজগণ বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ। সাধু বাগছি হইতে অধস্তন সপ্তদশ পুরুষ বৎসাচার্য। ইনিই পুঁঠীয়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বৎসাচার্য অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তন্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। লস্কর খাঁ নামক জনৈক মুসলমান লস্করপুর পরগনা দিল্লীর বাদশাহ হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লস্কর খাঁর মৃত্যু হইলে উক্ত জায়গীর বাদশাহের নামে আইসে। এই সময়ে কোন সুবাদার বিদ্রোহী হওয়ায় বাদশাহ বহু সংখ্যক সৈন্যসহ একজন উপযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। বৎসাচার্যের সহায়তায় সৈন্যাধ্যক্ষ বিদ্রোহ দমনে কৃতকার্য হন। দিল্লীর বাদশাহ বৎসাচার্যের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে লস্করপুর পরগনা দান করেন। বৎসাচার্য সাংসারিক কার্যে লিপ্ত থাকিতে ভালবাসিতেন না। সুতরাং তাঁহার পুত্র পীতাম্বর জমিদারি গ্রহণ করেন। পীতাম্বর অতিশয় বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী ছিলেন। পীতাম্বরের মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ নীলাম্বরই সমস্ত সম্পত্তির অধীশ্বর হন। পুঁঠীয়ার বর্তমান রাজারা নীলাম্বরের বংশধর। পুঁঠীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এখনও দেববৎ পূজিত হইয়া থাকেন।

বৎসাচার্যের জ্যেষ্ঠপুত্র পীতাম্বর সাংসারিক কার্যে নিতান্ত পটু ছিলেন। তিনি দিল্লীর সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিয়া লস্করপুর জমিদারির ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার এবং সর্বকনিষ্ঠ পুরন্দর খাঁর নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায়, নীলাম্বর উভয়ের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। নীলাম্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দ (অনন্ত) রাম। পিতা জীবিত থাকিতেই তিনি দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন; তৎপুত্র রতিকান্ত সর্বসাধারণের কোন অপ্রিয় কার্য করায় পিতৃরাজ্যের অধিকারী হন নাই, এবং 'ঠাকুর' নামে সকলের নিকট পরিচিত হইয়া উঠিলেন। রতিকান্ত হইতে পুঁঠীয়ার রাজারা 'ঠাকুর' নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন। রতিকান্তের পুত্র রামচন্দ্র। রামচন্দ্র কর্তৃক রাধাগোবিন্দের সেবা স্থাপিত হয়। প্রতিদিন সোয়া এক মণ আতপ তণ্ডুল এবং তদুপযোগী নানাবিধ উপকরণ দ্বারা অদ্যাপি রাধাগোবিন্দের ভোগ হইয়া থাকে। রামচন্দ্রের চারি পুত্র--রূপনারায়ণ, নরনারায়ণ দর্পনারায়ণ এবং জয়নারায়ণ। রামচন্দ্রের পুত্রগণ হইতে পুঁঠীয়া রাজবংশের সকলেরই নামে 'নারায়ণ' সংযুক্ত হয়।

এই বংশীয় রাজা প্রেমনারায়ণ একজন পরম ধার্মিক ও দাতা ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত দানপত্র হইতে ১১১১ সাল হইতে ১১১৬ সাল মধ্যে বিস্তর ব্রহ্মোত্তর দানের সন্ধান পাওয়া যায়।

লর্ড কর্ণয়ালিসের সময় আনন্দনারায়ণ লস্করপুর পরগনার রাজা ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে উক্ত পরগনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৮৯৫৯২ টাকা চার আনা জমায় সম্পন্ন হয়। আনন্দ নারায়ণের উত্তরাধিকারী রাজেন্দ্রনারায়ণকে গভর্নমেন্ট 'রাজা বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। হরিনাথ সান্ন্যালের কন্যা সূর্যমণির সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পকাল পরেই রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়। বিধবা রানি সূর্যমণি সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া বিশেষ

দক্ষতার সহিত রাজকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। রাজা ভুবনেন্দ্রনারায়ণ লস্করপুর পরগনার অংশ ব্যতীত আরও অনেক জমিদারি ক্রয় করেন। তৎপুত্র জগন্নারায়ণ ঠাকুর ১২১৪ সালে তিনটি নূতন জমিদারি ক্রয় করেন। তিনি বারাণসীধামে দেবমন্দির আদি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং একটি ঘাট ও অতিথিশালা নির্মাণ করিয়া দেন। বাঙ্গালা ১২১৬ সালে তিনি ও 'রাজবাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। বাঙ্গালা ১২২৩ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী রানি ভুবনময়ী দেবী পুঁঠীরায় শিব স্থাপন করিয়া তদুপলক্ষে বহুতর পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে নিষ্কর ভূমি দান করেন। ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ ঠাকুর নামে পুঁঠীয়া বংশের জনৈক রাজা অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। নিজের মূর্খতা এবং কুসংসর্গদোষে তাঁহার ধনক্ষয় হয়।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের বংশসম্ভূত পরেশনারায়ণ রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি নিজের জমিদারির মধ্যে বহু স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া প্রজাপুঞ্জের শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। পুঁঠিয়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় তাঁহারই কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

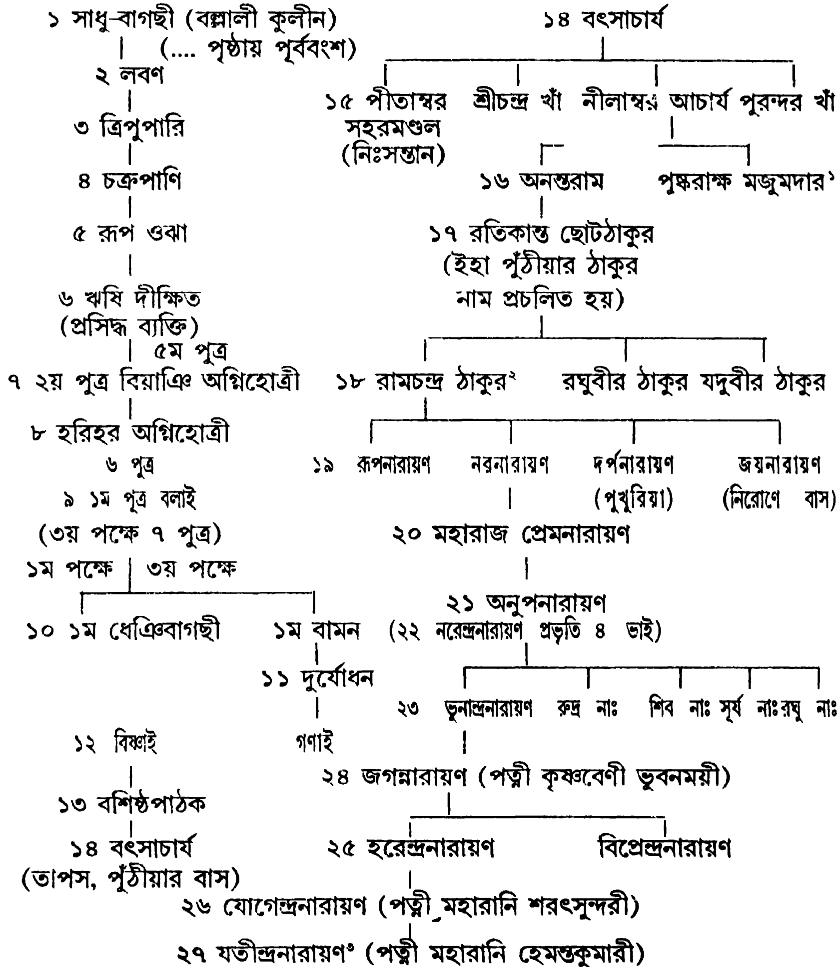
রাজা জগন্নারায়ণের পৌত্র যোগেন্দ্রনারায়ণ অতি অল্প বয়সে পিতৃহীন হন বলিয়া তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন হয়। ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ভৈরব সান্ন্যালের কন্যা শরৎসুন্দরীর সহিত যোগেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয়। বিষয়চিন্তা ও অন্যান্য নানা কারণে যোগেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি নেপোলিয়ানের মত স্বীয় জননীর নিকট হইতে দয়া, উদারতা, সাহস, তেজস্বিতা, রাজকার্যকৌশল প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছেন। বাঙ্গালা ১২৫৯ সাল হইতে বাঙ্গালা ১২৬৫ সাল পর্যন্ত নীলকর ওয়াট্‌সন কোম্পানির সহিত যোগেন্দ্রনারায়ণের রাজশাহী ও নদীয়ায় সম্পত্তি ইজারা ছিল। ইজারার কাল অন্তে ওয়াট্‌সন কোম্পানি 'নিজ জোত' নামে কতকগুলি জমি আপন দখলে রাখিয়াছিলেন। এই 'নিজ জোত' এবং 'পাটা' লইয়া প্রজার সঙ্গে ওয়াটসন কোম্পানির বিবাদ আরম্ভ হইল। যোগেন্দ্রনারায়ণ নীলকরদের হস্ত হইতে প্রজাদের রক্ষার নিমিত্ত ধনপ্রাণ অর্পণ করিলেন। এই সকল নানা দুশ্চিন্তায় তাঁহার স্বাস্থ্যহানি হইল। তাহার পর সুরাপানে তাহার দেহ ক্রমে নানা রোগের আবাসভূমি হইল। যৌবনের প্রথম উদ্যমে অতৃপ্ত জীবনে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করিলেন; তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একুশ বৎসর এগার মাস মাত্র।

তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী মহারানি শরৎকুমারীর বয়স ত্রয়োদশবর্ষ মাত্র। তিনি অশেষ গুণশালিনী ছিলেন। তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া আজীবন দীনদুঃখীর ও প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধন করিয়া গিয়াঁছেন। রাজকার্যপরিদর্শনে তিনি পুঁঠীয়া-বংশীয় কোন নৃপতি হইতে ন্যূন ছিলেন না। ইঁহার গুণ বিশেষভাবে বর্ণনা করিতে গেলে ইহা একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকার ধারণ করিবে।

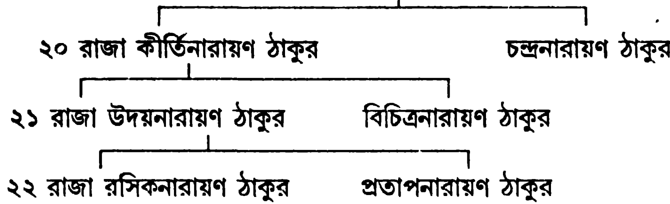
মহারানি শরৎকুমারী যতীন্দ্রনারায়ণ নামে একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। এই দত্তকের পত্নীর নাম রানি হেমন্তকুমারী দেবী। দত্তকপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শরৎসুন্দরী তাহার হস্তে সম্পত্তির ভার অর্পণ করিয়া কাশীধামে গমন করেন। কিন্তু অল্পদিন রাজ্যভোগ করিয়াই কুমার যতীন্দ্রনারায়ণ ছয়মাস গর্ভবতী পত্নী রাখিয়া কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। এই সময় পুত্রবধূ ও শরৎকুমারীর মধ্যে মনান্তর ঘটাইতে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। মহারানি তাহা জানিতে পারিয়া তীর্থযাত্রা করেন, ইহাতেও সে মনান্তর নির্বাপিত হইল না। তখন তিনি অনেকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্পত্তি বধূরানির বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে লইবার জন্য স্বয়ং কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করেন। পুনরায় শরীর কাতর হওয়াতে তিনি কাশীধাম চলিয়া আসিলেন। কাশীধামে তাঁহার মৃত্যুর পূর্বদিন তিনি টেলিগ্রামে জানিতে পারিলেন যে সম্পত্তি

কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন হইবে না। তাঁহার কাশীপ্রাপ্তির পর রানি হেমন্তকুমারী সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার আত্মীয়স্বজন আসিয়া রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া বসিলেন। ওদিকে রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের মাসির পুত্র জয়নাথ চক্রবর্তীকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া লোকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। জয়নাথ রাজশাহী জর্জ আদালতে যোগেন্দ্রনারায়ণের দত্তকপুত্রের অসিদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। জয়নাথের মৃত্যুর পর আদালতে দত্তকপুত্র সিদ্ধ হইল। দেবী হেমন্তকুমারীই সর্বময় কর্ত্রী হইলেন। তাঁহার দানশীলতার জন্য সম্প্রতি বৃটিশ গভর্নমেন্ট তাঁহাকে 'মহারানি' উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন।

পরে পুঁঠীয়া রাজবংশের সম্পূর্ণ বংশলতা প্রদত্ত হইল :



১. এই পুষ্করাক্ষ মজুমদার, কমলাপতি লাহিড়ী ও রাজা কংসনারায়ণ এই তিন শাণ্ডিল্য গোত্র সবকার বার্বকাবাদে অতিশয় খ্যাতিলাভ কবিয়াছিলেন। ভাদুড়ী-ব্যাখ্যায় কুলজ্ঞেরা লিখিয়াছেন—



২১ মহারাজ অনুপনারায়ণ ঠাকুর

২২ ২য় পুত্র মদননারায়ণ
৩য় পুত্র রূপেন্দ্রনারায়ণ
৪র্থ পুত্র প্রাণনারায়ণ ঠাকুর

২৩ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ (বড় তরফ)
মহেন্দ্রনাঃ (মধ্যম তরফ)
রবিনারায়ণ (ছোট তরফ) নিঃসন্তান
২৩ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর (পত্নী রানি সূর্যমণি)
২৩ আনন্দনারায়ণ

২৪ রাজা গোলকেন্দ্র (দত্তক)
গজেন্দ্রনারায়ণ (নিঃসন্তান)
২৪ ভূপেন্দ্রনারায়ণ (দত্তক)

২৫ রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ (দত্তক)
২৫ পরেশনারায়ণ

২৬ রাজা গোপালেন্দ্রনারায়ণ
২৬ সুরেশনারায়ণ (দত্তক)

২৪ রাজা মহেশনারায়ণ (নিঃসন্তান)
রাজা গিরিশনারায়ণ
২৪ ঈশ্বরনারায়ণ
২৪ ঈশাননারায়ণ

২৫ রাজা রমেশনারায়ণ
২৫ কেদারনারায়ণ

২৬ রাজা বৈকুণ্ঠনারায়ণ
২৬ সতীশনারায়ণ

২৭ রাজা হেমেন্দ্রনারায়ণ

২৫ রাজা নিমনারায়ণ
যজ্ঞেশনারায়ণ
তারকনারায়ণ

"পুষ্করাক্ষো বরো সাধোঃ লাহিড়ী কমলাপতিঃ।
নন্দনাবাসিনো জ্ঞেয়ঃ কংসনারায়ণঃ দ্বিজঃ ॥"

২. রামচন্দ্র ঠাকুর ভবানীপুর নিষ্কৃতি করিয়া প্রথমে ভবানীপুর পুঁঠীর কুলীন হন, অবশেষে পাঁচুড়িয়া দোষগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

৩. ভট্টনারায়ণ হইতে মহারাজ যতীন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর পর্যন্ত ৪১ পুরুষ হইতেছে।

জোয়াড়ার বিশী বংশ

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় পিপড়া ওঝা বিশী হইতে বিশী বংশের উৎপত্তি। পিপড়া ওঝা সুপ্রসিদ্ধ নারায়ণ ভট্টের অধস্তন জয়সাগরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টগাঞিঁর মধ্যে বিশীগাঞিঁ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

পিপড়া ওঝা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। খুব সম্ভব পিপড়া ওঝার কোন উর্ধ্বতন পুরুষ (কালিকা ওঝা) বল্লাল সেনকে দীক্ষা দিয়া বিশী গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, পিপড়া ওঝা আকবর বাদশাহের অন্যতম সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার পূর্ববাস আগরায় ছিল। আকবর ইঁহাকে হরিবাটী গ্রাম দান করার পর ইনি পারইডিঙ্গিতে আসিয়া বাস করেন। অতিথি সেবা করিবার জন্য আকবর ইঁহাকে হুলীখালী, জিয়াসিন্ধু, মাঁদা, সিন্দুর, কুসুম্বী, কালীগাঁও ও তেলাঙ্গী প্রভৃতি পরগনা এবং অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করেন। এই সম্পত্তি লাভ করার পর পিপড়া ওঝা পারইডিঙ্গিতে ইষ্টকগৃহ নির্মাণ করেন ও দেবালয়, অতিথিশালা ও সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তিনি একটি সুবৃহৎ জলাশয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। আকবর একখানি নীলপ্রস্তর পিপড়া ওঝাকে উপহার দিয়াছিলেন, সেখানি আজও হরিবাটীর দেবালয়ের সম্মুখে স্থাপিত আছে।

পিপড়া ওঝার পুত্র সাতকড়ি। সাতকড়ির পুত্র হরিপ্রিয়, তৎপুত্র যদুনাথ। যদুনাথের পুত্র দুর্গাদাস। দুর্গাদাসের দুই পুত্র রামহরি ও গঙ্গাহরি। ইঁহারা দুই ভ্রাতা পারইডিঙ্গীতে বাস করিতেন। দিল্লীর সম্রাটের অনুগ্রহে গঙ্গাহরি চাঁপলিয়া ফৌজদারী আদালতে প্রধান কর্মচারী পদ প্রাপ্ত হন। চাঁপলিয়া অবস্থান কালে গঙ্গাহরি জোয়ারী গ্রামের মজুমদার বংশীয় এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং শ্বশুরের পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। গঙ্গাহরির সন্তানদিগকে রামহরি পৈত্রিক সম্পত্তির কোন অংশ দেন নাই। নাটোরের রঘুনন্দন পারইডিঙ্গি, হুলিখালী ও হরিবাটী ব্যতীত রামহরির সমস্ত কাড়িয়া নেন।

গঙ্গাহরির সন্তানেরা জোয়ারীতে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহারাই জোয়ারীর বিশীবংশ। গঙ্গাহরির পুত্র রূপনারায়ণ, রূপনারায়ণের পুত্র উদয়নারায়ণ, উদয়নারায়ণের পুত্র দর্পনারায়ণ। দর্পনারায়ণের সময় হইতে আবার বিশীদের জমিদারি বৃদ্ধি হইতে থাকে। দর্পনারায়ণ সাঁতৈলের রানি সর্বাণীকে আতিথ্য দ্বারা তুষ্ট করিয়া জোয়ারীর উত্তরের বিল ও চক্ ভবানীর প্রজাদের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হন।

দর্পনারায়ণের তিন পুত্র—ভবানী, হরিপ্রসাদ ও বলরাম। পিতা বর্তমানে ভবানীর মৃত্যু হওয়ায় হরিপ্রসাদ ও বলরাম পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হয়েন। তাঁহারা ৩২০০০ টাকায় সোনাবাজু পরগনা ক্রয় করিয়া তাহার বার আনা অংশ তাঁতিবন্দ, হরিপুর ও দুলাইয়ের জমিদারদের নিকট বিক্রয় করেন। ইঁহাদের দুই ভ্রাতার বংশধরেরা যথাক্রমে ছোট তরফ ও বড় তরফ নামে অভিহিত হয়েন। হরিপ্রসাদের চারি পুত্র—শিবনাথ, হারু, রামধন ও যুধরাম। যুধরাম অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। শিবনাথের অনেকগুলি সন্তান হয়। ইঁহার নিরাবিল ও ভূষণাপটীর বহু কুলীন ও সম্ভ্রান্ত জমিদার-বংশে কন্যাদান করেন।

হরিপ্রসাদ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্যোতিষী ছিলেন। শিবনাথের বিষয় বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাঁহার পুত্র শম্ভুনাথ ওয়াটসন কোম্পানির ৭০০ কুঠীর ম্যানেজার ছিলেন। তিনি অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। শিবনাথের তৃতীয় পুত্র কাশীনাথের কন্যা সুধাময়ী দেবীর

সহিত খুজরা নিবাসী নিরাবিল পটীর কুলীন জমিদার ভোলানাথ খাঁর বিবাহ হয়। শম্ভুনাথের তিন পুত্র-জয়নাথ, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র। জয়নাথ 'দেবীযুদ্ধ' 'পদ্মপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় লিখিয়া সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেন। মহেশচন্দ্রের কন্যা কুমুদমণির বলিহার—রাজবংশে বিবাহ হয়।

জয়নাথের তিন পুত্র--যদুনাথ, যাদবচন্দ্র ও মাধবচন্দ্র। যাদবচন্দ্র অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন। তিনি জোয়ারীতে একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। হারুর পুত্র--রঘুনাথ নিজ চেষ্টায় অনেক জমিদারি লাভ করেন। তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদি পাঠ করাইতেন। ইঁহার পৌত্রী সৌদামিনীর সহিত চৌগ্রামের রাজা রোহিণীকান্তের বিবাহ হয়। ইটালী নিবাসী ঈশা চন্দ্র মৈত্র রামধনের পৌত্রী সখীসুন্দরীকে বিবাহ করিয়া ইটালী প্রভৃতি সাতশত টাকা লাভের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন।

ছোট তরফের বলরামের পুত্র রতনকৃষ্ণ। রতনকৃষ্ণের পুত্র দ্বারকানাথ (নিঃসন্তান) ও চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথের দুই পুত্র মোহিনী ও প্রমথনাথ।

বলরাম নাটোর রাজসরকারের দেওয়ানী করিতেন। তাঁহার কন্যা জয়সুন্দরীর তাহির পুরের রাজা বীরেশ্বর রায়ের সহিত বিবাহ হয়। তাঁহার পুত্র রতনকৃষ্ণ পিতার আরদ্ধ শিবমন্দির নির্মাণ সমাপ্ত করেন। রতনকৃষ্ণের দুই পুত্র ও তিন কন্যা; জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারকানাথ অপুত্রক পরলোক গমন করাতে কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রনাথ পিতৃ-জমিদারিতে প্রতিষ্ঠিত হন। রতনকৃষ্ণ নিরাবিলপঠীর কুলীনে কন্যাদের বিবাহ দিয়া সমাজগৌরব রক্ষা করেন।

চন্দ্রনাথের দুই পত্নী। জ্যেষ্ঠা পত্নী একমাত্র পুত্র মোহিনীকে রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। চন্দ্রনাথ কনিষ্ঠা পত্নীর বশীভূত হন। এই পত্নীর গর্ভে প্রমথনাথ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শৈশবেই প্রমথনাথ কালগ্রাসে পতিত হন। চন্দ্রনাথ উইল দ্বারা-মোহিনীকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া কনিষ্ঠা পত্নী মৃণ্ময়ীকে যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিতে ইচ্ছুক হন। যাদব বিশী ও বিজয়গোবিন্দ চৌধুরীর বিশেষ যত্নে ও চেষ্টায় উইল পরিবর্তন হওয়াতে মোহিনী বিশী পিতৃ-জমিদারিতে প্রতিষ্ঠিত হন। মোহিনী অতি সুধীর ও বিজ্ঞ। চন্দ্রনাথের দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত মুক্তাগাছার অমৃতলাল আচার্যের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ আচার্যের এবং কনিষ্ঠ কন্যার সহিত তাঁতিবন্দের জমিদার অন্নদা-গোবিন্দ চৌধুরীর পুত্রের বিবাহ হয়। এই দুই কন্যাকে চন্দ্রনাথ বার্ষিক বার শত টাকা লাভের সম্পত্তি দিয়া যান। এই ছোটতরফের জমিদার একা মোহিনী মোহন বিশী থাকায় বর্তমানে ছোট তরফের জমিদারির আয় অধিক।

শাণ্ডিল্যগোত্র জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের বংশ

পূর্ববঙ্গ রেলপথের শিবনিবাস স্টেশন হইতে আট ক্রোশ পূর্বে জেলা নদীয়া (বর্তমান যশোরের) অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে প্রাচীন কাল হইতে একটি শুদ্ধাচারী সিদ্ধশ্রোত্রিয় বারেন্দ্র বংশ বাস করিয়া আসিতেছেন। দেশপ্রসিদ্ধ অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই বংশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে নাটোর মহারাজের দ্বারপণ্ডিত কেবলরাম তর্কপঞ্চানন ও পরে তৎপুত্র রঘুত্তম বাণীকণ্ঠ, কলিকাতা হাতি বাগানের সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক হরচন্দ্র তর্কভূষণ, শ্রীরামপুরের কেরি সাহেবের শিক্ষক কালিদাস সভাপতি, নদীয়া-মহারাজের সভাপণ্ডিত বলভদ্র বিদ্যাবাচস্পতি, ভারতচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সদানন্দ বিদ্যাবাগীশ, মুন্সেফ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার,

হরধর ন্যায়রত্ন ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও জর্জ পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রধান। এই বংশের পরিচয়জ্ঞাপক মুদ্রিত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, এবং এই বংশের ও জয়গোপালের কথা বহু গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

এই বংশের কীর্তিমান মহাপুরুষ মধুসূদন ব্রহ্মচারী। ইনি বর্গীর হাঙ্গামার সময় স্বীয় বাসস্থান বর্ধমানের অন্তর্গত চাকন্দিয়া পরিত্যাগপূর্বক নদী-বৈদ্য-চতুষ্পাঠী পরিশোভিত আদর্শ গ্রাস বজরাপুরে বাস করেন। এই মধুসূদন আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন বত্রিশ পুরুষ। এই বংশীয়গণের শাণ্ডিল্যগোত্র, সাম বেদ কৌথমী, শাখা ও বাগছিগাঁই হইতেছে। এই বংশ বরাবর কুলক্রিয়া দ্বারা ইঁহারা সিদ্ধশ্রোত্রিয় বলিয়া সমাজে আদৃত হইতেছেন। এই বংশ কুলীনপোষক; তবে অবস্থা ভাল না থাকায় কোন কোন সরিক শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিয়াছেন। এই বংশের হলধর ন্যায়রত্ন স্বীয় কন্যা গোলাপী দেবীর বিবাহের সময় আট পটীর কুলীন একত্র করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কালনার উকিল শ্রীপূর্ণচন্দ্র সান্যাল, কলিকাতা পার্শিবাগানের শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতি বিখ্যাত কুলীন সন্তান এই বংশের জামাতা, এবং সমস্তিপুর নিবাসী শ্রীচিন্ময়চরণ সান্যাল, শ্রীরামপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল কাপবংশোদ্ভূত শ্রীউমেশচন্দ্র গোস্বামী ও শান্তিপুরের অদ্বৈতবংশোদ্ভূত সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী এই বংশের দৌহিত্র। এই বংশের ভবেন্দ্রনাল ভট্টাচার্য সুবিখ্যাত ময়ূর ভট্ট বংশোদ্ভূত মনুপ্রসাদ মুহুরির কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন--উক্ত মুহুরি বংশ চিরকাল কুলক্রিয়া করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের উজ্জ্বল বংশ অদ্যাপি বর্তমান।

যদিও এই বংশ বৈষ্ণব, তথাপি বিগত তিনশত বৎসর যাবৎ এই বংশে দুর্গাপূজা হইয়া আসিতেছে। ১১৮৭ শকে বিনির্মিত দুর্গামণ্ডপ অদ্যাপি বিদ্যমান--এই স্থানকে লোকে পীঠস্থান জ্ঞান করিয়া থাকে। উহার একাংশে লেখা আছে--

'শাকে ভুজনভোমৈত্রে পিত্রে গৌরীমুদর্থিনে।
শ্রীমতা রঘুরামেণ হর্ম্যং রম্যতমং দদৈ।।

অদ্যাবধি উক্ত দুর্গামণ্ডপে ও শ্রীসহায়রাম ভট্টাচার্যের পৃথক মণ্ডপে দুর্গাপূজা হইয়া আসিতেছে। বহুশত বৎসর হইল এই বংশের কুলদেবতা শ্রীগোপালজী প্রতিষ্ঠিত আছেন, ও তাঁহার নিত্য ভোগপূজা ও বার মাসে তের পার্বণ অনুষ্ঠিত হইতেছে। অতিথি সেবার বন্দোবস্ত বহুদিন হইতে আছে। নাটোর-রাজবংশের সহিত এই বংশের পাণ্ডিত্যের মধ্য দিয়া সম্বন্ধ। কেবলরাম তর্কপঞ্চানন ও রঘুত্তম বাণীকণ্ঠ নাটোরে দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। নাটোরের পুণ্যনাম্নী রানিভবানীর প্রদত্ত ও কৃষ্ণনগরের পুণ্যশ্লোক কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত বিপুল ব্রহ্মোত্তর ও জমিদারি এই বংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্তমানে শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য বিস্তৃত জমিদারির মালিক--ইনি প্রজার সুবিধাকল্পে তিনটি পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন। বর্তমান শ্রীজানকীরাম গভর্নমেন্ট বৃত্তি পাইয়া আধুনিক ইংরাজি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন ও এম এ, বি এল সসম্মানে পাশ করিয়া এক্ষণে ওকালতী করিতেছেন। এই বংশ বরাবর ধর্মপ্রবণ ইঁহাদিগের পাণ্ডিত্য, সদাচার, স্বধর্মনিষ্ঠা ও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহিতা দর্শন করিয়া নাটোররাজ ভট্টাচার্য উপাধি প্রদান করেন।

বজরাপুর গ্রাম পাণ্ডিত্যে ও বিদ্যাগৌরবে এককালে প্রায় নবদ্বীপের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁহার হরিভক্তি-গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন--

"চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
ভূমিপতি ভূমি-সুরপতি।
তাঁর রাজ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম, সমাজপূজিত গ্রাম
বজরাপুরেতে নিবসতি।"

এই ভট্টাচার্য বংশ পাণ্ডিত্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ ও আদৃত, তাহা উপরে লিখিত হইয়াছে। কেবলরাম ও রঘুত্তম নাটোরে ও বলভদ্র কৃষ্ণনগরে সভাপণ্ডিত ছিলেন। হরচন্দ্র তর্কভূষণ হাতিবাগানে টোল খুলিয়াছিলেন এবং একজন দেশবিখ্যাত স্মার্ত ও নৈয়ায়িক ছিলেন। ভারতচন্দ্র নবদ্বীপ ও কান্দি স্কুলে হেডপণ্ডিত ছিলেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কেরি ও মার্শম্যানের সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন, পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হ'ন ও তদানীন্তন হাইকোর্টের জর্জপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে তিনি অধ্যক্ষ হোরেস্--হেম্যান্ উইলসন্ কর্তৃক আনীত হ'ন। তাঁহার সাহিত্যজ্ঞান ও বিদ্যাবত্তায় সকলে মুগ্ধ ছিল। যাঁহাদের গুণগরিমায় বঙ্গভূমি গৌরবান্বিত, সেই সকল স্বনামধন্য মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাকান্ত বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, তারাশঙ্কর তর্করত্ন ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি বঙ্গের সুসন্তানগণ জয়গোপালের ছাত্র ছিলেন।

জয়গোপালের দুইটি কীর্তি তাঁহাকে চিরস্মরণীয় রাখিবে। তিনিই সর্বপ্রথম শ্রীরামপুর যন্ত্রে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত ১৮৩০ ও ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রাঙ্কিত করেন, ও কালের কবল হইতে উক্ত কবিদ্বয়ের কীর্তি রক্ষা করেন। জয়গোপাল পারসিক অভিধান প্রণয়ন ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'হরিভক্তি' গ্রন্থের কবিতানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি কবিবর ঈশ্বরগুপ্তের 'প্রভাকরে'র নিয়মিত লেখক ছিলেন, তাহা ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখ 'প্রভাকরে' প্রকাশিত ঈশ্বরগুপ্তের তালিকাতে পাওয়া যায়।

নিম্নে জয়গোপালের পূর্ববংশ-পরিচয় লিখিতেছি--

জয়গোপালের পূর্বপুরুষ মধুসূদন ব্রহ্মচারীর পত্নীর নাম রত্নেশ্বরী। ইঁহার দুই পুত্র.-- রাজারাম তর্কসিদ্ধান্ত ও কৃষ্ণরাম বেদান্তবাগীশ। রাজারাম তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র নিমাইচাঁদ সিদ্ধান্ত, তৎপুত্র কনকরাম বিদ্যাবাগীশ ও তৎসুত শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য।

কৃষ্ণরাম বেদান্তবাগীশের দুই পুত্র, --কেবলরাম তর্কপঞ্চানন ও সদানন্দ-বিদ্যাবাগীশ। কেবলরাম তর্কপঞ্চাননের রঘুত্তম বাণীকণ্ঠ, সদাশিব তর্করত্ন, বলভদ্র বিদ্যাপাচস্পতি, কালিদাস সভাপতি, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, রামতনু ও হেরম্ব এই সাত পুত্র ও যশোদা (রামধন খাঁ ভাদুড়ীর সহিত বিবাহিতা) নামে এক কন্যা। রঘুত্তম বাণীকণ্ঠের তিন পুত্র— (রামচন্দ্র, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও মহেশ ন্যায়রত্ন। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের সুরেশ, অজিত, কৈলাস ও শরৎ এই চারি পুত্র। সুরেশের বিশ্বেশ্বর ও হাজারি নামে দুই পুত্র, এবং গিরিবালা (স্বামী বিনোদ সান্ন্যাল) ও শৈলবালা (স্বামী সুরেন্দ্র মৈত্র) নামে দুই কন্যা। বিশ্বেশ্বরের তিন পুত্র--রাধারমণ, রাধাগোবিন্দ ও রাধাবিনোদ এবং এক কন্যা ঈশানী (স্বামী পূর্ণচন্দ্র সান্যাল)। রাধারমণের পুত্র অমিয়, অবনী ও অনাদি।

সদাশিব তর্করত্নের পুত্র মাধব সার্বভৌম। তৎপুত্র হলধর ন্যায়রত্ন ও মথুরানাথ। হলধর ন্যায়রত্নের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রগণের নাম দুর্লভ, বিশ্বম্ভর, পুরুষোত্তম লক্ষ্মীকান্ত ও নিবারণ; কন্যাগণের নাম গোলাপী (স্বামী হরমোহন মৈত্র), সুকেশী (স্বামী মোহিনী গোস্বামী) ও মনোমোহিনী (স্বামী মহেশ সান্যাল)। দুর্লভের সত্যভামা নামী এক

কন্যা। ইঁহার স্বামীর নাম রামগোপাল গোস্বামী এবং ইঁহার পুত্র প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী। দুর্লভসহোদর বিশ্বম্ভরের রামকৃষ্ণ ও নীলমণি নামে দুই পুত্র এবং যাদুমতী নামে এক কন্যা (স্বামী যোগীন্দ্র গোস্বামী, সাং শ্রীরামপুর)। পুরুষোত্তমের পুত্র কেশব, প্রিয় ও হৃদয়। হৃদয়ের পুত্র খোকা। হলধরের অপর পুত্র লক্ষ্মীকান্তের এক তনয়, তাঁহার নাম পঞ্চানন। কন্যা সুকেশী ও মনোমোহিনীর পুত্রদ্বয়ের নাম যথাক্রমে উমেশ গোস্বামী (শ্রীরামপুর) ও সতীশ সান্যাল।

মাধব সার্বভৌমের দ্বিতীয় পুত্র মথুরানাথের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম দেবনাথ ও চক্রপাণি এবং কন্যাদ্বয়ের নাম জ্ঞানদা (স্বামী মতি রায়) ও কৃষ্ণমতী (স্বামী তারক মৈত্র)। দেবনাথের পুত্র শ্যামসুন্দর। জ্ঞানদার পুত্র ভূপেন্দ্র ও কৃষ্ণমতীর পুত্র বীরেন্দ্র।

বলভদ্র বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র হরচন্দ্র তর্কভূষণ ও রামতারণ বিদ্যানিধি। হরচন্দ্রের পুত্র ভারতচন্দ্র, তৎপুত্র কানাই, লালমোহন ও সুরেন্দ্র।

কালিদাস সভাপতির দুই পুত্র,--মোহন শিরোমণি ও শ্যামাচরণ। মোহন শিরোমণির পুত্র হরি, মহেন্দ্র ও যোগীন্দ্র। হরির পুত্র মুকুন্দ ও মহেন্দ্রের পুত্র হাজারি।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের পুত্র তারক বিদ্যানিধি। তাঁহার তিন পুত্র শ্রীবিষ্ণু, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ এবং এক কন্যা সুশারময়ী (স্বামী অক্ষয় মৈত্র)। এই কন্যার চারিপুত্র--অমূল্য, অশ্বিনী, কালী ও রাধাচরণ।

সদানন্দ বিদ্যাবাগীশের চাঁদমোহন, চন্দ্রমোহন, কমলাকান্ত ও বৃন্দাবন এই চারি পুত্র। বৃন্দাবনের পুত্র দীননাথ। কমলাকান্তের পুত্র নবকুমার ও ক্ষুদিরাম। নবকুমারের পুত্র প্যারীলাল, নরেন্দ্রনাথ ও ভবেন্দ্রলাল। ভবেন্দ্রলালের একাদশ সন্তান--নলিনীবালা, পার্বতী, কিরণ, অপর্ণা, বিমলা, শ্রীপতি, সহায়রাম, রঘুরাম, সীতারাম, জানকীরাম, ও শিবরাম। কিরণ, অপর্ণা ও বিমলার পুত্রত্রয়ের নাম যথাক্রমে প্রভাস চক্রবর্তী, হেম বক্সী ও চিত্ত তরফদার। সহায়রামের পুত্র সত্যপ্রকাশ। রঘুরামের দুই পুত্র নিত্যপ্রকাশ ও ইন্দুপ্রকাশ। জানকীরামের পুত্র ধ্রুবপ্রকাশ।

বোয়ালিয়ার বাগছী বংশ

পীতাম্বর ঠাকুর হইতে বংশ গণনা হইয়া থাকে। পীতাম্বরের তিন পুত্র--লোকনাথ, সাধু ও রুদ্র। লোকনাথের বংশ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সাধুর লবণ ও মনু নামে দুই পুত্র। মনু দক্ষিণ দেশে গিয়া বাস করেন। লবণের পুত্র চক্রপাণি, তৎপুত্র রূপ ওঝা ও তৎপুত্র ঋষি দীক্ষিত। ঋষির পাঁচ পুত্র--সিয়াই, গদাধর, আনুমিত্র, গুছিপাণ্ডব ও বিয়াই (ধামসা সমাজ)। বিয়াইয়ের চারি পুত্র--হরিহর (অগ্নিহোত্রী), শ্রীকণ্ঠ (ছয়ঘরিয়া দলভুক্ত), বৈকুণ্ঠ ও মন্দার দীক্ষিত। হরিহরের পুত্র বলাই। বলাইয়ের দুই পুত্র,--বিয়াই ও বামন (পুঁঠীয়ার রাজবংশের আদিপুরুষ)। বিয়াইয়ের পুত্র গোপীনাথ (খোজাম্বরি অবসাদগ্রস্ত)। গোপীনাথের দুই পুত্র--রূপনারায়ণ ও জয়নারায়ণ। রূপনারায়ণের চারি পুত্র--রামনারায়ণ, হরিনারায়ণ, রঘুরাম ও শিবরাম। রামনারায়ণের সাত পুত্র--জয়দেব, বামদেব, মহাদেব, রামগোপাল, ভবদেব, কৃষ্ণদেব ও বিষ্ণুদেব। জয়দেবের দুইপুত্র--গঙ্গানারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ। বামদেবের পুত্র রামভদ্র। রামগোপালের পুত্র রাধাকৃষ্ণ। তৎপুত্র রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের পাঁচপুত্র--প্রতাপরুদ্র, কৃষ্ণকিঙ্কর, জগন্নাথ, আন্দিরাম ও

ব্রজরাম। প্রতাপরুদ্রের পাঁচপুত্র--হরিনাথ, কাশীনাথ, রামনাথ, শ্যামনাথ ও জগন্নাথ। কাশীনাথের দুই পুত্র--রামজীবন ও কৃষ্ণনাথ। কৃষ্ণনাথের দুইপুত্র--জানকী ও শ্রীনাথ। জানকীর বসন্ত, রজনী, প্রসন্ন ও যোগেন্দ্র নামে চারিপুত্র। শ্রীনাথের দ্বারকা ও শশী নামে দুই পুত্র।

রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজরামের কৃষ্ণকান্ত ও সদাশিব নামে দুইপুত্র। কৃষ্ণকান্তের চারিপুত্র--দর্পনারায়ণ, কমলাকান্ত, ভৈরব ও গগন। দর্পনারায়ণের আদিনারায়ণ নামে একপুত্র। কমলাকান্তের দুইপুত্র--রুদ্র ও চন্দ্র। ভৈরবের গোবিন্দ নামে এক পুত্র। সদাশিবের পাঁচপুত্র--রামানন্দ, জয়মঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, রণজয় ও মৃত্যুঞ্জয় রামানন্দের সর্বানন্দ ও উৎসবানন্দ নামে দুইপুত্র। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র রামজয়। ইনি স্বনামখ্যাত বোয়ালিয়ার ধর্মসভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। রামজয়ের পুত্র সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্রের যোগেন্দ্র ও শচীন্দ্র নামে দুইপুত্র।

ভবদেবের নীলকমল ও রামহরি নামে দুইপুত্র। বিষ্ণুদেবের রামেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর নামে দুই পুত্র।

হরিনারায়ণের শুভরাম, দ্বারিক ও কাশীনাথ নামে তিনপুত্র। শুভরামের দুই পুত্র--রত্নেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর। রত্নেশ্বরের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের দুইপুত্র--কৃষ্ণচন্দ্র ও রূপচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের নফর ও কাশীনাথ নামে দুইপুত্র। রূপচন্দ্রের পুত্র কীর্তিচন্দ্র। তাঁহার দুইপুত্র--নারায়ণ ও শিবচন্দ্র। শিবচন্দ্রের পুত্র মহেশ। তাঁহার উমেশ ও রমেশ (বালুঘরা) নামে দুইপুত্র।

রঘুরামের মণিরাম ও মুক্তারাম। মণিরামের তিনি পুত্র--নফর, দাবাড়ি ও প্রাণকৃষ্ণ। নফরের রাজারাম ও ভোলানাথ নামে দুইপুত্র। রাজারামের চারিপুত্র--শিবনাথ, রামচন্দ্র, প্রেমচাঁদ ও কাশীচন্দ্র। রামচন্দ্রের পুত্র রামনিধি। তৎপুত্র রামকুমার। প্রেমচাঁদের দুই পুত্র —জগন্নাথ ও রাধামোহন। জগন্নাথের দীনবন্ধু ও কৃপানাথ নামে দুই পুত্র। রাধামোহনের কাশীনাথ ও নিধু নামে দুই পুত্র।

প্রাণকৃষ্ণের দুই পুত্র--ভবানীপ্রসাদ ও দুর্গা। ভবানীপ্রসাদের চণ্ডীপ্রসাদ (জামিরতা) নামে এক পুত্র।

শিবরামের রামরাম, কৃষ্ণরাম, বলরাম, বিষ্ণুরাম, শ্যামরাম ও সর্বানন্দ নামে ছয় পুত্র। বলরামের গঙ্গাগোবিন্দ নামে এক পুত্র। তাঁহার পুত্র গুরুগোবিন্দ। গুরু গোবিন্দের নরসিংহ ও বীরসিংহ নামে দুইপুত্র।

শ্যামরামের চারিপুত্র--রামপ্রসাদ, রামধন, মণিরাম ও গঙ্গাধর। রামপ্রসাদের কমললোচন ও পদ্মলোচন নামে দুই পুত্র। কমললোচনের পুত্র জগমোহন; তৎপুত্র রাধামোহন। রাধামোহনের ভৈরব, ব্রজগোপাল ও রবিলোচন নামে তিন পুত্র। ভৈরবের পুত্র কৈলাস। ব্রজগোপালের পুত্র প্রাণগোপাল। রবিলোচনের পুত্র বিশ্বেশ্বর (জামিরতা)।

হরিহর অগ্নিহোত্রীর বংশ

ভট্টনারায়ণের বংশে জয়সাগর ও মণিসাগর নামে দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। জয়সাগরের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পীতাম্বরের তিন পুত্র হয়। তাঁহাদের মধ্যম সাধু বাগ্‌ছি। ইঁহার দুই পুত্র, কনিষ্ঠের নাম লবণ। লবণের পুত্র ত্রিপুরারি, তৎপুত্র চক্রপাণি, তৎপুত্র রূপ ওঝা। রূপ ওঝার পুত্রের নাম ঋষি দীক্ষিত। ইঁহার পঞ্চ পুত্রের মধ্যে চতুর্থ

বিয়াই, তৎপুত্র হরিহর অগ্নিহোত্রী। হরিহরের অধস্তন হলাহল, তৎপুত্র কুবের। কুবেরের সপ্ত পুত্র, তাঁহাদের চতুর্থ দামোদর মিশ্র। দামোদরের চারি পুত্র, তৃতীয়ের নাম নরসিংহ। নরসিংহের দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠের নাম নারায়ণ। ইঁহার তিনপুত্র, মধ্যম সদানন্দ। সদানন্দের তিন পুত্রের কনিষ্ঠ গোবিন্দ চক্রবর্তী। গোবিন্দের ছয় পুত্র; চতুর্থ রাজীব চক্রবর্তী। ইঁহার দুই পুত্র, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ রামনাথ রায়ের চারি পুত্র। তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় দুর্গারাম। ইঁহার পঞ্চ পুত্রের দ্বিতীয়ের নাম রঘুরাম। রঘুরামের দুই পুত্র, কনিষ্ঠ গদাধর। ইঁহার পুত্র ধরণীধর, তৎপুত্র গিরিধর, তৎপুত্র শশধর রায় বিখ্যাত উকিল ও মানবতত্ত্ববিৎ। তৎপুত্র অবিনাশচন্দ্র।

শাণ্ডিল্যগোত্র নন্দনাবাসী গাঁঞি—(গুয়াখরা) কুল্লূক ভট্টের ও তাহিরপুরের প্রাচীন রাজবংশ

ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভব মনু ভট্টের ৮ম অধস্তন পুরুষ দিবাকর জগৎগুরু। ইঁহার চারিপুত্রের নাম পুরুষোত্তম বৈদান্তিক, কুল্লূকভট্ট (গুয়াখরা), মকরন্দ মিশ্র (জামরুকি) ও খোভাচার্য (টুটইলা)। পুরুষোত্তমের পুত্র নাভ ভট্ট, তৎপুত্র শশীকুলীন ও তৎপুত্র সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণের পঞ্চ পুত্র,—নন্দন (দিঘা), বল্লভ (পাইকড়া), বিনায়ক (ঢাকপাড়া) নরহরি (গুনটিয়া) ও রাম (কয়ড়া)। কুল্লূকভট্টের তিন পুত্রের নাম আকাই, বিভাই ও মকরধ্বজ মিশ্র। মকরধ্বজের দুইপুত্র, রামদেব ও বামদেব। রামদেবের পুত্র জয়দেব ও হরিদেব। হরিদেবের পুত্র বলভদ্র, মীনকেতন ও পঞ্চানন। পঞ্চাননের পুত্র গোপীবল্লভ, তৎপুত্র জানকীবল্লভ ও তৎসুত রাজারাম। রাজারামের দুইপুত্র,—আত্মারাম ও রতিরাম। মীনকেতনের দুই পুত্র হরিভদ্র ও সদানন্দ। হরিভদ্রের পুত্র মধুসূদন, তৎপুত্র বিজয়, তৎসুত নয়ান, ও তৎপুত্র বাণীগুরু। বাণীগুরুর পুত্র হরিচরণ, কৃষ্ণচরণ ও গোবিন্দচরণ। হরিচরণের পুত্র রামেশ্বর।

সদানন্দের পুত্র রামচন্দ্র, তৎপুত্র অনিরুদ্ধ, তৎসুত সনাতন। সনাতনের দুই পুত্র গোপাল চৌধুরী ও শ্রীমুখ চৌধুরী। গোপালের পুত্র রতিকান্ত, শ্রীরাম, রামনারায়ণ ও রামগোবিন্দ। রতিকান্তের চারি পুত্র জয়কৃষ্ণ, রাজবল্লভ, রামচরণ ও রামজীবন। শ্রীমুখ চৌধুরীর পঞ্চপুত্র—মোহন, গঙ্গানারায়ণ, রামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ ও বলভদ্র। মোহনের পুত্র রাজারাম ও গঙ্গানারায়ণের পুত্র মণিরাম। নন্দনের পুত্র বামন ও ঈশান। বামনের পুত্র কন্দর্প ও সুরপতি। কন্দর্পের পুত্র কৃষ্ণ ও কামদেব। কৃষ্ণের পুত্র নিধাই তলাপাত্র, তৎপুত্র বদন, তৎসুত কমলাকান্ত। কমলাকান্তের পুত্র গৌরীকান্ত তৎসুত জগন্নাথ এবং তৎপুত্র বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের তিনপুত্র,—গঙ্গারাম, দেবীদাস ও লঙ্কারাম। লঙ্কারামের পুত্র রামেশ্বর ও হরিদেব। রামেশ্বরের চারিপুত্র শিবরাম, কৃষ্ণরাম, রমানাথ ও জয়রাম মিশ্র। রমানাথের পুত্র মহেশ ও গোপাল। গোপালের তনয় যদুচন্দ্র, তৎসুত যদুনন্দন ও হরিচরণ। যদুনন্দনের চারিপুত্র,—রমাপতি, হরিনন্দন সার্বভৌম, কালীনাথ ভট্টাচার্য ও হরিনারায়ণ সিদ্ধান্ত। হরিচরণের পুত্র কৃষ্ণদেব, তৎসুত কেশব পঞ্চানন। রমাপতির পুত্র নন্দরাম বিদ্যাবাগীশ, রাধাকান্ত তর্কালঙ্কার ও গঙ্গাধর তর্কবাগীশ (সাং খুড়ি)। গঙ্গাধরের পুত্র গিরিধর ও কাশী (সাং নয়ানগড়)।

কন্দর্পের দ্বিতীয় পুত্র কামদেব ভট্টের চারিপুত্র, প্রথম পক্ষে জাত সঞ্জয় ভট্ট ও দ্বিতীয়

পক্ষে জাত বিজয় লস্কর, জন্মেজয় ও ধনঞ্জয়। সঞ্জয়ের আটপুত্র,--রঘুনাথ, গোবিন্দ, মুকুন্দ, মুরারি, মাধব, মধুসূদন, নারায়ণ এবং গঙ্গাধর। রঘুনাথের পুত্র দুর্গাদাস এবং নারায়ণের পুত্র জগন্নাথ, চতুর্মুখ ও বিশ্বনাথ ভট্ট।

বিজয় লস্করের পুত্র রাজা উদয়নারায়ণ (তাহিরপুর)। তৎসুত হৃদয়নারায়ণ (বড় ঠাকুর), বিজয়নারায়ণ ও হরিনারায়ণ (ছোট ঠাকুর)। হৃদয়নারায়ণের পঞ্চ পুত্র--নরনারায়ণ, গরুড়নারায়ণ, রূপনারায়ণ ও সুবুদ্ধিনারায়ণ। রূপনারায়ণের পুত্র জয়নারায়ণ। সুবুদ্ধিনারায়ণের পুত্র অনন্তনারায়ণ, তৎপুত্র চাঁদনারায়ণ ও দর্পনারায়ণ। দর্পনারায়ণের পুত্র দুর্লভ নারায়ণ। হরিনারায়ণের (ছোট ঠাকুর) দুইপুত্র,--১ম পক্ষে মুকুন্দ ও ২য় পক্ষে রাজা কংসনারায়ণ। রাজা কংসনারায়ণের পুত্র রাজা ইন্দ্রজিৎ, তৎপুত্র রাজা চাঁদনারায়ণ, সূর্যনারায়ণ ও চন্দ্রনারায়ণ। সূর্যনারায়ণের চারি পুত্র--জয়নারায়ণ, সুরনারায়ণ, রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণের দুই তনয়--১ম পক্ষে দর্পনারায়ণ ও মহেন্দ্রনারায়ণ, ২য় পক্ষে ভূপেন্দ্রনারায়ণ ও রূপেন্দ্রনারায়ণ। মহেন্দ্রনারায়ণের পুত্র রাজা বিপ্রনারায়ণ ও রতীন্দ্রনারায়ণ। রতীন্দ্রনারায়ণের পুত্র রাঘবেন্দ্রনারায়ণ। ভূপেন্দ্রনারায়ণের তনয় বারীন্দ্রনারায়ণ। রূপেন্দ্রনারায়ণের পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ (তাহিরপুর)। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র কন্দর্পনারায়ণ, তৎপুত্র রবীন্দ্রনারায়ণ, এবং তৎসুত বলেন্দ্রনারায়ণ, ইনি অপুত্রক। ইঁহার কন্যার ভাদুড়ীবংশীয় আনন্দীরাম রায়ের সহিত বিবাহ হয়; তজ্জন্য তাহিরপুরের ১০ আনা অংশ শ্রোত্রিয় রাজবংশ হইতে ভাদুড়ী কুলীনবংশে যায়।

গনাই লাহিড়ীর বংশ (কাপ)

গনাই ঠাকুর হইতে এই বংশ গণনা হয়। গনাই ঠাকুরের পুত্র মধু। তাহার পুত্র গণেশ আচার্য। তৎপুত্র মুকুন্দ আচার্য। মুকুন্দের গঙ্গানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ আচার্য নামে দুইপুত্র। গঙ্গানন্দ নবাবের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র--শিবরাম, রামচন্দ্র ও রামেশ্বর রায়। শিবরামের নারায়ণ, রাজুরাম ও রাঘবরাম রায় নামে তিন পুত্র। নারায়ণের তিন পুত্র--রামজীবন, মধু রায় ও ঘনশ্যাম রায়। রাঘবরামের পুত্র মাধব রায়। মাধবের দুইপুত্র--রাধাকান্ত ও নৃসিংহ। রাধাকান্তের তিনপুত্র--বিরু, আত্মারাম ও দেবী রায়। বিরুর চারিপুত্র--ভাগবত, হরিশ, কেশব ও রামধন। রামধনের দুইপুত্র--কালিদাস ও সীতানাথ। সীতানাথের একপুত্র মোহিনীমোহন রায়। মোহিনীমোহন স্বনামধন্য পুরুষ ও একজন শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন, নিজ অধ্যবসায়ের গুণে তিনি বহু সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

রঙ্গপুরবাসী লোকনাথ লাহিড়ীর বংশ

লোকনাথ লাহিড়ী এই বংশের বীজপুরুষ। লোকনাথের পুত্র ভূতনাথ। তাহার পুত্র দিগম্বর। তৎপুত্র টুট। টুট ওঝার হলী, বলী, বল্লভাচার্য প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র। হলী বর্ণ ব্রাহ্মণ। বল্লভাচার্যের তিনপুত্র--অর্ক, কেশব ও দনুজারি। কেশবের পুত্র শ্রীনারায়ণ। তাহার মাধব অনন্ত প্রভৃতি কতিপয় পুত্র। মাধবের পুত্র মহামিশ্র ও তৎপুত্র বিদ্যাপতি। অনন্তের শ্রীধর নামে একপুত্র। তৎপুত্র বাণীনাথ। তৎপুত্র মদন (ছাগীপোড়া অবসাদ) ; তৎপুত্র চান্দাই; তৎপুত্র রামচন্দ্র (জোনালী ও ভূষণা)। রামচন্দ্রের অনন্ত, বাসুদেব ও গঙ্গাধর নামে তিনপুত্র। অনন্তের চারিপুত্র--যাদব, বাণীনাথ, বাচাই ও মৃত্যুঞ্জয়। যাদব সাঁতৈলের রাজা

রামকৃষ্ণের ভয়ে রঙ্গপুর জেলার তাম্বুলপুরে আসিয়া বাস করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র রঘুদেব। তৎপুত্র শিবরাম। তাহার মুক্তারাম ও রামচন্দ্র নামে দুইপুত্র। মুক্তারাম নলডাঙ্গায় বিবাহ করিয়া বাস করেন। তাঁহার তিন পুত্র--রতিদেব, রামদেব ও কৃষ্ণদেব। রতিদেব ভূমাধিকারী ছিলেন। রতিদেবের পুত্র রমানাথ, তৎপুত্র কালীমোহন, তৎপুত্র নীলকমল, তৎপুত্র গুরুপদ ও ভবানীচরণ। ভবানীচরণ একজন উচ্চশিক্ষিত ও বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। রতিদেবের ভ্রাতা রামদেবের পুত্র কাশীনাথ। তিনি কোচবিহাররাজের সাজোয়াল ছিলেন। তৎপুত্র কৃষ্ণহরি। ইনি দত্তক ছিলেন। তাঁহার শিবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র নামে দুই পুত্র। কৃষ্ণদেবের পুত্র রাধাকৃষ্ণ, তৎপুত্র কালীচন্দ্র। ইনি কোচবিহাররাজের দেওয়ান ছিলেন।

শাণ্ডিল্যগোত্র রুদ্রবাগছীর ধারা—ভারেঙ্গা তারানগরের চক্রবর্তী-বংশ

পীতাম্বরের মধ্যম পুত্র রুদ্র বাগ্‌ছী হইতে এই বংশ আরম্ভ। রুদ্র বাগ্‌ছীর পুত্র হরদেব, তৎপুত্র বামদেব, তৎপুত্র কামদেব; তৎপুত্র অনঘাচার্য, তৎপুত্র জিগিনী ওঝা। জিগিনী ওঝার রেখা, বেগ, জীয়া ও গেন নামে চারি পুত্র। রেখের পুত্র গণ্ড (শম্ভু) মহানিধি। গণ্ড মহানিধির ধুমাই ও তমাই নামে দুই পুত্র। ধুমাইর তিন পুত্র--ছিয়াই, কিরাই ও জগাই। ছিয়াইয়ের সুয়াই, নুয়াই ও ধনঞ্জয় নামে তিন পুত্র। নুয়াইয়ের মানাই (বোয়ালজানি), শ্রীপতি (সিমুলিয়া) ও গোসাই (গয়নাকান্দি) নামে তিন পুত্র। শ্রীপতির চারি পুত্র--নখাই, বলাই, জগাই ও মগাই। জ্যেষ্ঠ নখাইয়ের শশাই, সনাই, নরসিংহাই ও মাধাই নামে চারিপুত্র। শশায়ের চারি পুত্র--শুকাই, পিতাই, ধবাই ও অনন্ত। শুকাইয়ের চারি পুত্র--কৃষ্ণ, ভগবান্, রামব্রহ্মচারী ও রঘু। কৃষ্ণের দামোদর, চতুর্ভুজ, শ্রীমন্ত ও ঈশ্বর নামে চারিপুত্র। দামোদরের কমল ও শ্রীমুখ নামে দুইটি পুত্র। চতুর্ভুজের পুত্র হৃদয়। তৎপুত্র কাশীনাথ ও তৎপুত্র পদ্মনাভ। শ্রীমন্তের দুই পুত্র--শতানন্দ ও মথুরানাথ। শতানন্দের পুত্র রাঘব। তৎপুত্র রঘুনাথ। মথুরানাথের রতিনাথ, বাণীনাথ ও রামেশ্বর নামে তিন পুত্র। রতিনাথের রাঘব ও রাজারাম নামে দুই পুত্র। বাণীনাথের পুত্র রামকান্ত।

রামেশ্বরের পুত্র কৃষ্ণদেব চক্রবর্তী। ইনি ভারেঙ্গার চৌধুরী বংশের কন্যা গ্রহণ হেতু কুল ভাঙ্গিয়া সিমুলিয়া পরিত্যাগ করিয়া ভারেঙ্গা গ্রামে বসতি করেন। ইঁহার সময় হইতে বাগ্‌ছি উপাধি রহিত হইয়া চক্রবর্তী উপাধি হয়। ইনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। যাজনিক ব্যবসায় ইনি বা ইঁহার বংশের কেহ কখনও করেন নাই। সুপণ্ডিত বলিয়া চক্রবর্তী বলিত, তাহাই পরে এই বংশে প্রচলিত হইল।

কৃষ্ণদেবের পুত্র ঘনশ্যাম। ধনশ্যামের রঘুনাথ চক্রবর্তী ও চন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী নামে দুই সন্তান। রঘুনাথের মৃত্যুঞ্জয় ও গৌরীশঙ্কর নামে দুইপুত্র। মৃত্যুঞ্জয়ের দুই পুত্র জগমোহন ও রতন। রতনের এক পুত্র কালীচন্দ্র ও দুই কন্যা।

গৌরীশঙ্করের পুত্র শিবচন্দ্র। তৎপুত্র কাশীচন্দ্র। কাশীচন্দ্রের এক পুত্র ও দুই কন্যা। ঘনশ্যামের দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রনারায়ণের কালিকাপ্রসাদ, রামজয় ও রামগঙ্গা নামে তিন পুত্র। কালিকাপ্রসাদের গুরুপ্রসাদ, বিশ্বনাথ, পীতাম্বর ও রামসুন্দর নামে চারি পুত্র এবং জগদম্বা দেবী নামে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। গুরুপ্রসাদের বিবাহ পাইকরহাটীর মাণিকচন্দ্র বিশ্বাসের কন্যা সুলক্ষ্মণা দেবীর সহিত। তাঁহার কাশীপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ নামে দুই পুত্র। কাশীপ্রসাদের বিবাহ শ্রীকণ্ঠদিয়ার কাশীচন্দ্র রায়ের কন্যা কামিনী দেবীর সহিত হয়। তাঁহার একটি পুত্র এবং তিনটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

পীতাম্বর চক্রবর্তীর বিবাহ ভাদরের রবিলোচন ভৌমিকের কন্যা অচলমণি দেবীর সহিত হয়। তাঁহার তনয়--যাদবচন্দ্র, মাধবচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, গোপালচন্দ্র, মদনমোহন ও মোহিনীমোহন।

পীতাম্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী গভর্নমেন্টের নিকট হইতে "রায় বাহাদুর" উপাধি পান। ইনি কোচবিহারের স্টেটজর্জ ছিলেন। কুলশাস্ত্রদীপিকা নামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এবং Indian Native States নামে একখানি ইংরাজি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কুসুম্বিনী, সরোজিনী, সুরেশচন্দ্র, দ্বিজেশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র, নলিনী, শীতেশচন্দ্র, কিরণময়ী, হিরণ্ময়ী, মৃণ্ময়ী ও পরেশ এই ১১টি সন্তান। কুসুম্বিনীর বিবাহ হয় বারাণসী (পুখুরিয়া)--নিবাসী শরৎচন্দ্র সান্যালের সহিত। তিনি এম-এ, বি-এল. রায়বাহাদুর ও জর্জ ছিলেন।

দ্বিজেশচন্দ্রের বিবাহ হয় শ্রীরামপুরের উপেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা অনিন্দিতা দেবীর সহিত। তিনি এম, এ, বি, এল এবং তাঁহার পত্নী অনিন্দিতা দেবীও উচ্চশিক্ষিতা।

শীতেশচন্দ্র ইংলন্ড নিবাসিনী বেবী নাম্নী এক বিবিকে বিবাহ করেন। তিনি বড় ডাক্তার (I.M.S.)।

অনঙ্গমোহনের বিবাহ ভারেঙ্গা-নিবাসী শশীকুমার চৌধুরীয় কন্যা সুধীরাবালার সহিত হয়। তিনি সাব্‌ডেপুটি ছিলেন। শশাঙ্কমোহন এক্ষণে বায়ুরোগগ্রস্ত। বিনোদ মোহনের ক্ষেতুপাড়ার উমাগতি রায়ের কন্যা হেমনলিনী দেবীর সহিত বিবাহ হয়। বিনোদমোহন উকিল ছিলেন।

প্রমোদমোহনের বিবাহ শালিখার যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্যের কন্যা পঙ্কজবাসিনীর সহিত। কালিকাপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র রামসুন্দর খল্লি বাগসাটিয়ার হারাণচন্দ্র ভট্টাচার্যের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার হরসুন্দর, দুর্গাসুন্দর, শ্যামসুন্দর, রমণীসুন্দর, ও রমেশচন্দ্র নামে পাঁচ পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে।

হরসুন্দর প্রথমে শিবপুর নিবাসী বৈকুণ্ঠনাথ মৈত্রের কন্যা বসন্তকুমারী দেবী এবং পরে উদিবাড়ির ফটিকচন্দ্র সান্যালের কন্যা কুমুদিনী দেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহার পূর্ণচন্দ্র, দীনেশচন্দ্র, অনিলচন্দ্র, সুশীলচন্দ্র, নলিনচন্দ্র ও ফণিভূষণ নামে ছয় পুত্র ও একটি কন্যা।

শ্যামসুন্দর পাইকরহাটি নিবাসী মহিমনারায়ণ বিশ্বাসের কন্যা বিরাজমোহিনীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার ছয় সন্তান--খোকা, ক্ষীরোদবাসিনী (স্বামী পেঙ্গুঁয়ার বিমলাচরণ মজুমদার), সুধীর, সুহাসিনী ও অপর দুই কন্যা। রমণীসুন্দর বি এল্ উপাধিধারী। ইনি আমহাটির গঙ্গানারায়ণ রায়ের কন্যা হেমলতাকে বিবাহ করেন। ইঁহার সুদেব ও ভূদেব নামে দুই পুত্র। সৌদামিনীর স্বামী খেতুপাড়া নিবাসী তারানাথ রায়। কুমুদিনীর বিবাহ হয় কাষ্ঠসাংড়ার গোবিন্দনারায়ণ ভট্টাচার্যের সহিত। রমেশচন্দ্র এল, এম, এস, উপাধি প্রাপ্ত ডাক্তার। ইঁহার বিবাহ হয় বারাণসীর গিরিশচন্দ্র সান্যালের কন্যা অক্ষয়াকুমারী দেবীর সহিত। ইঁহার দেবেশ, নরেশ, ভবেশ, গঙ্গেশ ও রণেশ এই পাঁচ পুত্র এবং অপর এক কন্যা।

চন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর মধ্যম পুত্র রামজয়ের কৃষ্ণকুমার ও নন্দকুমার নামে দুই তনয়। কৃষ্ণকুমার পেঙ্গুয়ার কালীনাথ ভাদুড়ীর কন্যাকে বিবাহ করেন। রামজয়ের কনিষ্ঠ সহোদর রামগঙ্গার পাঁচ সন্তান--জগবন্ধু (বিবাহ নটাকোলার রক্ষাকর ভট্টাচার্যের কন্যা), লক্ষ্মীমণি (স্বামী আরালিয়ার রামনাথ মৈত্র), শিবসুন্দরী (স্বামী পেঙ্গুয়ার কাশীচন্দ্র রায়), ত্রিপুরাসুন্দরী (স্বামী সালিখা নিবাসী কৃষ্ণধন মজুমদার) ও প্রসন্নময়ী (স্বামী সালিখা নিবাসী রামধন মজুমদার)।

সিদ্ধশ্রোত্রিয় সিহরীগাঞি—ডেমরার রায়বংশ

পাবনা জেলায় ডেমরার রায়বংশ অতি প্রাচীন বংশ ও মুসলমান রাজত্বকাল হইতে জমিদার। সাঁতৈল রাজ্য লোপের পর নাটোর রাজসরকারের অধীনে এই রায়বংশ জমিদারি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

এই বংশের আদিপুরুষ স্বর্ণদেব ঠাকুর কালী উপাসক ও সাধক ছিলেন। তৎকালে ডেমরার চতুর্দিকে ৩, ৪ ক্রোশ মধ্যে কোন বসতি ছিল না; ক্ষুদ্র 'বড়-হর' নদীর তীরে এই গ্রাম একটি ক্ষুদ্র দ্বীপাকার নির্জন স্থান ছিল। সাধনার উপযুক্ত স্থান বিবেচনায় সস্ত্রীক স্বর্ণদেব ঠাকুর এখানে বাস করেন। পরে বংশধরগণ মুসলমান আমলে ডাকাতি করিয়া পার্শ্ববর্তী বহু স্থান বাহুবলে নিজ দখলে রাখিয়া জমিদারি ভোগ করেন।

স্বর্ণদেব ঠাকুরের তিন পুত্র--জয়ঠাকুর অজয়ঠাকুর ও শিবানন্দঠাকুর। শিবানন্দ-ঠাকুরের পুত্র ভৈরবানন্দ ঠাকুর, তৎপুত্র শ্রীমন্ত ব্রহ্মচারী ও তৎসূত কেশবানন্দ ঠাকুর। কেশবানন্দের পুত্র ভূগর্ভ। ভূগর্ভের তনয় শ্রীগর্ভ ; তৎপুত্র রামচন্দ্র রায়। রামচন্দ্রের চারি সন্তান-- রতিনাথ, রঘুনাথ, মথুরানাথ ও গঙ্গাহরি। মথুরানাথ বশংহীন। রঘুনাথের একপুত্র রূপচন্দ্র রায় ও পাঁচ কন্যা-- শিবাণী, ভবানী, রুদ্রাণী, শর্বাণীও সর্বমঙ্গলা। সাঁতৈলের রাজা রামকৃষ্ণের সহিত রানি শর্বাণীর বিবাহ হয়।

গঙ্গাহরি রায়ের দুই তনয়- কৃষ্ণবল্লভ ও প্রাণবল্লভ। প্রাণবল্লভের পুত্র প্রভুরাম, তৎপুত্র রামগোপাল। রামগোপালের রামলোচন, পদ্মলোচন ও কমললোচন নামে তিন পুত্র। রামলোচন ও পদ্মলোচন বংশহীন। কমললোচনের দুই পুত্র--কৃষ্ণলোচন ও বলরাম। ইঁহারা উভয়েই বংশহীন। কৃষ্ণবল্লভের রামভদ্র ও শুভারাম এই দুইপুত্র। শুভারাম পুত্রহীন। রামভদ্রের পুত্র রামকানু ও শম্ভুরাম। রামকানুর দুই পুত্র--বৈদ্যনাথ ও গগনচন্দ্র। ইঁহারা সন্তানহীন। শম্ভুরামের গৌরীনাথ, রামজয় ও শ্রীনাথ নামে তিন পুত্র। গৌরীনাথের পুত্র গোলকনাথ বংশ হীন। রামজয়ও অপুত্রক। শ্রীনাথের দুই পুত্র— গয়ানাথ ও কাশীনাথ। গয়ানাথ পুত্রহীন। কাশীনাথের তারানাথ ও বিশ্বনাথ নামে দুই পুত্র । তারানাথের ছয় পুত্র,--যোগেন্দ্র, ভোগেন্দ্র, শচীন্দ্র, মণীন্দ্র, কালিদাস ও দেবীদাস। যোগেন্দ্র ও শচীন্দ্র পুত্রহীন। জ্ঞানেন্দ্রের সুকুমার ও সুশীলকুমার এই দুই পুত্র। মণীন্দ্রের দুই পুত্র ---মোহিতকুমার ও মতিলাল। বিশ্বনাথের পুত্র বিধুভূষণ ও বীরেশ্বর। বিধুভূষণ অপুত্রক। বীরেশ্বরের এক পুত্র শঙ্কর বংশহীন।

রতিনাথ রায়ের পুত্র রাঘবেন্দ্র রায়। রাঘবেন্দ্রের তিন পুত্র,--রামজীবন, কৃষ্ণজীবন ও রামদেব। রামজীবনের দুই পুত্র,--রামনারায়ণ ও জয়নারায়ণ। জয়নারায়ণের পুত্র নরনারায়ণ বংশহীন। রামনারায়ণের ছয়পুত্র--রামকান্ত, আত্মারাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, কৃষ্ণগোবিন্দ, রামশঙ্কর ও কৃষ্ণশরণ। রামকান্তের পুত্র রামানন্দ, তৎপুত্র রামকমল, কনকরাম ও কৃপারাম। রামকমল ও কৃপারাম বংশহীন। কনকরামের পুত্র দুর্গাচরণ ও রামদয়াল। রামদয়াল পুত্রহীন। দুর্গাচরণের রজনী ও তার্পিণীকান্ত এই দুই পুত্র। ইঁহারা বংশহীন। আত্মারামের তিন পুত্র--- বিজয়রাম, কেবলকৃষ্ণ ও ভবানী। বিজয়রাম ও ভবানী অপুত্রক। কেবলকৃষ্ণের তনয় আনন্দচন্দ্রও বংশহীন। লক্ষ্মীনারায়ণের শিবনারায়ণ ও কীর্তিনারায়ণ নামে দুই পুত্র। ইঁহারা উভয়েই নিঃসন্তান।

কৃষ্ণগোবিন্দের জয়গোবিন্দ ও রাধাগোবিন্দ এই দুই পুত্র। জয়গোবিন্দের তিন পুত্র--

জগমোহন, শীতল ও প্রাণনাথ। শীতলের পুত্র কাশীদাস পুত্রহীন। জগমোহন ও প্রাণনাথ অপুত্রক। রাধাগোবিন্দের তনয় রাজচন্দ্র, তৎপুত্র শম্ভুচন্দ্র ও যাদবচন্দ্র। যাদবচন্দ্র নিঃসন্তান। শম্ভুচন্দ্রের পুত্র প্রহ্লাদচন্দ্র, তৎপুত্র প্রতাপচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র। প্রতাপচন্দ্রের অঘোর ও নরেশ নামে দুইপুত্র। সুরেশচন্দ্রে পুত্র মুরারি।

রামশঙ্কর সন্তানহীন। কৃষ্ণশরণের চারি সন্তান--রামনিধি, জগন্নাথ, ভৈরবনাথ ও জয়নাথ। ভৈরবনাথ বংশহীন। জগন্নাথের একমাত্র পুত্র কৃপানাথও নিঃসন্তান। রামনিধির পুত্র রামরত্ন ও কালীকমল। কালীকমল নিঃসন্তান। রামরত্নের তিন তনয়--রামগতি, কৃষ্ণগতি ও দুর্গাগতি। ইহারা তিন জনই বংশহীন। জয়নাথের পুত্র জগচ্চন্দ্র, তৎপুত্র মহিমাচন্দ্র। তাঁহার উপেন্দ্রনাথ, মন্মথনাথ, কৃষ্ণনাথ ও মণীন্দ্রনাথ এই চারি পুত্র। উপেন্দ্র ও মন্মথ পুত্রহীন। কৃষ্ণেন্দ্রনাথের পাঁচ পুত্র--অমরেন্দ্র, রণেন্দ্র, তেজেন্দ্র, জিতেন্দ্র ও সতীশ।

রাঘবেন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণজীবনের প্রাণকৃষ্ণ, বিষ্ণুরাম ও শ্যামরাম এই তিন তনয়। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র অনুপনারায়ণ। অনুপনারায়ণের চারি পুত্র--কৃষ্ণকান্ত, রাধাকান্ত, গোপীকান্ত ও রাধানাথ। কৃষ্ণকান্তের রুদ্রকান্ত, রামসুন্দর, নবকান্ত, কৃষ্ণমোহন ও কালীমোহন এই পাঁচ পুত্র। রুদ্রকান্তের পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ, তৎপুত্র গিরিশনারায়ণ বংশহীন। রামসুন্দরের কৃষ্ণসুন্দর ও হরানন্দ এই দুই পুত্র। হরানন্দ বংশহীন। কৃষ্ণসুন্দরের পুত্র বসন্তকুমার, তৎপুত্র জগন্নাথ ও বলরাম। নবকান্তের একমাত্র পুত্র কাশীকান্ত বংশহীন। কৃষ্ণমোহনের মনোমোহন ও ভুবনমোহন নামে দুই পুত্র। মনোমোহনের দুইপুত্র মোহিনীমোহন ও শশীমোহন। শশীমোহনের পুত্র পার্বতীমোহন। মোহনীমোহনের মাতঙ্গিনী নামে এক কন্যা। ইঁহার স্বামীর নাম মাধবীলাল গোস্বামী। ভুবনমোহনের পাঁচ পুত্র--প্যারীমোহন, শরচ্চন্দ্র, যজ্ঞেশ্বর, রমণীমোহন ও প্রমথনাথ। যজ্ঞেশ্বর গ্রামস্থ ভিন্ন গোত্রের জগচ্চন্দ্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইঁহার পুত্র শৈলেন্দ্র। ভুবনমোহনের অপর চারি পুত্র বংশহীন।

অনুপনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র রাধাকান্ত রাধামোহনকে দত্তক গ্রহণ করেন। রাধামোহন বংশহীন। গোপীকান্তের তিন পুত্র--প্রাণকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত ও উমাকান্ত। প্রথম দুই জন বংশহীন। উমাকান্তের পুত্র চন্দ্রকান্ত ও রুক্মিণীকান্ত। রুক্মিণীকান্তের তিন পুত্র--নলিনীকান্ত, গিরিজাকান্ত ও হেমচন্দ্র, তৎপুত্র রাধানাথের হরনাথ ও শিবনাথ নামে দুই পুত্র। শিবনাথ পুত্রহীন। হরনাথের রাজেন্দ্র ও হরেন্দ্র নামে দুইটি ঔরসপুত্র এবং শ্যামসুন্দর নামে এক দত্তকপুত্র। ইঁহার তিন জনই বংশহীন।

কৃষ্ণজীবনের দ্বিতীয় তনয় বিষ্ণুরামের পুত্র আন্দিরাম। তৎপুত্র কমলাকান্ত ও কালীকান্ত। কালীকান্তের কালীচন্দ্র, হরচন্দ্র, চন্দ্রনাথ ও কালীমঙ্গল এই চারি সন্তান। কালীচন্দ্রের পুত্র কালীসুন্দর ও দুর্গাসুন্দর। ইঁহারা বংশহীন। চন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র গঙ্গানাথ বংশহীন। হরচন্দ্র ও কালীমঙ্গল নিঃসন্তান। কমলাকান্তের তিন পুত্র--কাশীচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও কালীভৈরব। কালীভৈরব বংশহীন। শিবচন্দ্রের পুত্র গদাধর, তৎপুত্র দুর্গাপ্রসন্ন, তৎপুত্র দীনেশ, সুরেশ ও রমেশ। দীনেশচন্দ্র বংশহীন। সুরেশের পুত্র সুখদাপ্রসন্ন। কাশীচন্দ্রের পাঁচপুত্র--ঈশ্বরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ও মাধবচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রের একমাত্র পুত্র ঈশানচন্দ্র বংশহীন। মহেশচন্দ্র এবং কেশবচন্দ্রও বংশহীন। গিরিশচন্দ্রের শ্যামাচরণ, যোগেশচন্দ্র ও সারদাচরণ এই তিন পুত্র। সারদাচরণ সন্তানহীন। যোগেশচন্দ্রের

জ্যোতিষচন্দ্র ও ক্ষিতীশচন্দ্র এই দুই পুত্র। শ্যামাচরণের চারি পুত্র--সতীশচন্দ্র, জিতেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ। সতীশচন্দ্রের পুত্র অনিলচন্দ্র। নধরচন্দ্রের তিনপুত্র--কালীকুমার, রোহিণীকুমার ও মহিম। কালীকুমার অপুত্রক। রোহিণীকুমারের সূর্যকুমার, বিনয়কুমার ও অশ্বিনীকুমার নামে তিন পুত্র। মহিম বাঁশিলার স্বর্ণময়ী কর্তৃক দত্তক গৃহীত হন।

কৃষ্ণজীবনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্যামরামের সদাশিব ও শম্ভুনাথ নামে দুই পুত্র। শম্ভুনাথের পুত্র কৃষ্ণকুমার, তৎপুত্র আনন্দচন্দ্র বংশহীন। সদাশিবের দুইপুত্র--কালীনাথ ও কৃষ্ণনাথ। কালীনাথ নিঃসন্তান, কৃষ্ণনাথের পুত্র দুর্গানাথ ও রামপ্রসাদ। দুর্গানাথের পুত্র গুরুগোবিন্দ ও হরগোবিন্দ। রামপ্রসাদের পুত্র মাণিকগোবিন্দ।

রাঘবেন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রামদেবের তিন সন্তান,--হরিকৃষ্ণ, হরিদেব ও হরিনারায়ণ। হরিকৃষ্ণের পুত্র রামকৃষ্ণ, তৎসুত গৌরীপ্রসাদ। ইঁহার হরকান্ত, কেদারনাথ, কালীকুমার ও চন্দ্রকুমার এই চারি ঔরসপুত্র এবং দীনবন্ধু নামে এক দত্তক পুত্র। ঔরসপুত্রগণ বংশহীন। দত্তক দীনবন্ধুর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথের নগেন্দ্র, যতীন্দ্র ও পূর্ণেন্দ্র এই তিন পুত্র। পুর্ণেন্দ্রর তিন পুত্র--সমরেন্দ্র, টিকেন্দ্র ও বীরেন্দ্র।

হরিদেবের পুত্র রমাকান্ত। তৎপুত্র শ্রীকান্ত, কালাচাঁদ ও ভীমচন্দ্র। কালাচাঁদের পুত্র গোবিন্দ বংশহীন। ভীমচন্দ্রের চারি পুত্র,--ভৈরব, বিজয়, কৈলাস ও প্রসন্ন। ভৈরবের সুত বসন্ত সন্তানহীন। বিজয়ের গিরিবালা নাম্নী এক কন্যা। গিরিবালার তিন তনয়--সতীশ, ক্ষিতীশ ও চারু তালুকদার। কৈলাস ও প্রসন্ন বংশহীন। শ্রীকান্তের শ্রীধর, রত্নকান্ত, করুণাকান্ত ও গুরুচরণ এই চারি তনয়। শ্রীধর ও করুণাকান্ত বংশহীন। রত্নকান্তের একমাত্র সুত কালীরত্নও বংশহীন। গুরুচরণের সাত সন্তান--বামাচরণ, গোপালচন্দ্র, ভবানীচরণ, অম্বিকাচরণ, অন্নদাচরণ, কামদা ও প্রাণদাচরণ। বামাচরণের শিশিরকুমার নামে এক পুত্র। গোপালচন্দ্রের এক সুত ব্রজেন্দ্র। ভবানীচরণের সুত ভবেশ। অম্বিকাচরণের অতুল নামে একপুত্র। অন্নদাচরণের তিন পুত্র,--অনুকূল, অনিল ও অরবিন্দ। কামদাচরণ সন্তানহীন।

হরিদেব সহোদর হরিনারায়ণের পুত্র হরিশ্চন্দ্র, তৎপুত্র কাশীশরণ। ইঁহার জগবন্ধু, কালীবন্ধু, ও মুকুন্দবন্ধু এই তিন সন্তান। কালীবন্ধু ও মুকুন্দবন্ধু বংশহীন। জগবন্ধুর তিন পুত্র--মধুসূদন, বৈকুণ্ঠনাথ ও ভোলানাথ। মধুসূদনের পুত্র শশধর ও অমূল্য। বৈকুণ্ঠনাথের চারি তনয়, যথা--মতিলাল, জ্ঞানেন্দ্র, মণীন্দ্র ও জিতেন্দ্র। ভোলানাথের ভূপেন্দ্র ও গিরীন্দ্র নামে দুই পুত্র।

সিদ্ধশ্রোত্রিয়--নন্দনবাসী গাঞি-(টুটহলা) খোঁড়াচার্য বংশ

টুটহলার খোঁড়াচার্যের দুই পুত্র--মাহি ওঝা ও ত্রিলোচন হাজরা। মাহি ওঝার জয়দেব ও হরিদেব নামে দুই পুত্র। জয়দেবের দুই পুত্র--শ্রীধর ও নরসিংহ। শ্রীধরের পুত্র অনন্ত, দৈত্যারি, অশুভ, রক্ষিত ও শঙ্কিত। অনন্তের পুত্র মাধব। তৎপুত্র লম্বোদর এবং তাহার পুত্র গোবিন্দ আচার্যসিংহ। গোবিন্দের বাচস্পতি ভট্টাচার্য ও বিদ্যালঙ্কার নামে দুই পুত্র। বাচস্পতির দুই পুত্র ভবানন্দ ও বাণীনাথ চক্রবর্তী। ভবানন্দের রতিনন্দন, কাশীনাথ ও মধুসূদন নামে তিন পুত্র এবং বাণীনাথের নীলকণ্ঠ নামে এক পুত্র। রতিনন্দনের চারি পুত্র ---গঙ্গারাম, শ্রীরাম, বিষ্ণুদেব এবং রামনারায়ণ। গোবিন্দাচার্যের দ্বিতীয় পুত্র বিদ্যালঙ্কারের কন্দর্প ও রামনারায়ণ নামে দুই পুত্র।

জয়দেবের দ্বিতীয় পুত্র নরসিংহের গঙ্গাধর ও ত্রিবিক্রম নামে দুই পুত্র। ত্রিবিক্রমের চারি পুত্র--সুরত্ন, ভরত, কেশব ও পরাশর। সুরত্নের পুত্র বাসুদেব পণ্ডিত ও তৎপুত্র রঘুনাথ আচার্য। রঘুনাথের তিনপুত্র--ষষ্ঠীদাস আচার্য, রমণ চক্রবর্তী ও জগন্নাথ আচার্য। ষষ্ঠীদাসের পুত্র শ্রীরাম চক্রবর্তী এবং তৎপুত্র রতিনাথ চক্রবর্তী। রমণ চক্রবর্তীর ভবানীদাস চক্রবর্তী নামে এক পুত্র।

শ্রীধরের দ্বিতীয় পুত্র দৈত্যারির মুক্তিধর নামে একপুত্র। মুক্তিধরের পুত্র নারায়ণ এবং তৎপুত্র কৃষ্ণানন্দ। কৃষ্ণানন্দের রামচন্দ্র, লক্ষ্মীকান্ত, কালীকান্ত ও জগন্নাথ আচার্য নামে চারি পুত্র। লক্ষ্মীকান্তের চন্দ্রশেখর, রঘুনাথ ও রতিনাথ নামে তিন পুত্র। চন্দ্রশেখরের বিশ্বনাথ নামে এক পুত্র। বাণীকান্তের রত্নেশ্বর, গঙ্গাহরি ও বিষ্ণুদেব নামে তিন পুত্র। রত্নেশ্বরের পাঁচ পুত্র--গোপীনাথ, যদুনাথ, মধুসূদন, অমরনাথ ও অনন্তরাম।

শ্রীধরের চতুর্থ পুত্র রক্ষিতের কানাই, বামনাই ও ধরণীধর নামে তিন পুত্র। বামনাইয়ের দ্বিজরাজ নামে এক পুত্র। দ্বিজরাজের চারি পুত্র--সহদেব, বিশ্বনাথ, ভিক্ষাকর ও কংসারি। সহদেবের বিরূপাক্ষ সমাদ্দার ও কমলাকান্ত নামে দুই পুত্র। বিরূপাক্ষের বেদগর্ভ ও ভূগর্ভ নামে দুই পুত্র। বেদগর্ভের পুত্র সাধু সমাদ্দার, তৎপুত্র গোবিন্দ। ভূগর্ভের গোপীকান্ত ও চণ্ডীদাস নামে দুই পুত্র।

শ্রীধরের কনিষ্ঠ পুত্র শঙ্কিতের বৎস নামে এক পুত্র। তাহার পুত্র ঠাকুর লঙ্কা। তৎপুত্র কুলপতি ও তৎপুত্র নরহরিসিংহ। নরহরির নিতাই, মাধাই ও রামভদ্র নামে তিন পুত্র। তাহার রাঘব সরখেল নামে এক পুত্র। রাঘবের তিন পুত্র--রামকৃষ্ণ, শিব ও মহেশ।

সহদেবের দুই পুত্র হিরণ্য ও গুণার্ণব। হিরণ্যের পুত্র চরণ ভট্টাচার্য। তৎপুত্র হলধর। তৎপুত্র সারঙ্গধর; তৎপুত্র বারকড়ি; তৎপুত্র রাজধর; তৎপুত্র জগন্নাথ; তৎপুত্র শ্রীহরি; তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ; তৎপুত্র রামচন্দ্র এবং তাঁহার পুত্র মহেশ্বর মহেশ্বরের চারি পুত্র--রতিনাথ, বিশ্বনাথ, দেবীদাস ও গণেশ। রতিনাথের তিন তনয়--রূপনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ ও শ্রীনারায়ণ। রূপনারায়ণের তিন তনয়—নরনারায়ণ, শ্যামনারায়ণ ও বীরনারায়ণ।

গঙ্গানারায়ণের দুই তনয়--বিশ্বনাথ ও দেবীদাস। দেবীদাসের দুই তনয় বাসুদেব ও বেণী সরকার। বাসুদেব সরকারের ১ম পক্ষে রাজারাম, হরিবল্লভ ও কৃষ্ণরাম এবং ২য় পক্ষে রামেশ্বর নামে চারি তনয় জন্মগ্রহণ করেন। রাজারামের রামরাম নামে এক তনয়। রামরামের রামভদ্র, দয়ারাম, শিবরাম, সীতারাম, শম্ভুরাম ও শ্যামরাম নামে ছয় তনয়। রামভদ্রের কমলাকান্ত নামে এক তনয়। ইনি প্রথমে পাইতের পরে পাঁচুমরিয়া আসিয়া বাস করেন।

সিদ্ধশ্রোত্রিয়—নন্দনাবাসী গাঁঙ্গি (ঢাকোপাড়া) বিনায়ক বংশ

এই বংশের বিনায়ক হইতেছেন বীজপুরুষ। তাঁহার দুইপুত্র--দেবপতি ও নরপতি। দেবপতির পুত্র—গজপতি ও অশ্বপতি। গজপতি প্রথমে ঢাকোপাড়া গিয়া বসতি স্থাপন করেন। গজপতির পুত্র ত্রিবিক্রম ও অশ্বপতির পুত্রের নাম গাছা। ত্রিবিক্রমের হানাই ওঝা ও কবিবল্লভ নামে দুই পুত্র। কবিবল্লভের পুত্র দামোদর। তৎপুত্র উৎসাকর ও তৎপুত্র নরসিংহ। নরসিংহের দুইপুত্র--মাধব ও কুবের পাঠক। মাধবের দুই পুত্র--দুর্লভ ও হৃষিপণ্ডিত। দুর্লভের মাঙ্গানি ও শ্রীগর্ভ নামে দুই পুত্র। মাঙ্গানির দুই পুত্র--লক্ষ্মীনাথ ও

ভোলানাথ। লক্ষ্মীনাথের প্রভুরাম, ভবানী ও শ্রীরাম নামে তিন পুত্র। প্রভুরামের রামেশ্বর নামে এক পুত্র।

এদিকে কুবের পাঠকের সুলোচন, গোপীনাথ আচার্য ও লোকনাথ নামে তিন তনয়। সুলোচনের চারি পুত্র--নিতাই, বসন্ত রায়, রঘুনাথ আচার্য ও বৈদ্যনাথ। বসন্ত রায়ের ১ম পক্ষে জগৎনারায়ণ ও শ্রীনারায়ণ এবং ২য় পক্ষে রামনারায়ণ চৌধুরী ও রতিরাম নামে চারি পুত্র। জগৎনারায়ণের শ্যামনারায়ণ ও কৃষ্ণচরণ; শ্রীনারায়ণের গোপাল ও মাধব এবং রামনারায়ণের ১ম পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ এবং ২য় পক্ষে জয়কৃষ্ণ নামে দুই পুত্র। বৈদ্যনাথের গঙ্গানারায়ণ, জয়রাম চক্রবর্তী ও গঙ্গাহরি চক্রবর্তী নামে তিন পুত্র। জয়রামের দুই পুত্র--জয়কৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ।

গোপীনাথ আচার্যের জীবানন্দ আচার্য, বাসুদেব আচার্য, মধুসূদন, মঙ্গল, মধুকণ্ঠ ও রাজেন্দ্র নামে ছয় পুত্র। মধুসূদনের ভিক্ষাকর নামে এক তনয়। তৎসুত গোবিন্দ। মঙ্গলের চারিপুত্র--রামভদ্র, জগদীশ, বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ। রামভদ্রের রামেশ্বর, রামনাথ, প্রভুরাম, কালিদাস ও গৌরীদাস নামে পাঁচপুত্র। মধুকণ্ঠের গণেশ ভট্ট নামে এক পুত্র।

রাজেন্দ্রের জনার্দন চক্রবর্তী নামে এক তনয়। তাঁহার দুই পুত্র--রাজারাম ও রামভদ্র। রাজারামের কৃষ্ণজীবন, রামবল্লভ ও সীতারাম নামে তিন পুত্র। কৃষ্ণজীবনের দর্পনারায়ণ, শিবনারায়ণ ও বৈদ্যনাথ নামে তিন পুত্র। দর্পনারায়ণের দুই পুত্র--সূর্যনারায়ণ ও রামমোহন। শিবনারায়ণের শিবপ্রসাদ, গৌরীপ্রসাদ, রামনিধি ও নিলু নামে চারি তনয়। রামনিধির রাধানাথ ও রাজচন্দ্র নামে দুই তনয়। রাজচন্দ্রের ঈশানচন্দ্র নামে এক তনয়।

লোকনাথের নবীন নামে এক তনয়। নবীনের ১ম পক্ষে শ্রীমুখ ও সম্বুবারি এবং ২য় পক্ষে বাণীনাথ আচার্য, রূপনাথ আচার্য ও ভবানী নামে তিন তনয়। শ্রীমুখের যাদব ও রাসমণি নামে দুই তনয়। সম্বুবারির পীতাম্বর, দেবীদাস ও কাল নামে তিন তনয়। পীতাম্বরের চারি তনয়--পদ্মনাভ, পুরুষোত্তম, লক্ষ্মীনারায়ণ ও গণেশ। বাণীনাথের দুই তনয়--ভারতীদাস ও রাজকৃষ্ণ। রূপনাথের চাঁদ, যদুনাথ, কার্তিক ও অনন্তরাম নামে চারি তনয়। ভবানীর কৃপাময় নামে এক তনয়।

চম্পটি গাঞি শেখর হাজরা ও মাধবের বংশ

এই বংশের বীজপুরুষ মাধবের পুত্র অভিমন্যু। তৎপুত্র বৎস চম্পটি ও বল্লভ ভাড়িয়াল। বৎস চম্পটির আট সন্তান,--অজ (পিপলিয়া), পজ, মনু, মার্কণ্ড প্রভৃতি পজের তিন সন্তান। রাম, মেরু ও কালিশী ওজা (বিশী)। রামের পুত্র বররুচি, তৎপুত্র শেখর ওঝা হাজরা ও শ্রীকান্ত ওঝা (মৎস্যাশী)। শেখর ওঝার বাসুদেব, দেবানন্দ ও হরিহর এই তিন পুত্র। বাসুদেবের পুত্র ধৃতিকর অগ্নিহোত্রী। তৎপুত্র আনুআই, পদুয়াই ও বামনাই। আনুয়াইর তিন পুত্র,--ঈশান পাঠক, উমাপতি পাঠক ও শিবাচার্য (শিমুলিয়া গ্রাম শাসন)। ঈশান পাঠকের পাঁচ সন্তান--সুরোত্তম পাঠক, নরোত্তম, অর্জুন মিশ্র (পাঁচপাড়া), ভরত আচার্য ও হরিহর পাঠক।

ধৃতিকরের দ্বিতীয় পুত্র পদুয়াইর পুত্র হলায়ুধ ভট্টাচার্য, তৎপুত্র বিশ্বম্ভর, তৎপুত্র রাম মিশ্র, শ্রীকান্ত ও রাঘব। শ্রীকান্তের তিন সন্তান মধুসূদন, রত্নগর্ভ ও সুলোচন। রত্নগর্ভের পুত্র বিদ্যানাথ ও রাঘব। রাঘবের পুত্র হিরণ্যগর্ভ।

পদুয়াইর সহোদর বামনাইয়ের তিন পত্নী। প্রথম পক্ষে শুভাই, সরুয়াই, গঙ্গাধর, মুক্তিধর, নিতাই, দুর্গাবর, শ্রীপতি ও মানাই আট সন্তান; দ্বিতীয় পক্ষে শশীধর, ভূধর ও হলধর এই তিন সন্তান এবং তৃতীয় পক্ষে শুক্লাম্বর, দিগম্বর ও মহীধর এই তিন পুত্র। ভূধরের পুত্র পরমানন্দ মিশ্র, তৎপুত্র কংসারি আচার্য ও মহেশ ব্রহ্মচারী। শশীধরের পুত্র শুভঙ্কর, তৎপুত্র পরমেশ্বর মিশ্র; তৎপুত্র কৃষ্ণাচার্য ও গৌরীনাথ ভট্টাচার্য। কৃষ্ণাচার্যের পুত্র কমল ও তৎপুত্র রামেশ্বর। গৌরীনাথের রঘুনাথ, রামচন্দ্র, শ্রীহরি বিদ্যালঙ্কার, নরহরি পাঠক ও রামচন্দ্র আচার্য এই পাঁচ সন্তান। রঘুনাথের পুত্র হরিরাম। রামচন্দ্র আচার্যের তিন পুত্র, —গণেশ, বংশী ও মহেশ। গণেশের পুত্র রাজেন্দ্র ও রত্নেশ্বর। রাজেন্দ্রের তনয় রূপরাম।

শুক্লাম্বরের দুই পুত্র জগাই ও গোপীনাথ। জগাইর পুত্র শ্রীমন্ত ও সুন্দর। শ্রীমন্তের পুত্র গোবিন্দ, তৎসুত গোপীরমণ ও তৎপুত্র কৃষ্ণচরণ, সুন্দরের পুত্র রঘুনাথ, তৎপুত্র নারায়ণ ও তৎপুত্র নরসিংহ।

গোপীনাথের পুত্র মঙ্গল মাঝি ও শতানন্দ, মঙ্গল মাঝির পুত্র বৈদ্যনাথ ও কৃষ্ণাই। বৈদ্যনাথের তিন সন্তান শ্রীমুখ, শ্রীপতি ও শিবানন্দ। শ্রীমুখের পুত্র চণ্ডীদাস ও রামচরণ। চণ্ডীদাসের তনয় হরিনারায়ণ। তৎপুত্র জয়কৃষ্ণ, বিশ্বনাথ ও কৃষ্ণদেব। জয়কৃষ্ণের পুত্র দয়ারাম। তৎপুত্র নন্দকিশোর, যুগলকিশোর ও কৃষ্ণগোবিন্দ।

শ্রীপতির দুই সন্তান,--গোপালপ্রসাদ চৌধুরী ও রামচরণ চৌধুরী। গোপালপ্রসাদের পুত্র রামকানু বিশ্বাস। তৎপুত্র কৃষ্ণজীবন, কৃষ্ণদেব, মোহনকৃষ্ণ ও যাদুরাম। কৃষ্ণজীবনের পুত্র জয়দেব ও শুকদেব। জয়দেবের পুত্র আন্দীরাম ও রামবল্লভ। আন্দীরামের পুত্র রামোত্তর ও রামকৃষ্ণ। রামবল্লভের পুত্র বাঁধু বানিয়াদি বাস করেন।

শ্রীপতির দ্বিতীয় সন্তান রামচরণ চৌধুরীর দুই পুত্র রামগোবিন্দ ও কৃষ্ণরাম। রামগোবিন্দের তনয় সৃষ্টি ও রামনাথ। সৃষ্টির পুত্র দুলাল। ইনি সিমুলিয়া গণকপাড়ায় বসতি করেন।

কংসারি আচার্যের পুত্র রামভদ্র তর্কবাগীশ। ইঁহার প্রথম পক্ষে তিন সন্তান,-- পুরুষোত্তম চক্রবর্তী, বাণীনাথ চক্রবর্তী ও যদুনাথ চক্রবর্তী। ইঁহার দ্বিতীয় পক্ষে বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য, হৃষিকেশ চক্রবর্তী ও উমানন্দ চক্রবর্তী এই তিন সন্তান। যদুনাথের পুত্র লক্ষ্মণ ও মোহন। লক্ষ্মণের তিন পুত্র,--নরসিংহ, জয়হরি ও বিষ্ণু।

হৃষিকেশ চক্রবর্তীর রঘুপতি, জানকীনাথ ও রতিকান্ত এই তিন সন্তান। জানকীনাথের দুই পুত্র রামদেব ও রামানন্দ। রতিকান্তের পুত্র রাধাকান্ত। রঘুপতির চারি পুত্র,--রাজেন্দ্র চক্রবর্তী, দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, জয়দেব চক্রবর্তী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। রাজেন্দ্রের পুত্র নরসিংহ, রামনাথ, শ্রীরাম ও রামজীবন। দেবীপ্রসাদের পুত্র রামনারায়ণ, রামচন্দ্র, হরিদেব ও মহাদেব। মহাদেবের পুত্র সর্বেশ্বর ও জয়দেবের পুত্র রামনাথ; বিশ্বনাথের পুত্র রবিলোচন।

মহেশ ব্রহ্মচারীর পুত্র দামোদর আচার্য। তৎপুত্র গণেশ চক্রবর্তী, গণেশের পুত্র রামশঙ্কর। বিশ্বনাথের দুই পুত্র দুর্গারাম ও রামগোপাল। দুর্গারামের পুত্র কৃষ্ণহরি।

সুরোত্তম পাঠকের দুই সন্তান,--অনিরুদ্ধ পণ্ডিত ও অব্যয় পণ্ডিত। অনিরুদ্ধ পণ্ডিতের প্রথম পক্ষে দুইটি ও দ্বিতীয় পক্ষে দুইটি সন্তান। প্রথম পক্ষের সন্তানদ্বয়ের নাম শ্রীনাথ কারফরমা ও বাসুদেব কারফরমা এবং দ্বিতীয় পক্ষের দুই পুত্রের নাম গোপাল কবিরাজ ও নবাই তলাপাত্র।

রামবল্লভের পুত্র রামরুদ্র, তৎসুত মৃত্যুঞ্জয়, তৎসুত জানকীনাথ, তৎসুত রামরতন, তৎসুত লোকনাথ ও তৎসুত দুর্গাচরণ।

শ্রীনাথ কারফরমার পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ, তৎসুত রূপচন্দ্র ও শ্রীরাম রায়। বাসুদেব কারফরমার পুত,--শ্রীচন্দ্র খাঁ, অনন্ত কারফরমা, রমানাথ কারফরমা ও কেশব। শ্রীচন্দ্রের প্রথম পক্ষে সতানন্দ রায় ও গজেন্দ্র রায় নামে দুইটি এবং দ্বিতীয় পক্ষে জগদানন্দ রায়, গন্ধর্ব রায়, কন্দর্প রায় ও মুকুন্দ রায় নামে চারিটি সন্তান। সতানন্দের পুত্র ভবানন্দ তৎপুত্র শ্রীপতি, তৎসুত জগদানন্দ ও সুবুদ্ধি। জগদানন্দের পুত্র বাসুদেব বিদ্যালঙ্কার, তৎপুত্র শিবরাম তর্কবাগীশ ও রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী। শিবরামের পুত্র রঘুদেব, রামনাথ, রাজীব, রামদেব ও বিনোদ পাঠক। বিনায়কের পুত্র শ্রীনাথ, তৎপুত্র গোপীনন্দন ও তৎপুত্র পরশুরাম।

সুবুদ্ধি রায়ের চাঁদ রায়, রাম রায় ও কৃষ্ণবল্লভ। কৃষ্ণবল্লভের পুত্র রঘুদেব, জয়দেব, হরিদেব ও নরসিংহ। রঘুদেবের পুত্র রামবল্লভ। নরসিংহের পুত্র হরিকৃষ্ণ, ইনি বনগ্রামে বাস করেন। হরিদেবের তিন সন্তান,--প্রেমনারায়ণ, সনাতন ও রামনারায়ণ। প্রেমনারায়ণের তনয় রামচন্দ্র। রামনারায়ণের তনয় কৃষ্ণদেব। সনাতনের পুত্র রাধাকৃষ্ণ। তৎপুত্র রাজকৃষ্ণ, লোচন ও শ্যামাচরণ। রাজকৃষ্ণের পুত্র রামকুমার।

জয়দেবের রামেশ্বর, রত্নেশ্বর, রামদেব, ভীমনারায়ণ ও প্রাণকৃষ্ণ এই পাঁচটি সন্তান। রামেশ্বরের তনয় সূর্যনারায়ণ, তৎপুত্র দেবীপ্রসাদ, তৎপুত্র গৌরীপ্রসাদ। রত্নেশ্বরের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র, তৎসুত শীতল ও নিহাল। রামদেবের পুত্র কৃষ্ণকান্ত। কৃষ্ণকান্তের লক্ষ্মীকান্ত ও কমলাকান্ত এই দুই তনয়। ভীমনারায়ণের রামপ্রসাদ, বাঞ্ছারাম ও আনন্দীরাম নামে তিন সন্তান।

শ্রীচন্দ্র খাঁর দ্বিতীয় তনয় গজেন্দ্র রায়ের দুই সুত হরিশ্চন্দ্র ও চাঁদ। চাঁদের পুত্র হরিচরণ ও রামগোপাল। হরিচরণের তনয় রামনাথ, তৎপুত্র রঘুদেব, তৎসুত জয়দেব।

শ্রীচন্দ্রের অপর সন্তান গন্ধর্ব রায়ের ছত্র রায় ও মদন নামে দুই পুত্র। ছত্র রায়ের দুই তনয় গোপাল ও কৃষ্ণবল্লভ।

গন্ধর্ব রায়ের সহোদর কন্দর্পের পুত্র গোবিন্দ, তৎপুত্র রামচন্দ্র ও অব্যয় পণ্ডিত। অব্যয় পণ্ডিতের তিন সন্তান--হিরণ্য, গুণার্ণব ও চতুর্ভূজ। গুণার্ণবের পাঁচ সন্তান,--জানকীবল্লভ, কেশব, ভুবন, নিরঞ্জন ও শ্রীচন্দ্র। জানকীবল্লভের পুত্র জিতামিত্র। তৎপুত্র গৌরীকান্ত, গোপীকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত। গোপীকান্তের পুত্র, রামচরণ। গৌরীকান্তের সুত রামনাথ, তৎসুত রবিলোচন ও কৃষ্ণদেব। রবিলোচনের প্রথম পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ও দ্বিতীয় পক্ষে নীলকণ্ঠ নামে দুই সন্তান। কৃষ্ণদেবের দুই পক্ষে চারিটি সন্তান--প্রথম পক্ষে নন্দরাম ও শুকদেব এবং দ্বিতীয় পক্ষে শ্রীরাম ও হরিরাম।

জিতামিত্রের কনিষ্ঠ সন্তান লক্ষ্মীকান্তের, রামকৃষ্ণ ও রাঘব এই দুই তনয়। রাঘবের পুত্র রাধাবল্লভ বৈষ্ণব ও নরোত্তম বৈষ্ণব। রাধাবল্লভের পুত্র খেলারাম বৈষ্ণব, ভুবন বৈষ্ণব, শ্রীধর বৈষ্ণব ও বল্লভ বৈষ্ণব। ভুবনের দুই পুত্র গঙ্গাধর চৌধুরী ও পরমানন্দ রায়। গঙ্গাধরের তিন সন্তান--শ্রীরাম, বসন্তরাম ও শিবরাম। বসন্তরামের সুত চাঁদ রায়। শ্রীরামের সুত গন্ধর্ব রায়, তৎসুত রামকান্ত, রামগোপাল ও রামদেব। রামকান্তের পুত্র বীরনারায়ণ। রামগোপালের সুত রামগোবিন্দ, শুকদেব ও মনোহর। রামদেবের প্রথম পক্ষে রঘুদেব ও দ্বিতীয় পক্ষে জয়দেব এই দুই সন্তান। রঘুদেবের তনয় কৃষ্ণকান্ত ও

মহাদেব। জয়দেবের তনয় বড়ু রায়। ইনি কৃষ্ণপুরে বাস করেন।

গঙ্গাধর-সহোদর পরমানন্দ রায়ের দুই তনয় রাজেন্দ্র ও নিরঞ্জন। নিরঞ্জন-সুত বাসুদেব পুরুষোত্তম পাঠক। পুরুষোত্তমের দুই পক্ষে দুইটি সন্তান,--যুধিষ্ঠির ও দুর্গাবর। যুধিষ্ঠিরের পুত্র শ্রীকর কবিশেখর ও বিনায়ক পাঠক। শ্রীকরের পাঁচ পুত্র--যদুনন্দন, সুবুদ্ধি মিশ্র, দামোদর, রঘুনন্দন ও কবিচন্দ্র। দুর্গাবরের পুত্র প্রসাদ ও ছকড়ি। প্রসাদের পুত্র অমোঘ আচার্য, তৎপুত্র বংশীবদন, তৎসুত কামদেব ভট্টাচার্য। কামদেবের প্রথম পক্ষে শ্রীরাম বিদ্যাবাগীশ ও শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য নামে দুই সন্তান এবং দ্বিতীয় পক্ষে গঙ্গাধর ও গোবিন্দ ভট্টাচার্য নামে দুই সন্তান। শ্রীরাম বিদ্যাবাগীশের পুত্র গোপীবল্লভ। শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের ছয় সন্তান--গৌরীচরণ, ত্রিপুরারি দাস, রামনারায়ণ, হরিনারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণ সার্বভৌম ও চন্দ্রনারায়ণ। গৌরীচরণের দুই তনয়--মহাদেব ও জয়দেব। মহাদেবের পুত্র নন্দকিশোর, রামচরণ ও শ্রীরাম। রামনারায়ণের পুত্র রঘুনন্দন।

হরিনারায়ণের প্রথম পক্ষে রামদেব নামে এক সন্তান ও দ্বিতীয় পক্ষে রামচন্দ্র ও রামগোপাল নামে দুই সন্তান। ইন্দ্রনারায়ণ সার্বভৌমের পাঁচ পুত্র,--রামনাথ, রঘুরাম, ঘনশ্যাম, রামজীবন ও রুদ্ররাম। চন্দ্রনারায়ণের গোবিন্দরাম ও জয়রাম এই দুই পুত্র।

দুর্গাবরের অপর তনয় ছ'কড়ির শক্তিধর নামে এক পুত্র। শক্তিধরের চারি সন্তান,--নন্দন, দৈবকীনন্দন, যদুনন্দন ও রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের পুত্র রাঘব। রাঘবের সন্তান রুদ্রদাস ও শিবদাস। যদুনন্দনের তিন তনয়--কেশব ভট্টাচার্য, গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য ও কুশল তলাপাত্র। কেশবের পুত্র রামভদ্র চক্রবর্তী। গঙ্গাদাসের তনয় রত্নেশ্বর চক্রবর্তী। কুশলের তিন সন্তান--রামানন্দ, রমাপতি ও নরোত্তম। রমাপতির গোপাল ও বঁধু এই দুই তনয়।

কামদেব ভট্টাচার্যের অপর পুত্র গঙ্গাধরের তিন সন্তান--রাজীব, রামেশ্বর ও রমাকান্ত। রমাকান্তের সুত রামদেব। রাজীবের পুত্র গোবিন্দরাম, তৎসুত কৃষ্ণরাম, রামচন্দ্র ও রামভদ্র। রামেশ্বরের প্রথম পক্ষে হরিদেব নামে একটি এবং দ্বিতীয় পক্ষে জয়দেব ও শুকদেব নামে দুইটি সন্তান।

চৌগাঁয়ের রাজবংশ

রামপুর বোয়ালিয়া হইতে নাটোর দিঘাপতিয়া দিয়া যে রাজপথ বগুড়ামুখে গিয়াছে, চৌগ্রাম তাহারই পার্শ্বে অবস্থিত। ইহার চতুর্দিকে বিল। সিঙ্গড়া থানা ইহার ৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে। চৌগ্রামের জমিদারদিগকে প্রজারা রাজা বলিয়া সম্বোধন করে।

সুবুদ্ধি, কেশব ও জগদানন্দ নামে তিন ভাই, গৌড়ের বাদশাহের অধীনে পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। বাদশাহ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সুবুদ্ধি ও কেশবকে খাঁ উপাধি ও জগদানন্দকে রায় উপাধি দান করেন। ইহারা উদয়নাচার্যের বংশধর রাজা কংসনারায়ণের ভাগিনেয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া ইঁহাদের খ্যাতি আছে।

জগদানন্দের দুই বৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম পাঁচু রায় ও ভুবন রায়। পাঁচু রায়ের তনয় রসিক রায় রাজা রামজীবনের সমসাময়িক ছিলেন। রসিকের দুই তনয়। কনিষ্ঠ তনয় রামকান্তকে নাটোরের রাজা রামজীবন দত্তক গ্রহণ করেন। ইনিই নাটোর-রাজবংশের রাজা রামকান্ত বলিয়া খ্যাত। রসিক রায় রাজা রামজীবনের নিকট হইতে রাজশাহীর অন্তর্গত পরগনা চৌগ্রাম ও রঙ্গপুরের অন্তর্গত পরগনা ইসলামাবাদ পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

রসিক রায়ের জ্যেষ্ঠ তনয়ের নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। তিনিই চৌগ্রাম রাজবাটী নির্মাণ করেন। কৃষ্ণকান্তের তনয় রুদ্রকান্ত রোহিণীকান্ত নামে দত্তক সুত গ্রহণ করেন। রোহিণীকান্তের কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায়, তিনি নিরাবিল পটীর কুলীন কৃপানাথ মৈত্রের এক তনয়কে দত্তক গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম রমণীকান্ত। তিনি বুদ্ধিমান, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত। তিনি জমিদারির আয় বৃদ্ধি করেন ও একটি মধ্যশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। [১৫৪ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]

শাণ্ডিল্য গোত্র—রামগোপালপুরের বাগছী-বংশ

রুদ্র বাগছী. [৩৬ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ], তৎসুত হরদেব, তৎসুত রামদেব, তৎসুত কামদেব। তৎসুত আনাই আচার্য, অন্য নাম অমোঘ আচার্য, তৎপুত্র জিম্মানি ওঝা অন্য নাম জৈমিনি ওঝা, তৎপুত্র রেখ বাসস্থান বা সমাজ জিয়াগাইল, তৎপুত্র পণ্ডু মহানিধি অন্যনাম গণ্ডু মহানিধি, মহানিধির দুইপুত্র ধুবাই বা ধুমাই এবং হর্ষবর্ধন। হর্ষবর্ধন ছয়ঘরিয়া দলে গিয়া নিস্কুল হন।

ধূমাইর তিনপুত্র প্রথম হিরাই অন্যনাম ছিয়াই, দ্বিতীয় কিরাই, তৃতীয় জগাই। ছিয়াইর তিন পুত্র প্রথম সুখাই অন্য নাম সুয়াই, দ্বিতীয় লখাই অন্য নাম লুয়াই, তৃতীয় বনহার অন্য নাম ধনঞ্জয় ও বামনাই। সুয়াই বাগছীতে কালাপুরী অবসাদ পড়ে, পরে তার নিষ্কৃতি হয়।

সুয়াইর তিন পুত্র মানাই, শ্রীপতি, গোপাই বা গোপাল। বাসস্থান বা সমাজ বেয়ালজানি। সবাইর চারি পুত্র লখাই, বলাই, জগাই ও দুধাই। লখাইর চারি পুত্র শশাই, শনাই, নরসিংহ, আধাই। শশাইর পাঁচ পুত্র শুকাই, নিতাই, ধরাই, অনন্ত এবং ধ্রুব জগন্নাথ। ধ্রুব জগন্নাথে পরাণ মৌলিকী অবসাদ জন্মে, জীবধর মৈত্রের সহিত করণ করিয়া অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি পান। শুকাইর চারি পুত্রকৃষ্ণ, জগদানন্দ, রাম ব্রহ্মচারী ও রঘু। রঘুর তিন তনয় বাণেশ্বর, জয়কৃষ্ণ ও যাদু। জয়কৃষ্ণের তনয় শ্রীকৃষ্ণ বাগছী, ইনি নওপাড়ার জমিদার জনার্দন খাঁর কন্যা বিবাহ করিয়া আশুদিয়া গ্রাম যৌতুক পান ও জনার্দনী অবসাদে আস্তাড়িত হন। তিনি কিছু দিন আশুদিয়া থাকিয়া তথা হইতে নওপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। উক্ত পল্লীতে জটাধর বাগছীকে উৎপাদন করিয়া পরে তিনি বোয়ালজানি চলিয়া যান। তথায় উপকারের করণ করিয়া জনার্দনী অবসাদ হইতে মুক্ত হন। জটাধর বাগছী, নওপাড়া হইতে আশুদিয়ায় গিয়া বসতি করেন। জটাধরের তনয় রামকৃষ্ণ বাসস্থান আশুদিয়া। রামকৃষ্ণের পাঁচটি তনয়, প্রথম হিরণ্যগর্ভ, দ্বিতীয় রামনারায়ণ, তৃতীয় পদ্মগর্ভ ন্যায়ালঙ্কার, চতুর্থ রত্নগর্ভ, পঞ্চম বেদগর্ভ। রামকৃষ্ণ বাগছীর দ্বিতীয় তনয় রামনারায়ণ, তৎসুত কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণজীবনের তিন তনয় কৃষ্ণরাম, রঘুরাম, ও অনন্তরাম। রঘুরামের সুত শ্যামরাম বিদ্যাভূষণ (রাম রায়ের অন্য দুই নাম বিষ্ণু ও কৃষ্ণকান্ত।) শ্যাম রায় বিদ্যাভূষণের তনয় কাশীচন্দ্র (অন্য দুই নাম কৃষ্ণচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র) কাশীচন্দ্রের তিন তনয়, গোলক, রামদুলাল বিদ্যামণি, এবং দুর্গাচরণ বাগছী। ইঁহারা রামগোপালপুর রাজবাড়ির পুরোহিত। দুর্গাচরণের দুই তনয় ঈশ্বর বাগছী ও অভয় (ফটিক) বাগছী। ঈশ্বরের তনয় উমাপ্রসন্ন। অভয়ের তনয় হরিপদ বাগছী. বসতি রামগোপালপুর।

শাণ্ডিল্য গোত্র—সাঁতৈলের রাজবংশ

সাঁতৈলের রাজা বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে একজন ছিলেন। যে স্থানে আত্রাই নদী ও করতোয়া নদীর সংযোগ ঘটিয়াছে, সেই স্থানে সাঁতৈল রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। ইহার নিকটেই সাঁতৈলের বিল নামক প্রকাণ্ড জলাশয় চলনবিলের সহিত মিশিয়াছে। সাঁতৈলের রাজবংশ শাণ্ডিল্য গোত্রোদ্ভব।

আত্রাই নদীর উভয় পার্শ্বস্থ ভাতুড়িয়া প্রদেশ এবং তদন্তর্গত ২৪১৯৭ টাকা বার্ষিক আয়ের ১৩ খানি পরগনা সাঁতৈল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে যে সাঁতৈল রাজ্যের আয় ছিল ২৯০০২৭ দাম (৪০ দামে এক টাকা)। অরঙ্গজেবের পুত্র আজিম উস্‌সানের শাসনকালে সীতানাথ সাঁতৈলের রাজা ছিলেন। সীতানাথের পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বর রাজ্যভার প্রাপ্ত হয়েন। রামেশ্বর অতিশয় সুচতুর, বুদ্ধিমান ও বলবান ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে এক সময়ে সমগ্র উত্তর বঙ্গ কম্পিত হইত। তিনি জ্যেষ্ঠ সীতানাথকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। কিন্তু শেষ কালে তিনি সীতানাথের সহিত ভাল ব্যবহার করেন নাই। এজন্য সীতানাথ মনোকষ্টে দেহত্যাগ করেন।

রামেশ্বরের পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার রানি শর্বাণী রাজ্য পরিচালনা করেন। রানি শর্বাণী করতোয়া নদীতটে এক মহাপীঠ আবিষ্কার করেন। সেখানে বহু যাত্রীর সমাগম হইত। রানি-ভবানী-ঐ-মন্দির পরে সংস্কার করাইয়া দেন। রানি-শর্বাণীর মৃত্যুর পর কৃষ্ণরামের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু তিনি অন্ধ ও বধির ছিলেন বলিয়া রাজকার্য পরিচালনে অসমর্থ হন। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া সাঁতৈল রাজ্য আক্রমণ করেন। সাঁতৈল নাটোরের রঘুনন্দনের হস্তগত হয়।

শাণ্ডিল্যগোত্র—টেংরামারি ভট্টাচার্য বংশ

এই বংশ ভিক্ষাকরের সন্তান আঢ্য কাপ, রুদ্র বাগছি বংশোদ্ভব। ইঁহাদের এক পূর্বপুরুষ পুষ্করিণীর জলে দাঁড়াইয়া একদিন আহ্নিক করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি টেংরা মাছ তাঁহাকে কামড়াইয়া দিয়াছিল, তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া এক গণ্ডুষ জল মন্ত্রপূত করিয়া তাহা পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করেন। তাহাতে পুকুরের সমস্ত টেংরামাছ, ভাসিয়া উঠে। সেইজন্য এই বংশের নাম টেংরামারির ভট্টাচার্য বংশ হয়।

ইঁহাদের পূর্ববাস বগুড়া জেলার অন্তর্গত সেরপুর গ্রামে। সেইজন্য ইঁহাদিগকে সেরপুরের বাগছী বলা হয়। বিষ্ণুপুরের রাজা ইঁহাদের পূর্বপুরুষকে বাঁকুড়ার লইয়া যান ও ঢেঙ্গাতলায় জমি জমা দিয়া বাস করান। ইঁহাদের বংশের অনেকে বিষ্ণুপুর রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। নবদ্বীপের আগমবাগীশ ভট্টাচার্য ঢেঙ্গাতলা হইতে ইঁহাদের এক পূর্বপুরুষকে নবদ্বীপে লইয়া আসেন ও নিজের জ্যেষ্ঠ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। সেই সময় হইতে ইঁহারা এখনও বিষ্ণুপুরের জমি জমা ভোগ করিতেছেন। এই বংশের অনেকে তান্ত্রিক সাধনায় ও জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বর্তমানে নীলকণ্ঠের সঙ্গীতবিদ্যা খ্যাতি প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের উপাধি বাগছী ভট্টাচার্য।

কাসিমপুরের রায় বাহাদুর বংশ

রাজশাহী জেলার অন্তর্গত কাসিমপুরের লাহিড়ী বা রায় বাহাদুর বংশ নামে পরিচিত, কেন না এই বংশের গিরিশচন্দ্র ও কেদারপ্রসন্ন গভর্নমেন্ট হইতে রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন। ইঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্র, ভট্টনারায়ণের অধস্তন সন্তান। ইঁহাদের পূর্বপুরুষ লোকনাথের পৌত্র বল্লভাচার্য উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করেন। বল্লভাচার্যের আকাই, কেশাই ও দনুজাই নামে তিন পুত্র হয়।

কেশাইয়ের অধস্তন পুরুষ গদাধর লাহিড়ী রাজশাহী জেলার অন্তর্গত ঝিকড়া গ্রামে বাস করিতেন। গদাধর তাঁহার মৃত্যুকাল আসন্ন জানিয়া নৌকাপথে কাসিমপুর হইয়া গঙ্গাযাত্রা করিতেছিলেন। কাসিমপুর-নিবাসী রঘুনাথ চৌধুরীর এক অনূঢ়া প্রাপ্ত যৌবনা কন্যা ছিল। উপযুক্ত কুলীনের সন্ধান না পাওয়ায় তিনি এত দিন কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। এখন কুলীনশ্রেষ্ঠ গদাধরকে পাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিয়া কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। বলা বাহুল্য অতি অল্পকাল মধ্যেই গঙ্গাতীরে গদাধর দেহত্যাগ করিলেন।

গদাধরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রামকিশোর লাহিড়ী কাসিমপুরে আই সেন। উক্ত গ্রামের রুদ্রকান্ত চৌধুরী তাঁহার সহিত স্বীয় ভগিনীর বিবাহ দিয়া তাঁহাকে কাসিমপুরে বাসোপযোগী ব্রহ্মোত্তর ভূমি ও কম খাজনায় কয়েকখানি জোত প্রদান করেন। তখন হইতে রামকিশোর কাসিমপুরেই বাস ভবন নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন।

রামকিশোরের কালীকান্ত, কাশীকান্ত ও কালীশঙ্কর নামে তিন পুত্র হয়। কালীকান্ত অপুত্রক ছিলেন। কালীকান্তের দুই পুত্র--কমলাকান্ত ও রজনীকান্ত। কালীশঙ্করের একটি পুত্র গিরিশচন্দ্র। কালীকান্তের তিন ভাই একান্নে ছিলেন। কালীকান্ত প্রথমে নাটোরে পরে রামপুর বোয়ালিতে মোক্তারী করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করেন। তিনি নাটোর ছোট তরফের, কাসিমপুর চৌধুরীদের, মুক্তাগাছার ও ডিহি ছাওনীর জমিদারদের মোক্তার ছিলেন। তিনি এই সময়ে অনেক ভাল ভাল জমিদারি ক্রয় করেন ও রাজশাহীতে বাস ভবন নির্মাণ করেন। তিনি নানা কৌশলে জমিদারি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার জমিদারির আয় প্রায় আশীহাজার টাকা হইয়াছিল। তিনি দুইবার বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার প্রথমা পত্নী কাশীশ্বরী ও দ্বিতীয়া পত্নী মৃণ্ময়ী। মৃণ্ময়ী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন বলিয়া কাশীকান্ত তাঁহার নিকট বৈষয়িক বিষয়ে যুক্তি পরামর্শ লইতেন। কালীকান্তের দুই ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র কমলাকান্ত তাঁহার জীবিত সময়েই পরলোক গমন করেন। তখন কালীকান্তের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রহিলেন দুই জন মধ্যম ভ্রাতার পুত্র রজনীকান্ত ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র গিরিশচন্দ্র। কালীকান্ত রজনীকান্তকে দত্তক গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম দিলেন সারদাকান্ত। ইহার পর হইতে মৃণ্ময়ী গিরিশচন্দ্রকে বিষচক্ষুতে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কালীকান্তের প্রথম পক্ষের স্ত্রী কাশীশ্বরী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। গিরিশ নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া জ্যেষ্ঠতাতের নিকট সম্পত্তি অংশ চাহেন। কিন্তু কালীকান্ত সকল সম্পত্তি স্বোপার্জিত বলিয়া গিরিশকে কিছুই দিলেন না। বহুকষ্টে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া গিরিশ মোকদ্দমা করেন; তাহাতে তাঁহার নামে বার্ষিক ৯০০ টাকা মাসহারা মঞ্জুর হয়।

কালীকান্তের মৃত্যুর পর সারদাকান্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তখন কাশীশ্বরী কাশীধামে বাস করিতে যান ও মৃণ্ময়ী ইহলীলা সংবরণ করেন। সারদাকান্ত অপুত্রক অবস্থায় অতি অল্প বয়সে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যু কালে পত্নীকে দত্তক গ্রহণের

অনুমতি দিয়া যান। কিন্তু সারদার বিধবা পত্নী দত্তক রাখিবার সুযোগ পান নাই. কেন না তিনি স্বামীর মৃত্যুর এক বৎসর পরেই পরলোকে গমন করেন, তখন কালীকান্তের প্রথমা পত্নী কাশীশ্বরই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন। তিনি তখন কাশী বাস করিতেন। গিরিশ কাশীশ্বরীকে বশীভূত করিয়া ও মাসহারা দিতে স্বীকৃত হইয়া সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করেন।

সারদাকান্তের স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমলার অনেক টাকা চুরি করিয়াছিল। গিরিশ প্রথমে ঋণ গ্রহণ করেন। কিন্তু নিজের বুদ্ধিবলে অল্প দিন মধ্যেই তিনি তাঁহা পরিশোধ করেন। গিরিশ অত্যন্ত পরোপকারী ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। তিনি কাশীমপুরে একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি অনেক ছাত্রকে নানারূপে সাহায্য করিতেন। বাঙ্গলার ছোটলাট স্যার জর্জকাম্বেল তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি বিশেষ মাননীয় ছিলেন। নিরাবিল, রোহেলা, ভূষণা প্রভৃতির কুলীনপাত্রে তিনি তাঁহার পাঁচ কন্যাকে সম্প্রদান করেন ও জামাতাদিগকে ভূসম্পত্তি দান করেন। শ্রেষ্ঠ কুলীনে কন্যাদান করায় তিনি বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজে স্পর্শমণি আখ্যায় খ্যাত হন।

গিরিশচন্দ্রের পুত্র কেদারপ্রসন্ন পিতার সদ্‌গুণরাজির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনিও রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন।

শাণ্ডিল্য গোত্র—ভবানন্দ লাহিড়ীর ধারা
ভিটাদিয়া ও বাণীগ্রামের গোস্বামী বংশ

লোকনাথ লাহিড়ীর দুই পুত্র শ্রীনাথ ও ভূতনাথ। ভূতনাথের পুত্র দিগম্বর ওঝা. তৎপুত্র বেদগর্ভ, তৎপুত্র সনাতন, তৎপুত্র চ্যুত বা টুট ওঝা, চ্যুতের সাত পুত্র--হলী. বলী, বৎস, বল্লভ আচার্য, সোম, দিবাকর, ও ত্রিবিক্রম। হলী জাতিভ্রষ্ট বর্ণব্রাহ্মণ। আর সকলেই পণ্ডিত আচার্য উপাধি। বল্লভাচার্য উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর কন্যা লীলাবতীকে করণ করিয়া পরিবর্ত নিয়মে বিবাহ করেন। এই পরিবর্ত নিয়মে উদয়নের কন্যা বল্লভাচার্য এবং বল্লভের ভগিনী উদয়নপুত্র পশুপতি গ্রহণ করেন। উদয়ন হইতে কন্যাগত কুল এবং শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান নিষিদ্ধ হয়।

বল্লভাচার্যের তিন পুত্র অর্ক, দনুজারি ও কেশব। দনুজারি ছয়ঘরিয়া দলে প্রবেশ করিয়া নিষ্কুল হন। কেশবের সমাজ নকৈড়। কেশবের পুত্র সুবিখ্যাত খেখাই লাহিড়ী, ইঁহার আসল নাম শ্রীনারায়ণ লাহিড়ী। তাঁহার সাত পুত্র—অনন্ত, মাধব. শ্রীকর, শ্রীবৎস, সারঙ্গ, দামোদর ও ঈশান ওঝা। ঈশান ওঝা অন্য স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত শুনা যায়।

শ্রীনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র মাধব। মাধবের পাঁচ পুত্র, মহামিশ্র. নরপতি, বারকড়ি, নিতাই ও অরুণ।

মহামিশ্রের ছয় পুত্র--বিদ্যাপতি, প্রগর্ভ ভট্ট, সর্বানন্দ, গোসাঞি মিশ্র, রঘুপতি মিশ্র ও মুকুন্দ মিশ্র।

প্রগর্ভ ভট্টের তিন পুত্র রামচন্দ্র আচার্য বা রামাচার্য শ্রীকণ্ঠ ও হরিভট্ট। রামাচার্যের তিন পুত্র, সত্যভানু, জনার্দন. এবং মধুসূদন। মধুসূদনের উপাধি বাচস্পতি মিশ্র এবং তর্কবাগীশ।

মধুর এক পত্নীর পুত্র বিজয় লাহিড়ী অন্য পত্নীর পুত্র ভবানন্দ লাহিড়ী. এবং সারঙ্গাই লাহিড়ী। ভবানন্দের উপাধি আচার্য।

ভবানন্দ বেতালের জমিদার সদানন্দ রায়ের কন্যাকে প্রথম বিবাহ করেন, তাহাতে ভিটাদিয়া গ্রাম যৌতুক পান। সেই পত্নীর গর্ভে ভবানন্দের তিন পুত্র জন্মে, শ্রীগর্ভ ভট্টাচার্য, পদ্মগর্ভ আচার্য এবং বেদগর্ভ ভট্টাচার্য। পদ্মগর্ভ বড় পণ্ডিত ছিলেন, গীতাভাষ্য, দ্বাদশ উপনিষদভাষ্য, পৈঙ্গীরহস্য, ব্রাহ্মণভাষ্য, এবং ক্রমদীপিকার টীকা রচনা করেন। ক্রমদীপিকার টীকায় পদ্মগর্ভ সর্বশেষে আপনার পরিচয় দিয়াছেন।*

ভবানন্দ সুসঙ্গে এক বিবাহ করেন, সেই পত্নীর পুত্রের নাম রামচন্দ্র লাহিড়ী। তাহার বংশ নারায়ণডহর প্রভৃতি স্থানের জমিদার-গোষ্ঠী। ভবানন্দ নবদ্বীপে এক বিবাহ করেন, সেই পত্নীর পুত্র হিরণ্যগর্ভ আচার্য এবং শ্রীবৎস আচার্য উভয়ের বাস নবদ্বীপে। ভবানন্দ মধ্যদেশে এক বিবাহ, বিক্রমপুরে দুই বিবাহ এবং অন্যান্য স্থানেও বিবাহ করেন। ভবানন্দের দ্বিতীয় পুত্র পদ্মগর্ভ আচার্য পাঠ্যাবস্থায় নবদ্বীপে প্রথম বিবাহ করেন, নবদ্বীপের পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পুরুষোত্তম আচার্য, সন্ন্যাসাশ্রমে নাম স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, বাসস্থান নবদ্বীপ, চৈতন্যের প্রিয়পার্ষদ। ইহার বংশ নাই।

দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত পুত্র লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী বাসস্থান ভিটাদিয়া। ইঁহার বংশ বহু বিস্তৃত, বাণীগ্রামের গোস্বামীগণ ইঁহার বংশধর।

* ক্রমদীপিকায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—
"সম্ফুল্লেন্দীবরাভং স্মিতসিতবদনং কৌস্তভোদ্বৃদ্ধকান্তিং,
বর্হাপীড়ং ত্রিভঙ্গং ব্রজজনললনাচিত্তপুষ্পৈকভৃঙ্গং।
শান্তং সৌম্যং সুপীতাম্বরযুগরুচিরং পুষ্প মালং সবেণুং,
বন্দেবৃন্দাবনেণু সুবিদিতচরিতং গোপবেশং মুকুন্দং।।[১]
নিপীয় যৎকীর্তিকথাং সুধাময়ীং, সুদাবমন্তে নিতরাং বিপশ্চিতঃ।
তং বেদবেদান্ত, বিদং যতীশ্বরং লক্ষ্মীপতিং নাম গুরুং ভজামাহং।।[২]
প্রখ্যাতাস্তি বরেন্দ্রভূঃ সুরনদীতীরে সমুদ্ভাসিনী,
তস্যাং গ্রামবরঃ সুরেন্দ্রনগর প্রখ্যো নকৈড়াখ্যকঃ।
তত্রাসীৎ প্রপিতামহো মম পুবা শ্রীলাহিড়ীবংশজা,
রামাচার্য সুধীঃ সুগীতচরিতঃ শ্রেষ্ঠঃ কুলীনীশ্বয়ে।।[৩]
তস্য চ পবমকোবিদাস্ত্রয়ঃ সুতাস্ত্রয়ী প্রবন্ধবুদ্ধয়ঃ।
সত্যভানুজনার্দনাবিত্যাস্তং দ্বাবতিবিশ্রুতৌ।।[৪]
একোহপরো বিপুলধী বাচস্পতিমিশ্রতর্কবাগীশঃ।
দিগন্তবিশ্রুতকীর্তি মধুসূদনাভিধান আসীৎ।।[৫]
মিশ্রস্মৃতিঃ কৃতা তেন স্মৃতীনাং সারসংগ্রহঃ।
মন্বাদীনাং স্মৃতীনাং বৈ টীকা কৃতাতিষত্নতঃ।।[৬]
তস্য পুত্রো ভবানন্দলাহিড়ী লোকবিশ্রুতঃ।
আচার্যো বিদুযাং শ্রেষ্ঠঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিযঃ।।[৭]
বঃ কামরূপেশ্বর-মুখ্যমন্ত্রিণো, বেতালরাজ্ঞস্য মহাযশস্বিনঃ।
শ্রীমৎসদানন্দমহীসুরস্য বৈ রায়স্য কন্যামুনবোঢ় ধর্মতঃ।।[৮]
এগারসিন্দুর প্রদেশশাস্তা যস্মৈ সদানন্দ-মহোদয়েন।
আচার্যবরায় নরোত্তমায় ভিটাদিয়েত্যাখ্যপুরী প্রদত্তা।।[৯]
ভবানন্দতো জাতা স্ততঃ শ্রীসুনীতিগর্ভে বিদগ্ধাঃ।
সর্বশাস্ত্রপারীণা স্ত্রয়ঃ পুত্রা অতিরমণীয়াঃ।।[১০]
জ্যেষ্ঠস্ত্বমীষা শ্রুতিবিদ্বরিষ্ঠো মনোজ্ঞকান্তি গুণিনাং গরিষ্ঠঃ।
আচার্যভট্টো নিতরাং সুশিষ্টঃ শ্রীগর্ভনামান্বয় সংপ্রতিষ্ঠঃ।।[১১]

পদ্মগর্ভের তৃতীয় পত্নীর গর্ভজাত পুত্র যদুনাথ লাহিড়ী. ইঁহার বংশধর ভট্টাচার্যগণ কানিহারি বাস করেন। এই বংশে পণ্ডিতের বিরাম না থাকায় ইঁহাদিগকে পণ্ডিতের ঘর বলে। পদ্মগর্ভের চতুর্থ পত্নীর গর্ভে অমরনাথ লাহিড়ী ও রঘুনাথ চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের বংশ নাই। পদ্মগর্ভের দ্বিতীয় পুত্র লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী। চৈতন্যদেব শ্রীহট্ট যাওয়ার সময় কিছু দিন ইঁহার গৃহে অবস্থিতি করেন; ইঁহাকে পুত্রবর প্রদান করেন, সেই বরে লক্ষ্মীনাথের এক প্রবীণ পণ্ডিতপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বৈষ্ণবাচার্য রূপনারায়ণ সরস্বতী গোস্বামী। রূপনারায়ণ সুবিখ্যাত লোক ছিলেন, ইনি জীব গোস্বামীর সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া মহাপ্রভুর মত গ্রহণ করেন, জ্যেষ্ঠতাত স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর নিকট গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত হন। সামাজিক ইতিহাস স্বরূপ চরিতে এবং রূপনারায়ণ চরিতে ইঁহার জীবনচরিত আছে, প্রেমবিলাসে ও ইহার কথা কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি দিল্লীর বাদশাহ্ হইতে অনেক ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি লাভ করেন। দেশে বিদেশে ইনি বহুতর শিষ্য সেবক করেন। লোহজঙ্গের পালচৌধুরী জমিদারগণ এবং ভাগ্যকুলের রায়চৌধুরী জমিদারগণ বাণীগ্রামের গোস্বামী বংশের শিষ্য।

রূপনারায়ণ নবদ্বীপে এক বিবাহ করেন, পত্নীর পুত্র নন্দরাম বিদ্যাসাগর এবং শ্রীধর তর্কালঙ্কার। রূপনারায়ণ ভিটাদিয়া আসিয়া আরও এক বিবাহ করেন। সেই পত্নীর পুত্র কৃষ্ণজীবন বাণীকণ্ঠ বাচস্পতি।

রূপনারায়ণ কিছুদিন পুত্রগণ সহ এগার সিন্দুরে বাস করেন, বৃদ্ধ বয়সে বৃন্দাবন চলিয়া যান, তথায় রাধাকুণ্ডে দেহত্যাগ করেন।

শতানি সচ্ছাত্রগণান্ বরেণ্যঃ, সদান্নদানেন প্রহর্ষ ধীরান্।
অধ্যাপ্য সম্যক্ শ্রুতিশাস্ত্রজাতং, মমাগ্রজো লব্ধবিদ্যাংশ্চকার।।[১২]
কনিষ্ঠো বেদগর্ভস্তু বেদবেদান্তপারগঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো বদান্যশ্চ নীতিজ্ঞো ধার্মিকঃ সুধীঃ।।[১৩]
আস্যোদরে তস্য ষড়ঙ্গবেদা বিভাসমানাঃ সততং ততোহস।
অন্বর্থযুক্তং কৃতিনোপদিষ্টং শ্রীবেদগর্ভেতি সুনামধেয়ং।।[১৪]
বেদান্তস্মৃতিকাব্যজৈমিনিনয়ৌলুক্যেতিহাসশ্রুতি-
সাঙ্খ্যন্যায়পুরাণতর্কজলধিস্নানোজ্জ্বলপ্রজ্ঞকঃ।
আচার্য প্রবরঃসুকীর্তিকিরণঃ প্রোদ্ভাসিভাশান্তকঃ।
কারুণ্য মৃতপূর্ণপুণ্যহৃদয়ো গণ্যঃ শরণ্যঃ সতাং।।[১৫]
সম্যক্‌ধর্মপরায়ণঃ শ্রুতিধরো ধন্যো ধনেশেশ্বরো,
দারিদ্রাম্বুধিমগ্নমর্ত্যবসতা মুক্তারপেতঃ স্বযং।
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রচারুচরণদ্বন্দারবিন্দাশ্রিতো,
ভৃঙ্গঃ সদগুণভূষণগুণিজনপ্রিয়স্ত্বহং মধ্যমঃ।।[১৬]
নত্বা শ্রীগুরুপাদপদ্মমমলং যঃ পদ্মগর্ভঃ সুধীঃ,
গীতাদ্বাদশসঙ্খ্যাকোপনিষদাং পৈঙ্গীরহস্যস্য বৈ।
বেদান্তস্য চ রম্য ভাষ্যনিচয়ং সারার্থযুক্তং মতং,
শ্রীরামানুজসম্মতং ব্যরচয়ৎ প্রালোচ্য সদ্বৈষ্ণবৈঃ।।[১৭]
সোহয়ং সুনীতিজননীং শিরসা প্রণম্য, লক্ষ্মীপতেঃ সুচরণার্পিতদেহগেহঃ।
ভিটাদিয়াখ্যনগরে নিবসন্ মনোজ্ঞাং, টীকানিমাং রচিতবান্ ক্রমদীপিকায়াঃ।।[১৮]
পুরুষোত্তম বনস্য ব্যাখ্যাং দৃষ্টা যথামতি। তাং চিত্তরঞ্জনীং নাম বিদুষাং চিত্তরঞ্জিনী।।[১৯]

মান সিংহ এবং ঈশা খাঁর যুদ্ধের সময় এগার সিন্দুর হইতে নন্দরাম, শ্রীধর ও কৃষ্ণজীবন বাণীয়া গ্রামে চলিয়া আসেন, তথায় তিনটি টোল স্থাপন করিয়া ভ্রাতৃত্রয় অন্নদান করিয়া বহু ছাত্রের অধ্যাপনা করাইতেন। সেই বাণীয়া গ্রাম এখন বাণীগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ।

রূপনারায়ণের প্রথম পুত্র নন্দরাম বিদ্যাসাগর। তৎপুত্র ব্রজকিশোর শিরোমণি, অন্যনাম ব্রজবল্লভ। ব্রজকিশোরের পাঁচ পুত্র। প্রথম রাধামাধব গোস্বামী, ইনি লাল ঠাকুরগোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ, বৈষ্ণব পণ্ডিত এবং ভক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী, তৃতীয় রামমাণিক্য গোস্বামী, চতুর্থ ফকির ও পঞ্চম রাধু। রামমাণিক্য, ফকির ও রাধু এই তিনের বংশ নাই।

রাধামাধব বৃদ্ধ বয়সে বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে দেহত্যাগ করেন। রাধামাধবের পুত্র ভুবনমোহন। তৎপুত্র গোলকমোহন। তৎপুত্র রামকুমার গোস্বামী। তাহার দুই পুত্র--নন্দকুমার ও রাজেন্দ্র লাল গোস্বামী। যে বৎসর সর্বপ্রথম সংস্কৃত কলেজে তীর্থ উপাধি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসর নন্দকুমার গোস্বামী কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ করেন। তাঁহার অন্য উপাধি তত্ত্বনিধি। ইনি মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ছাত্র। নন্দকুমার কলিকাতায় উপেন্দ্রমোহন গোস্বামীর নিকট শ্রীভাগবতাদি বৈষ্ণবশাস্ত্র ও বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করেন।

নন্দকুমার গোস্বামীর ছয় পুত্র--নিখিলানন্দ, ব্রজানন্দ, নিত্যানন্দ, অচ্যুতানন্দ, সচ্চিদানন্দ ও বিজ্ঞানানন্দ। প্রথম পুত্র নিখিলানন্দ ব্যাকরণ-কাব্য-তর্কতীর্থ উপাধিতে উত্তীর্ণ। নবদ্বীপের আশুতোষ তর্কভূষণের ছাত্র। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত এবং জ্যোতিষশাস্ত্রেও অভিজ্ঞ; সুকবিও বটেন।

নিখিলের পুত্র অপূর্বকৃষ্ণ ও অনিলকৃষ্ণ। অপূর্বের অন্যনাম হরিদাস। নন্দকুমার গোস্বামীর দ্বিতীয় পুত্র ব্রজানন্দ, তৎপুত্র নারায়ণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাৎস্যগোত্র নবদ্বীপের জটিয়া যাদু সান্যালের বংশ

জটিয়া যাদু আগমবাগীশের সহিত একত্রে তান্ত্রিক উপাসনা করিতেন। কথিত আছে—জটিয়া যাদুর পরামর্শ মত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ আগমেশ্বরী মাতার ভোগ দিতেন। জটিয়া যাদু ধরাধর বংশীয় দিবাইয়ের নবম অধস্তন পুরুষ ছিলেন। তিনি কুলভঙ্গ করিয়া আঢ্য হয়েন। কুলজ্ঞরা বলিয়া থাকেন--

"আগমবাগীশ সহস্রাক্ষ জটিয়া যাদু ভিকে।
এই চারি আঢ্য কাপ নদীয়ার লেখে।"

তাঁহার মস্তকে জটা ছিল। ন্যাস ও প্রাণায়ামের সময়ে তাঁহার জটা ঊর্দ্ধ্ব দিকে উত্থিত হইত বলিয়া তাঁহার নাম জটিয়া যাদু হয়।

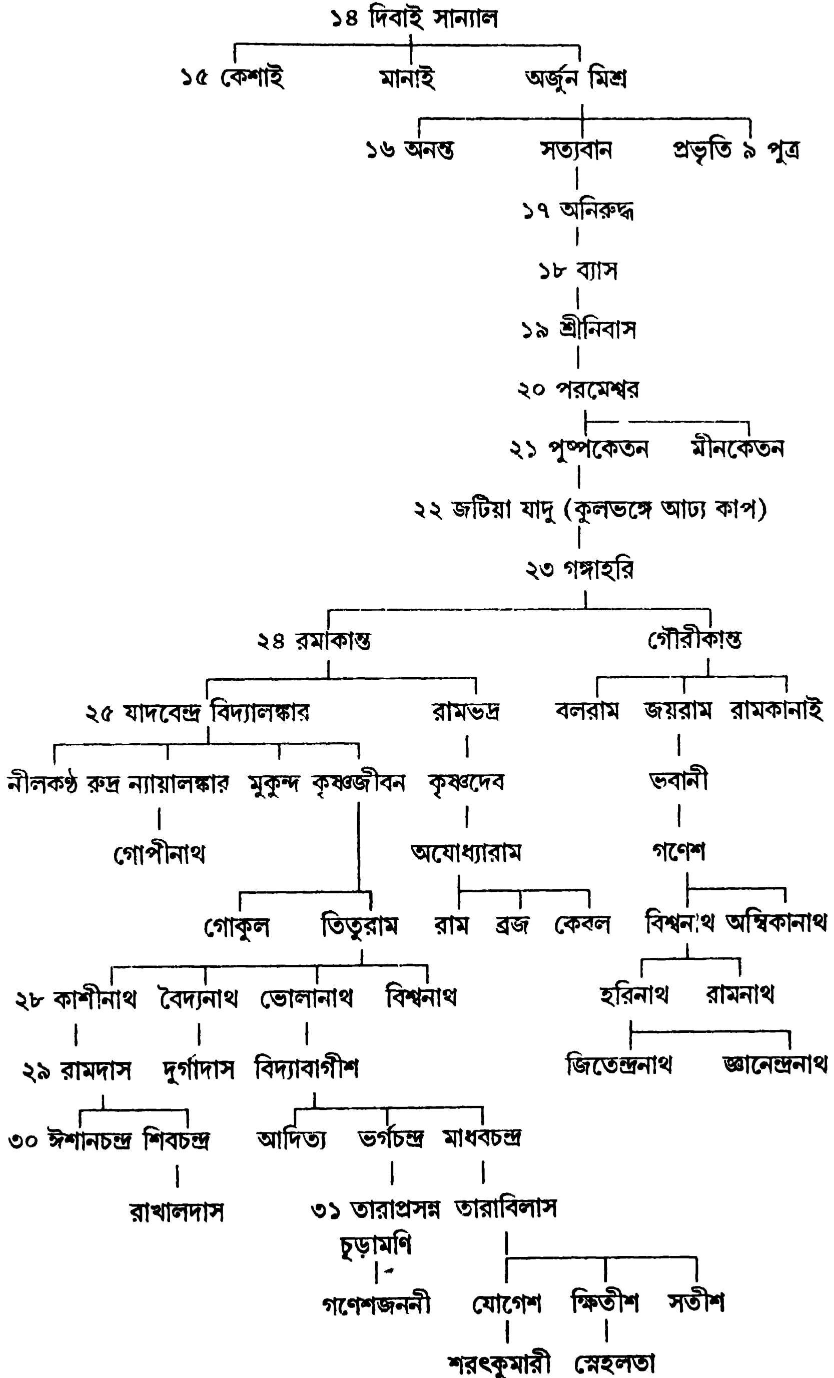
এই বংশে অনেক পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করেন। জটিয়া যাদুর ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ তিতুরাম তর্কপঞ্চাননের পৌত্র তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি স্মৃতিশাস্ত্রে নবদ্বীপের মধ্যে একজন গণনীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি স্বগৃহের চতুস্পাঠীতে ছাত্রগণকে অধ্যাপনা করাইতেন। ইঁহার শান্ত প্রকৃতিতে সকলে মুগ্ধ হইত। ইনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকে গমন করিয়াছেন।

[২৫১ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]

কাসিমপুরের চৌধুরী বংশ

কাসিমপুরের চৌধুরীরা বাঙ্গালার চৌদ্দ চৌধুরীর অন্যতম। গঙ্গানন্দ স্যান্যাল হইতে উক্ত চৌধুরী বংশের উন্নতি আরম্ভ হয়। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত তপৈলার গ্রামে গঙ্গানন্দ বাস করিতেন। তিনি নিরাবিল-পটীর কুলীন ছিলেন, পরে কাপের কন্যা গ্রহণ করিয়া কাপ হইয়াছিলেন। কাপের মধ্যে কাসিমপুর, হরিপুর ও লালৌরের চৌধুরীরা শ্রেষ্ঠ। প্রবাদ আছে যে কাসিম খাঁ নামক মোগল জায়গীরদারের উপর বিরক্ত হইয়া বাঙ্গালার সুবেদার তাঁহার জায়গীর গঙ্গানন্দের পুত্র শিবরামকে প্রদান করেন। সেই হইতে ইঁহারা চৌধুরী উপাধিতে পরিচিত।

গঙ্গানন্দের চারি পুত্র--শিবরাম, সীতারাম, রামনারায়ণ ও দেবীদাস। ইঁহাদের বংশধরেরাই কাসিমপুরের চৌধুরী বলিয়া পরিচিত। কাসিমপুর হইতে ইঁহাদের বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা আয় হইত। ইহা ব্যতীত শিবরামের আরও অনেক সম্পত্তি ছিল। শিবরামের প্রথম পক্ষের দুই পুত্র জয়কৃষ্ণবল্লভ ও বিষ্ণুবল্লভ কাসিমপুরেই থাকিতেন। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র শ্যামমোহন হাজরাহাটী নামক স্থানে বাস করিতেন। জয়কৃষ্ণের পুত্র ব্রজবল্লভ নাটোরের রাজা রামজীবনের সমসাময়িক। রাজা রামজীবন একবার কাসিমপুরে আসিয়া ব্রজবল্লভের গৃহে আহার করেন। ব্রজবল্লভ তাঁহাকে লৌকিকতা স্বরূপ কালিগড় পরগনা দিয়াছিলেন। রাজা রামজীবন কেবল মাত্র কাসিমপুর পরগনা ব্রজবল্লভের জন্য রাখিয়া অন্যান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।


১৪ দিবাই সান্যাল
১৫ কেশাই
মানাই
অর্জুন মিশ্র
১৬ অনন্ত
সত্যবান
প্রভৃতি ৯ পুত্র
১৭ অনিরুদ্ধ
১৮ ব্যাস
১৯ শ্রীনিবাস
২০ পরমেশ্বর
২১ পুষ্পকেতন
মীনকেতন
২২ জটিয়া যাদু (কুলভঙ্গে আদ্য কাপ)
২৩ গঙ্গাহরি
২৪ রমাকান্ত
গৌরীকান্ত
২৫ যাদবেন্দ্র বিদ্যালঙ্কার
রামভদ্র
বলরাম
জয়রাম
রামকানাই
নীলকণ্ঠ
রুদ্র ন্যায়ালঙ্কার
মুকুন্দ
কৃষ্ণজীবন
কৃষ্ণদেব
ভবানী
গোপীনাথ
অযোধ্যারাম
গণেশ
গোকুল
তিতুরাম
রাম
ব্রজ
কেবল
বিশ্বনাথ
অম্বিকানাথ
২৮ কাশীনাথ
বৈদ্যনাথ
ভোলানাথ
বিশ্বনাথ
হরিনাথ
রামনাথ
২৯ রামদাস
দুর্গাদাস
বিদ্যাবাগীশ
জিতেন্দ্রনাথ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ
৩০ ঈশানচন্দ্র
শিবচন্দ্র
আদিত্য
ভর্গচন্দ্র
মাধবচন্দ্র
রাখালদাস
৩১ তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি
তারাবিলাস
গণেশজননী
যোগেশ
ক্ষিতীশ
সতীশ
শরৎকুমারী
স্নেহলতা

বিষ্ণুবল্লভের বংশধর বৃন্দাবনবল্লভ কাসিমপুর ত্যাগ করিয়া জোয়াড়ি নামক স্থানে যাইয়া বাস করিতে থাকেন।

বর্তমানে গঙ্গানন্দের বংশ নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে, সুতরাং সম্পত্তিরও বহু ভাগ হইয়াছে। ইহার মধ্যে রুদ্রকান্ত চৌধুরীর বংশই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রুদ্রকান্তের পুত্র হরকান্ত পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন। তিনি বহু তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন। মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠে তিনি সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পুত্র সারদাকান্ত বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত। রঘুনাথের প্রপৌত্র কিশোরীনাথ বিশেষ সজ্জন ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। রঘুনাথের ভগিনীর সহিত ঝিকড়া নিবাসী কুলীন গদাধর লাহিড়ীর বিবাহ হয়। ইহাতে গদাধর কুল হারাইয়া কাপ হয়েন। ইঁহাদের কন্যা অনেক কুলীন পাত্রে অর্পিত হইয়াছেন। [২৫৩ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]

বাৎস্যগোত্র বলিহার-রাজবংশ

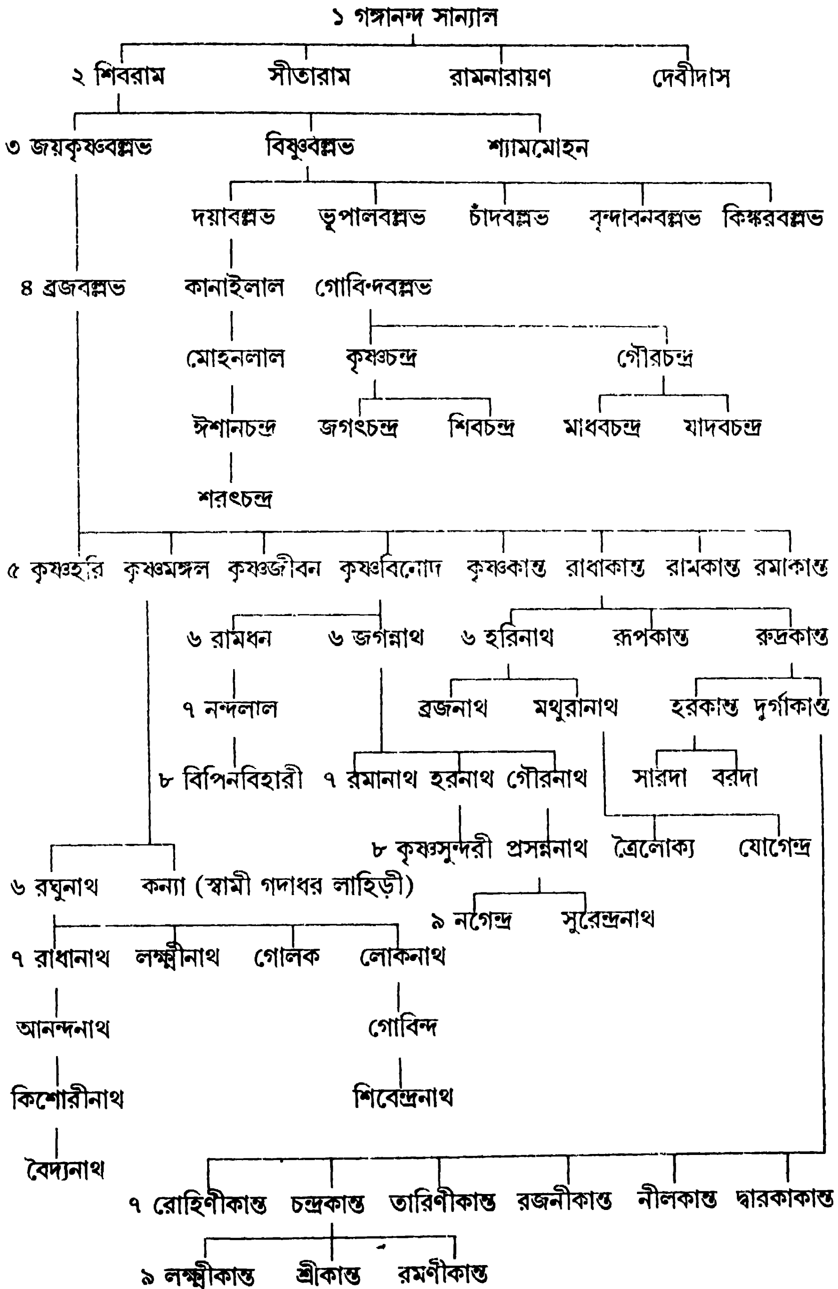
খৃস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঐতিহাসিক ভাগ্য বিপর্যয়ে বাঙ্গালাদেশে যে সকল জমিদার বংশের উদ্ভব হয়, তাহার মধ্যে বলিহার রাজবংশ অন্যতম। বলিহারের রাজবংশের প্রাচীন বাসস্থানের নাম ছিল কুড়মইল গ্রাম। কুড়মইল গ্রামের নাম কুলজ্ঞ শাস্ত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বলিহার রাজবংশ বাৎস্য গোত্র রাঘবের প্রপৌত্র বেদান্তাচার্য হইতে উদ্ভুত। বেদান্তাচার্যের দুই পুত্র--হরিহয় ও লক্ষ্মীধর। হরিহর ও লক্ষ্মীধরের পুত্র বর্ধমান কুড়মইল গ্রামে বাস করিতেন। বর্ধমান কুড়মইল গ্রাম ত্যাগ করিয়া পৈত্রিক সান্যাল গ্রামে গিয়া বাস করেন। লক্ষ্মীধরের অধস্তন সন্তান অনন্ত ও রামনাথ হইতে যথাক্রমে বলিহার-রাজবংশ ও দিনহাটার রায়চৌধুরী বংশের উদ্ভব হইয়াছে।

অনন্তের প্রপৌত্র গোপাল। গোপালের তিন পুত্র--কৃষ্ণদেব, প্রাণকৃষ্ণ ও রামরাম। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদেব রঙ্গপুর জেলার বাহিরবন্দ পরগনার সুপ্রসিদ্ধ। ভূম্যধিকারী রানি সত্যবতীর ভগিনীকে বিবাহ করেন। এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে কৃষ্ণদেবের দুই ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণ ও রামরাম রানি সত্যবতীর জমিদারিতে প্রধান কার্যকারকের পদ লাভ করেন। কিন্তু তাঁহারা দুই ভাই কৌশলজাল বিস্তার করিয়া ভিতরবন্দ নামক সুবিস্তৃত পরগনা অধিকার করিয়া নেন। এই পরগনার চার আনা ১৫ গণ্ডা লইলেন রামরাম আর ছয় আনা ৫ গণ্ডা লইলেন প্রাণকৃষ্ণ। এই প্রাণকৃষ্ণের বংশই বলিহার-রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত।

প্রাণকৃষ্ণের প্রপৌত্র রাজেন্দ্র রায়। তিনি নাটোরের বিখ্যাত রাজা রামকৃষ্ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া যৌতুক স্বরূপ বহু ভূসম্পত্তি লাভ করেন। সেই সময় হইতে বলিহার-রাজ-বংশের শ্রী বর্ধিত হইতে থাকে।

রাজেন্দ্র রায়ের পৌত্র কৃষ্ণেন্দ্র রায় এই বংশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কৃষ্ণেন্দ্র শিবপ্রসাদ রায়ের দত্তক পুত্র। তিনি রাজকার্য পরিচালনায় ও গ্রন্থাদি রচনায় সমান নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। তৎকালে রাজশাহী জেলার জমিদারের মধ্যে তাঁহার মত বিদ্যানুরাগী আর কেহই ছিলেন না। বাল্যকালে ঘটনা-বিপর্যয়ে তিনি ভালরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরিণত বয়সে নিজের অসামান্য অধ্যবসায় বলে বহু বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি নিজেও বেশ লিখিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত "স্বভাব-নীতি", "সীতাচরিত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "স্বভাবনীতি" গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন যে, যৌবনকালে তাঁহার



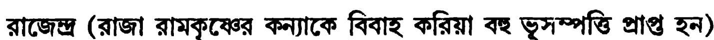
একটু পদস্খলন হইয়াছিল--কিন্তু পরে তিনি তজ্জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণেন্দ্র রায়ের অমায়িক ব্যবহারে ধনী দরিদ্র সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার সহিত দেখা করিতে

হইলে এত্তালা দিবার জন্য দরওয়ানদের খোসামদ করিতে হইত না। তাঁহার দ্বার সকলের নিকট অবারিত ছিল। তিনি মৃগয়াতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই জন্য সাহেবদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। সঙ্গীত-বিদ্যায় তাঁহার বেশ অধিকার ছিল। তিনি পরের দুঃখ মোচনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, অতিথিসেবা প্রভৃতি তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। রথযাত্রা ও অন্যান্য দেবার্চনায় তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় বলিহার গ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনি একটি বালিকাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন--তাঁহার সহিত স্বীয় দত্তক পুত্রের বিবাহ দেন।

বলিহারের কুমারগণ অধুনা ইংরাজি বিদ্যায় শিক্ষিত ও সমাজহিতৈষী।

বলিহারের রাজবংশ

শিকাই সান্যাল
- কানাই
  - মহী
    - দামোদর
      - অনন্ত
        - গোপীজন চক্রবর্তী
          - নৃসিংহ চক্রবর্তী
            - গোপাল
              - কৃষ্ণদেব
              - প্রাণকৃষ্ণ
                - রামনাথ
                  - নীলকণ্ঠ
              - রামরাম
      - রামনাথ
        - কৃষ্ণগোপাল সান্যাল
          - কৃষ্ণকান্ত
            - আনন্দচন্দ্র
              - কালীকান্ত
                - মহেশচন্দ্র
                  - যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
      - রমানাথ
- বলাই
- পিয়াই
  - আনুয়াই


রাজেন্দ্র (রাজা রামকৃষ্ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বহু ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন)
- শিবপ্রসাদ
  - রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়

বাৎস্যগোত্র কানাই ঠাকুরের বংশ

বাৎস্যগোত্রজ ধরাধর হইতে এই বংশের গণনা হইয়া থাকে। ধরাধরের পুত্র বেদ ওঝা; তৎপুত্র সিদ্ধেশ্বর পাঠক। সিদ্ধেশ্বরের দুইপুত্র চতুর্বেদাচার্য (বারেন্দ্র) ও দামোদর ওঝা (রাঢ়ী)। চতুর্বেদের ছয় পুত্র--হরিহর কুড়মুড়ি, লক্ষ্মীধর সান্যাল, জয়মান মিশ্র কালিয়াই, দিবাকর ভাড়িয়াল; শক্তিধর ও শশধর। লক্ষ্মীধরের পুত্র বর্ধমান, তৎপুত্র বাসুদেব। বাসুদেবের পুত্র মেধাভিক্ষু। তাঁহার পাঁচ পুত্র নৃসিংহ, হিরণ্য, হরদেব, পুরদেব ও মুরদেব। হিরণ্যের মহেশ্বর, সোমেশ্বর, প্রহেশ্বর, গোপালাচার্য ও মুরারি পাঠক নামে পাঁচ পুত্র। মহেশ্বরের পুত্র বাপী। বাপীর পুত্র শূতাই (ওরফে ভূতনাথ) শূতাইয়ের দুইপুত্র শিখাই ও দামাই। শিখাইয়ের আট পুত্র পিয়াই (বাস বগুড়া, তালসন), পুরাই (পাবনা, গারুদহ), বৈকুণ্ঠাই (পাবনা চামটা) কানাই (মালদহ পুখুরিয়া), অচ্যুতাই (বগুড়া মাইজদিয়া), সুরাই (যশোর), শঙ্কর (পুখুরিয়া) ও মনু মিশ্র। কানাইয়ের চারিপুত্র রামাই, বাসুয়াই, মুরাই ও পজাই সান্যাল। মুরাইয়ের দিবাই, অসুয়াই, তিয়াই, বৃহস্পতি, ঈশাই, বিবর্ত, গনাই (পক্ষে), রঘুয়াই ইত্যাদি পুত্র। ঈশাইয়ের পুত্র গদাই। গদাইয়ের দুই পুত্র সাতাই ও কুবের পাঠক। সাতাইয়ের পুত্র বংশধর সান্যাল। ইঁহার বংশ এখন রাজশাহীতে আছে।

কুবেরের বাসুদেব, ধনঞ্জয় ও বৈষ্ণব মিশ্র নামে তিন পুত্র। বৈষ্ণব মিশ্রের চারিপুত্র-- মুকুন্দ, হরিগোসাঞি (পক্ষে), দামোদর ও নৃসিংহ সান্যাল। হরির ছয় পুত্র নন্দ, নারায়ণাচার্য, লোকবন্ধু, দেবকী, রত্নগর্ভ, মাধব ও গোপাল আচার্য। নন্দের চারিপুত্র রাঘবাচার্য, মুরারি, জগন্নাথ ও কানাই ঠাকুর।

কানাই ঠাকুর মালদহে কানশাঠ পুখুরিয়া গঙ্গাতীরে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮ বৎসর বয়সের সময় বাকসিদ্ধ হয়েন। সিদ্ধপুরুষ কানাই ঠাকুরের বহু রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ শিষ্য হন। এখনও তাহা বর্তমান আছে।

কানাই ঠাকুরের চারিপুত্র--চাঁদ চক্রবর্তী, রামজীবন, মাধবাচার্য ও রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী। রামকৃষ্ণের কামদেব ন্যায়বাগীশ, রামদেব তর্কবাগীশ ও শঙ্কর চক্রবর্তী নামে তিনপুত্র। কামদেবের তিন পুত্র--নন্দরাম তর্কালঙ্কার, মুকুন্দরাম বাচস্পতি ও বাণেশ্বর ভট্টাচার্য। বাণেশ্বরের সদানন্দ তর্কশিরোমণি, প্রাণনাথ ন্যায়ভূষণ, হরেকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন ও মনোহর সিদ্ধান্তবাগীশ নামে চারিপুত্র। সদানন্দের তিনপুত্র বলরাম ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকান্ত সিদ্ধান্ত ও কালাচাঁদ ভট্টাচার্য। কালাচাঁদের রামনরসিংহ, ভবানীপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর নামে তিন পুত্র। ব্রহ্মানন্দের গুরুনাথ শিরোমণি, হরিনাথ কাব্যতীর্থ শাস্ত্রী, কুঞ্জমোহন ভাগবতভূষণ ও মোহিনীমোহন, জ্যোর্তিভূষণ নামে চারিপুত্র। হরিনাথের পুত্র বীরেশ্বর ভট্টাচার্য এবং কুঞ্জমোহনের পুত্র অমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য।

চামটা সমাজ—ভবাই সান্যাল বংশ

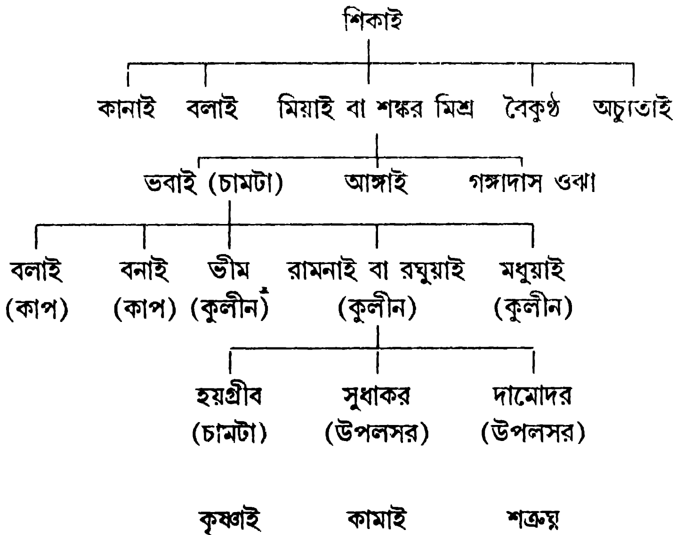
ধরাধরের অধস্তন পুরুষ শঙ্কর মিশ্রের পুত্র ভবাই চামটা হইতে চামটা-সমাজের সান্যাল বংশের উৎপত্তি। ভবাইর ষোড়শ অধস্তন পুরুষ মধুসূদন সান্যাল এই বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি নদীয়া ও ২৪ পরগনা জেলার বিস্তর জমিদারি করেন। তিনি জমিদারির আয় লক্ষ অর্থে নিজের বিলাস বাসনা পরিতৃপ্ত করিতেন না। তিনি বহু সংখ্যক

দরিদ্র ব্যক্তিকে অর্থসাহায্য করিতেন ও অতিথিসেবাদি কার্যে কালাতিপাত করিতেন। কলিকাতা জোড়াসাঁকোর চিৎপুর রোডের শ্যাম-মল্লিকের বাড়ির সম্মুখে তাঁহার বাড়ি ছিল। কিন্তু তাঁহার জন্মস্থান ছিল ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোঁড়কদি গ্রামে। সরিকী বিবাদে মধুসূদন নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। মৃত্যুকালে মধুসূদন তাঁহার পুত্র নিমচাঁদ সান্যালকে বার লক্ষ টাকা ও কন্যাকে তিন লক্ষ টাকা দিয়া যান।

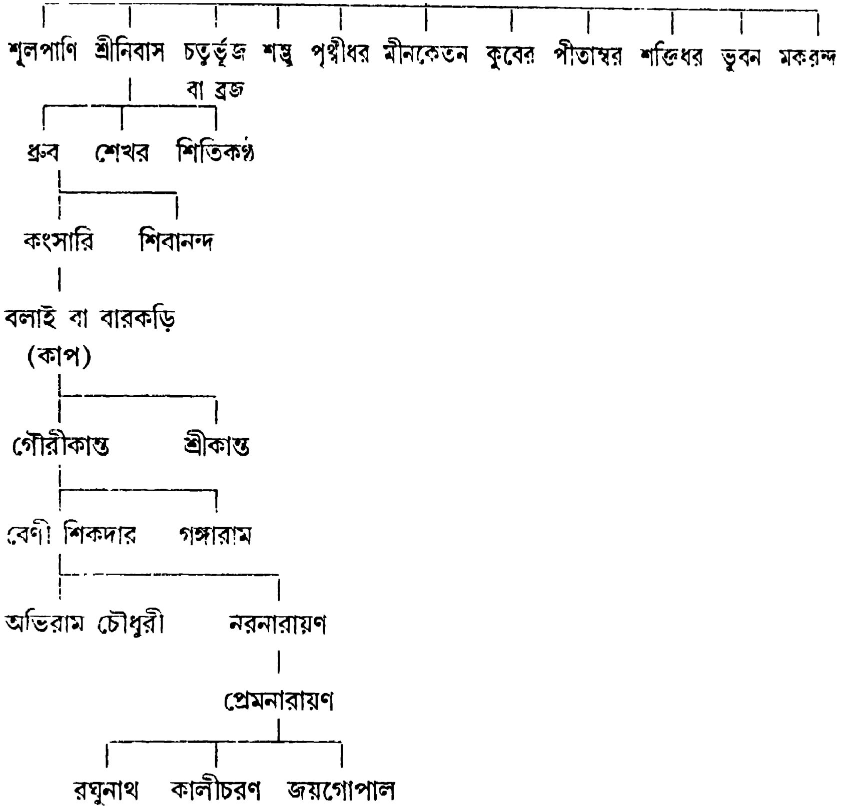
নিমচাঁদ একযোগে বার লক্ষ টাকা হাতে পাইয়া আমীরী চালে চলিতে থাকেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়--এমন কি কলিকাতার পৈত্রিক বসতবাটীও বিক্রয় হইয়া যায়। তখন নিমচাঁদ শ্বশুড়বাড়ি যাইয়া অতিকষ্টে শেষ জীবন যাপন করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। মধুসূদনের দৌহিত্র--কোঁড়কদির লাহিড়ী ও ভাদুড়ীরা ধনাঢ্য হইয়া দেশ মধ্যে মাননীয় হইয়া আছেন। যখন কলকাতায় কোন থিয়েটার বা রঙ্গমঞ্চ হয় নাই, চিৎপুর রোড়স্থিত উক্ত মধুসূদন সান্যালের বাড়িতেই "ন্যাসানাল থিয়েটার" রঙ্গমঞ্চ প্রথম নির্মিত হয়।

সলপের সান্যাল জমিদার বংশ

আদিশূর আনীত পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ মধ্যে বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর হইতে এই বংশের উদ্ভব। ইঁহারা সঞ্জামিনী বা সান্যাল গাঞি, শঙ্কর মিশ্রের ধারা।



সুধাকর ও দামোদরের সন্তানগণ উপলসরের সান্যাল নামে খ্যাত। উপলসর রাজশাহী জেলায় বড়াই গ্রাম থানার অধীনে চলন-বিলের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। উপলসরে এখন সান্যাল বংশের বাস নাই। বর্তমান ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন গোত্রীয় নিয়োগী উপাধিধারী। কানাই এর বংশীয় গুণাইগাছার ঢোল উপাধিধারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বংশ হইতে সলপের সান্যাল জমিদারগণের পুরোহিত সান্যাল-বংশ উদ্ভূত।



কালীচরণের পিতা প্রেমনারায়ণ সলপ মৌজার দক্ষিণে শ্রীবাড়ি মৌজায় বাস করিতেন। তাঁহার বসত ভিটা আজও 'প্রেমার ভিটা' নামে কথিত হয়। রঘুনাথের বংশীয় গোবিন্দপুরের সান্যালগণ মধ্যে ললিতমোহন সান্যাল বি-এল পাবনায় ওকালতি করেন এবং রমেশচন্দ্র সান্যাল জলপাইগুড়ি দেবীগঞ্জের সবরেজিস্টার। বর্তমানে পাঁচ ঘর সান্যাল গোবিন্দপুরে বাস করেন।

জয়গোপালের বংশীয় ঘাটিনার সান্যাল বংশে তারিণীশঙ্কর সান্যাল সরল বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ঐ ব্যাকরণ বাঙ্গালার বহু বিদ্যালয়ে প্রায় ৪০ বৎসর কাল একমাত্র পাঠ্য ছিল। এখনও অনেক স্কুলে পাঠ্য আছে।

কালীচরণ সান্যালই সলপে বাস করেন, তাঁহার বংশধরগণই সলপের সান্যাল নামে খ্যাত। পিতামাতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ শ্রীবাড়ির পৈত্রিক বাস ত্যাগ করিয়া গোবিন্দপুরে বাড়ি করেন। জয়গোপাল ঘাটিনাতে বসতি করেন। কালীচরণ নাটোরে চলিয়া যান। তিনি একজন বিশিষ্ট শক্তিসাধক ছিলেন, সেজন্য অতি সহজেই মহারানি ভবানীর অনুগ্রহ ভাজন হন। তিনি মহারানিকে মা বলিয়া ডাকিতেন। মহারানি তাঁহার

সঙ্গে কথা বলিতেন বলিয়া তিনি মহারানির খাস দরবারে প্রজাসাধারণের পক্ষে মোক্তারী করিতেন। ক্রমে রাজদরবারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ হয়, তাঁহার প্রতিপত্তিতে ঈর্ষাপরবশ হইয়া রাজসরকারের কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁহার বিরুদ্ধে মহারানির নিকট মিথ্যা অপবাদ করেন যে, তিনি মহারাজ রামকৃষ্ণকে "লাগান গাইয়ের বাছুর" বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন। ঐ কথায় মহারানি ক্রুদ্ধা হইয়া কালীচরণকে তদ্দণ্ডেই নাটোর হইতে বিতাড়িত করিতে আদেশ দেন, কিন্তু তাৎকালিক রাজগুরু বরিয়া-পাকুড়িয়ার ঠাকুর মহাশয়ের চেষ্টায় কালীচরণ অবিলম্বে মিথ্যা অপবাদমুক্ত হইয়া রাজসরকারে আবার ক্ষমতাপন্ন হন। প্রবাদ এইরূপ, 'মিথ্যা নির্যাতিত হইয়া কালীচরণ অভিসম্পাত করেন যে, তাঁহার মিথ্যাপবাদকারীর যেন ত্রিরাত্র মধ্যে পুত্রনাশ হয়। কার্যতও তাহাই ঘটে। এই ঘটনায় তাঁহার পুনঃ প্রতিপত্তি লাভে বিশেষ সাহায্য হয়।

বাঙ্গালা ১১৮০ সালের কিছু পূর্ব্বে মহারানি ভবানী নাটোরে প্রতিষ্ঠাকল্পে একখানি ঁজয়কালী মুর্তি গঠন করাইয়াছিলেন। কিন্তু উহাতে শিবমূর্তি শ্বেতমর্মর প্রস্তরে খোদিত না হইয়া উভয় মূর্তিই কাল কষ্টিপাথরে খোদিত হওয়ায় ঐ মূর্তি তাঁহার অপছন্দ হয়। তখন কালীচরণ মহারানির নিকট ঐ মূর্তি প্রার্থনা করেন। মহারানি তাঁহাকে ঐ মূর্তি দান করেন এবং সেবা পূজা নির্বাহ জন্য সলপ সন্নিহিত নলসোন্দা মৌজায় একটি ব্রহ্মোত্তর কালীচরণকে দেন। ঐ ব্রহ্মোত্তর অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন। বাং ১৮৮০ সালে (ইং ১৭৭৩ অব্দে) কালীচরণ সলপে ঁজয়কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ ঁজয়কালীমাতার এবং অন্যান্য পৈত্রিক ও পরবর্তী কালে স্থাপিত ঁদধিবামন, ঁলক্ষ্মীনারায়ণ, ঁলক্ষ্মীজনার্দন, ঁশ্যামরায়, ঁলক্ষ্মীমাতা, ঁগোপালজিউ, ঁমঙ্গলচণ্ডীমাতা ও ঁবুড়াশিব দেবদেবীগণের নিত্য পূজা ভোগ, সেবা, অতিথি সৎকার আদি ক্রিয়া কলাপ নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

কালীচরণের দুই পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ ও গৌরীশঙ্কর। গঙ্গাগোবিন্দের আট পুত্র এবং গৌরীশঙ্করের ছয় পুত্র। দুই ভাইয়ের এই চৌদ্দ পুত্র সলপের চৌদ্দ সরিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। গঙ্গাগোবিন্দের পুত্রগণ বড় তরফ এবং গৌরীশঙ্করের পুত্রগণ ছোট তরফ নামেও কথিত। এই চৌদ্দ সরিক সান্যাল ভ্রাতৃগণের আমলে নাটোর-রাজ-বংশের ময়মনসিংহ জেলাস্থিত পরগনে পুকুরিয়ার নিলাম খরিদ্দার পুটিয়ারাজের সহিত নাটোররাজের ভীষণ বিবাদ আরম্ভ হয় এবং নাগাবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সেই সময় নাটোরের মহারাজ বিশ্বনাথ সলপে শুভাগমন করেন এবং ছয় মাস কাল সলপে অবস্থান করিয়া গোপীনাথ, বিশ্বনাথ, শিবশঙ্কর, রাজশঙ্কর আদি সান্যাল-ভ্রাতৃগণের অধিনায়কত্বে বহু বরকন্দাজ সৈন্য পুখুরিয়ায় প্রেরণ করেন। ঐ সান্যাল ভ্রাতৃগণের অদম্য সাহস, উৎসাহ ও চেষ্টায় নাটোররাজ বিবাদে জয়ী হন এবং পরগনা পুখুরিয়া মধ্যে নাটোর-রাজের বর্তমান সম্পত্তি বাজে তালুক সুরক্ষিত হয়। নাটোররাজের বহু কর্মচারীই বিশ্বাসঘাতকতা করায় এবং সলপের সান্যালগণ বরাবর রাজসরকারের হিতসাধন করায় নাটোর-রাজসরকার সলপের সান্যালগণকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। এমন কি, নাটোর ছোট তরফের পরলোকগত রাজা যোগেন্দ্রনাথ অনেক সময় বলিতেন যে, "সেওয়ার সলপ আর সব নিমকহারাম"।

১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে নাটোররাজের পরগনা ইউসুফসাহী বাকি সদর রাজস্ব আদায় জন্য ভিন্ন ভিন্ন ডিহিতে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন লাটে নিলাম হয়। পাবনা জেলার স্থল ও নওহাটার পাকড়াশী ও ভট্টাচার্য জমিদারগণের পূর্বপুরুষ ঁকাশীনাথ ও রামকমল পাকড়াশী

ভ্রাতৃদ্বয় উক্ত উভয় সম্পত্তি নিলাম খরিদ করেন। কালীচরণের বিশেষ নিষেধ থাকায় তাঁহার বংশধর অন্য কেহ খরিদ না করিলেও তাঁহার পৌত্র গোপীনাথ তাঁহার বন্ধু কাশীনাথ পাকড়াশীর সহিত গোপনে উভয় ডিহির অর্ধাংশ পাকড়াশীদের বেনামীতে খরিদ করেন এবং অর্ধেক টাকা কাশীনাথকে দেন। কিন্তু খরিদের পর পাকড়াশীরা অংশ দিতে অসম্মত হন। তাহাতে ডিহি সাহাজাদপুর ও তদধীন সলপের মৌরসী জোত তবফ চাপড়ীর মোকদ্দমা কয়েকবার Privy Council পর্যন্ত গিয়া অবশেষে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে নিষ্পত্তি হয়। তৎকালে সলপের সান্যাল ও নওহাটার ভট্টাচার্যগণের উভয় পক্ষের দেনাপাওনা স্থির হইয়া ভট্টাচার্যগণের বিরুদ্ধে সান্যালগণের প্রায় তিন লক্ষ টাকার ডিক্রি হয়। ঐ ডিক্রিজারীর মোকদ্দমাও বহুবার Privy Council পর্যন্ত চলিলে Privy Council বিশেষ আদেশ দেন যে, এই ডিক্রির টাকা চূড়ান্ত আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই ডিক্রিজারী খারিজ হইবে না।

চৌদ্দ শরিক সান্যাল-ভ্রাতৃগণ মধ্যে বড় তরফের পাঁচ ভাই এবং ছোট তরফের পাঁচ ভাই বর্তমান ছিলেন। তন্মধ্যে গোপীনাথের চেষ্টায় কতকগুলি প্রধান সম্পত্তি অর্জিত বা রক্ষিত হওয়ায় তাঁহাকে ঐ সকল সম্পত্তির চারি আনা অংশ দেওয়া হয়। অবশিষ্ট বার আনার ছয় আনা বড় তরফের অপর চারি ভ্রাতা এবং বাকি ছয় আনা ছোট তরফের পাঁচ ভ্রাতা প্রাপ্ত হন। সেজন্য বড় তরফকে দশ আনী এবং ছোট তরফকে ছয় আনীও বলে। গোপীনাথকে চারি আনা অংশ দেওয়া সম্বন্ধে ছোট তরফের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামশঙ্কর অন্যান্য ভাইদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই স্বীকার হন, কিন্তু পরে কোন দু'ভাই আপত্তি উত্থাপন করেন। তখন দ্বিতীয় ভ্রাতা জয়শঙ্কর ভাইদিগকে বুঝাইয়া সম্মত করান। তাহাতে রামশঙ্কর শঙ্করের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্বাদ করেন যে, "তুমি আমার মুখ রক্ষা করিলে, আশীর্বাদ করি তুমি রাজা হও"। তাঁহার সেই আশীর্বাদ শীঘ্রই ফলবান্ হয়। অল্পকাল মধ্যেই রাজশাহী কালেকটরীর তৌজির ১নং সম্পত্তি পরগনা লস্করপুরের সোয়া তিন ক্রান্তির ছাহাম যাহা পুঁটিয়ার রানি সত্যভামার ছিল, তাহা বাকি সদর রাজস্ব জন্য নিলাম হওয়ায় জয়শঙ্কর নামমাত্র মূল্য দশ হাজার টাকায় ঐ বহু মূল্যবান ও বহু সম্মানের রাজসম্পত্তি খরিদ করেন। এই রাজসম্পত্তি অর্জিত হওয়ায় রাজশাহী জেলার সদর মফঃস্বলে জয়শঙ্কর এবং তাঁহার ওয়ারিশগণের খ্যাতি প্রতিপত্তি বিশেষ বর্ধিত হয়।

জয়শঙ্কর নিঃসন্তান, কিন্তু নিজে খুব আমীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। সে সময় রেল স্টিমার আদি সৃষ্টি হয় নাই। সলপ হইতে রাজশাহী সদরে নৌকা হাতী পাল্কী ঘোড়া আদিতে যাতায়াত করিতে হইত। জয়শঙ্করের বজরা নৌকা এক মাইল দূরবর্তী ফুলজোর নদী হইতে সলপে বাড়ির ঘাটে আসিবার জন্য তিনি ঘাটিনা হইতে সলপ পর্যন্ত একটি খাল খনন করান। ঐ খাল ঘাটিনা-খাল নামে প্রসিদ্ধ থাকিয়া জয়শঙ্করের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। ঐ খাল নৌকা আনার জন্য সৃষ্ট হইলেও পরে উহা বর্ষার প্রথম ভাগ হইতে শেষ পর্যন্ত গ্রাম মধ্যে প্রবাহিত হইতে দিয়া জোলাহাটি, বাহিমান, সলপ, শ্রীবাড়ি, হাড়িভাঙ্গা, গোপীনাথপুর, সড়াতৈল, কানুসোন, রামনগর, কোনাবাড়ি নলসোন্দা আদি গ্রামের দূষিত জল আবর্জনাদি ধৌত করিয়া ঐ গ্রামগুলির স্বাস্থ্যরক্ষায় বিশেষ সাহায্য করিয়া আসিত। কয়বৎসর যাবৎ ঐ খালের সুখ ঘাটিনার জনকতক অধিবাসী পাট বুনিয়া আবদ্ধ করায় বালি ও পলিমাটি আবদ্ধ হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে, সেজন্য ঐ সমুদয় গ্রামের সমূহ স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। গত ১৯১৪ ও ১৯১৫ সনে প্রমদাশঙ্কর সান্যাল পাবনা

জেলাবোর্ডের মেয়র থাকা কালে তিনি ঐ খাল পুনর্খনন জন্য জেলাবোর্ডের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন, নানা অজুহাতে ও প্রধানত ঘাটিনা গ্রামবাসী ঐ কয়েকজন কৃষকের প্রতিবন্ধকতায় উহা কার্যে পরিণত হয় নাই। বহু বর্ষ ধরিয়া বহু চেষ্টার ফলে সম্প্রতি ঐ খাল Bengal Agricultural & Sanitary Improvement Act অনুসারে পুনঃ সংস্কার করার আদেশ হইয়াছে।

বড় তরফের কাশীনাথ এবং ছোট তরফের ভবানীশঙ্কর বিশেষ দয়াবান ও দয়াশীল ছিলেন। তাঁহাদের নিকট কোন প্রার্থী কখনও বিমুখ হইত না। শুনা যায় জমিদারি সুশাসন জন্য অপরাপর ভ্রাতা সময় সময় যে সকল প্রজাকে গারদে আবদ্ধ রাখিতেন, উঁহারা গোপনে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেন। বড় তরফের কৃপানাথ এবং ছোট তরফের মনোমোহনের কর্তৃত্বকালে নীলকর সাহেবগণের অত্যাচার চরম সীমায় উঠে। ঐ নীলকরের অত্যাচার দমনে দেশের প্রজাসাধারণকে রক্ষা করার জন্য সলপের সান্যাল জমিদারগণ নিকটবর্তী সগুনা, বনবারিয়া, কাছাই, বেড়া, সলঙ্গা আদি ৭/৮টি নীলকুঠি এক অহোরাত্র মধ্যে ধ্বংস করেন। সেই ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী ধরিবার জন্য যখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বয়ং পুলিশ ফৌজ সহ সলপ ঘেরাও করেন তখন মহাপ্রাণ মনোমোহন সমুদয় দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইয়া হাজির হন এবং নীলকুঠি-ধ্বংস যজ্ঞের আহুতি স্বরূপ ১২৬৫ সালের বৈশাখ মাসে পাবনা কারাগারে দেহত্যাগ করেন। এই সমুদয় প্রজাহিতকর কার্যের জন্য এবং প্রজাগণ বহু অনাবাদি, পতিত, বিলভরাট জমি, জলঙ্গ আদি আবাদ করিয়া জোতভুক্ত করা সত্ত্বেও প্রজাগণের জোত জরীপ জমাবন্দী আদি করিয়া জমা বৃদ্ধি না করায় প্রজাসাধারণ সান্যাল জমিদারগণকে বিশেষ ভালবাসিত। ইং ১৮৭২।৭৩ অব্দ বাং ১২৮০ সালে পাবনা জেলায় যে Agrarian Riot বা প্রজাবিদ্রোদ হয়, (যে বিদ্রোহের কথা ইং ১৮৮৫ অব্দের প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের ভূমিকায় ঐ আইন প্রণয়নের অন্যতম কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে) জমিদারগণের বিরুদ্ধে প্রজাগণের ঐ বিদ্রোহ পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন পরগনা ইউসুফসাহী হইতেই আরম্ভ হয়। সলপ হইতে ৪।৫ মাইল দূরবর্তী খুকনী দৌলতপুরের ঈশানচন্দ্র রায় ঐ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। ঐ বিদ্রোহ ক্রমে সমুদয় পাবনা জেলায় বিস্তৃত হয় এবং ডেমরা, গোপালনগর, পোরজনা আদি বহু সমৃদ্ধ জমিদারপল্লী বিদ্রোহীরা লুটতরাজ করিয়া ও অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করে। কিন্তু বিদ্রোহীগণ সলপ আক্রমণ করে নাই। এমন কি, পরবর্তীকালে আত্মকলহের ফলে যখন সলপের বহু সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়, তখনও প্রজাগণ ভালবাসার খাতির দীর্ঘ ১২/১৪ বৎসর কাল পর্যন্ত নীলাম খরিদদারগণকে দখল দেয় নাই।

সলপ সান্যাল বংশের এই দুর্দিনের শেষ ভাগে বসন্তকুমার, দক্ষিণারঞ্জন, উমাশঙ্কর, জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও বিজয়শঙ্কর প্রমুখ বংশধরগণের অভ্যুদয় হয় এবং তাঁহাদেরই সমবেত চেষ্টায় এই অবনতির গতি প্রতিরুদ্ধ হয়।

জ্ঞানদাশঙ্কর প্রাচীন ন্যায়, সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন অধ্যয়নান্তে 'সাংখ্য-শাস্ত্রী' উপাধি এবং গীতার উপাধি পরীক্ষায় "তত্ত্ববিশারদ" উপাধি লাভ করিয়া চরক-সুশ্রুত-আদি আয়ুর্বেদ গ্রন্থ অধ্যয়ন পূর্বক কবিরাজী করিতেছেন। জ্ঞানদাশঙ্কর একজন সুকবি এবং সাহিত্যিক। তাঁহার প্রণীত "ভারতবাসী" সর্বত্র উচ্চ প্রশংসিত। তিনি "ভারত যুদ্ধ", 'সিন্ধুবিজয়", "মিলনের পথে' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং "ভক্ত নন্দকুমার' আদি উপন্যাসও

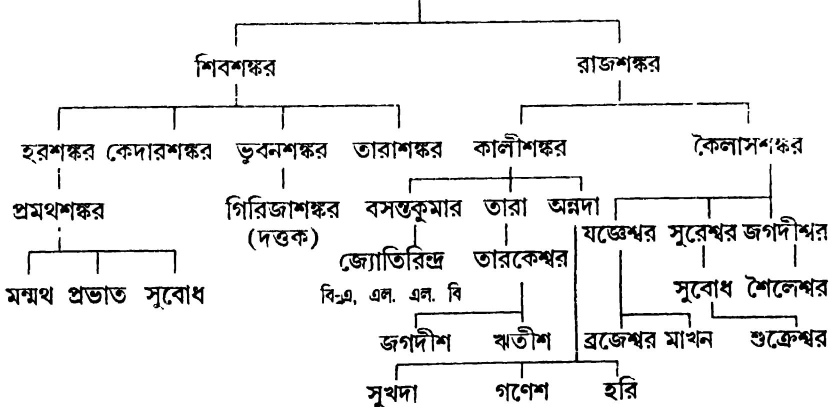
প্রণয়ন করিয়াছেন। নিত্যনিরঞ্জন প্রণীত "কল্যাণী" নামক সদ্ভাবপূর্ণ স্কুলপাঠ্য কবিতাবলী এবং এই বংশের স্ত্রীকবি শ্রীমতী মনোরমা দেবী প্রণীত "বনফুল" নামক কবিতাবলী ও সুখপাঠ্য এবং প্রশংসার্হ।

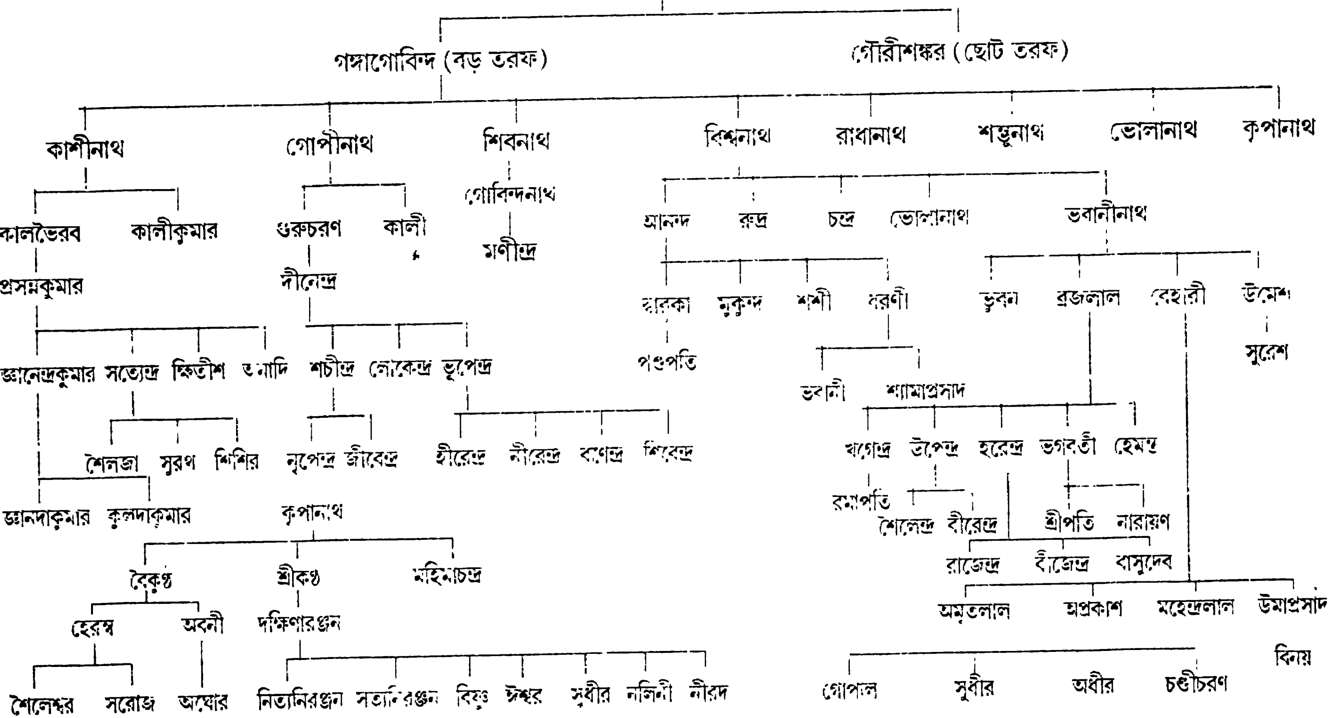
প্রমদাশঙ্কর সলপ সান্যাল বংশে সর্বপ্রথম গ্র্যাজুয়েট বি এ, বি-এল, তিনি সিরাজগঞ্জে ওকালতি করিতেন। অসহযোগ আন্দোলন ফলে ওকালতি ছাড়িয়া দিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রকুমার বি-এ, এল এল-বি,--কাশীধামে ওকালতি করেন। নিত্যনিরঞ্জন বি-এ, শৈলজাকুমার বি-এ। রমাপতি বি-এ সলপ-স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন। কুলদাকুমার বি-এ, পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন।

সলপের সান্যাল বংশ (ছোট তরফ)



গৌরীশঙ্কর (ছোট তরফ)





সলপের সান্যাল বংশ (বড় তরফ)
কালীচরণ
গঙ্গাগোবিন্দ (বড় তরফ)
গৌরীশঙ্কর (ছোট তরফ)
কাশীনাথ
গোপীনাথ
শিবনাথ
বিশ্বনাথ
রাধানাথ
শম্ভুনাথ
ভোলানাথ
কৃপানাথ
কালভৈরব
কালীকুমার
গুরুচরণ
কালী
গোবিন্দনাথ
মণীন্দ্র
আনন্দ
রুদ্র
চন্দ্র
ভোলানাথ
ভবানীনাথ
প্রসন্নকুমার
দীনেন্দ্র
মুকুন্দ
শশী
ভুবন
ব্রজলাল
বেহারী
উমেশ
পশুপতি
সুরেশ
জ্ঞানেন্দ্রকুমার
সত্যেন্দ্র
ক্ষিতীশ
শচীন্দ্র
ভূপেন্দ্র
ভবানী
শ্যামাপ্রসাদ
শৈলজা
সুরথ
শিশির
নৃপেন্দ্র
জীবেন্দ্র
হীরেন্দ্র
নীরেন্দ্র
খগেন্দ্র
উপেন্দ্র
হরেন্দ্র
ভগবতী
হেমন্ত
জ্ঞানদাকুমার
কুলদাকুমার
কৃপানাথ
শৈলেন্দ্র
বীরেন্দ্র
শ্রীপতি
নারায়ণ
বৈকুণ্ঠ
শ্রীকণ্ঠ
মহিমচন্দ্র
রাজেন্দ্র
বাসুদেব
হেরম্ব
অবনী
দক্ষিণারঞ্জন
অমৃতলাল
মহেন্দ্রলাল
উমাপ্রসাদ
বিনয়
শৈলেশ্বর
সরোজ
অঘোর
নিত্যনিরঞ্জন
বিষ্ণু
ঈশ্বর
সুধীর
নলিনী
নীরদ
গোপাল
সুধীর
অধীর
চণ্ডীচরণ

বাৎস্যগোত্র প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গদাধরের বংশ

সান্যাল কুলের গৌরব চতুর্বেদ আচার্য ওরফে চণ্ডী বেদান্তী। উক্ত আচার্যের পুত্র হরিহর, লক্ষ্মীধর ও জয়মান মিশ্র। হরিহর কুড়মইল, লক্ষীধর সান্যাল এবং জয়মান মিশ্র কালিহাই-গ্রামী।

জয়মান মিশ্রের তিন পুত্র--সুগ্রীব (নিদ্রালী), হলধর (দেবলী) ও চক্রপাণি (কালিয়াই)। চক্রপাণির পুত্র নারায়ণ রাজগুরু। তৎপুত্র পীতাম্বর মিশ্র। তৎপুত্র বলদেব অগ্নিহোত্রী। তৎপুত্র অধিপতি। অধিপতির ছয় পুত্র--জয় (ভীম কালিয়াই), শশী (কামদেব কালিহাই), ভগবান্ (কানসোনার কালাই), তন্ত্রকেলী; অনন্ত (নাগাসুর), ভীম, শশীকাম। জয়ের দুই পুত্র--অচ্যুধর (কালিহাই) ও মহীধর, (ভট্টশালী)। অচ্যুধরের পুত্র --ভজাই ও বেটুয়াই। ভজাইয়ের অনন্ত বাঙ্গাল ওঝা, বাসুদেব ও গদাধর নামে তিন পুত্র। অনন্তের ধরাই (পোনসুয়ার), দুরাই (দুরগ্রাম), অচ্যুতাই (বোয়ালিয়া কিন্নাদাড়া) ও বরাই (হাঁপানিয়া)। বরাইয়ের দশ পুত্র--ধরাই, শশাই, পজাই, পদ্মনাভাই, সিতাই (রায়সা), মাধাই (রায়সা, ডাকুবাই (পাঁচুড়িয়া), গোবিন্দ (ঐ) ও মর্যাদ (ঐ)।

ডাকুয়াই একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। এক সময় একজন উদাসীন তাঁহার অধিকারে আসিয়া তান্ত্রিক সাধন করিতে থাকেন। তাঁহার সঙ্গে এক খানি অচল পাথর ছিল। সেই পাথরের উপর বসিয়া তিনি জপাদি করিতেন। উদাসীনের দৈব শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া ডাকুয়াই তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। তিনি উদাসীনের নিকট সাধনের ক্রিয়াদি শিক্ষা করিয়া তান্ত্রিক সাধন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সাধনায় তাঁহার অভীষ্ট দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, "সন্ন্যাসীর নিকট যে পাথর আছে, সেই পাথর খানি চাহিয়া লও, আমি তোমার গৃহে থাকিব।" ডাকুয়াই উদাসীনের নিকট প্রার্থনা করিবামাত্র তিনি পাথরখানি দিয়া চলিয়া গেলেন। ডাকুয়াই সেই পাথর খানির উপর বসিয়া সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে, তাঁহার অধিকারের লোকেরা বামাচার অবলম্বন করিলেন। কেবল তাঁহার বিধবা ভগিনী ও পুরোহিত বামাচার অবলম্বন করেন নাই। একদিন অমাবস্যায় ডাকুয়াই মহাসমারোহে শ্যামাপূজার আয়োজন করিলেন। মহানিশায় একটি মহিষ বলি দিতে হইবে, কিন্তু বলিদান কালে মহিষ গোয়াল ঘরে পলাইয়া যায়; সকলেই সুরাপানে উন্মত্ত, মহিষ ভ্রমে একটি কাল রঙের গরু গোয়াল হইতে বাহির করিয়া আনিয়া দেবীর সম্মুখে বলি দেওয়া হইল। বিধবা ভগিনী ও পুরোহিত বাধা দিতে আসায় তৎক্ষণাৎ কাটা পড়িল। গুরুপত্নী দেবী দর্শনে আসিয়াছিলেন, নেশায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া গুরুপত্নীকে ধরিয়া বলাৎকার করা হইল। এই ঘটনা সর্বত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। গোহত্যা, সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও গুর্বাঙ্গনাগমন, এই পঞ্চ মহাপাতক হওয়ায় দেশস্থ অধ্যাপক ও সমাজিক লোকেরা একত্র হইয়া বিচার করিয়া ডাকুয়াইকে পাঁচুড়িয়া দোষে আস্তাড়ন করিলেন। সেই অবধি ডাকুয়াই ও তাঁহার বংশধরগণ এবং তাঁহাদের সহিত যাঁহারা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাও পাঁচুড়িয়া দোষগ্রস্থ হইয়া আসিতেছেন। সামাজিক অপরাপর বহু দোষ হইতে আদান প্রদান দ্বারা অনেকে দোষমুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু বংশগত পাঁচুড়িয়া দোষ হইতে কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই।

ডাকুয়াইর সাত পুত্র--বিশ্বম্ভর, দিবাকর, দুর্গাবর, রাম, সনাতন, সত্যবান ও চণ্ডীদাস। দিবাকরেরও ছয়পুত্র--হরিহর, সিদ্ধেশ্বর, শ্রীধর, নরোত্তম, কৃত্তিবাস ও দ্বিতায় পক্ষে লোহাই। হরিহরের পুত্র বলভদ্র। বলভদ্রের চারি পুত্র-- জনার্দন, পুষ্পকেতন, মীনকেতন

ও বদন পাঁজা। বদন পাঁজার ধনাই, কৃষ্ণাই, পদ্মনাভ ও বামন নামে চারিপুত্র। বামনেরও চারি পুত্র-- চক্রপানি পাঠক, বশিষ্ঠ, ভীম ও পরাশর। চক্রপাণির কালিদাস নামে এক পুত্র। কালিদাসের পুত্র হলধর। তৎপুত্র জানকীনাথ চক্রবর্তী। জানকীনাথের তিন পুত্র-- কেশব আচার্য, কুমুদানন্দ চক্রবর্তী ও জগদানন্দ মিশ্র। জগদানন্দের রঘুনাথ চক্রবর্তীও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নামে দুই পুত্র। বিশ্বনাথের পুত্র রামচন্দ্র পাঠক। তৎপুত্র শুক্রাম্বর পাঠক। তৎপুত্র শতানন্দ আচার্য। তৎপুত্র জীবু আচার্য। জীবু আচার্যের চারি পুত্র--গদাধর ভট্টাচার্য, দয়ারাম সার্বভৌম, গোপীনাথ ন্যায়ালঙ্কার ও রাজচন্দ্র চক্রবর্তী। গদাধর ন্যায়শাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার।

জীবু আচার্যের পুত্র গদাধর শিরোমণির নাম নবদ্বীপের নৈয়ায়িক সমাজে সর্বজন পরিচিত। অনেকের বিশ্বাস, চারি সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গদাধর বৃহস্পতির অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্বোধ ন্যায়শাস্ত্রের টীকা রচনা করিয়া তিনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

গদাধরের টীকা পড়িয়াই অনেকে ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। সেই টীকাই "গদাধরী" নামে পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত। গদাধর নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে আসিয়া আর গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করেন নাই, নবদ্বীপেই বাসভবন ও চতুষ্পাঠী নির্মাণ করিয়া এখানে ছাত্রদিগকে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র--রাম তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য, রামদেব তর্কবাগীশ, মহাদেব ভট্টাচার্য ও রঘুদেব ন্যায়বাগীশ, এই পাঁচজনেই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্যের পুত্র হরিদেব তর্কসিদ্ধান্ত। ইনি পোষ্যপুত্র ছিলেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র- তিতুরাম তর্কপঞ্চানন, কৃপারাম তর্কভূষণ, শ্যাম সার্বভৌম, গোকুল বিদ্যাবাগীশ ও কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কার। কৃষ্ণকান্তের দুই পুত্র-- শ্রীরাম শিরোমণি ও রঘুমণি শিরোমণি। শ্রীরাম শিরোমণি ভট্টাচার্য ন্যায়শাস্ত্রের এক জন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। কেবল বঙ্গদেশের নানাস্থান বলিয়া নহে, সুদুর মিথিলা, কাশী, দ্রাবিড়, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি বহু স্থান হইতে ছাত্রেরা আসিয়া শ্রীরাম শিরোমণির চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতেন; তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেও তাঁহার জীবনে অহঙ্কার কখনই স্থান পায় নাই; তিনি অতিশয় বিনয়ী ও নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন চূড়ামণিও ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া পিতার ন্যায় হইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন ন্যায়শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি অতি কটুভাষী ও অহঙ্কারী ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ মধুসূদন স্মৃতিরত্ন সংস্কৃত কলেজের প্রধান স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন ; তিনিও বৃটিশ গভর্নমেন্ট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

ভুবনমোহনের পুত্র নগেন্দ্র, তৎপুত্র নরেন্দ্র। মধুসূদনের পুত্র সন্তোষ ও গোপাল। সন্তোষের পুত্র মনোমোহন ও ধীরেন্দ্র। রঘুমণির দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য নামে একপুত্র। দ্বারকানাথের পুত্র হরিদাস স্মৃতিভূষণ ও রামগোপাল তর্কতীর্থ।

বাৎস্যগোত্র বারুইহুদা-নিবাসী দেওয়ান কার্তিকেয় রায়ের বংশ

প্রসিদ্ধ শিকাই সান্যালের পুত্র পিয়াই। এই পিয়াইর পৌত্র মতাই বা সাভাই।

সাভাই হইতে এই বংশের গণনা হইয়া থাকে। সাভাইয়ের বিজয়, নিমাই শ্রীযাম্ ও বঙ্গ নামে চারি পুত্র। বিজয়ের তিন পুত্র-- শ্রীকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ ও ঈশ্বর। শ্রীকণ্ঠের সুরেশ,

পুরুষোত্তম, শ্রীবৎস, জনার্দন, প্রভাকর ও দামোদর নামে ছয় পুত্র। পুরুষোত্তমের দুই পুত্র-- কালিদাস ও বিষ্ণুদাস। বিষ্ণুদাসের পুত্র কৃষ্ণানন্দ আচার্য। তৎসুত রামচন্দ্র আচার্য। রামচন্দ্রের দুই পুত্র--গোবিন্দ পাঠক ও দেবীদাস বাচস্পতি। গোবিন্দের ষষ্ঠীদাস ও কৃষ্ণদেব চক্রবর্তী নামে দুই পুত্র। ষষ্ঠীদাস চক্রবর্তী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। পরশুরাম পঞ্চাননের আখ্যায়িকায় ইহার কুলের বিষয় লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণদেবের বংশধরেরা নবদ্বীপে ছিলেন।

ষষ্ঠীদাসের তিন সুত-- জ্যেষ্ঠ দেওয়ান রামরাম চক্রবর্তী। মধ্যম রামভদ্র এবং কনিষ্ঠ রামশঙ্কর চক্রবর্তী। দেওয়ান রামরামের দুই সুত--দেওয়ান রামগোপাল চক্রবর্তী ও দেওয়ান মদনগোপাল চক্রবর্তী। রামগোপাল ও মদনগোপাল রোহেলাপটীর মধ্য হইতে কতকগুলি কুলীন বাহির করিয়া মমিনপুরভাব পত্তন করিয়া ছয়ঘরিয়া মত স্থাপন করেন।

মদনগোপালের দুই সুত--দেওয়ান রাধাকান্ত রায় ও দেওয়ান রত্নেশ্বর রায়। রত্নেশ্বরের বংশ অদ্যাপি বর্তমান আছে। রাধাকান্তের তিন সুত-- দেওয়ান তারাকান্ত, শিবকান্ত ও ভোলাকান্ত (অপর নাম উমা কান্ত রায়)। এই তিন ভ্রাতার ভাগিনেয় সর্বজন পরিচিত ধার্মিক ঁরামতনু লাহিড়ী এবং তাঁহার ভ্রাতা কেশবচন্দ্র লাহিড়ী, লক্ষ্মীপ্রসাদ লাহিড়ী এবং কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী।

ভোলাকান্তের দুই পুত্র-- উমেশচন্দ্র ও দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায। উমেশচন্দ্রের জামাতা ব্যারিস্টার মাননীয় মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্তী।

দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় কুলীনে কন্যা দান করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র প্রসিদ্ধ কবিনাট্যকার জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি। ঁজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার অধুনা সঙ্গীতবিদ্যায় জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন।

বাৎস্যগোত্র ভট্টশালী গাঞি মহীধরের বংশ ময়ূরভট্টের ধারা

মহীধর হইতে এই বংশ গণনা করা হইয়া থাকে। মহীধরের পুত্র ময়ূরভট্ট। ময়ূরভট্টের বাণভট্ট, বাচস্পতি, মেরু, সমুচ্চভট্ট ও উর্জসভট্ট নামে পাঁচ পুত্র। বাণভট্টের পুত্র নীলমেঘ। নীলমেঘের উধাই ও ফণাধর নামে দুইপুত্র। ফণাধর বা কন্যাবির পুত্র দানবারি। দানবারির ইতিহাস (সিমীতল), পুরন্দর (বায়রা), ভূতনাথ (বায়েরা) ও দিগম্বর নামে চারিপুত্র। ইতিহাসের চারিপুত্র--নিধিপতি, বাপিমিশ্র, যদুনন্দন ও কবিকর। নিধিপতির আসাই ও আদাই নামে দুই পুত্র। আসাইয়ের চারিপুত্র--মীনকেতন হাজরা, শ্রীধর, গৌরীধর ও ধরণীধর। মীনকেতনের পুত্র উদ্ধব। তৎপুত্র পরমানন্দ। পরমানন্দের দুই পক্ষে রঘুনাথ, যদুনাথ, ভবাই, কাশীনাথ ও লোহাই নামে পাঁচপুত্র। রঘুনাথের পুত্র গোবিন্দ। তৎপুত্র জয়রাম। জয়রামের চারিপুত্র--কামদেব, মাধব, মধু ও গোপীরমণ। কামদেবের পুত্র হরিশঙ্কর।

ভবাইয়ের পুত্র শতানন্দ। তৎপুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথের পাঁচ পুত্র--রামেশ্বর, দুর্গাপ্রসাদ, কাশীশ্বর, নন্দরাম ও কৃষ্ণদেব। রামেশ্বরের বিশ্বেশ্বর, রামদেব, জয়দেব, রুদ্রদেব, সূর্যনারায়ণ ও রামচন্দ্র নামে ছয় পুত্র। দুর্গাপ্রসাদের চারিপুত্র---কামদেব হরিদেব, জীবননারায়ণ ও রামনারায়ণ। কামদেবের তিন পুত্র--কানু বলরাম ও মঙ্গল। বলরামের শঙ্কর, রঘুনন্দন ও রামানন্দ নামে তিন পুত্র। হরিদেবের দুই পুত্র- মানিক ও রামভদ্র। মাণিকের শম্ভুচন্দ্র, ব্রজনাথ ও গোপীনাথ নামে তিন পুত্র। গোপীনাথ কড়ুয়াজানি গিয়া বাস করেন।

লোহাইয়ের কুশল নামে এক পুত্র। তাঁহার পুত্র রমাই। তৎপুত্র গঙ্গাপ্রসাদ। গঙ্গাপ্রসাদের দুই পুত্র—রামকৃষ্ণ ও রাজীব। রামকৃষ্ণের পুত্র রামেশ্বর। তৎপুত্র শুকদেব। রাজীবের পুত্র কালিকাপ্রসাদ। তাঁহার রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে দুই পুত্র।

সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ভট্টশালী গাঞি-- সিদ্ধান্ত বংশ

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মীরপুর গ্রামের (পূর্বনিবাস মুর্শিদাবাদ) সিদ্ধান্ত বংশ প্রসিদ্ধ। ময়ূরভট্ট হইতে এই বংশের গণনা হইয়া থাকে। ময়ূরভট্টের পুত্র বাণভট্ট। তৎপুত্র নীলমেঘ। নীলমেঘের চারিপুত্র-- ইতিহাস, পুরন্দর, ভুতনাথ ও দিগম্বর। দিগম্বরের পুত্র রাঘব ও ত্রিপুরারি। রাঘবের পুত্র রঘুনন্দন ; তৎপুত্র পরমানন্দ, তৎসুত জয়রাম। জয়রামের বাসুদেব। বাসুদেবের পুত্র ভবানী। তৎপুত্র বিশ্বনাথ; তৎপুত্র কুশানন। তৎপুত্র গোবিন্দ; তৎপুত্র শঙ্কর। শঙ্করের কামদেব নামে এক পুত্র। কামদেবের পুত্র কৃষ্ণদেব। তৎপুত্র অনন্ত। তৎসুত দুর্গাচরণ। তাঁহার পুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথের পুত্র জগজ্জীবন। তৎপুত্র কৃপারাম পঞ্চানন (স্ত্রী ভগবতী দেবী)। কৃপারামের পুত্রের নাম কালীচরণ বিদ্যাবাগীশ। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার গৌরীচরণ ও কাশীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত নামে দুই পুত্র জন্মে। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রামনাথ সার্বভৌম নামে এক পুত্র জন্মে। রামনাথের পুত্র হরচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৎপুত্র ঈশানচন্দ্র। ঈশানচন্দ্রের দুই পুত্র-- সুরেন্দ্র ও হেমেন্দ্র।

গৌরীচরণের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার (স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী)। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র-- ঈশ্বর, ভগবান (স্ত্রী বামাসুন্দরী) ও গৌরচন্দ্র। ভগবানের পুত্র- শশীভূষণ। শশীভূষণের প্রিয়বালা ও সরযূবালা নামে দুই কন্যা এবং ইন্দুভূষণ ও বিধুভূষণ নামে দুই পুত্র।

কাশীনাথ তর্কসিদ্ধান্তের (স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী) দুই পুত্র ও চারি কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম শিবচন্দ্র (স্ত্রী চন্দ্রকলা দেবী) ও গঙ্গাগোবিন্দ সিদ্ধান্ত (স্ত্রী কাশীশ্বরী দেবী)। কন্যাগণের নাম তারামণি (স্বামী অমৃত রায় সাং ধামরাই), উমা (স্বামী কালাচাঁদ চক্রবর্তী , সাং বেতকা বিক্রমপুর), ভৈরবী (স্বামী শম্ভুনাথ মৈত্র সাং পাইকপাড়া, বিক্রমপুর) ও দুর্গা (স্বামী রামসুন্দর মৌলিক সাং ধামরাই।

শিবচন্দ্রের পুত্র কালীহর। গঙ্গাগোবিন্দ সিদ্ধান্তের হরিহর (স্ত্রী বিমলাসুন্দরী), মহেন্দ্র নাথ (স্ত্রী বগলাসুন্দরী) অবনীনাথ (স্ত্রী মৃণ্ময়ী ও ষোড়শীবালা) ও অবিনাশ।

হরিহরের সাত পুত্র ও দুই কন্যা, পুত্রগণের নাম যামিনীরঞ্জন, মনোরঞ্জন, সত্য, দক্ষিণা, প্রিয়, প্রভাত ও নিত্যরঞ্জন। যামিনীরঞ্জনের পুত্র সুনীতকুমার ও গোস্বামী। অবিনাশের পুত্র জগদীশ ও জ্যোতীন্দ্র। অবনীনাথের পুত্র--বীরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, নগেন্দ্র ও শচীন্দ্র।

বিক্রমপুরের পাইকপাড়া গ্রামস্থ ভট্টশালী বংশ

এই বংশ বর্তমানে ভট্টশালী বলিয়া পরিচিত, কিন্তু বিক্রমপুর বারেন্দ্র-সমাজে ইঁহাদিগকে ভাড়িয়াল বলিয়াও জানে। ভাড়িয়াল কষ্টশ্রোত্রিয়, ভট্টশালী সিদ্ধশ্রোত্রিয়।

এই বংশের পূর্বপুরুষ দেবীদাস রাজশাহী অঞ্চল হইতে রাজা টোডরমল্লের বঙ্গাগমন কালে এই অঞ্চলে আগমন করেন বলিয়া পরিবার মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি আছে। দেবীদাসের না কি তিন খানা হাত ছিল, দুইটি স্বাভাবিক হস্ত, অপর একটি ক্ষুদ্রায়তন অকর্মণ্য হস্ত না কি দক্ষিণ বাহুর মূলদেশ হইতে ঝুলিয়া থাকিত। দেবীদাস প্রথমে মিরকাসিমের হাটের নিকটস্থ বামন ভিটা নামক স্থানে বাড়ি করেন। খালের ঘাটে তদগত

চিত্তে সন্ধ্যাবন্দনায় নিযুক্ত দেবীদাসকে দেখিয়া বজরা আরোহণে খাল দিয়া যাইবার সময় টোডরমল্লের শ্রদ্ধা হয় এবং দেবীদাস দান গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে দেবীদাসের পুত্র বিশ্বনাথ শর্মার নামে তিনি এক খানি তালুক নিষ্কর করিয়া দিয়া যান। অদ্যাপি পাইক পাড়ায় ভট্টশালীগণ তালুক বিশ্বনাথ শর্মা নামে পরিচিত এই তালুক ভোগ করিতেছেন।

দেবীদাসের তিন পুত্র বিশ্বনাথ, বলরাম ও গঙ্গারাম। বিশ্বনাথের চারিপুত্র রাঘব, রমাবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ ও হরিবল্লভ। হরিবল্লভের তিন পুত্র গৌরীপ্রসাদ, নন্দরাম ও বিষ্ণুরাম। গৌরীপ্রসাদের পুত্র সৃষ্টিধর, তৎপুত্র রামকান্ত, তৎপুত্র নটবব ও শিবনাথ। নটবরের তিন পুত্র গৌরীশঙ্কর, রামদুলাল ও রামরূপ। গৌরীশঙ্করের চারিপুত্র অভয় কাশী, মহিম ও গোবিন্দ। অভয়ের পুত্র আনন্দ ও শশীকুমার। আনন্দের পুত্র জিতেন্দ্র ও হরেন্দ্র। কাশীর পুত্র দেবীপ্রসাদ। মহিমের পুত্র বরদাকান্ত, তৎপুত্র উপেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, প্রফুল্ল।

রামরূপের পুত্র রোহিণীকান্ত ও অক্ষয়চন্দ্র। রোহিণীকান্তের পুত্র চন্দ্রকান্ত ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম এ। অক্ষয়চন্দ্রের পুত্র হন জগদীশ, সুধীর ও দীনেশ।

হাটুরিয়ার ভীমকালিহাই রাজা দেবীদাস রায়ের বংশ

বাৎস্যগোত্রীয় ধরাধরের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ জয়মান মিশ্র ভীমকালিহাই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে জয়মানমিশ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মীধর মহারাজ বল্লাল সেনের সভায় উপস্থিত থাকিয়া কৌলীন্য মর্যাদা প্রাপ্ত হন। জয়মানের অপর নাম ছিল ভীম। তিনি রাজগুরু হওয়ার কালিহাই গ্রাম প্রাপ্ত হন। সেই জন্য তাঁহার বংশধরগণ ভীমকালিহাই গ্রামী বলিয়া পরিচিত হয়েন। কালিহাই গ্রাম গৌড়ের সন্নিকটে ছিল। মালদহে কালিয়াচক নামে যে গ্রাম আছে, সম্ভবত উহাই প্রাচীন কালে কালিহাই গ্রাম নামে পরিচিত ছিল।

জয়মান মিশ্রের পৌত্র নারায়ণ রাজগুরু ছিলেন। ইনি রাজার নিকট হইতে যে ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন, তাহা তাঁহার বংশধরগণ এখনও ভোগ করিতেছেন।

নারায়ণের অষ্টম অধস্তন পুরুষ অনন্ত বাঙ্গাল ওঝা নামে খ্যাত হন। কেননা তিনি কালিহাই গ্রাম ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গের বোয়ালিয়া গ্রামে বাস করেন। আধুনিক ভীমকালিহাইগণ তাঁহার সন্তান। অনন্তের পুত্র অচ্যুতানন্দ নিজের চেষ্টায় অনেক সম্পত্তি অর্জন করেন। ইনি বোয়ালিয়ার সমাজপতি হইয়াছিলেন। অচ্যুতানন্দের পৌত্র ঠাকুর কুশলী।

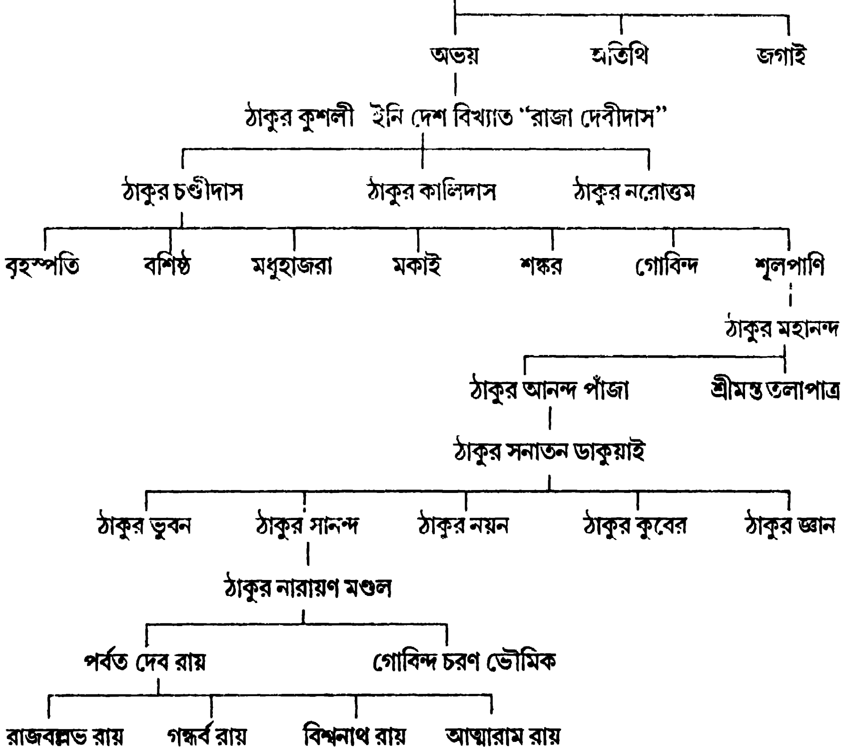
ঠাকুর কুশলীই দেশবিখ্যাত 'রাজা দেবীদাস'। ইনি কৌলীন্য হারাইয়া প্রথমে কাপ হয়েন। ইনি বহু সম্পত্তি অর্জন করিয়া বোয়ালিয়ার আবাস ত্যাগ করেন ও পাবনা জেলার দক্ষিণপূর্ব ভাগে আত্রেয়ী নদীতীরে ছাতক নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। ছাতক এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে গৌড়ের বাদশাহ সোলেমান কররানির সেনাপতি উমেরু খাঁন ছাতক আক্রমণ করিলে বৃদ্ধ রাজা দেবীদাস তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্তিক রায় ও বংশের অন্যান্য প্রধান ব্যক্তির সহ যুদ্ধে নিহত হয়েন। রাজমহিলারা ইঁদারায় প্রাণ বিসর্জন দিয়া সতীত্ব রক্ষা করেন।

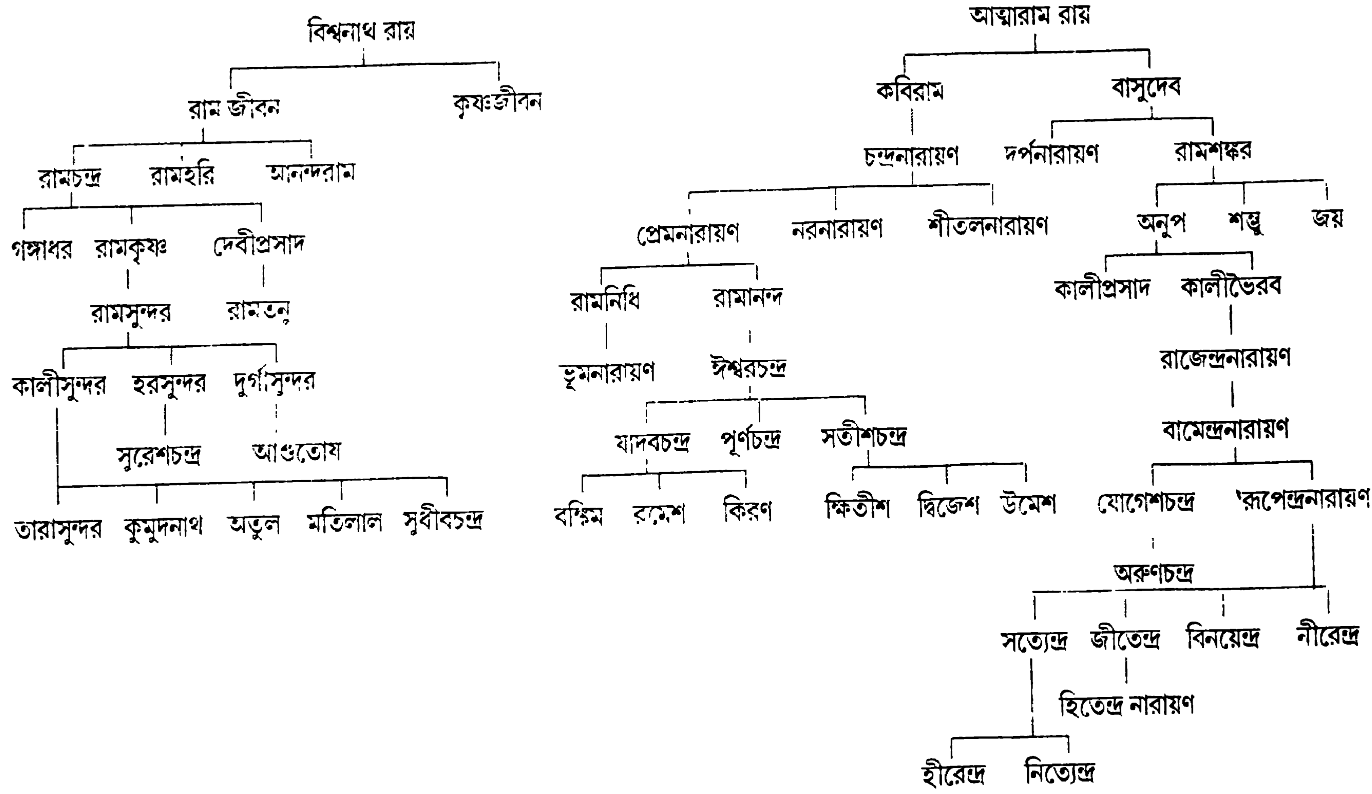
কার্তিক রায়ের শিশুপুত্র পুরোহিত হরু ঠাকুরের হস্তে সমর্পিত হয়েন। ভবিষ্যতে ঐ শিশু রাজা ভবানীপ্রসাদ নামে পরিচিত হইয়া চাঁদ প্রতাপের রাজা হয়েন। তিনি যে পুরোহিতের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ছিলেন বলিয়া

ভবানীপ্রসাদ রাঢ়ীয় শ্রেণীভুক্ত হয়েন। ঢাকা জেলার রোয়াইলের রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জমিদারেরা অদ্যাপি রোয়াইলের কাশ্যপ বলিয়া খ্যাত। রাজা দেবীদাসের দুই পুত্র কাশী রায় ও কেশব রায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া রক্ষা পান। বাদশাহ তাঁহাদিগকে ছাতকের সন্নিকটে লাখেরাজ প্রদান করেন। অদ্যাপি লাখেরাজপুর নামক গ্রাম ইঁহাদের বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন। আমিনপুরের ও এলাচিপুরের মিঞারা উক্ত দুই ভ্রাতার সন্তান।

দেবীদাসের অপর তিন পুত্র চণ্ডীদাস, কালিদাস ও নরোত্তম ভোলা নাপিতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা করেন। ইঁহারা সাবালক হইয়া পুরনায় পৈতৃক জমিদারি উদ্ধার করেন। কালীদাস অত্যন্ত দুর্দান্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া সর্বদা প্রজাপীড়ন ও দেশ মধ্যে উপদ্রব করিতেন। এমন কি সময় সময় জাহাঙ্গীর নগর হইতে গৌড় নবাবের খাজনা যাওয়ার সময় পথে উহা লুণ্ঠন করিতেন। এইরূপ লুণ্ঠনের কথা নবাবের কর্ণগোচর হইলে, রাজা কালিদাস অষ্টাদশ পুত্র সহ নিহত হয়েন। কেবলমাত্র লখাই ফৌজদার নামক পুত্র ভৃত্যের বেশে পলায়ন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার সন্তানগণ কাশীনাথপুর, খেতুপাড়া, পাকুড়িয়া, শঙ্কর পাশায় রায় ও বালিয়াকান্দির চৌধুরী বলিয়া পরিচিত।

ভীম কালিহাই রাজা দেবীদাসের বংশ




বিশ্বনাথ রায়
রাম জীবন
কৃষ্ণজীবন
রামচন্দ্র
রামহরি
আনন্দরাম
গঙ্গাধর
রামকৃষ্ণ
দেবীপ্রসাদ
রামসুন্দর
রামতনু
কালীসুন্দর
হরসুন্দর
দুর্গাসুন্দর
সুরেশচন্দ্র
আশুতোষ
তারাসুন্দর
কুমুদনাথ
অতুল
মতিলাল
সুধীবচন্দ্র
আত্মারাম রায়
কবিরাম
বাসুদেব
চন্দ্রনারায়ণ
দর্পনারায়ণ
রামশঙ্কর
প্রেমনারায়ণ
নরনারায়ণ
শীতলনারায়ণ
অনুপ
শম্ভু
জয়
রামনিধি
রামানন্দ
কালীপ্রসাদ
কালীভৈরব
ভূমনারায়ণ
ঈশ্বরচন্দ্র
রাজেন্দ্রনারায়ণ
যাদবচন্দ্র
পূর্ণচন্দ্র
সতীশচন্দ্র
বামেন্দ্রনারায়ণ
বঙ্কিম
রমেশ
কিরণ
ক্ষিতীশ
দ্বিজেশ
উমেশ
যোগেশচন্দ্র
রূপেন্দ্রনারায়ণ
অরুণচন্দ্র
সত্যেন্দ্র
জীতেন্দ্র
বিনয়েন্দ্র
নীরেন্দ্র
হিতেন্দ্র নারায়ণ
হীরেন্দ্র
নিত্যেন্দ্র

কালিদাসের ভ্রাতা নরোত্তমের বংশধরগণ সাকুলা, সারাজিয়া, বেলতৈল, দৌলতপুর ও এলাসিনের রায় নামে খ্যাত। কালিদাসের জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা চণ্ডীদাসের প্রথম পুত্র বৃহস্পতি। তাঁহার সন্তানেরা করঞ্জার ব্রহ্মচারী। তাঁহার তৃতীয় পুত্র মধু হাজরার বংশধরগণ কারিকোলার মৌলিক। তাঁহার চতুর্থ পুত্র শঙ্করের বংশধরগণ ভারেঙ্গার চৌধুরী। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শূলপাণির দুই পৌত্র ঠাকুর আনন্দ পাঁজা ও শ্রীমন্ত তলাপাত্র। শ্রীমন্তের সন্তানেরা ধোপাঘাটার ভট্টাচার্য। এই বংশের গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য রঙ্গপুরের জজ পণ্ডিত ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার শাস্ত্র বিচার হইয়াছিল।

ইটাকুমারী-নিবাসী ঠাকুর কালিদাসের বংশ

রঙ্গপুর জেলাস্থ ইটাকুমারীর ঠাকুর কালিদাসের বংশে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। বাৎস্যগোত্রীয় ধরাধরের অষ্টাদশ অধস্তন পুরুষ ঠাকুর কালিদাস। তিনি ঠাকুর কুশলী বা রাজা দেবীদাসের পুত্র। রাজা দেবীদাস কৌলীন্য হারাইয়া কাপ হয়েন। কালিদাসের দুই পুত্র নাতাই ও দাসাই ফৌজদারের পদ পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ মহামহোপাধ্যায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ উদীচ্য ভট্টাচার্য। রাজারায় কর্তৃক আহূত হইয়া রামকৃষ্ণ রঙ্গপুর জেলার ইটাকুমারী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। রামকৃষ্ণ 'উদীচ্য ভট্টাচার্য' নামে বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে যে রামকৃষ্ণের সম্মুখে সহসা একদিন সরস্বতী দেবীর আবির্ভাব হয়। রামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ আর্যাচ্ছন্দে স্বরচিত শ্লোকপঞ্চকে সরস্বতীকে স্তব করেন। দেবী তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় কবিত্ব শক্তি প্রদান করেন এবং গ্রন্থকাররূপে যশ অর্জন করিবার বর দেন। তিনি আরও বলেন যে রামকৃষ্ণ হইতে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত এই বংশের লোকেরা স্বাভাবিক কবিত্ব-সম্পন্ন হইবেন। এই প্রবাদ নবদ্বীপের বৃদ্ধ পণ্ডিতেরা এখনও বলিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের ন্যায় 'শুদ্ধিকৌমুদী' প্রভৃতি অনেকগুলি স্মৃতিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগ্রন্থ এবং পূর্বমীমাংসা দর্শনের 'অধিকরণ কৌমুদী' নামক প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য যে যে বিষয়ের মীমাংসা করেন নাই ও যে যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, মহামহোপাধ্যায় উদীচ্য ভট্টাচার্য সেই সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি মীমাংসা দর্শনের অবলম্বিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের কোন কোন সিদ্ধান্তের খণ্ডনও করিয়াছেন। উদীচ্য ভট্টাচার্যের প্রদর্শিত অনেক ব্যবস্থা রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তৎকৃত 'অধিকরণকৌমুদীর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণের তিন পুত্র-- রুদ্রেশ্বর, রত্নেশ্বর ও ভুবনেশ্বর; কনিষ্ঠ ভুবনেশ্বরের বংশই পাণ্ডিত্য প্রতিভায় সমধিক উজ্জ্বল। ভুবনেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেশ্বর খ্যাতিমান পণ্ডিত ছিলেন। জরাগ্রস্ত হইয়াও কাকিনার রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। কাকিনার রাজা তাঁহাকে বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করেন। দেবেশ্বর প্রথমে তাহা গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে তিনি দেখিলেন যে সম্পত্তি ব্যবস্থা করিতে যাইয়া তাঁহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও ধ্যান ধারণার বিঘ্ন হয়। তাই তিনি সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া মাত্র চারি টাকা মাসিক বৃত্তিতে সন্তুষ্ট রহেন। তিনি স্মার্ত রঘুনন্দন কৃত 'শুদ্ধিকৌমুদী' ও উদীচ্য ভট্টাচার্য কৃত উক্ত নামের অপর একখানি গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেন। ইহাতে ছাত্রদের অধ্যয়নের বিশেষ সুবিধা

হয়। অনেক ধনী ব্যক্তি তাঁহাকে বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি সেই বৃত্তি ভোগ করিতেছেন।

দেবেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র লোকেশ্বরও পিতার ন্যায় পাণ্ডিত্যসম্পন্ন ছিলেন। তিনি রানি অন্নপূর্ণার সহিত পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথক্ষেত্রে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে যখন দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন, তখন ভূতলে একখানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েন। তাহা পাঠ করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়। এই গ্রন্থের নাম জানা যায় নাই।

দেবেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম গঙ্গেশ্বর। তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র রামকান্ত ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। রামকান্তের দ্বিতীয় পৌত্র ঈশ্বরকান্ত পাণ্ডিত্য প্রতিভায় সকলের আদরণীয় হইয়াছিলেন। তৎকৃত 'কাতন্ত্রকারিকা' কাতন্ত্রব্যাকরণের ব্যাখ্যা স্বরূপ। 'কাতন্ত্রকারিকা' অধুনা 'আশুবোধব্যাকরণ' নামে পরিচিত।

দেবেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণেশ্বর মাঘের 'শিশু পাল' বধের একটি টীকা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ঐ টীকা ছাত্রগণের উপকার সাধন করিয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় উদীচ্য ভট্টাচার্যের প্রপৌত্র হরিনারায়ণ সিদ্ধান্তের পুত্র আনন্দেশ্বর ভট্টাচার্য। আনন্দেশ্বরের পুত্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্নের নাম কেবলমাত্র বঙ্গদেশে নহে ভারতবর্ষের সর্বত্র সুপরিচিত। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ আছে। তিনি একাধারে কবি, পণ্ডিত ও সমাজসংস্কারক ছিলেন। কাশীধামে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য এম-এ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও 'সারনাথের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা।

উদীচ্য ভট্টাচার্যে রামকৃষ্ণের প্রপৌত্র রামশঙ্কর বিদ্যামণি, তাঁহার দুই পুত্র-ভবানীশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং মহাকবি ও নৈয়ায়িক কেশবেশ্বর তর্কপঞ্চানন। কেশবেশ্বরের পুত্র রাজশাহীর প্রসিদ্ধ উকিল মহেশ্বর ভট্টাচার্য; তাঁহার চারি পুত্র ও চারি কন্যা। পুত্রগণের নাম--শৈলেশ্বর, যোগেশ্বর, যতীশ্বর ও অতুলেশ্বর।

উদীচ্য ভট্টাচার্যের প্রপৌত্র ইন্দ্রেশ্বর চূড়ামণি। চূড়ামণির পুত্র--ধনেশ্বর, জ্ঞানেশ্বর, হারাধন ও হরকান্ত বিদ্যাভূষণ। হরকান্ত বিদ্যাভূষণের পুত্র--দুর্গাকান্ত, কালীকান্ত ও মাধবেশ্বর, মাধবেশ্বরের পুত্র রজনীশ্বর। বিদ্যাভূষণের ভাগিনেয় হইতেছেন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক। রামানন্দ পঞ্চানন ও বিখ্যাত নৈয়ায়িক রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার। বিদ্যাভূষণের দৌহিত্র খ্যাতনামা দার্শনিক রাজেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্ররত্ন।

উদীচ্য ভট্টাচার্য রামকৃষ্ণের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ক্ষিতীশ্বর ভট্টাচার্যের পাঁচ পুত্র--দুর্গেশ্বর বিদ্যাবাগীশ, রূপেশ্বর, তারিণীশ্বর, গৌরীশ্বর ও মহাকবি শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার। শ্রীশ্বরের পুত্র গোপালেশ্বর এবং নানা গ্রন্থ রচয়িতা পণ্ডিতবর কোকিলেশ্বর বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থ এম-এ। কোলিলেশ্বরের পুত্র ব্রহ্মেশ্বর ও মানেশ্বর।

চতুর্দশ অধ্যায়

ভরদ্বাজগোত্র উচ্ছরাখ গাঞি—সুসঙ্গ রাজবংশ

ময়মনসিংহ জেলার উত্তর প্রান্তে গারো পাহাড়ের পাদদেশে সুসঙ্গ রাজ্য অবস্থিত। খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সুসঙ্গ-রাজবংশ স্বাধীন ও প্রতাপশালী ছিলেন। স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবার পরও ইঁহারা বঙ্গের সামাজিক ও রাজনীতিক ইতিহাসের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। সুসঙ্গ রাজবংশের ইতিহাস বাঙ্গলার ইতিহাসের একাংশ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে (৬৮৬ বঙ্গাব্দে) সোমেশ্বর পাঠক নামক ভরদ্বাজগোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণ, কামাখ্যাদি তীর্থ দর্শন করিয়া পার্বতীয় পথে ফিরিবার সময় সুসঙ্গর উত্তরবর্তী গারো পর্বতের নিকট আসিয়া বিশ্রাম করেন। তিনি যে শিলাখণ্ডদ্বয়ের উপর বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি 'দেওশিলা' নামে পূজিত হইতেছে। তিনি স্থানীয় ধীবরগণের অনুরোধে অত্যাচারী গারো সর্দার বাইসা গারোকে পরাজিত করেন। তিনি বাইসা গারোর অধিকৃত স্থানগুলি নিজের শাসনে আনিয়া তাহাকে মাত্র বাণাঝুড়ি ও মান্দোগাড়া নামক দুইখানি গ্রাম প্রদান করেন। এইরূপে সোমেশ্বর পাঠক সুসঙ্গ রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া স্বদেশ হইতে আত্মীয়স্বজন ও সুশিক্ষিত অনুচরবর্গকে আনয়ন করেন। তাহাদের সহায়তায় পার্শ্ববর্তী জোয়ারদারগণের জোতগুলি অধিকার করেন। তদ্ব্যতীত হো সেন-প্রতাপ পরগনা ও নাস্তিং পুঞ্জির রাজার সহিত সন্ধিসূত্রে নংমিন্, নাংলু , নংসুপ্য ও রংচু নামক গ্রামগুলি লাভ করেন। তিনি নিকটবর্তী নদীর গতি ফিরাইয়া নিজ রাজধানীর পার্শ্ব দিয়া উহা প্রবাহিত করান এবং নিজ নামানুসারে তাহার নাম সোমেশ্বরী নদী রাখেন। তাঁহার পূজিত শালগ্রাম আজও সুসঙ্গ রাজবংশে অর্চিত হইতেছেন। সোমেশ্বর পাঠক অশোককুঞ্জস্থিত কয়েকজন সাধুর উপদেশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া স্বরাজ্যের নাম সুসঙ্গ রাখেন। তিনি ৭১৪ বঙ্গাব্দে একমাত্র পুত্র বুদ্ধিমন্ত পাঠককে বর্তমান রাখিয়া পরলোকে গমন করেন।

বুদ্ধিমন্ত বুদ্ধিমান ও সুচতুর ছিলেন। পিতার জীবিতকালে তিনি নবাব নাসির উদ্দীনের সৌহার্দ্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে বুদ্ধিমন্ত খাঁ উপাধি প্রদান করেন। তিনি রাজা হইয়া সুসঙ্গের চতুর্দিকের দস্যু তস্করাদি দমন করেন। তিনি জোয়ারদারগণকে পুনরায় পরাজিত করেন এবং ৭১৯ বঙ্গাব্দে বড়েবাড়ি ও ৭২০ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্টের বংশীকুণ্ডা পরগনা দখল করেন। তিনি উচ্চকুল ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিজ কন্যাকে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া নবাব নাসির উদ্দীন্‌কে সুপাত্র প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। নবাব শ্রীনিবাস মৈত্র নামক জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সন্তানকে পাঠাইয়া দেন। বুদ্ধিমন্ত তাঁহার সহিত প্রথমা কন্যাকে বিবাহ দিয়া নিজ রাজ্যে প্রভূত সম্পত্তি দিয়া তাঁহাকে বাস করান। সেই সময় হইতে সুসঙ্গ রাজপরিবারের কন্যাগণের বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। বুদ্ধিমন্ত প্রথমে সুসঙ্গে হস্তীখেদা বা হাতী ধরার প্রথা প্রবর্তন করেন।

বুদ্ধিমন্তের পুত্র কানাই হাজরা, পৌত্র বাসুদেব খাঁ ও প্রপৌত্র জগদানন্দ খাঁর সময়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা হয় নাই। জগদানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র মল্লিক জানকীনাথ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের পুত্র ইন্দ্রজিতের সহিত তিনি নিজ কন্যার বিবাহ দেন। এই সামাজিক বন্ধনে তিনি 'উদয়াচল' খ্যাতি লাভ করেন। বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে আটটি পটী আছে তাহার প্রত্যেকের সঙ্গেই সুসঙ্গ রাজকন্যাদের বিবাহ হইতে পারে এই নিয়ম করিয়া তিনি 'সর্বদ্বারিক' খ্যাতি লাভ করেন। এখনও সুসঙ্গ রাজপরিবারের সামাজিক নায়কত্ব খ্যাতি আছে।

জানকীনাথের মৃত্যুর পর রঘনাথ রাজপদে আরূঢ় হয়েন। তিনি অত্যন্ত বলশালী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বলবত্তার অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একবার বওলার জোয়ারদার রঘুনাথকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ দেন। বিবাহের রাত্রে রঘুনাথ বাসরঘরে তাঁহার পত্নীর মুখে এই গুপ্ত ষড়যন্ত্র কথা জানিতে পারিয়া নবপরিণীতা বধূকে পিঠে করিয়া শত্রুবেষ্টিত গৃহ হইতে অবলীলাক্রমে চলিয়া আসেন। এই ঘটনার পর হইতে সুসঙ্গ রাজকুমারগণের বিবাহের সময় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যাইবার প্রথা হইয়াছে। রঘুনাথের বিরুদ্ধে বওলার জোয়ারদারগণ, জঙ্গলবাড়ির দেওয়ান সাহেব, চাঁদ রায়, কেদার রায় প্রভৃতি ষড়যন্ত্র করেন। এই সকল প্রবল শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া রঘুনাথ মান সিংহের সহায়তায় জাহাঙ্গীর বাদশাহের শরণাপন্ন হয়েন। এই সময় হইতেই সুসঙ্গ রাজবংশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। রঘুনাথ চাঁদ রায় ও কেদার রায়কে মানসিংহের নিকট ধরাইয়া দেন ও চাঁদ রায়ের গৃহদেবতা দুর্গাদেবীকে (দশভূজাদেবী) নিজ রাজধানীতে স্থাপন করিয়া রাজধানীর নাম দুর্গাপুর রাখেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ তাঁহার কার্যের জন্য পুরস্কৃত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে ১০১৬ হিজরী সনে ৩৫০ শত নায়েবের শাসক ও পঞ্চহাজারী মনসবদারী প্রদান করিয়া তাঁহাকে বলবন্ত সিংহ উপাধি দেন। রাজা রঘুনাথ অনেক কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ঢাকায় রঘুনাথ (রামসীতা) বিগ্রহ স্থাপন, ঠাটারী বাজার, ওয়ারী, আমলীগোলা ও কামরাঙ্গার চরে স্বত্ব স্থাপন, কাশীধামে গৃহ নির্মাণ তথা মাতৃকুণ্ড, পিতৃকুণ্ড স্থাপন, রাজধানীর অনতিদূরে মাধবপুর গ্রামে মঠ স্থাপন ও সফুর গ্রামে শিবস্থাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রঘুনাথের মাতা কমলাদেবী রাজধানীর অনতিদূরে সাগরদীঘি নামক এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করান, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন আছে।

রাজা রঘুনাথের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামনাথ রাজা হন। তিনি দিল্লীতে সনন্দ আনিতে গেলে জাহাঙ্গীর তাঁহার অপর ছয় ভ্রাতার নামেও অন্য ছয় পরগনার সনন্দ দিতে চাহেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করিয়া বলেন যে ভ্রাতারা আসিয়া সনন্দ লইবে। দেশে ফিরিয়া তিনি দেখিতে পান যে ভ্রাতৃগণ রামজীবন, রামকৃষ্ণ ও যাদবেন্দ্র এই তিন ওয়ারিশ রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তখন তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হয়েন। নিজের পুত্র না থাকায় মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র রামজীবনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন ও যাদবেন্দ্রকে কয়েকটি তালুক দেন। অবশেষে এই তালুক হরিরাম ভাদুড়ী ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হয়েন। সুসঙ্গের জমিদারির অংশ উল্লেখ করিলে এই তালুকের মালিকগণের সম্মান বৃদ্ধি হইবে বিবেচনায় রাজা রাজসিংহের অনুমতি লইয়া ইঁহারা

দশশলা বন্দোবস্তের সময় এই তালুককে সুসঙ্গের দুই আনি ছয় অংশ বলিয়া লেখান। কিন্তু ইহা সুসঙ্গের জমিদারির অংশ নহে। ..... পৃষ্ঠায় দু' আনীর বংশলতা দেওয়া হইল।

রামজীবন শাহজাহানের রাজত্বের শেষ ভাগে সুসঙ্গের সিংহাসনের অধিকারী হয়েন। তিনি দিল্লীতে কর স্বরূপ আগর কাষ্ঠের পরিবর্তে নগদ রাজস্ব প্রদান করেন।[১]

রামজীবন হাতীখেদার কার্যে বিশেষ উন্নতি করেন ও অনেক পার্বত্য জন্তু বধ করিয়া রাজ্য নিরুপদ্রব করেন। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামকৃষ্ণ রাজা হয়েন।

রামকৃষ্ণের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামসিংহ রাজা হয়েন। তিনি বিদ্রোহী হইলে মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁহাকে বলপূর্বক ১৭৩৫ খ্রি অব্দে এক মুসলমান-কন্যার সহিত বিবাহ দেন ও তাঁহার নাম আবদুল রাখেন। কিন্তু রামসিংহের হিন্দু পত্নী নিজ পুত্র রণ সিংহকে রাজা করিয়া রাজ্য চালাইতে থাকেন। রাম সিংহের মুসলমান পত্নীর গর্ভজাত কন্যা তারা বিবির সহিত সিন্দুর-আটীয়া গ্রামের জনৈক মল্লিক উপাধিধারী মু সলমানের বিবাহ হয়।

রণ সিংহের পর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কিশোর সিংহ রাজা হন। কিশোর ও তাঁহার ভ্রাতা রাজ সিংহের উপর রাজস্ব অনাদায় হেতু ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ঢাকাস্থ কর্মচারিরা অত্যন্ত অত্যাচার করেন; এমন কি নাবালক রাজা ও তাঁহার ভাইকে ঢাকায় লইয়া যাইয়া তোপমুখে উড়াইয়া দিবার আদেশ দেন। কিন্তু রাজার বিশ্বস্ত ভৃত্য বাঞ্ছারাম কৌশলে তাঁহাদিগকে লইয়া ঢাকা হইতে সুসঙ্গে পলাইয়া আসেন। কিশোর সিংহ বাঞ্ছারামকে অনেক জায়গীর দিয়া পুরস্কৃত করেন।

কিশোর সিংহের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর রাজসিংহ সিংহাসনাধিরোহণ করেন (১৭৮৭ খ্রি অঃ)। রাজ সিংহ সুকবি ও ধার্মিক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'ভারতী মঙ্গল', 'রাগমালা', 'সংক্ষিপ্ত মনসার পাঁচালী ও ঢাকা গমনের একটি খণ্ড কবিতা পাওয়া যায়। তিনি দিল্লীবাসী এক আলেখ্য বিক্রেতার নিকট হইতে রাগরাগিণীর একখানি অতি সুন্দর চিত্র ক্রয় করিয়া উহার বর্ণনামূলক 'রাগমালা' গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মণিপুর হইতে অনেক মণিপুরী আসিয়া সুসঙ্গে বাস করিতে থাকেন।

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজা রাজ সিংহ পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ রাজা হয়েন। তিনি বলবান ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা গোপীনাথ ও জগন্নাথ কালেক্টারীতে নিজ নিজ নাম জারী করিয়া পৃথক ভাবে তহশীলাদি কার্য আরম্ভ করেন। এই দুই ভ্রাতার স্ত্রী বিধবা হইয়া সুসঙ্গের অংশ পৃথক করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। জগন্নাথের স্ত্রী রানি ইন্দ্রমণি শ্রীকৃষ্ণ নামে এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৩৭ খ্রি অব্দে বিশ্বনাথের সহিত লেকং দাওবাক্, সিজু, হেমকিং ও সিঞীজুরা নামক গারো মহাল লইয়া ইংরাজ গভর্নমেন্টের সহিত মোকর্দমা উপস্থিত হয়। গভর্নমেন্ট উক্ত স্থানগুলি তাঁহার জমিদারিভুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন।

বিশ্বনাথের পর তাঁহার পুত্র রাজা প্রাণকৃষ্ণ রাজা হন। তিনি নিজের প্রখর বুদ্ধিবলে সরিকানী বিবাদ সত্ত্বেও রাজ্য রক্ষা করেন। রানি ইন্দ্রমণি দত্তক অসিদ্ধের মামলায় জয়লাভ করিয়া ১/৩ অংশ জমিদারি দখল করেন। গোপীনাথের বিধবা রানি হরসুন্দরী তাঁহার ১/৩ অংশ জমিদারি লইবার জন্য আদালতের সাহায্য নেন। কিন্তু রাজা প্রাণকৃষ্ণ এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করেন যে সুসঙ্গ পরিবারের কৌলিক প্রথা অনুযায়ী জ্যেষ্ঠ

পুত্রই একমাত্র উত্তরাধিকারী। তিনি ১২৭২ সনে রামকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, জগৎকৃষ্ণ ও শিবকৃষ্ণ নামক চারি পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

রাজা প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সুসঙ্গ রাজপরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্রই যে একমাত্র উত্তরাধিকারী, এই প্রথা আদালতের বিচারে রদ হয়। তদনুসারে রানি হরসুন্দরীর দুই কন্যা সুসঙ্গ জমিদারি ১/৩ অংশের অধিকারিণী হইলেন এবং রাজকৃষ্ণাদি চারি ভ্রাতা বাকি সম্পত্তি তুল্যাংশে ভাগ করিয়া নেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট ২২ আইন দ্বারা গারো পাহাড় দখল করিয়া নেন। রাজা রাজকৃষ্ণ মাত্র দেড় লক্ষ টাকা লইয়া গারো পাহাড়ের উপর অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ফাল্গুন রাত্রি কালে তস্কর কর্তৃক দশভূজাদেবী অপহৃতা হন। ১২৯৮ সালের ১০ই বৈশাখ এক জঙ্গল মধ্যে দশভূজাদেবীকে আবার পাওয়া গেলে পুনরায় তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে রাজকৃষ্ণ ব্যক্তিগতভাবে 'মহারাজ' উপাধি পান এবং ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বংশপরম্পরায় মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হন।

তিনি ১২৯৭ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে কুমুদচন্দ্র, নীরদচন্দ্র, নগেন্দ্রচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র নামে চারি পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র কুমুদচন্দ্র মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপুত্র মহারাজ ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বর্তমান সুসঙ্গের রাজা বলিয়া পরিচিত। বিগত ১৩০৪ বঙ্গাব্দে প্রবল ভূমিকম্পে সুসঙ্গ-রাজবাটীর পূর্বতন রাজপ্রাসাদ সমূহ ও প্রাচীন কীর্তিগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অধুনা সুসঙ্গ-রাজপরিবারের প্রায় সকলেই ইংরাজি শিক্ষিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। (২৭৮ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য)।

ভরদ্বাজ গোত্র সিদ্ধ শ্রোত্রিয় নাড়িয়াল গাঞি—অদ্বৈত প্রভুর বংশ পরিচয়

কনোজাগত তিথিমেধার পুত্র গৌতম হইতে অধস্তন ১৬শ পুরুষে আরু ওঝা নাড়িয়াল (৭৮ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ দ্রষ্টব্য)। আরু ওঝার পুত্র যদু পণ্ডিত, সুধাকর ও জটাধর। যদু-পণ্ডিতের পুত্র শ্রীপতি। শ্রীহট্টের লাউড়পতি সূর্যসিংহ শ্রীপতিকে আনাইয়া নবগ্রামে স্থাপন করেন। তৎপুত্র কুলপতি, তৎপুত্র ঈশান[২]। ঈশানের পুত্র বিভাকর, তৎপুত্র প্রভাকর। প্রভাকরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ নরসিংহ নাড়িয়াল। ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশে লিখিত আছে--

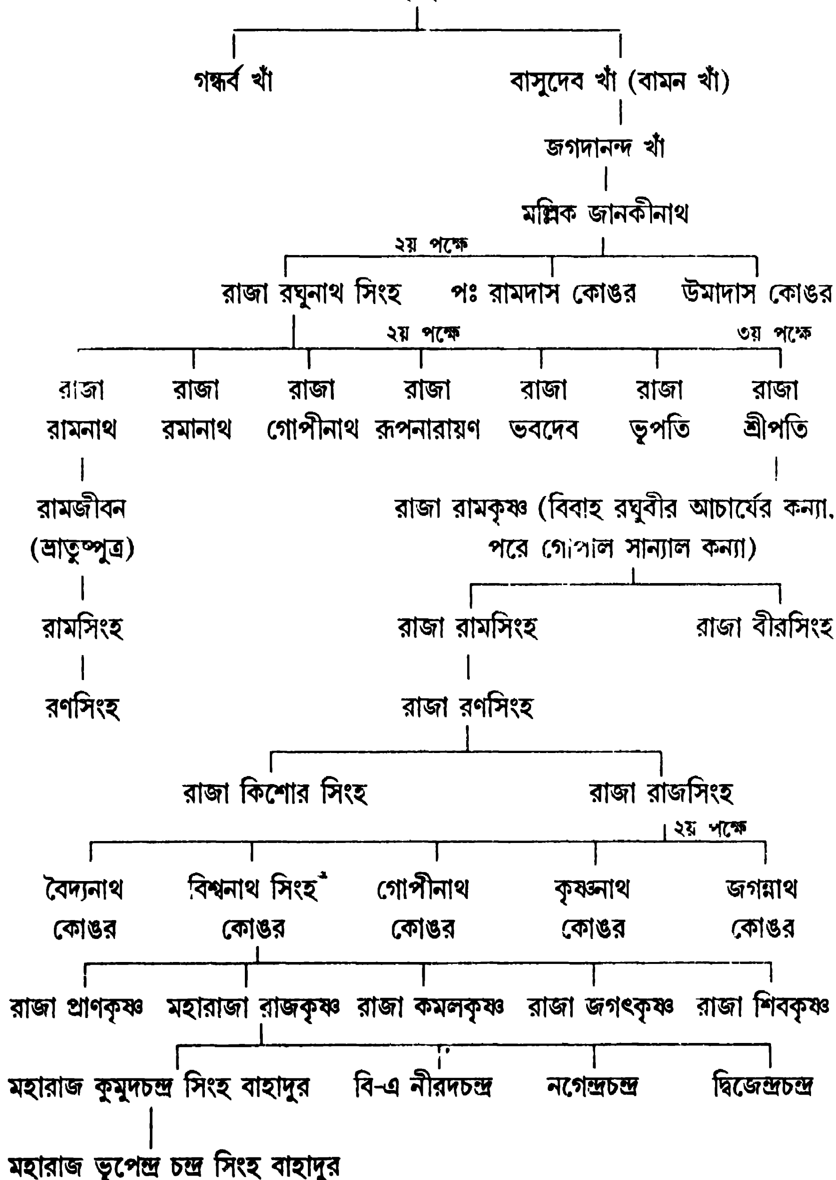
যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত। সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার বংশজাত।।
যেই নরসিংহ যশ ঘোষ ত্রিভুবন। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ।।
যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা। গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈল রাজা।
যার কন্যা বিবাহে হয় কাপের উৎপত্তি। লাউর প্রদেশে হয় যাহার বসতি।।'

উপযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন তৎকালে কেহ সহজে রাজমন্ত্রী হইতে পারিতেন না। নর সিংহ যে একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল রাজকীয় বলিয়া নহে, সামাজিক ব্যাপারেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।

তৎকালে সামাজিক ব্রাহ্মণ সকলেই একযোগে আহার করিতেন, কোন ব্রাহ্মণের আসিতে বিলম্ব হইলে, অনুসন্ধান করিয়া না আসার কারণ অবগত হইয়া সকলে আহারে বসিতেন। এইরূপ এক সামাজিক ভোজে নর সিংহ নাড়িয়ালের আসিতে অধিক বিলম্ব

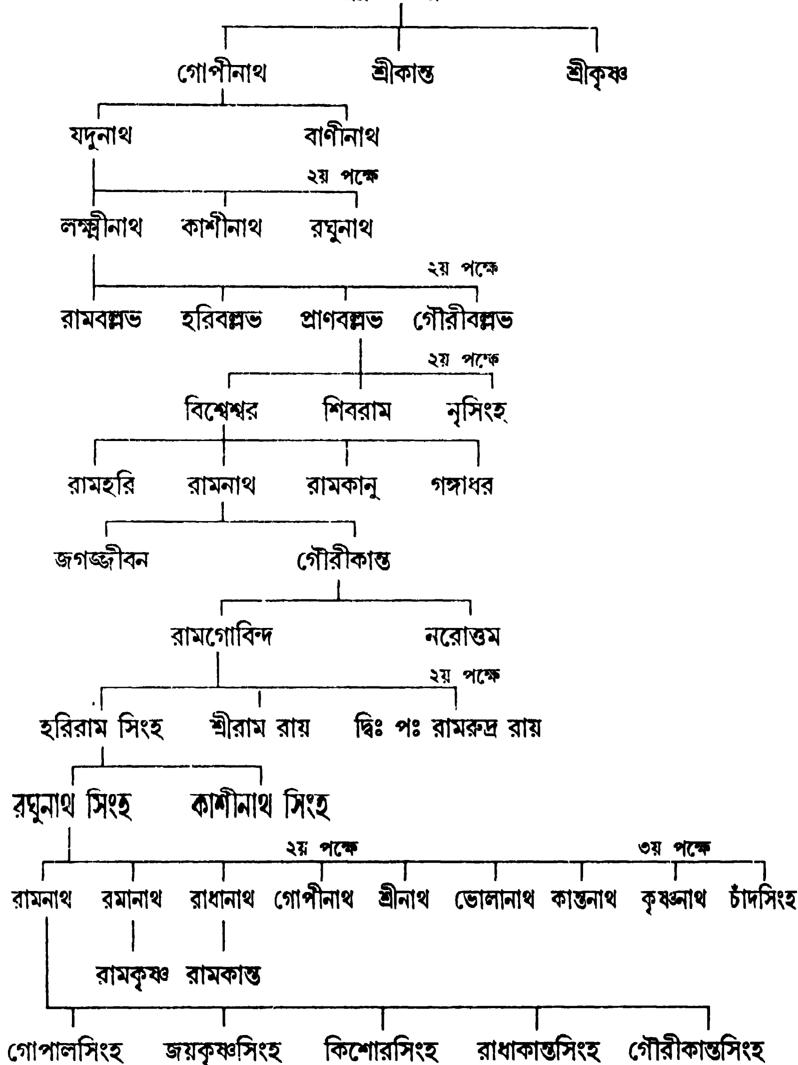
ভরদ্বাজ গোত্র—উচ্ছরখি গাঞি—সুসঙ্গের রাজবংশ

বিনায়ক উচ্ছরখি তৎপুত্র, পরীক্ষিৎ তৎপুত্র মধুসূদন মিশ্র, তৎপুত্র দক্ষ, তৎপুত্র বিলক্ষণ, তৎপুত্র বীর, তৎপুত্র পিপড়ওঝা, তৎপুত্র মনাইওঝা, তৎপুত্র কেশাইওঝা, তৎপুত্র সোমেশ্বর পাঠক (সুসঙ্গে বাস), তৎপুত্র রক্ষিত ও বুদ্ধিমন্ত খাঁ, বুদ্ধিমন্তের পুত্র কামাই হাজরা



সুসঙ্গের ভাদুড়ী রাজবংশ*

মুকুন্দ ভাদুড়ী



* ১৬০ পৃষ্ঠায় এই বংশের সংক্ষিপ্ত বংশলতা দেওয়া হইয়াছে।

হওয়ায়, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একজন কুলীন বলিলেন যে নর সিংহ নাড়িয়াল মধুই মৈত্র কি মিঞাই বাগচি নহেন যে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবেক। এস, সকলে ভোজন করা যাউক। এই কথায় ব্রাহ্মণেরা আহারে বসিলেন। ইতিমধ্যে নর সিংহ নাড়িয়াল আসিয়া সমস্ত শুনিলেন। নর সিংহ আহার করিতে না গিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মধু মৈত্রের সহিত যেরূপেই হউক করণ করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া একখানি নৌকাতে শালগ্রাম, গাভী, তাঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে আরোহণ করিয়া মধু মৈত্রের বাসভূমি গুড়নৈ গ্রামে মধু মৈত্রের ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মধু মৈত্র স্নান ও তর্পণাদি করিবার জন্য সেই ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। নর সিংহ মধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'মহাশয়! মধু মৈত্রের বাড়ি কোন স্থানে? মধু বলিলেন, 'আমারই নাম মধু মৈত্র, আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন বলুন।' নর সিংহ নাড়িয়াল বলিলেন, 'আমি কন্যাদায়গ্রস্ত, আপনার সহিত করণ করিব, আমার এই কথা।' নৌকায় কন্যাকে অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া বলিলেন, 'এই কন্যা আপনাকে সম্প্রদান করিব।' মধু মৈত্র বলিলেন 'আপনি শ্রোত্রিয়, আপনার সহিত করণ করিয়া আপনার কন্যা গ্রহণে আমি অপারগ।' ইহা শুনিয়া নাড়িয়াল গভীর জলে মাঝিকে নৌকা লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। নৌকাবাহক নদীর মধ্যস্থলে নৌকা লইয়া গেল। তখন নর সিংহ মধুকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আপনি যদি আমার সহিত করণ না করেন, তাহা হইলে এই নৌকায় শালগ্রাম, গাভী ও স্ত্রী, বালকবালিকা এবং আমি ব্রাহ্মণ সকলেই এই নৌকা ডুবাইয়া দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব।' এই বলিয়া নৌকা ডুবাইবার উপক্রম করিলেন। মধু মৈত্র তর্দ্দর্শনে বিবেচনা করিলেন, কুল গেলে মানুযের ক্ষতির কারণ নাই, সমাজে হীন হওয়া মাত্র; কিন্তু ধর্ম গেলে মনুষ্যের কিছুই থাকিল না, কুলের জন্য ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা এবং শালগ্রাম-শিলা জলমগ্ন হইতেছে, অতএব কুলরক্ষায় প্রয়োজন নাই, ধর্মরক্ষা করাই শ্রেয়। এইরূপ চিন্তা করিয়া মধু নরসিংহ নাড়িয়ালকে বলিলেন, 'আমি তোমার সহিত করণ করিতেছি। তুমি নৌকা ঘাটে লইয়া আইস।' মধু মৈত্র নর সিংহ নাড়িয়ালের সহিত সেই ঘাটে করণ করিয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিলেন।

বারেন্দ্র-কুল গ্রন্থে কোন এক স্থানে লেখা আছে—নরসিংহ নাড়িয়ালের পিতা মাতা তাঁহার শৈশব কালেই পরলোক গমন করেন। তিনি পাখা বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি নিজ বুদ্ধি বলে গৌড়ের রাজা গণেশের মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

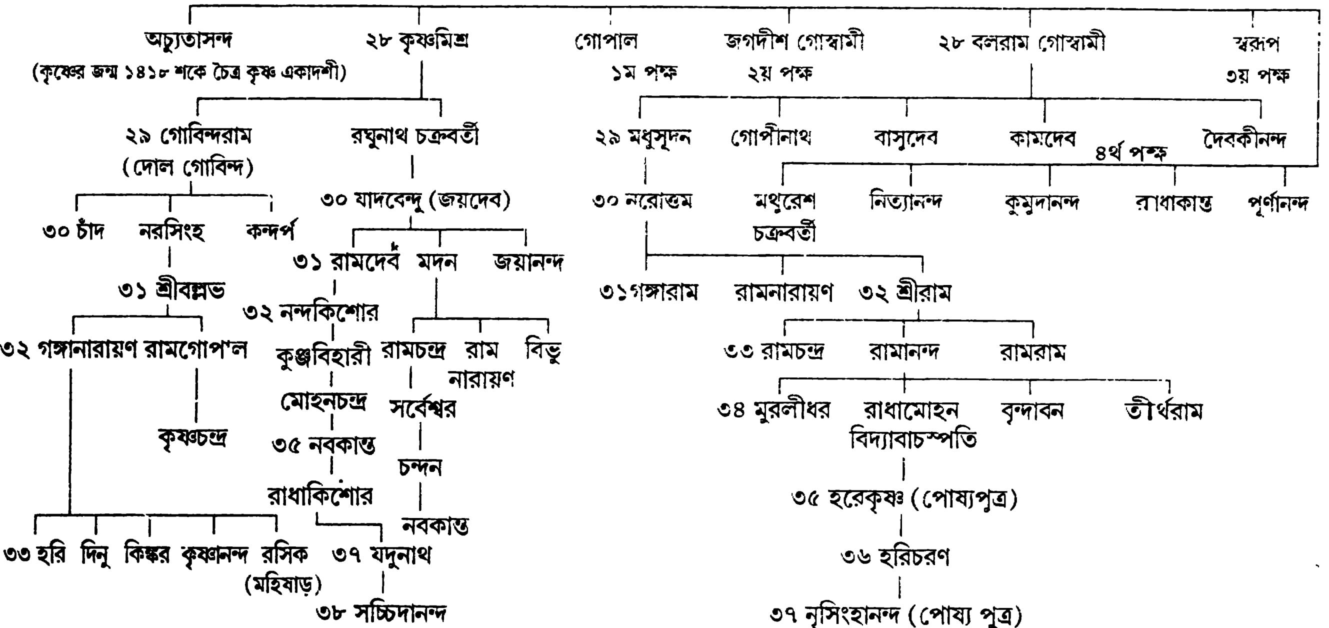
নরসিংহের পুত্র বিদ্যাধর, তৎপুত্র ছ'কড়ি, তৎপুত্র কুবেরাচার্য তর্কপঞ্চানন। কুবের আচার্য গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। কুবের আচার্যের ঔরসে নাভা দেবীর গর্ভে প্রভু অদ্বৈতাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীচৈতন্য দেব যেরূপ বিষ্ণুর অবতার, অদ্বৈত প্রভুও সেইরূপ শিবের অবতার বলিয়া পরিচিত।

যাঁহার আহ্বানে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নদীয়ায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, শান্তিপুরের গোস্বামি প্রবর সেই অদ্বৈতাচার্য প্রভুর বিস্তৃত পরিচয় এই সামাজিক ইতিহাসে উপযুক্ত স্থানাভাব। তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় দিতে হইলে, একখানি বৃহৎগ্রন্থ লিখিতে হয়। ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশ, হরিচরণ দাসের অদ্বৈত মঙ্গল, বীরেশ্বর কৃত অদ্বৈত বিলাস ও দিগ সিংহের বাল্যলীলাসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে অদ্বৈত প্রভুর বিস্তৃত জীবনী বিবৃত হইয়াছে। যে সকল প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকথা বর্ণিত

হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থেই অদ্বৈত প্রভুর প্রসঙ্গ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও নিত্যানন্দ প্রভুর পরই শ্রীল অদ্বৈত গোস্বামী পূজিত হইয়া আসিতেছেন। অদ্যাপি অদ্বৈত প্রভুর বংশধরগণ শান্তিপুর শিবালয়, ও উথলিগ্রামে প্রধানত বাস করিতেছেন। এখনও এই বংশের শাখা প্রশাখা ঢাকা, ময়মনসিংহ কোচবিহার, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর, বগুড়া, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন ও নামকীর্তন প্রচার দ্বারা অদ্বৈত প্রভুর নাম স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্বৈত প্রভুর পৌত্র দোলগোবিন্দকে ঈশান নাগরের বংশধর শান্তিপুর হইতে শিবালয়ে আনিয়া স্থাপন করেন। তাঁহার অধস্তন ৫ম পুরুষে রত্নেশ্বর নাটোরের ব্রহ্মত্র পাইয়া ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত উথলী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। দোলগোবিন্দের বংশধরগণ মধ্যে এক শাখা শিবালয়ে থাকেন, এবং দুইভাগ উথলী আসেন, উথলী গ্রামেও উত্তর পাড়া ও দক্ষিণ পাড়ায় দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের যত্নে উত্তর পাড়া, মধ্য পাড়া ও দক্ষিণ পাড়ায় শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রত্নেশ্বরের পৌত্র রামচন্দ্র হইতে মধ্যপাড়ার বড় আটানী ও লক্ষ্মীনারায়ণ হইতে মধ্যপাড়ার ছোট আটানী ঘর হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকিশোর হইতে কাটোয়ার বড় প্রভু ও ছোট প্রভু ঘর বাহির হইয়াছে। উথলীতে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের ধারায় বর্তমান ২৬ ঘর হইয়াছে। এই বংশের পঞ্চম দোলপর্ব পূর্ব বঙ্গে বিখ্যাত। উখলীর দোলমঞ্চ তিনটির প্রত্যেকটি সুবৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ। এই পঞ্চম দোল উপলক্ষে দিবসত্রয় ব্যাপী মহামহোৎসব হইয়া থাকে। ২৮০ অদ্বৈতাচার্য প্রভুর বংশলতা প্রদত্ত হইল।

১. দিল্লীর বাদশাহ হইতে রাজা রামজীবন যে সকল পারসী সনদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার একটি তর্জমা করিয়া এখানে দেওয়া গেল—
"জিসান, আলীসান রমেহেব শাহে সুজা। তারিখ ৭ই সাবান সন ১০৬২ হিজরী। মোঃ ২৪এ মাহ্ শহর এলাহী ১৬ জুলুস। জুবদতল্ আম্ আসান্ অল্ একবান্ রামজীবন জমিদার সুসঙ্গ। যে বিষয়ে তুমি উমেদার ছিলে তৎসম্বন্ধে জানিবে। তুমি সরকারী আদিষ্ট কার্যাদি সরবরাহ করিবার নিমিত্ত যে প্রস্তুত হইয়াছ, তাহা মহম্মদ বাদরের আরজী দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে। কড়ইবাড়ির জমিদারি কেদারের জিম্মায় ছিল। নানা কারণ বশত তাহার প্রতি বিরক্তি জন্মায়, তাহাকে ঐ জমিদারির কার্য হইতে বিচ্যুত করিয়া উহা তোমাকে দেওয়ার অনুমতি করা গেল। তোমার কর্তব্য যে তুমি অত্র সরকারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া আগর কাষ্ঠের সরবরাহ করিবা ও খাজানা আদায় কার্যে বিশেষ যত্ন করিয়া তাহা পঁহুছাইতে থাকিবে। যে সকল নানকর, রুসুম ও চৌধুরাই জমিদারি কেদার মজুমদারের তহুরূপে ছিল, তাহা সমস্ত তোমাকে অর্পণ করা গেল। তোমার উচ্চ সম্মানের জন্য পূর্ব মুনসেফের অতিরিক্ত একশত জোত ও ২৫ সোয়ার অতিরিক্ত দেওয়া গেল। তুমি মনোযোগ করিয়া কার্য করিলে বিশেষ লাভবান হইবে। এই জমিদারির কর রীতিমত আদায় করিবে। দিন দিন এইরূপ উৎকৃষ্ট কার্য করিলে তোমার কার্যকারিতা এ পক্ষের নিকট প্রকাশ হইবে।"

২. গৌড়ে ব্রাহ্মণ ও তদনুবর্তী সম্বন্ধনির্ণয়কার এই ঈশানের নাম ছাড়িয়া গিয়াছেন। ভারেঙ্গা ও চক চণ্ডীপুরের পুঁথিতে এই নাম পাওয়া গিয়াছে।



১ কুলশাস্ত্র দীপিকার মতে ২৮ কৃষ্ণ মিশ্রের পুত্র ২৯ দোলগোবিন্দ ও রঘুনাথ। দোলগোবিন্দের পুত্র ৩০ গোপীনাথ, তৎপুত্রে ৩০ জগদানন্দ, তৎসুত ৩২ প্রাণবল্লভ, তৎপুত্র ৩৩ রত্নেশ্বর, তৎপুত্র ৩৪ কৃষ্ণরাম। কৃষ্ণরামের বংশধর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার পরবর্তী বংশপরিচয় এইরূপ পাঠাইয়াছেন— কৃষ্ণরামের দুই পুত্র ৩৫ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণর পুত্র ৩৬ নবকিশোর, দুলাল ও গোবিন্দচন্দ্র। গোবিন্দের ছয় পুত্র মধ্যে ২য় কৃষ্ণকুমার, কৃষ্ণকুমারের পুত্র ৩৮ ঈশান, তৎপুত্র ৩৯ বেণীমাধব, তৎপুত্র ৪০ প্রিয়নাথ গোস্বামী বি. এ.।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখায় জানা যায়, হিন্দু যুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি সম্পর্কে কোন বিবরণ পাওয়া না গেলেও, ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল প্রাচীনকাল থেকেই। গুপ্তযুগে বাংলার প্রায় সর্বত্রই ছিল ব্রাহ্মণদের বসবাস। "... তাম্রশাসন ও শিলালিপি হইতে দেখা যায় যে পরবর্তীকালে বিদেশ হইতে আগত বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ এদেশে স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছেন, আবার এদেশ হইতেও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ অন্য দেশে গিয়েছেন। কালক্রমে বাংলার ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, শাকদ্বীপী প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। রাজর্ষি অথবা ধনী লোক ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি, কখনও বা সমস্ত গ্রাম দান করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেন। এই সমুদয় গ্রামের নাম হইতে ব্রাহ্মণের গাঁঞীর সৃষ্টি হয় এবং ইহা তাঁহাদের নামের শেষে উপাধিস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এই রূপে বন্দ্যঘটী, মুখটী, গাঙ্গুলি প্রভৃতি গ্রামের নাম বা গাঁঞী হইতে বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি সুপরিচিত উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে। পুততুণ্ড, পিপলাই, ভট্টশালী, কুশারী, মাসচটক, বটব্যাল, ঘোষাল, মৈত্র, লাহিড়ী প্রভৃতি উপাধিও সম্ভবত এইরূপে উদ্ভুত হইয়াছে। হিন্দুযুগের অবসানের পূর্বেই যে বাংলায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ এবং গাঁঞী প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ....

"রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কুলজীর উক্তি সংক্ষেপত এই : 'গৌড়ের রাজা আদিশূর বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, কারণ, বাংলার ব্রাহ্মণেরা বেদে অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই পঞ্চব্রাহ্মণ স্ত্রী-পুত্রাদিসহ বাংলাদেশে বসবাস করেন এবং আদিশূর তাঁহাদের বাসের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। কালক্রমে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল, তাহার ফলে কতক রাঢ়দেশে, কতক বরেন্দ্রভূমে বাস করিতে লাগিলেন। পরে মহারাজা বল্লাল সেনের রাজ্যকালে বাসস্থানের নাম অনুসারে তাঁহারা রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র নামে দুইটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। কালক্রমে তাঁহাদের বংশধরেরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইল। আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতিশূরের সময় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মোট সংখ্যা হয় ঊনষাট। ক্ষিতিশূর তাঁহাদের বাসের জন্য ঊনষাটখানি গ্রাম দান করেন। এই গ্রামের নাম হইতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের গাঁঞীর উৎপত্তি হইয়াছে। রাজা ক্ষিতি শূরের পুত্র ধরাশূর এই সমুদয় ব্রাহ্মণদিগকে মুখ্য কুলীন, গৌণ কুলীন এবং শ্রোত্রিয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ মহারাজা বল্লাল সেনের সময় কুলীন, শ্রোত্রিয় ও কাপ এই তিনভাগে বিভক্ত হন। তাহাদের গাঁঞীর সংখ্যা একশত।"

রমেশচন্দ্র বলেছেন, বিভিন্ন কুলজী গ্রন্থে ওপরের বক্তব্য সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী উক্তি লক্ষ্য করা যায়। এই কুলগ্রন্থ যোড়শ শতকের আগে রচিত নয়। সে কারণে বাংলার ব্রাহ্মণদের ইতিহাস রচনায়ও অনির্ভরযোগ্য। মজুমদার লিখেছেন : "... কুলজীর মতে আদিশূর কর্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের পূর্বে বাংলায় মাত্র সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন।

তাঁহাদের বংশধরেরা সপ্তশতী নামে খ্যাত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ সমাজে বিশেষ হীন বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কালক্রমে সাতশতী ব্রাহ্মণ বাংলাদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং পরবর্তীকালে আগত বৈদিক প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ ব্যতীত, বাংলাদেশের প্রায় সকল ব্রাহ্মণই কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চব্রাহ্মণের সন্তান। এই উক্তি বা প্রচলিত মত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বা ততোধিক ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই। কারণ, তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, মধ্যদেশ হইতে আগত বহু ব্রাহ্মণ এদেশে এবং ভারতের অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছেন। ইহারা বাংলাদেশে ব্রাহ্মণদের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। বাসস্থানের নাম অনুসারে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র প্রভৃতি বিভিন্ন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে, ইহাও সঙ্গত ও স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়। কৌলিন্য মর্যাদার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কুলগ্রন্থের বর্ণনাও অধিকাংশই কাল্পনিক এবং অতিরঞ্জিত। বাংলায় বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও বিশেষ সম্মানভাজন। ইঁহারা দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ন্যায় ইহাদের কোন গাঁঞী বা কৌলিন্য প্রথা নাই।" —বৈদিক ব্রাহ্মণদের কুলজী গ্রন্থাদিতে তাদের আগমন সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য আছে। কারও মতে গৌড়ের রাজা শ্যামল বর্মা পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে এদেশে আনয়ন করেন। এবং তাদের গ্রাম দান করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এরা পাশ্চাত্য নামে খ্যাত। অন্য কুলজী গ্রন্থে রাজার নাম শ্যামল বর্মা নয়, হরিবর্মা। দাক্ষিণাত্য বৈদিকরা বলেন, আর্যাবর্তে মুসলিম অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বেদাদি শাস্ত্র চর্চা হ্রাস পায়। দাক্ষিণাত্যে এমন বেদাদি শাস্ত্রচর্চা প্রবল ছিল। তখন বাংলার ব্রাহ্মণরা দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণদের সাদরে এদেশে নিয়ে আসেন।

রমেশচন্দ্র বাংলার ব্রাহ্মণদের আলোচনা প্রসঙ্গে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও সারস্বত ব্রাহ্মণদের উল্লেখ করে বলেছেন : 'বাংলায় গ্রহ-বিপ্র নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। ইহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়াও পরিচিত। ইহাদের কুলপঞ্জিকায় উক্ত হইয়াছে যে, গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক রোগাক্রান্ত হইয়া বৈদ্যগণের চিকিৎসায় সুফল না পাওয়ায় সরযু নদীর তীরবাসী জপ-যজ্ঞপরায়ণ দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া গ্রহযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন ও রোগমুক্ত হন। রাজার আদেশে ইঁহারা সপরিবারে গৌড় দেশে বাস করেন। ইঁহারা শাকদ্বীপবাসী মার্তণ্ডাদি আটজন মুনির বংশধর। গরুড় শাকদ্বীপ হইতে ইহাদের পূর্বপুরুষগণকে মধ্যদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন।

'এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি শ্রেণীর ব্রাহ্মণও সম্ভবত হিন্দুযুগে বাংলায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বল্লাল সেন তাঁহার গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে অনুমিত হয় যে, তিনি সারস্বত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কুলজী অনুসারে অন্ধ্ররাজ শূদ্রক সরস্বতী নদীর তীর হইতে তাহাদিকে আনয়ন করেন। কুলজী গ্রন্থে ব্যাস পরাশর, কৌণ্ডিণ্য সপ্তশতী প্রভৃতি অন্য যে সমুদয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর উল্লেখ আছে, তাহার কোনটিই যে প্রাচীন হিন্দুযুগ বাংলায় বিদ্যমান ছিল, ইহার বিশ্বস্ত প্রমাণ এখনও পর্যন্তও পাওয়া যায় নাই।

(বাংলাদেশের ইতিহাস। প্রথম ভাগ—প্রাচীন যুগ—রমেশচন্দ্র মজুমদার। পৃঃ ১৯৫ ১৯৭)

নীহাররঞ্জন রায়

"... পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলাদেশে ব্রাহ্মণদের কিছু অভাব ছিল না, বেদাঙ্গচর্চাও যথেষ্টই ছিল; অষ্টম শতকের আগেই বাংলার সর্বত্র অসংখ্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বসবাস হইয়াছিল। আর অষ্টম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অসংখ্য ব্রাহ্মণ যেমন বাংলায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, তেমনই বাংলার ব্রাহ্মণ-কায়স্থেরা বাংলার বাইরে গিয়াও বিচিত্র সম্মাননা লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গজ ব্রাহ্মণদের কোনও কাহিনী কুলশাস্ত্রগুলিতে নাই, অথচ (পূর্ব) বঙ্গেও অনেক ব্রাহ্মণ গিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং সম্ভবত বৈদিক ও গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণদের অস্তিত্বের খবর অন্যতর স্বতন্ত্র সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতেও পাওয়া যায়। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র একান্তই ভৌগোলিক...; বৈদিক ব্রাহ্মণদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আদিশূর-পূর্ব লিপি প্রমাণ বিদ্যমান; আর গ্রহবিপ্রেরা তো বাহির হইতে আগত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়। ইহাদের সম্পর্কে কুলজীর ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক এবং অনৈতিহাসিক। ... আদিশূর কাহিনী এবং কৌলীন্য প্রথার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের গাঁঞী বিভাগও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। গাঁঞীর উদ্ভব গ্রাম হইতে; যে গ্রামে যে ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপন করিতেন তিনি সেই গ্রামের নামানুযায়ী গাঁঞী পরিচয় গ্রহণ করিতেন। বন্দ্য, ভট্ট, চট্ট প্রভৃতি গ্রামের নামের সঙ্গে উপাধ্যায় বা আচার্য জড়িত হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পদবীর সৃষ্টি। বস্তুতঃ বন্দ্য, চট্ট ব্রাহ্মণদের এইসব গ্রামনামায় পরিচয় অষ্টম শতক-পূর্ব লিপিগুলিতে দেখা যাইতেছে। কাজেই এইসব গাঁঞী পর্যায়-পরিচয় স্বাভাবিক ভৌগোলিক কারণেই উদ্ভূত হইয়াছিল এবং তাহার সূচনা ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই দেখা গিয়াছিল - আদিশূরকাহিনী বা কৌলিন্য প্রথার সঙ্গে উহাকে যুক্ত করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ...

(বাঙালি হিন্দুর বর্ণভেদ—নীহাররঞ্জন রায়। পৃঃ ১৭-১৯)

অতুল সুর

যদিও খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকেই বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তবুও গুপ্তযুগের পূর্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাংলাদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। বস্তুত, গুপ্তযুগেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণরা এসে বাংলাদেশে বসবাস শুরু করেছিল। সমসাময়িক তাম্রপট্টসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে, এসময় বাংলার চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য বহু ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হয়েছিল এবং মন্দির নির্মাণ করাও হয়েছিল। এইসকল লিপি থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, এই সকল ব্রাহ্মণ বেদের বিভিন্ন শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বৈদিক যজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপাদি সম্পন্ন করা সম্বন্ধে তাদের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। সাধারণত এই সকল ব্রাহ্মণ 'শর্মা' ও 'স্বামিন' উপাধি ধারণ করত। ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'গাঁই' প্রথারও প্রচলন ছিল। 'গাঁই' বলতে সেই গ্রামকে বোঝাতো যে গ্রামে এসে তারা প্রথম বসবাস শুরু করেছিল। এইসকল 'গাঁই'-এর নাম (যেমন ভট্ট, চট্ট, বন্দ্যো ইত্যাদি) পরবর্তীকালে উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

...পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু সেন রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ ধর্মের স্তম্ভস্বরূপ। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় তাঁরা যথেষ্ট প্রয়াসী হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত পূজা-

অর্চনাদি ও যাগযজ্ঞ সম্পাদনে তাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন। এই সময়ের সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য পুনরায় ঘটে। তাঁরা স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের অনুশাসন অনুযায়ী বিধান দিতে থাকেন এবং এই সকল বিধান সমাজকে ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে। এই যুগেই রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ছাড়া বৈদিক শাকদ্বীপী প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ছড়াছড়ি ঘটায় এই যুগে নতুন করে ব্রাহ্মণ্য সমাজ সংগঠিত হয় এবং কিংবদন্তী অনুযায়ী সেনরাজা বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে গাঁই-এর প্রাধান্য এই যুগে পরিলক্ষিত হয় এবং বন্দ্যো, চট্ট, মুখটী, ঘোষাল, পূতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি, কাঞ্জিলাল ও কুন্দলাল—এরা প্রধান বা 'মুখ্যকুলীন' হিসাবে পরিগণিত হয়। রাঢ়ী, গুড়, মাহিন্ত, কুলভী, চৌতখণ্ডি, পিপ্পলাই, গড়গড়ি, ঘণ্টাসরী, কেশরকোণা, দিমসাই, পরিহল হাড়, পিতমুণ্ডী ও দীর্ঘতি—এরা হয় গৌণ কুলীন। বাকি ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হয়। রাঢ়ীয়দের ৫৫টি গাঁই (কারোর মতে ৫২ বা ৫৯)। আর বারেন্দ্রদের ১০০টি গাঁই। কিন্তু কিংবদন্তী অনুযায়ী বল্লাল সেন কর্তৃক মাত্র পাঁচটি বারেন্দ্র গাঁই, যথা—লাহিড়ী, বাগচী, মৈত্র, সান্যাল ও ভাদুড়ি কুলীন বলে স্বীকৃত হয়। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, যথা সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, সাধ্য শ্রোত্রিয় ও কাস্বক্ষত্রিয়।

এখানে পরবর্তীকালে রচিত কুলপঞ্জিকাসমূহে বিবৃত এক কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কাহিনী অনুযায়ী গৌড়ের রাজা আদিশূর একটি যজ্ঞ সম্পাদনা করবার সংকল্প করে কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আনেন। বাংলাদেশে সাতশতী, বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণী ছাড়া আর যত ব্রাহ্মণ বর্তমানে আছে, তারা সকলেই এই পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধর। এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পাঁচজন ভৃত্য আসে বর্তমান বাংলার কুলীন কায়স্থগণ তাদের মধ্যে চারজনের বংশধর। কুলগ্রন্থসমূহে আদিশূরকে বল্লাল সেনের মাতামহ বলা হয়েছে। কিন্তু পণ্ডিত মহলে আদিশূর কর্তৃক এই পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য বলে গ্রহণ করা হয়নি। তবে আদিশূর নামে বাংলাদেশে যে কোনও রাজা ছিলেন না, বা তিনি কোনও যজ্ঞ সম্পাদন করেননি বা তা অলীক বলে মনে করবার সপক্ষেও কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু কুলপঞ্জিকাসমূহে আদিশূরের বংশাবলী ও রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী মতও দেখতে পাওয়া যায়। তিনি যে যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন বিভিন্ন কুলপঞ্জিকায় তার বিভিন্ন নাম এবং তিনি যে পঞ্চব্রাহ্মণ এনেছিলেন বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের বিভিন্ন নাম দেখে ওই কাহিনীর যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।

(বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন—অতুল সুর। পৃঃ ৯২-৯৬)

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

... বরেন্দ্রভূমি যে ব্রাহ্মণেরা বাস করতেন তারা হয়ে রইলেন বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ, যারা রাঢ়ে বা রাঢ় থেকে বঙ্গে গেলেন তারা রইলেন রাঢ়ী। যাতায়াতের অসুবিধায় জন্য বারেন্দ্র ও রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈবাহিক ব্যাপার ও সামাজিক আদান-প্রদান এল কমে; এবং পরবর্তীকালে, ক্রমে বিশেষত ঘটকদের কারসাজিতে সারা বাংলার প্রধান দুটি ব্রাহ্মণ-সমাজ আত্মঘাতী ও অবাঞ্ছিত রেষারেষির জালে বদ্ধ হয়ে পড়লেন। নইলে বারেন্দ্র ও রাঢ়ী ব্রাহ্মণের মধ্যে সমাজগত কি পার্থক্য রয়েছে বা থাকতে পারে? ...

(বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা—১১০০-১৯৯০ খ্রীঃ পৃঃ ৭৭)

নির্ঘণ্ট